ব্রহ্মসূত্র

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, শাঙ্কর মতানুযায়ী ব্যাখ্যা ও নির্দেশিকা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতীয় দর্শনের বিশাল পরিসরে 'প্রস্থানত্রয়ে'র অন্যতম 'ব্রহ্ম-সূত্র' গ্রন্থের তুলনা নাই। সেইজন্য অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম সঙ্ঘগুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-কৃত ব্রহ্মসূত্রের ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশনায় ব্রতী হইয়াছি।

ইংরাজী হইতে বাংলায় গ্রন্থটি অনুবাদ করিয়াছেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। এই জন্য তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের অনুবাদ যথাসাধ্য ইংরাজীর শব্দানুগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। [ ] বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদক সূত্রটির মূল বক্তব্যকে একটু বিস্তারিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন— যাহা মূল গ্রন্থে নাই।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিখানি পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম.এ. ; বেদান্ত তীর্থ, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, উইমেনস খ্রীস্টান কলেজ, কলিকাতা, ও আংশিক ভূতপূর্ব অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অতিযত্নের সঙ্গে সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অনুবাদকের সহধর্মিণী ৺অধ্যাপিকা অণিমা ধর গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিখানিকে মুদ্রণযোগ্য করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সহসা শরীর চলিয়া যাওয়ায় গ্রন্থখানির প্রকাশ তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

পরিশেষে, গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অনুমতি দিবার জন্য অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আশা করি, সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি বঙ্গভাষাভাষী পাঠকদের তৃপ্তি দান করিবে।

মুখবন্ধ

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কোন কোন কেন্দ্র, ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সীমিতজ্ঞান সম্পন্ন সাধারণ পাঠকদের নিকট বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে, হিন্দুধর্মের মুখ্য শাস্ত্রগুলির মূল অংশ, প্রতিশব্দের অর্থসহ প্রামাণ্য ভাষ্যগুলির উপর টীকার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত স্বামী স্বরূপানন্দ-কৃত ভগবদ্গীতা, এবং রামকৃষ্ণ মঠ মাদ্রাজ কর্তৃক প্রকাশিত স্বামী সর্বানন্দ-কৃত 'Eight Major Upanisads' (মুখ্য অষ্ট-উপনিষদ্) গ্রন্থ দুইটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই একই ভাবের অনুবর্তী ব্রহ্ম-সূত্রেরও একখানি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া বহুকাল যাবৎ-ই প্রত্যাশিত ছিল। বর্তমান গ্রন্থখানি এই অভাব পূরণের জন্য এবং শঙ্করাচার্যের মতানুসারে 'প্রস্থানত্রয়ের' প্রকাশ সমাপনের উদ্দেশ্যেই রচিত। এই গ্রন্থে প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে আক্ষরিকভাবেই, কিন্তু টানা অনুবাদের ক্ষেত্রে সাবলীল পাঠ্যতার সঙ্গতিকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব আক্ষরিকতাকে রক্ষা করারও চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃতির অনুবাদগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে ম্যাক্স মূলার (Max Muller) সম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থ হইতে এবং শ্রীভাষ্যের উদ্ধৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে ডঃ থিবাউট্ (Dr. Thibaut) সম্পাদিত সংস্করণের 'সেক্রেড্ বুক অব দি ইষ্ট' (Sacred book of the East) গ্রন্থাবলী হইতে। উভয় ক্ষেত্রেই উহা গ্রহণ করা হইয়াছে কিছুটা প্রয়োজনমত পরিবর্তিত আকারে।

আমরা আশা করি, এই গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সমান মর্যাদা ও সমাদর লাভ করিবে।

অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, হিমালয়
২৫ নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

সূচীপত্র

গ্রন্থ-সংকেত তালিকা

ঐ. ঐতরেয় উপনিষদ্

ঐ. আ. ঐতরেয় আরণ্যক

ক. কঠ. কঠ উপনিষদ্

কে. কেন. কেন উপনিষদ্

কৌ. কৌষীতকী উপনিষদ্

ছা. ছান্দোগ্য উপনিষদ্

জা. জাবাল উপনিষদ্

তৈ. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

প্র. প্রশ্ন. প্রশ্ন উপনিষদ্

বৃ. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

মহা. মহাভারত

মা. মাণ্ডূক্য উপনিষদ্

মু. মুণ্ডক উপনিষদ্

মৈ. মৈত্রায়ণী উপনিষদ্

শত. ব্রাঃ শতপথ ব্রাহ্মণ

শ্বে. শ্বেত. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

ব্রহ্ম-সূত্র

ভূমিকা

ষড়্‌-দর্শন

যে-কোন সম্প্রদায় বা মতবাদেরই অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন, হিন্দুমাত্রেরই শাস্ত্রগ্রন্থ হইল বেদ। বেদই হইল আধুনিক কাল পর্যন্ত জানা প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এবং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি-সৌধের মূল ভিত্তি। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন বেদ অনাদি এবং অপৌরুষেয় এবং ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মুখনিঃসৃত বাণী নহে। ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কৃত নহে— ইহা স্বয়ং ঈশ্বরেরই নিঃশ্বাস। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত— কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু হইল যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় হইল ব্রহ্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানকাণ্ডকে বেদান্তও বলা হয়। কারণ ইহা বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ এবং বেদপ্রতিপাদ্য সত্যের নির্যাস। বেদ কল্পনা বিলাসের প্রকাশমাত্র নহে, ইহা সমগ্র জাতির বহু শতাব্দীর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রামাণ্য ইতিহাস।

যদিও আমরা বেদের সুপ্রাচীন অংশের কয়েকটি সূক্তের মধ্যে, যথা নাসদীয় সূক্ত, বৈদান্তিক ভাবনার সন্ধান পাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন আর্য ভারতীয়গণ যাগযজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য নাসদীয় সূক্তকে উপনিষদের প্রাথমিক ভিত্তি বলা যাইতে পারে। পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এইসব যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটির উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তী কালের যুক্তিবাদী মননশীল ব্যক্তিরা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের ফলের উপরও সন্দিহান হইয়া উঠেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন এবং পার্থিব সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধানে উপনীত হন। বেদের সূক্তভাগে যে বেদান্ত ভাবনা বীজাকারে নিহিত ছিল, তাহাই কালক্রমে বিবর্ধিত হইয়া উপনিষদ্ আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব ব্যক্ত করার নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষত্রিয়গণ। আর্য ভারতীয়গণ খুবই বলিষ্ঠ ও সাহসিক চিন্তাবিদ ছিলেন। সত্যের তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহারা কোন কিছুকেই ধর্মবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করিতেন না। বেদের মধ্যেই বৈদিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তিবাদের প্রবল বন্যার ফলেই অতি বিরুদ্ধ চার্বাক দর্শনের ন্যায় কতকগুলি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে, যেসব দর্শন ছিল অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং ধর্ম-বিরোধী।

শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব-যুগে এবং শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে ধর্মীয় এবং দার্শনিক চিন্তার বিরাট বিপ্লব দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মজাল সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে অন্ততপক্ষে বাষট্টি-টি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে আমরা তদানীন্তন আর্যাবর্তের বহু শ্রদ্ধেয় ধর্মাচার্য এবং দার্শনিকের নামও জানিতে পারি। যেমন— পুরাণকশ্যপ, কাত্যায়ন, মক্কালি গোসাল, জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নির্গন্থ নাথপুত্র এবং আরও অনেকে। এই সকল মহানুভব মহাত্মাগণ বেদ-বিরুদ্ধ চিন্তার দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিককে প্রকাশ করিয়াছেন। তেমনি আরও বহু মহানুভব মনীষী ছিলেন যাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পরম্পরা আগত ভাবধারাকেও রক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতি ইঁহাদের সকলকেই গভীর শ্রদ্ধা করে।

চার্বাক এবং অপরাপর বেদ-বিরোধী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাচীন বৈদিক সমস্ত মতবাদের ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় বাধ্য হইয়া, নৈষ্ঠিক প্রাচীনপন্থিগণ নিজেদের দার্শনিক চিন্তাকে এমন একটি দৃঢ় যুক্তির বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, উহা অপরের দ্বারা অখণ্ডনীয় হইয়া উঠে। এই দার্শনিক চিন্তা হইতেই ছয়টি আস্তিক্য হিন্দু দর্শনের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা অতীন্দ্রিয় বস্তু নির্ণয়ে বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করিতেন তাঁহাদিগকেই এখানে আস্তিক বলা হইয়াছে। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করিতেন না তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত। যদিও অন্য পক্ষে বলা যায় যে, তাঁহাদের চিন্তাও ছিল উপনিষদের চিন্তারই ফলশ্রুতি। আস্তিক দার্শনিকগণ বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাঁহারাও সকলে বেদকে হুবহু, সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তাঁহাদের বেদের প্রতি আনুগত্যের মধ্যেও বেশ পার্থক্য ছিল এবং স্থল বিশেষে আস্থাও ছিল বেশ শিথিল। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত— এই ছয়টি আস্তিক্য-দর্শনের মধ্যে শেষের দুইটি (পূর্ব ও উত্তর-মীমাংসা) বেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ না থাকার ইহাও একটি কারণ, তাঁহারা অন্য দর্শনগুলির কিন্তু উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ছয়টি আস্তিক্য দর্শন ভারতের সর্বত্রই একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠিতে পরিপুষ্ট হইতেছিল। উপনিষদের যুগেও এই সকল মতবাদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আবার প্রত্যেকটি মতবাদেরই বহু শাখাপ্রশাখাও ছিল। এইভাবে, ভারতে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী নানা দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইয়াছিল। অবিন্যস্ত এই সকল দার্শনিক চিন্তাকে সংহত এবং বিন্যস্ত করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করার ফলেই সূত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি।

সূত্র

গুরুগৃহে শিষ্যগণ আচার্য শিক্ষকের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ কালে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতেন, তাহাকে স্মরণ রাখার জন্য কতকগুলি সাংকেতিক শব্দের দ্বারা উহাকে নিবদ্ধ করা হইত। এই সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত শব্দরাশিকে বলা হয় সূত্র—যাহার অর্থ সন্ধানলাভের সহায়ক। [এই সূত্র হইতেই অধীত বা জ্ঞাতব্য জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। কালক্রমে শাস্ত্রের বিস্তারিত অংশকে স্মরণ রাখার সহায়তার জন্য সুসংবদ্ধ সূত্র গ্রন্থের উৎপত্তি হয়।] খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে চিন্তাকে সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়, কারণ ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, এই চিন্তার অনেকটা অংশই সূত্র পাঠকের জানা আছে। ইহার ফলে চিন্তারাশির সর্বাধিক অংশকে যথাসম্ভব ন্যূনতম অল্প কয়েকটি শব্দের মধ্যেই সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া রাখা হয়। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে মধ্বাচার্য পদ্মপুরাণ হইতে সূত্রের এই সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অল্পাক্ষরমসংদিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

"সূত্র-শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন সূত্র হইবে সংক্ষিপ্ত এবং দ্ব্যর্থহীন, আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ দ্যোতক অথচ সকল প্রশ্নের প্ররোচক, পুনরুক্তি বর্জিত এবং ত্রুটিহীন।" যদিও সূত্রের এই সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে সূত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তথাপি ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সূত্রকে সংক্ষিপ্ত করিবার প্রবণতা এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বর্তমানে সূত্রশাস্ত্রের অধিকাংশই প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষত বেদান্তসূত্র সম্পর্কে এই দুর্বোধ্যতা খুবই প্রকট যাহার ফলে বেদান্তের বহু শাখার (মতবাদের) উৎপত্তি হইয়াছে।

আর্যভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখারই সূত্র ছিল। বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে এই সূত্রগুলি এমনই দুর্বোধ্য এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক সময় এইগুলিকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ হইল। এই সূত্রকারগণ কিন্তু যে সকল মতবাদ তাঁহারা অনুসরণ করিতেন, সেই সকল মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁহারা বহু শতাব্দী যাবৎ অনুসৃত বংশপরম্পরাগত এই সকল চিন্তাবিদদের চিন্তারাশিকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের পরবর্তী চিন্তাবিদ্‌গণ এই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত চিন্তারাশিকে পরিপুষ্ট এবং অনেকক্ষেত্রে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিতও করিয়াছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা তাঁহাদের মৌলিকত্বের দাবি করেন নাই। বরং তাঁহারা ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সূত্রগুলির ব্যাখ্যাতা মাত্র। বিশেষত দার্শনিক সূত্রশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী কালের এই সকল দার্শনিকগণ এই ষড়্‌দর্শনের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বংশপরম্পরা এই সকল চিন্তাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং নব

নব উদ্ভূত বিরুদ্ধপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ইহাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাবে পরিপক্ক এবং সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া বাক্য, বৃত্তি, কারিকা ও ভাষ্য প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্ত্রসাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই পূর্ব-পূর্ববর্তী হইতে অধিকতর ভাবে ব্যাখ্যাত এবং বিস্তারিত রূপ ধারণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম-সূত্র

উপনিষদ্‌গুলিতে পূর্বনির্দিষ্ট এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন দার্শনিক মতবাদের সংস্থান ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবই দৃষ্ট হয়। ইহার জন্যই উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে নিহিত চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্ত-সূত্রের সংকলক বাদরায়ণই যে শুধু উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাকে সংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে। আমরা ব্রহ্ম-সূত্রেই দেখিতে পাই যে, তখন বেদান্তের আরও বহু শাখা এবং সেই সকল মতবাদের বহু অনুগামীও ছিলেন। ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন, বাদরি, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য এবং আরও বহু নামের উল্লেখ ব্রহ্ম-সূত্রে পাওয়া যায়। যদিও সম্ভবত বাদরায়ণের সূত্র সংকলনকেই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, তথাপি এই সকল নামের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রের সূত্রকার একমাত্র তিনিই ছিলেন না। বর্তমানে ভারতবর্ষের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ই এই সূত্রগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন এবং প্রত্যেকটি নূতন সম্প্রদায়ই ইহার উপর এক একটি নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া নিজের মতের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্ম-সূত্রকে বাদ দিয়া এই দেশে কোন ধর্মসম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সূত্রগ্রন্থের রচয়িতা এবং কাল

সূত্রকার বাদরায়ণ সম্পর্কে বর্তমানকাল পর্যন্ত অতি অল্পই জানা গিয়াছে। প্রচলিত কাহিনী-মতে গীতা এবং মহাভারতের গ্রন্থকার ব্যাসদেবকেই বাদরায়ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ব্যাসকে মহাভারতের এবং বাদরায়ণকে ব্রহ্ম-সূত্রের রচয়িতা (গ্রন্থকার) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত তাঁহার মতে এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন। শঙ্করের অনুগামী বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং আরও অনেকে ব্যাস এবং বাদরায়ণকে একই ব্যক্তি বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণ সূত্রগ্রন্থকে ব্যাসদেবেরই রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Deussen জৈমিনি এবং বাদরায়ণের গ্রন্থে উভয় নামেরই একাধিক অংশে উল্লেখ থাকার জন্য মনে করেন যে, পরবর্তী কালের কোন সম্পাদকের দ্বারা উভয় গ্রন্থ এক

হইয়া যাওয়ার ফলেই উভয় নামের একত্ব মনে করা হইয়াছে। ডাসেন বলেন যে, উপবর্ষ এই সম্মিলিত গ্রন্থটির উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। উপবর্ষের এই ভাষ্যের উপরই শবরস্বামীর পূর্ব-মীমাংসা ভাষ্য এবং শঙ্করের উত্তর-মীমাংসার (বেদান্তের) ভাষ্য প্রতিষ্ঠিত। আচার্য শঙ্করের ৩.৩.৫৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য এই মতবাদকে সমর্থন করে। ইহা সাধারণে প্রচলিত এই মতবাদকেও সমর্থন করে যে, দুই মীমাংসার সংহত রূপই মীমাংসাশাস্ত্র। এই সম্মিলিত গ্রন্থটিই হয়তো মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব কর্তৃক সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত হইয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, পরম্পরা আগত বাদরায়ণের মতের উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিজেই এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। সূত্রে বাদরায়ণের নামের উল্লেখ থাকার ইহাই কারণ বলিয়া মনে হয়। Colebrook (কোলব্রুক্) মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকারদের গ্রন্থকর্তৃত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে গ্রন্থকার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা বিরল নহে। MaxMuller (ম্যাক্সমূলার)ও মনে করেন যে, বাদরায়ণ এবং এইজাতীয় নামগুলি বিভিন্ন দার্শনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন স্থান বা কোন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন উপাধি মাত্র।*

এই দুই ব্যক্তি যে একজনই— এই মতবাদের স্বপক্ষে আর একটি সমর্থন পাওয়া যায়। সেই সময়ে, পাণিনি-সূত্রের সমসাময়িক কালে, ভিক্ষু-সূত্র নামে আর একটি সূত্রগ্রন্থ ছিল। বাচস্পতি ভিক্ষুসূত্রকেই বেদান্তসূত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেন ব্রহ্ম, মুখ্যত ব্রহ্মই সন্ন্যাসীদের জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং ব্রহ্ম-সূত্রকে যথার্থ ভাবেই ভিক্ষু-সূত্র বলা যাইতে পারে। পাণিনি তাঁহার সূত্রগ্রন্থে ভিক্ষুসূত্রকে পারাশর্য— পরাশরের পুত্রের অর্থাৎ বেদব্যাসের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। বেদব্যাসকে বাদরায়ণও বলা হইত কারণ তাঁহার আশ্রম ছিল হিমালয়ের অন্তর্গত বদরি নামক স্থানে। পাণিনির কালের পূর্ব হইতেই যে বেদান্তসূত্র এবং পূর্বমীমাংসাসূত্র ছিল তাহা অনুমান করা যায় এই দুই গ্রন্থের উপরই উপবর্ষ-কৃত ভাষ্য হইতে। কথাসরিৎসাগরে এই উপবর্ষকেই পাণিনির গুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই দুই উপবর্ষ যে একই ব্যক্তি ছিলেন তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিতে পারি না।

বেদান্তসূত্রকে ভিক্ষুসূত্র বলিয়া ধরিয়া নিলে নিঃসন্দেহে সূত্রগুলিকে শ্রীবুদ্ধের বহুকাল পূর্বের বলিয়াই নির্ণয় করা যায়। তবুও একটি সন্দেহ থাকিয়া যায়, কিভাবে এত প্রাচীন সূত্রগ্রন্থটি বহু পরবর্তী কালে উদ্ভূত নানা দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ ও তাহাদের খণ্ডন করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূত্রকার কোন দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারই নাম উল্লেখ করেন নাই। এমনকি বিভিন্ন দার্শনিক মতের যেসব

* The Six Systems of Indian Philosophy (1920 Impression) p. 120

প্রাতিভাসিক শব্দ বা সংজ্ঞা আমরা আজকাল পাই তাহাদেরও কোন ব্যবহার বা উল্লেখ করেন নাই তিনি। উপনিষদের যুগের পরবর্তী কালে দার্শনিক চিন্তায় একটি বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল, এই মতবাদগুলিই পরবর্তী কালে নানা শাখার মাধ্যমে এক একটি রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিল। সুতরাং বাদরায়ণ পরবর্তী কালে বিশেষ কোন ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত এই সকল মতবাদের সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত ছিলেন বলিয়া, এই সকল নামের উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাকে ইঁহাদের পরবর্তী বলা চলে না। পরবর্তী কালে উল্লেখিত এই নামগুলি কিছুতেই এই সকল মতবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতার হইতে পারে না। তাঁহারা সেই কালে প্রচলিত বহু মতবাদের মধ্য হইতে বিশেষ কোন মতবাদকে বিশিষ্ট আকারে রূপায়িত করিয়াছিলেন মাত্র। বাদরায়ণ বৌদ্ধ এবং জৈন মতবাদকেও পূর্ব হইতেই ধরিয়া নিতে পারিয়াছিলেন, কেন না বুদ্ধ বা মহাবীর কেহই কোন সম্পূর্ণ নূতন একটি দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। তাঁহারা তৎকালে দেশে প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাগুলি হইতেই নিজেদের চিন্তাকে রূপায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে মূল চিন্তা হইতে খুব বেশি রকমের কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চিন্তারাশিই বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রূপায়িত করিয়া আসিয়াছে। জৈন দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, উহা পার্শ্বনাথের (খ্রীস্টপূর্ব ৮ম-৯ম শতাব্দী) পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, বুদ্ধের আবির্ভাব-পূর্ববর্তী কালের দার্শনিক চিন্তার প্রবল প্রসারের যুগেই এই সকল মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। তাই শ্রীবুদ্ধের এই সকল দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই বেদান্তসূত্রের কোন গ্রন্থকার এই গ্রন্থের তর্কপাদে এই সকল মতবাদগুলির খণ্ডন করিয়াছেন। বর্তমান কালে এই সকল মতবাদকে যে-আকারে আমরা জানি, বা শঙ্কর যে-আকারে উহাদের খণ্ডন করিয়াছেন, পূর্বে হয়তো তাহা সেই আকারে ছিল না।

উপরন্তু শ্রীবুদ্ধের পূর্বেই যে বেদান্তসূত্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা গীতা হইতেও প্রমাণ করা যায়। গীতা এবং গীতা যাহার অন্তর্ভুক্ত সেই মূল মহাভারতের সময়কে শ্রীবুদ্ধের পূর্ববর্তী বলিয়াই প্রমাণ করা যায়। এই দুই গ্রন্থই প্রাক্‌বুদ্ধ কালের, কারণ ইহাদের কোনটাতেই বুদ্ধের বা বৌদ্ধধর্মের কোন উল্লেখ নাই। বোধায়নের আবির্ভাব কাল ৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। বোধায়নের গ্রন্থে এই দুই গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃতি আছে। গীতার ভাষাও পাণিনি-পূর্ব কোন কালের বলিয়াই মনে হয়। তিনি মহাকাব্যের চরিত্রগুলি সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। সুতরাং আমরা নিশ্চিত ভাবেই বলিতে পারি যে, গীতা এবং মহাভারত উভয় গ্রন্থই বুদ্ধের পূর্বেই সুপরিচিত ছিল। গীতার ১৩.৪ শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এখানে আমরা- ‘ব্রহ্ম-সূত্র পদৈঃ’ এই শব্দটি পাই। ইহা নিশ্চয়ই বেদান্ত সূত্রের-ই উল্লেখ। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩।৪

তিলক তাঁহার গীতা-রহস্যে বলিয়াছেন যে, শ্লোকের প্রথমার্ধে সেই সব মতবাদের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা পরস্পর অসংবদ্ধ এবং বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত ছিল। এইজন্যই এইগুলি উপনিষদের শিক্ষাকেই নির্দেশ করে। অপরপক্ষে, শ্লোকের শেষার্ধ সুনিশ্চিত এবং যুক্তিপূর্ণ কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করে। এই শ্লোকের মধ্যে উভয় অংশের স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বেদান্তসূত্রের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। ম্যাক্সমূলারও মনে করেন যে, বেদান্তসূত্র গীতার পূর্ববর্তী কালেই রচিত।[১] বেদান্ত অথবা ব্রহ্ম-সূত্র[২] এই নামে সুপরিচিত কোন গ্রন্থকেই গীতাকার এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ, মধ্ব এবং আরও অনেক ভারতীয় গীতা-ভাষ্যকার গীতার এই শ্লোকে বেদান্তসূত্রকেই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু বেদান্তসূত্র যদি গীতা অপেক্ষা প্রাচীনকালের হয় তাহা হইলে উহা গীতাকে কিভাবে উল্লেখ করিতে পারে? ২.৩.৪৫ এবং ৪.২.২১ সূত্র দুইটিতেই সকল ভাষ্যকারই গীতার একই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা সকলেই অভ্রান্ত। এইরূপ পারস্পরিক উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান আকারে প্রাপ্ত ব্রহ্ম-সূত্রের উপর গীতাকারের কিছু কৃতিত্ব ছিল। গীতা এবং ব্রহ্ম-সূত্র উভয়েরই ভাগবতের চতুর্ব্যূহকে পরিহার করিয়া সাংখ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেও এই অনুমান আরও স্পষ্ট হয়। গীতা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বকে স্বীকার করে, কিন্তু ইহাকে কিছুটা নিজের মতো পরিবর্তিত করিয়া নিয়া প্রধানকে গৌণ এবং অদ্বৈত পরম ব্রহ্মকে মুখ্য করিয়াছে। বেদান্তসূত্রেও গ্রন্থকার সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। প্রধান বা প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের অধীন সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই (১.৪.২-৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। আচার্য শঙ্কর এই সূত্রগুলির ভাষ্য প্রসঙ্গে ইহাকে বিশদভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বেদান্তসূত্র যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালেই ছিল তাহার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রচলিত ধারণা মতো বাদরায়ণ এবং বেদব্যাস যদি একই ব্যক্তি না-ও হন, তাহা হইলেও বর্তমান বেদান্তসূত্রের উপর বেদব্যাসের হস্তক্ষেপ নিশ্চিতই ছিল। তাঁহার কৃতিত্ব কতটুকু ছিল, তিনি কি বাদরায়ণের মূল সূত্রগুলিকে শুধুমাত্র সংশোধনই করিয়াছিলেন, অথবা বাদরায়ণের মতানুযায়ী সূত্রগুলিকে হুবহু এই ভাবেই রচনা করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

---

১ The Six systems of Indian Philosophy, p. 113
২ তদেব, পৃঃ ১১৮

ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যকারগণ

বাদরায়ণের ব্রহ্ম-সূত্র যে খুবই প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ফলে বহু মহান আচার্যই ইহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যই হইল বিস্তারিত ভাষ্যের মধ্যে প্রাচীনতম। আচার্য শঙ্কর এবং ভাস্কর উপবর্ষ রচিত একটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষ্যে। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বোধায়ন রচিত একটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে বহু উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। শঙ্কর বোধায়নের কোন উল্লেখই করেন নাই। বেদান্ত দেশিকের মতানুসারে এই দুইজন একই ব্যক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় বোধায়নের এই গ্রন্থখানা বর্তমানকালে দুষ্প্রাপ্য। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদীদের গ্রন্থ দ্রামিড় ভাষ্য হইতেও রামানুজ বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনায় শঙ্করের পরবর্তী কালে যাদব প্রকাশ, ভাস্কর, বিজ্ঞান ভিক্ষু, রামানুজ নীলকণ্ঠ, শ্রীপতি, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ এবং বলদেব প্রমুখ অনেকেই আবির্ভূত হন। তেমন মূল্যবান না হইলেও সাম্প্রতিক কালেও কিছু ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ইঁহাদের সকলেই প্রমাণ করিতে সচেষ্ট যে, তাঁহাদেরই মতবাদ বাদরায়ণ তাঁর সূত্রের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন।

বর্তমান কালে এই পাঁচজন মহা-ভাষ্যকারের অনুগামীদের সংখ্যাই সমধিক : অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য রামানুজ, ভেদাভেদবাদের প্রবক্তা নিম্বার্কাচার্য, দ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য মধ্ব এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য বল্লভ। বাদরায়ণ তাঁহার সূত্রে যে-সকল প্রাচীন বৈদান্তিক মতবাদসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন এই সকল মতবাদও তাহাদেরই কোন না কোন শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, একই গ্রন্থ হইতে এতগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের কি-ভাবে উৎপত্তি হইতে পারে ? ইহার কারণ অনেক। প্রথমত সূত্রগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, ভাষ্যকারগণ ইহাদের মধ্যে নিজস্ব কিছুও সংযোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সর্বজনগ্রাহ্য, পরম্পরা আগত অবিচ্ছিন্ন কোন ধারার অস্তিত্ব না থাকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বদ্ধমূল ধারণাকে ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন কিছু সংযোগ না করিয়াও একই সূত্রকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থেও ব্যাখ্যা করা চলে (যেমন- ৩.২.১১ সূত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে শঙ্কর এবং রামানুজ)। শুধুমাত্র একটি যতিকে স্থানান্তরিত করিয়া দুই বিপরীতভাষ্য করিয়াছেন। আবার, কোন গ্রন্থকে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ভাগ প্রভৃতি হিসাবে সাজাইবার একটা প্রচলিত রীতি অল্প বিস্তর সর্বত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সূত্রের বিষয়বস্তুকে অধিকরণগুলিতে সাজাইবার ক্ষেত্রে এইরূপ কোন প্রচলিত রীতির অনুসরণ করা হয় নাই। এমনকি সূত্রগুলির মধ্যে কোন্‌টি

পূর্বপক্ষ এবং কোন্‌টি সিদ্ধান্ত তাহা নির্ণয় করার মতো কোন নির্দেশও গ্রন্থে নাই। সুতরাং নিজের ইচ্ছামতই সূত্রগুলিকে বিষয়বস্তু হিসাবে সাজাইবার স্বাধীনতা ভাষ্যকারদের আছে এবং যে-কোন সূত্রকেই গ্রন্থকারের মত বলিয়া গ্রহণ করার স্বাধীনতাও আছে। শাস্ত্রের কোন্ অংশ সূত্র বিশেষে আলোচিত হইতেছে ইহারও কোন উল্লেখ সূত্রগুলিতে নাই। ইহার ফলে ভাষ্যকারগণ অনন্ত শাস্ত্ররাশির যে-কোন অংশকেই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছেন। এই স্বাধীনতা এমন পর্যায়ে উঠিতে পারে যে, অনেকক্ষেত্রে একই সূত্রগুচ্ছে বিভিন্ন ভাষ্যকারকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিতে দেখা যাইবে। ইহার পরও সর্বোপরি অসুবিধা হইল এই যে, বাদরায়ণ তাঁহার নিজস্ব কোন মত প্রকাশের ব্যাপারে বহুক্ষেত্রেই নীরব, এমনকি কোন মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও নীরব। তিনি বিভিন্ন বেদান্তবাদীর মত মাত্র উপস্থাপিত করিয়াই আলোচনা শেষ করিয়াছেন (দ্রঃ ১.৪.২০-২২)।

এই পাঁচজন মহা-ভাষ্যকার কোন বিষয়ে অল্প বিস্তর একই মত পোষণ করেন; বিশেষত সূত্রকার যেখানে যেখানে বেদান্ত-বহির্ভূত মতবাদকে আক্রমণ করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রে। ব্রহ্মই এই বিশ্বের কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই জীবের পরম কাম্য মোক্ষ লাভ হয়; একমাত্র শাস্ত্রের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা সম্ভব, শুধু তর্কের দ্বারা নয়— এই সকল বিষয়ে ইঁহাদের সকলেই একমত পোষণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কার্যকারণ সম্বন্ধ, জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, এবং মুক্ত অবস্থায় আত্মার স্বরূপ কি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে।

আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, শাশ্বত, শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহার মতে ঈশ্বর হইলেন মায়া সৃষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মের জীবাত্মার বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জগৎ হইল নির্গুণ ব্রহ্মেরই মায়াসৃষ্ট বিবর্ত— ইহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। প্রকৃতপক্ষে জীব হইল সর্বব্যাপী এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যদিও অন্তরেন্দ্রিয়দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট দেহধারী হইয়া সে নিজেকে অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে করে। নির্গুণ ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবেই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহাদের 'দেবযানের' মাধ্যমে যাইতে হয় না। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মকে জানেন তাঁহাদেরই দেবযানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়। ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহাদের আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না— কল্পান্তে তাঁহারা ব্রহ্মেই লীন হন। জ্ঞানই হইল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতানুসারে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, তিনি অনন্ত কল্যাণ-গুণসম্পন্ন সাকার ঈশ্বর। তাঁহারা মনে করেন যে, যদিও মানুষের ব্যক্তিত্ব সসীমরূপেই অনুভূত হয়, তথাপি শঙ্করের মতানুযায়ী ইহাকে যদি অবিকলভাবে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে আরোপ

না করা হয়, তবে আর তাঁর অসীমত্বে আপত্তি আসে না। তাঁহারা শঙ্করের মায়াবাদকে স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহাদের নিকট জগৎ সত্য এইজন্য যে, ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্বাচার্য কিন্তু ব্রহ্মকে নিমিত্ত-কারণ মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করেন, উপাদান-কারণ হিসাবে নহে। তাঁহাদের মতে জীব বাস্তবিকই অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরেরই অংশ বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেবযানের পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হন এবং আর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁহারা শঙ্করের ন্যায় জ্ঞানকে উচ্চ বা নিম্ন বলিয়া পার্থক্য করেন না। তাঁহাদের মতে ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়, জ্ঞান নহে।

এইরূপে তাঁহাদের সকলের নিকটই ব্রহ্ম, জগৎ এবং জীব সব কিছুই সত্য। রামানুজ এই তিনটিকে একই অঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাঁহার মতে জগৎ এবং জীব ব্রহ্মেরই দেহ। ভেদাভেদবাদের মতানুসারে নিম্বার্কাচার্য ভেদ এবং অভেদ এই উভয় কল্পনা করিয়া এই তিনটিকেই (ব্রহ্ম, জগৎ এবং জীব) ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত করিয়া বলিয়াছেন যে, চেতন এবং অচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। কট্টর (ঘোর) দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য এই তিনটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিত্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহার মতে ব্রহ্মই হইলেন অপর দুইটির নিয়ন্তা। বল্লভাচার্যের মতে জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই অভিন্ন স্বরূপ। তাহারা সকলেই সত্য—ব্রহ্ম হইতে তাহারা অভিন্ন, তবে ব্রহ্ম হইলেন পূর্ণ, আর অপর দুইটি হইল তাঁহার অংশ।[১]

ব্রহ্ম-সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য

শঙ্করাচার্যের আধ্যাত্মিক মতবাদের নিজস্ব মহিমা যতই থাকুক না কেন, অথবা উপনিষদের ব্যাখ্যায় তিনি যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ দৃঢ়তার সঙ্গেই মনে করেন যে, বাদরায়ণের সূত্রভাষ্য প্রসঙ্গে শঙ্কর সুবিচার করেন নাই। আধুনিক সমালোচকগণ মনে করেন যে, বাদরায়ণ ব্রহ্মের দুই প্রকার স্বরূপ এবং ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে জ্ঞানেরও দুই স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। মায়াবাদও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল সুতরাং তিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। ব্রহ্ম বিবর্তিত হইয়াই জগৎরূপে প্রকাশিত। সূত্র এমন কোন মতবাদ পোষণ করে না যে, জীব এবং ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতানুসারে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাদরায়ণের মত ছিল ঈশ্বর-বিশ্বাস-নির্ভর এবং তাঁহার মতবাদের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতবাদ অপেক্ষা রামানুজ এবং নিম্বার্কের মতবাদেরই অধিকতর সাদৃশ্য ছিল। পণ্ডিতদের এই অভিমত নূতন নয়। আচার্য ভাস্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভেই শঙ্করাচার্যকে এই বিষয়েই অভিযুক্ত

১ For details see the various Bhasyas on Sutra 1.1.2, 1.4.23, 26; 2.1.26-28, 2.3.18-53, 3.2.30, 4.2.12-14 এবং 4.4.1-7

করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা ভক্তিসূত্র প্রণেতা শাণ্ডিল্যের মতও উদ্ধৃত করিতে পারি। শাণ্ডিল্য তাঁহার ৩০ সংখ্যক সূত্রে বাদরায়ণকে অদ্বৈতবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, বাদরায়ণ যে অভেদবাদী ছিলেন— এই ধারণাটি প্রাচীনকালে, এমনকি ব্রহ্মসূত্রের রচনার সময়েই প্রচলিত ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এইরূপ একটি বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর আমরা এই আলোচনার প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দেখিব শঙ্করের বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা কতটা যুক্তিপূর্ণ। অবশ্য প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে শঙ্করের ব্যাখ্যাকে কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই কষ্টকল্পিত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই দোষ যে শুধু তাঁহার ভাষ্যেরই আছে তাহা নহে, অপর সকল বিস্তারিত ভাষ্যই এই দোষ-দুষ্ট। উপরন্তু, সূত্রগুলির বিচারমূলক পাঠে সমগ্র সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য ভাবকে বর্জন করিয়া শুধু সূত্রের অক্ষরার্থ লইয়া বিচার করিলে আমরা খুব লাভবানও হইব না। শুধু সূত্রের অক্ষরার্থ হইতেই সূত্রগুলির সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু সেইক্ষেত্রে আমরা সমগ্র গ্রন্থের মূল ভাবটি হইতে বঞ্চিত হইব।

পৌর্বাপর্যাপরামৃষ্টঃ শব্দোঽন্যাং কুরুতে মতিম্।

"শ্রুতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একটি মাত্র ভাবদ্যোতক হিসাবে পাঠ না করিলে উহা হইতে বিরুদ্ধভাবের জ্ঞানও হইতে পারে।" মোট কথা, শুধু সূত্রের শব্দার্থ ইহার ভাবকে অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট করিতে পারে।

সূত্র ২ : নির্গুণ ব্রহ্মেরই নির্দেশক

প্রথমে আমরা বাদরায়ণ ২ সংখ্যক সূত্রে ব্রহ্মের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহা লইয়া আলোচনা করিব। ১ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু। পরবর্তী সূত্রেই ব্রহ্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই আমরা বুঝিয়া লইতে পারি যে, মোক্ষের হেতু ব্রহ্মকেই এখানে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইভাবে এখানে আমরা সগুণ ব্রহ্মকেই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসাবে পাইয়া গেলাম, শঙ্করাচার্য বর্ণিত সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে নহে। সুতরাং মনে হয় যেন গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই শঙ্করের মতবাদকে তাঁহার সূত্রগুলির মধ্যে পঠিত এবং আলোচিত হইবার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা আর একটু সন্ধান করিয়া দেখিতে পারি ব্যাপারটি ঠিক এইরূপ কি না।

১ সূত্রে 'ব্রহ্মকে জানিতে হইবে'— এইরূপ বিবৃতির পর, স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে— 'ব্রহ্মের স্বরূপ কি ?' সূত্রকার এখানে পূর্ব হইতেই একটি আপত্তি অনুমান করিয়া নিয়াছেন

যে, ব্রহ্মের লক্ষণ কিছুতেই নির্দেশ করা যায় না। কারণ এই বিশ্বে যাহাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই সসীম সুতরাং সসীম কোন কিছু অসীম অনন্ত ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। সীমাবদ্ধ কোন বস্তু অসীম বস্তুকে নির্দেশ করিতে পারে না। আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা বহির্ভূত কোন লক্ষণের দ্বারাও, যেমন কোন বস্তুর সত্তার ধারণা ইত্যাদি, আমরা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে পারি না। কারণ সুবিজ্ঞাত লক্ষণের দ্বারাই কেবল কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ করা এবং ঐ বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করা যায়। পুনশ্চ শাস্ত্র ব্রহ্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম অনুপম অদ্বিতীয় বলিয়া ইহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং কোন সংজ্ঞা বা লক্ষণ না থাকার জন্য ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ও (জ্ঞাতব্য) হইতে পারেন না এবং ইহার দ্বারা মানুষের কোন প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। এই সকল আপত্তি খণ্ডনের জন্যই সূত্রকার ২ সূত্রে ব্রহ্মের সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন। ধরিয়া নেওয়া গেল যে, আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জাগতিক কোন বস্তুর দ্বারা ব্রহ্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না, এই বস্তু ব্রহ্মের গুণই হউক অথবা ইহা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নই হউক, তথাপি ইহার (ব্রহ্মের) জগৎ উৎপত্তির কারণত্ব হইতেই ইহার ধারণা সম্ভব। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে এই জন্মাদির উল্লেখ দ্বারাই ব্রহ্মের লক্ষণ ব্যাকরণভাবেই নির্ধারিত হইল। যদিও জন্মাদি জাগতিক ব্যাপার এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি কারণত্ব সম্পর্কে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সংশ্রব থাকায় এই লক্ষণ যথার্থ। এই কারণত্বই ব্রহ্মকে নির্দেশ করে। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রমের সময় আমরা সর্পকে রজ্জুতে আরোপ করি এবং বলি সর্প এবং রজ্জু একই বস্তু। আসলে ভ্রান্তিবশতই আমরা সর্প এবং রজ্জুকে এক বলিয়া মনে করি। সুতরাং এই লক্ষণ বাস্তবিকপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে, ইহাকে সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।[১]

উপরন্তু এই সূত্রে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতেও উদ্ধৃতি আছে— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে......তৎ ব্রহ্ম ইতি"(৩.১) "যাহা হইতে এই সকল বস্তু জাত......তিনিই ব্রহ্ম"। 'তৎ' এই শব্দটি দ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মকে ইহার অব্যবহিত পূর্ব অধ্যায় আনন্দবল্লীতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই শাস্ত্রাংশ হইতেই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপটি অবগত হইতে পারি।

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে সূত্রকার কেন ব্রহ্মের বাস্তবস্বরূপ "সৎ-চিৎ-আনন্দ" এই সংজ্ঞায় নির্ধারিত না করিয়া পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিলেন? ইহার উত্তর হইল— সূত্রকার এখানে শিক্ষার্থীকে গুরুতর বিষয়ে শিক্ষা দিবার চিরাচরিত পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে নিম্নতর হইতে উচ্চতর এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর

---

১ ২ সূত্রের শঙ্করের ভাষ্যের উপর ভামতী ও রত্নপ্রভা

বিষয়ের ধারণা দিতে হয়। শিশুকে চন্দ্র দর্শন করাইতে হইলে প্রথমে কোন বৃক্ষের উচ্চ শাখায় তাহার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বৃক্ষশাখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই পরবর্তী ধাপে শিশু চন্দ্রকে দর্শন করিতে পারে। সেইরূপভাবে ব্রহ্মকে সর্বপ্রথম কারণ হিসাবে জগতের সৃষ্ট পদার্থসমূহ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, আনন্দ হইতেই এই বিশ্ব জাত হইয়াছে। পরে ব্রহ্মকে অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ, যথা অণু, প্রধান প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এইভাবেই পরিশেষে অন্যান্য বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সাধকের মন জগতের সকল ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, তিনি প্রথমে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া ধারণা করিবেন। যদিও ব্রহ্ম এই জগতের অভ্যন্তরেই অন্তরাত্মারূপে অনুস্যূত হইয়া আছেন, তথাপি তাঁহাকে দূর বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। এইজন্যই শ্রুতি প্রথমে শিক্ষা দেন যে, ব্রহ্ম জগতের কারণ, তারপর তার ব্রহ্ম সম্পর্কে দূরত্বের ধারণাকে দূর করিয়া শিক্ষা দেন যে, ব্রহ্ম তাহারই অন্তরাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব ও ব্রহ্মের এই একত্ব অনুভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়াই মনে হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতেও আমরা জানি যে, অবিচ্ছিন্ন আনন্দই ব্রহ্ম। "একমাত্র ভূমাই আনন্দ, ভূমাকেই আমাদের জানিতে হইবে" (৭.২৩.১)। এই ভূমা বা অনন্ত কি, যাহাকে আমরা আনন্দ বলি ? উপনিষদ্ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন— "যেখানে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না তাহাই ভূমা। যেখানে অন্য কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য থাকে তাহাই অল্প (সসীম)। ভূমাই অমৃত, অল্পই মৃত্যু।" (তদেব, ৭.২৪.১)। এই অদ্বৈত আনন্দই ভূমা, আনন্দবল্লীতে ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দম্' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতেই সকল ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। বরুণের পুত্র ভৃগু এইরূপেই ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

পুনশ্চ, তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই যে উদ্ধৃতি— "যাহা হইতে ভূতসকল জাত......তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তাহাই ব্রহ্ম"। তাহা অদ্বৈত ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছে, এখানে সগুণ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে নাই। ইহা ব্রহ্মকে বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ হিসাবেই নির্দেশ করিয়াছে— কারণ ব্রহ্মই সৃষ্টির লয়ের স্থল। সব কিছুরই উপাদান কারণ হওয়ায় ব্রহ্মই সব কিছুর মূল সত্তা। ইহা হইতে এই ধারণাই জন্মে যে, ব্রহ্ম অদ্বৈত এবং অন্য সব কিছুই অ-সৎ। ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম অদ্বৈত, সেই হেতু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুরই নিমিত্ত কারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইভাবে এই উভয় সংজ্ঞাই অভিন্ন এবং অদ্বৈত

ব্রহ্মকেই ব্যাকরণগতভাবে বুঝাইয়াছে বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ-রূপে। মৌলিক অণুসমূহের সমবায়ে যেমন নূতন কিছু উৎপন্ন হয়, সেইরূপভাবে অদ্বৈত, অপরিণামী এবং চেতন ব্রহ্মেরও কোন উৎপত্তি সম্ভব নয়। অথবা সাংখ্যের প্রধানের মতো ইহা কোন কিছুর রূপান্তরও হইতে পারে না। মায়া বা অজ্ঞানের মাধ্যমে বিবর্তিত হইয়াই ব্রহ্ম জগতরূপে আপাত রূপান্তরিত হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র।[১] ইহা যে বাদরায়ণের মতকেই সমর্থন করে তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যখন তিনি 'সৎ' এই শব্দকে শুধু ব্রহ্মেরই লক্ষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। জীব এবং জগতকেও যদি তিনি ব্রহ্মের ন্যায় 'সৎ' বলিয়া মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি এই শব্দের এইরূপ ব্যবহার করিতেন না (সূত্র ২.৩.৯ দ্রষ্টব্য)। সকল ভাষ্যকারই এই 'সৎ' শব্দটিকে এখানে ব্রহ্মকে বুঝাইতেই ব্যবহার করিয়াছেন।

এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাদরায়ণ নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝাইবার নিমিত্তই এই লক্ষণটি দিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য নহে। এবং বিশাল শাস্ত্ররাশি হইতে তাঁহার লক্ষণকে সমর্থন করে এইরূপ অর্থবহ শাস্ত্রবাক্যসমূহই তিনি নির্বাচন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম কি জগতের যথার্থ কারণ না প্রাতিভাসিক কারণ ?

এখন আমরা ব্রহ্মের কারণত্ব সম্পর্কিত সূত্রগুলির আলোচনা করিয়া দেখি, যথা সূত্র ১.৪.২৩-২৭ এবং সূত্র ২.১.১৪। ইহার পূর্বে আমরা গ্রন্থের ২.১.১৪ পর্যন্ত সূত্রগুলির সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করিয়া লইব। ২ সূত্রে ব্রহ্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়া সূত্রকার ১.১.৫ হইতে ১.৪.১৩ এবং ১.৪.২৩-২৭ সূত্রের মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রের সকল উদ্ধৃতিই শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্ম হইলেন জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। তিনি সাংখ্যমতকে ১.১.৫-১১ এবং ১.৪.১-১৩ সূত্রগুলিতে খণ্ডন করিয়াছেন। ১.৪.১৪-২২ সূত্রগুলিতে তিনি প্রথম কারণ সম্পর্কে শ্রুতিশাস্ত্রের উদ্ধৃতির মধ্যে যে স্ববিরোধ ভাব আছে বলিয়া সাংখ্যকাররা আপত্তি তুলিয়াছেন তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। উপসংহারে ২৮ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, সাংখ্যের মত খণ্ডনের দ্বারাই অন্যদের আপত্তিও খণ্ডন করা হইয়াছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ২.১.১-২ সূত্রে সাংখ্য, যোগ এবং স্মৃতির প্রামাণ্যকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৪-১১ সূত্রগুলিতে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত না করিয়াই যুক্তিদ্বারা সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যদের আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না, কারণ ব্রহ্ম এবং জগতের প্রকৃতি ভিন্ন— সুতরাং তাহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ১২ সূত্র অতীন্দ্রিয় বিষয়কে তর্কের দ্বারা

---

১ সিদ্ধান্তলেশ— ব্রহ্মলক্ষণ বিচার

প্রতিষ্ঠিত করাকে খণ্ডন করিয়াছে। এইভাবে যে-সকল মতবাদ তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের সবকয়টিকেই খণ্ডন করা হইয়াছে। ১৩ সূত্রে— ব্রহ্ম যদি উপাদান কারণ হন তাহা হইলে ভোক্তা এবং ভোগ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না, অথচ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা এই পার্থক্য অনুভব করিয়া থাকি— সাংখ্যের এই মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সূত্রে এই আপত্তিকে এইভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে— এইরকম পার্থক্য অভিন্ন জিনিসের মধ্যেও থাকিতে পারে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন প্রভৃতির পার্থক্যজ্ঞান আমাদের হয়, যদিও ইহারা সমুদ্র হইতে অভিন্ন। সুতরাং বৈদান্তিক মতবাদও স্ববিরোধী অভিজ্ঞতার যুক্তিতে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া যায় না। তারপর, দ্বৈত এবং অদ্বৈত এক এবং অভিন্ন বস্তুর মধ্যে অবস্থান করিতে পারে না, কারণ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের দৃষ্টান্ত সঠিক হইত যদি ব্রহ্মের কোন আকৃতি থাকিত; কিন্তু অদ্বৈত সত্তার কোনরূপ আকার স্বীকার করা হয় না। উপরন্তু ১৩ সূত্রে, ১.৪.২৩ সূত্রে যে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি আছে— "যাহাকে জানিলে সবই জ্ঞাত হইয়া যায়"— তাহার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। এই দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্যই ১৪-২০ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কার্য বস্তুত কারণ হইতে অভিন্ন; অর্থাৎ কার্যের কারণ হইতে পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই।[১]

'অভিন্নত্ব' অর্থ এখানে 'একত্ব' নহে— ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তাহাই বুঝানো হইয়াছে।[২] অন্যভাবে বলিতে গেলে ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়ের সত্যতার মাত্রা একরূপ নহে।[৩] ইহাই বক্তব্যের তাৎপর্য। জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সত্তা হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতিবচনটি বিরুদ্ধ হইয়া যায়— "কেবলমাত্র আত্মাই ছিলেন" (বৃ. ১.৪.১, ১.৪.১৭)। আবার জগৎ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতিবচনটি বিরুদ্ধ হইয়া যায়— "এখানে যাহা আছে, সেখানে তাহার কিছুই নাই—" (বৃ. ৪.৪.১৯)। সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম হইতে অ-ভিন্ন। কিন্তু অভিন্নত্ব বলিতে একত্ব বুঝায় না। জগৎ এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে এই ধারণা অসম্ভব, কারণ, ইহাদের প্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং এখানে অভিন্নত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে যে ব্রহ্ম হইতে ইহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ইহা পার্থক্যকে স্বীকার করে না। একত্বের অস্বীকৃতির দ্বারা কিন্তু জগৎ এবং ব্রহ্মের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল না। ইহাদ্বারা শুধু আপাত প্রতীয়মান একত্ব বা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিপূর্ণ একত্ব দেখাইয়া জগতের ভ্রান্ত প্রকৃতি নির্ণয় করা হইল। ইহাই ছান্দোগ্য

---

১ শঙ্কর সূত্র ১৪ আলোচনা

২ ভামতী সূত্র ১৪

৩ সিদ্ধান্তলেশ, ব্রহ্মকারণত্ববিচার

উপনিষদে ৬.১.৪ মন্ত্রে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইভাবেই শুধু একের জ্ঞানের দ্বারা বহুকে জানা যায়। অন্য কোন অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম হইতে জগতের অ-ভিন্নত্ব যখন স্বীকৃত হইল, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে যে, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন জীবের দুঃখকষ্টের ও দুষ্কৃতির জন্য ব্রহ্মই দায়ী। ২.৩.২১-২৩ ও ২৪-২৫ সূত্রগুলিতে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখানো হইয়াছে যদিও ব্রহ্ম উপাদান এবং করণরহিত তথাপি তিনিই জগতের কারণ, যেমন দুগ্ধ বাহিরের কোন কিছুর সাহায্য না লইয়াই দধির কারণ রূপে বর্তমান। এই দৃষ্টান্ত আবার ২৬ সূত্রে নূতন এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে— ব্রহ্ম একই সময়ে অপরিবর্তনীয় এবং জগতের মধ্যে পরিবর্তিত আকারে থাকিতে পারেন না। এই আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে ২৭ সূত্রে। সেখানে বলা হইয়াছে যে শ্রুতিতে এই দুই বিরুদ্ধ মতের উক্তিই আছে, সুতরাং ইহাকে অবশ্যই মান্য করিতে হইবে, কারণ, ব্রহ্ম সম্পর্কে শ্রুতিই একমাত্র প্রামাণ্য। এই উভয় বিপরীত মতকে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে তাহা দেখানো হইয়াছে ২৮ সূত্রে। সেখানে বলা হইয়াছে, যেমন স্বপ্নে জীবাত্মাতে নানারূপ সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, অথচ তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না— সেইরূপে এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মের স্বকীয়ত্ব কোন প্রকারে ক্ষুন্ন হয় নাই। এখানে যে দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করা হইল তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইহা হইতে জানা যায় যে, বাদরায়ণ মায়াবাদের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন; কেন না, তিনি মনে করিতেন যে, উচ্চতর ভাবনায় এই জগৎ মিথ্যা, যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট জগৎ মায়া (৩.২.৩)। এই দুইটি সূত্রে এবং একই সঙ্গে ২.৩.৫০ ও ৩.২.১৮ সূত্র দুইটি প্রমাণ করে যে, তিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই মনে করিতেন। পরবর্তী সূত্রগুলিতে দেখানো হইয়াছে যে, ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে সর্বপ্রকার সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষমতা ধারণ করেন, এবং আরও অনেক কিছু।

উপরের এই সারসংক্ষেপ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই কতটা যুক্তিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শঙ্কর এই সূত্রগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাদরায়ণ এই সূত্রগুলিতে যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার কোন সম্ভাবনাই শঙ্কর রাখিয়া যান নাই।

এইভাবে বাদরায়ণ সূত্রগ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রথম অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাংখ্যবাদীরা ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার আলোচনায় মুখ্যত সাংখ্যবাদীরাই প্রতিপক্ষ ছিলেন। যেহেতু তাঁহারাও প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁহাদের মতবাদের সপক্ষে শাস্ত্রের উদ্ধৃতিই উপস্থাপিত করিতেন, সেইজন্য বাদরায়ণের মতের তাঁহারাই ছিলেন প্রধান বিরুদ্ধপক্ষ। সাংখ্যবাদীদের

মতকে খণ্ডন করিয়া, তিনি 'এই যুক্তিতেই অন্য মতও খণ্ডিত হইল' বলিয়া অন্যদের মতকে খণ্ডনের নিষ্পত্তি করিতেন। আচার্য শঙ্করও, তাঁহার সূত্রভাষ্যের উপরের আলোচনা হইতেই আমরা দেখিয়াছি, প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাংখ্যবাদীদের মতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন অথবা যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আপত্তির উত্তর দিয়াছেন।

আচার্য শঙ্করের কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, সূত্রকার সাংখ্যবাদীদের মত খণ্ডনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্র ৪-১১, এবং বিশেষত প্রথমপাদের সূত্র ৬ তে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শঙ্করের দৃষ্টিকোণ হইতে খুব সুপ্রযুক্ত হয় নাই। কারণ তাঁহার মতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, মায়া-উপহিত ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ২৪ সূত্রও অপ্রযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় যদি জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। কারণ এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিজেকেই জগৎরূপে বিবর্তিত করিয়াছেন যেমন দুগ্ধ দধিতে রূপান্তরিত হয়। ১.৪.২৩ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ; অথচ ইহা বলা হয় নাই যে, মায়ার সাহায্যেই ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। অপরপক্ষে ১.৪.২৬ সূত্রে 'পরিণামাৎ'— এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া দেখানো হইয়াছে ব্রহ্ম কিভাবে জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন।

এই সমালোচনাকে খুব প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। ২.১.৪-১১ সূত্রগুলিতে ব্রহ্মের উপাদান কারণত্বের বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এখানে সূত্রকার ব্রহ্মকে উপাদান কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এই কারণত্বের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করার বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। এইভাবে তিনি সাংখ্যবাদীদের দ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ সাংখ্যবাদীরা অন্যনিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে প্রধানকে প্রথম কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩ সূত্র পর্যন্ত তিনি সাংখ্যবাদীদের নিজস্ব বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে উত্থাপিত আপত্তিগুলিকে খণ্ডন করিয়াছেন। কারণত্বের যথার্থ তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে ১৪ সূত্রে। ইহা সত্য নয় যে, শঙ্কর শুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ নয় বলিয়া মনে করেন এবং শুধু মায়া উপহিত ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন। ১.৪.২৩ সূত্রে ব্রহ্ম বা শুধু বিজ্ঞান রূপকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু এইজন্যই আমরা জগৎরূপ কার্যকে সর্বতোভাবে ব্রহ্মরূপ কারণের সঙ্গে একরূপ বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি না। শঙ্কর তাঁহার ২.১.৬ সূত্রের ভাষ্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, কার্য এবং কারণ সর্বতোভাবে এক হইতে পারে না। যদি তাহারা একই হয়, তাহা হইলে কার্য এবং কারণ বলিয়া কোন পার্থক্য

থাকে না। তাই তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করা হয়। কার্য এবং কারণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইল এই যে, কার্যের মধ্যেও কারণের কিছু গুণকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। ব্রহ্ম এবং জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ে এই শর্তটি নিঃসন্দেহে বর্তমান। এই জগতের প্রত্যেক বস্তুরই সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। সৎ-রূপী ব্রহ্ম হইতেই সকল বস্তুর অস্তিত্বগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইরূপ বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের গুণেই সকল বস্তু অবভাসিত। সুতরাং ১.৪.২৩ সূত্রে বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে যে জগতের কারণ বলা হইয়াছে তাহাতে শঙ্করের ভাষ্য ইহার বিরোধী হয় নাই। এই সূত্রে (১.৪.২৩) আরও বলা হইয়াছে— "এই মত ছাঃ ৬.১.১৪ সূত্রে প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ নহে।" কি অর্থে বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব এই বিবৃতির (যুক্তি প্রদর্শনের) বিরোধী নহে তাহা সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন ২.১.১৪ সূত্রে। এই সূত্রগুলি হইতেই আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ম এবং মায়া উভয়কে জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিবর্তনের মাধ্যমে এবং মায়া পরিণামের মাধ্যমে জগৎরূপ কার্যে বর্তমান, কারণ ইহাদের উভয়ের গুণগুলিই কার্যে দৃষ্ট হয়। যেমন ঘট জ্ঞান হইতে আমরা পাই 'ঘটটি আছে'— 'ঘটটি জড়' ইত্যাদি। এখানে ঘটের অস্তিত্ব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন কারণ ব্রহ্মই অস্তিত্ব-স্বরূপ, এবং জড়ত্ব মায়ার সহিত অভিন্ন, কারণ মায়া জড়। এই জগতের প্রত্যেকটি বস্তুরই পাঁচটি উপাদান আছে— যথা অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম এবং রূপ। প্রথম তিনটির মধ্যে ব্রহ্ম উপাদান কারণরূপে বর্তমান, যেহেতু ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ— এই তিনটি উপাদান যথাক্রমে ইহাদের মধ্যে আছে। পরবর্তী দুইটি মায়ার অধীন এবং সেইজন্যই ইহারা মিথ্যা। সূত্রকার যে পরিণাম মতবাদকেই সাংখ্য মত খণ্ডন করিবার কার্যকর ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় আচার্যগণ ধাপে ধাপে শিষ্যকে চরম সত্য উপলব্ধির দিকে লইয়া যান, ইহাই প্রচলিত রীতি। এই সর্বসম্মত রীতি অনুসরণ করিয়াই সূত্রকার বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে ব্রহ্মকে পরিণাম মতানুসারে জগৎকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া, ২.১.১৪ সূত্রে বিবর্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সূত্রকার যে পরিণামবাদের সমর্থক নহেন তাহা ২৬-২৮ সূত্রের আলোচনা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ২৮ সূত্র স্পষ্টতই জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা এবং অপারমার্থিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

রামানুজের ভাষ্যের পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি শঙ্করের মতো ততটা যুক্তি-নিষ্ঠা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতানুসারে চেতন অচেতন সমগ্র বস্তু সমেত সমগ্র বিশ্বই সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর। যখন জীব এবং পদার্থগুলি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে তখন ইহারা কারণরূপী ব্রহ্ম এবং যখন ইহারা বস্তুর মতো স্থূল আকার ধারণ করে তখন ইহারা কার্যরূপী ব্রহ্ম। এইভাবেই কার্য— অর্থাৎ জগৎকে, কারণ—

অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখা যায়। (শ্রীভাষ্য, ১.৪.২৭ এবং ২.১.১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) বাদরায়ণ এই মত পোষণ করেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তিনি কোথাও বলেন নাই যে, জীব এবং জড় পদার্থ সবই ব্রহ্মের শরীর। যদিও ২.৩.৪৩ সূত্রের অর্থ এই করা যায় যে, 'জীব হইল ব্রহ্মের শরীর', তথাপি অন্যত্র এমন কোন সূত্র নাই যাহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, 'জড় পদার্থও ব্রহ্মের দেহ'। উপরন্তু, ব্রহ্ম যদি শুধু জড় অংশেই জগতের উপাদান কারণ হিসাবে গৃহীত হন— কারণ উপরের যুক্তি যেন ইহাই প্রমাণ করিতে চায়— তাহা হইলে ১.৪.২৩ সূত্রে যে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান রূপেই জগতের উপাদান কারণ', তাহা বিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং ২.১.২৬-২৮ সূত্রগুলিও নিরর্থক হইয়া যায়। কারণ, ব্রহ্মের সমগ্র সত্তাই জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এইরূপ প্রশ্ন কিছুতেই উঠিতে পারে না। অথবা কারণ অবস্থায় এবং কার্য অবস্থায় একই ব্রহ্মের স্থিতি বলিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কার্য-কারণ সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। যদি এইরূপ সম্পর্ককে মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ২.১.৪-৬ সূত্রগুলি নিরর্থক হইয়া যায়; কারণ ব্রহ্মের প্রকৃতি, জগৎ এবং ব্রহ্ম, জড় এবং চেতন এই ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন হইতে পারে না। রামানুজ ১৪ সূত্রকে বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রকার সাংখ্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন মতবাদকে প্রতিপক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। 'সাংখ্য মতবাদ খণ্ডনের যুক্তিদ্বারাই অন্য মতবাদও খণ্ডিত হইল' এইরূপ বলিয়া তিনি অন্য মতবাদগুলি খণ্ডনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন (সূত্র ১.৪.২৮ এবং ২.১.১২ দ্রষ্টব্য)। রামানুজ কর্তৃক ২.১.২৮ সূত্রের ব্যাখ্যা খুবই কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক বস্তুর মূল প্রকৃতির পার্থক্যের জন্যই প্রত্যেক বস্তুর গুণেরও পার্থক্য হয়; যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সেইজন্য আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত গুণসমূহ ব্রহ্মে থাকিতে পারে— তাঁহার এই যুক্তি এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, শঙ্করের ব্যাখ্যা খুবই সন্তোষজনক কারণ, ব্রহ্ম কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করিয়াও অপরিবর্তিত থাকিতে পারেন তাহা তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে ধারণা করা যায়। অধিকন্তু রামানুজ ২৬-২৮ সূত্রে শ্রুতির উদ্ধৃতির মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ভাব আছে তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এই বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ যুক্তি, শ্রুতির বিরুদ্ধ নয় বলিয়া সকল মতের বেদান্তবাদীরাই ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে সূত্রকার তাঁহার এই উত্তরমীমাংসা গ্রন্থে শঙ্কর যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই প্রস্তাব আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নিম্বার্কের ভাষ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, ব্রহ্মের কারণত্ব নির্ণায়ক এই সূত্রগুলিকে তিনি ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাঁহার যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। ২.১.১৩ সূত্রকে তিনি প্রথমে শঙ্করের ন্যায়ই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ১৪ সূত্রে তিনি 'অনন্যত্বম্' এই শব্দটিকে 'ন তু অত্যন্ত ভিন্নত্বম্'— সম্পূর্ণ ভিন্ন, অন্যপ্রকার নয়—

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ, কার্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এইভাবে সূত্র ১৩ হইতে পাওয়া যায়— ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন, ৪-৬ সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় জড়জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ১৪ সূত্রে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ইহাদের পৃথক্ কোন সত্তা নাই। এই সূত্রার্থগুলি হইতে নিম্বার্ক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জড় এবং চেতন জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের 'ভেদ' এবং 'অভেদ' উভয় সম্বন্ধই আছে। কিন্তু এক এবং অভিন্ন আধারের বস্তুতে এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য, মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত বস্তুগুলি সত্য নয়; কারণ, তাহারা নাম মাত্র, তাই অসৎ। একটা মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। যদিও মৃত্তিকা এবং ঘট মূলত একই সত্তার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি যখন আমরা ইহাকে ঘট আকারে দেখি তখন ইহার মৃন্ময়ত্ব আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, আবার যখন ইহাকে মৃত্তিকারূপে দেখি, তখন আমরা ঘটকে পাই না। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, ইহার স্বরূপ মায়া, কারণ ইহাকে আমরা ইহার যথার্থরূপে জানিতে পারি না। যাহা অন্যবস্তু হইতে অভিন্ন, অথচ যাহাকে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং যাহার অস্তিত্ব অভেদত্বের উপরই নির্ভরশীল তাহাকে মায়া ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং ঘট এবং মৃত্তিকার মধ্যে মৃত্তিকাই সত্য, ঘট সত্য নয়। ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যেও এইরূপই সম্পর্ক। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। "এই সবই যখন একমাত্র আত্মা তখন অন্য কিছুকে দেখা কিরূপে সম্ভব?" (বৃঃ ২.৪.১৪) ছান্দোগ্য ৬.১৬ শ্রুতিতে উক্ত আছে— "যে নানাত্ব দেখে, সে ভ্রান্ত; যে একত্ব দেখে সে-ই যথার্থ দ্রষ্টা।" কিন্তু যাহারা অজ্ঞানে নিমগ্ন, তাহাদের নিকট ভেদত্ব এবং অভেদত্ব উভয়কেই সত্য বলিয়া মনে হয়। কেন না শাস্ত্র হইতে অভেদত্বের জ্ঞান জন্মে, আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভেদত্বই অনুভূত হয়। ইহা হইল আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক অনুভব। অভেদত্বই সত্য। সুতরাং নিম্বার্কের মতবাদ অভ্রান্ত হইতে পারে না।

বাদরায়ণ পঞ্চরাত্রের মতকে স্বীকার করেন কি?

ব্রহ্মসূত্রে ২য় অধ্যায়ের ২য় পাদে সূত্রকার পরমতকে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি শুধু আত্মপক্ষকেই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এই পাদের সর্বত্রই তিনি কোন শাস্ত্র উদ্ধৃত না করিয়া শুধু যুক্তির দ্বারাই সেই কালে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলিকে খণ্ডন করিয়াছেন। এই পাদে আস্তিক্য মতাবলম্বিগণ যে-সকল মতবাদকে বেদবহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন সেই সকল মতবাদকেই সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। মহাভারত, পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে অজস্র উল্লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সূত্রকার এই দ্বিতীয় পাদে যে-সকল মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন সেইগুলি বিবেচিত ছিল বেদ-বহির্ভূত রূপে।

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে আমরা এই শ্লোকাংশ পাই— "ত্রয়ী সাংখ্য যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সাংখ্য, যোগ, পাশুপত এবং বৈষ্ণব (পঞ্চরাত্র ইহারই অন্তর্গত) মতগুলিকে ত্রয়ী অথবা কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-সমন্বিত বৈদিক মত হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করা হইত। অধিকন্তু পঞ্চরাত্র মতবাদের বহু গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক মতবাদকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। শঙ্কর নিজেই এইরূপ একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ এবং আনন্দগিরির ন্যায় গভীর যুক্তিবাদী পণ্ডিতগণও এই জাতীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুতরাং এই মতবাদগুলিকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ সুনিশ্চিতভাবেই বেদবহির্ভূত বলিয়াই মনে করিতেন। সেই কারণেই বাদরায়ণ আস্তিক্য মতবাদের ঔপনিষদিক চিন্তাকে চূড়ান্তভাবে সূত্রাকারে গ্রথিত করিবার সময়, এই সকল মতবাদে বর্ণিত চিন্তাধারাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা সঙ্গত কারণেই মনে করিতে পারি। অবশ্য এই সকল মতবাদের যতটুকু বেদবিরুদ্ধ নয় ততটুকুকে গ্রহণ করিতে সূত্রকারের কোন আপত্তি ছিল না। শঙ্করও এই জাতীয় অংশকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করেন নাই— ইহা তাঁহার ৪২ এবং ৪৩ সূত্রের ভাষ্য হইতে স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু রামানুজ মনে করেন যে, ৪২ এবং ৪৩ সূত্রের আপত্তিকে খণ্ডন করিতে গিয়া ৪৪ এবং ৪৫ সূত্রে পঞ্চরাত্রের মতবাদকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যা খুবই কষ্ট-কল্পিত। তাঁহার অভীষ্ট অর্থ পাইবার জন্য তিনি ৪৫ সূত্রকে একটু বক্রপথে ব্যাখ্যা করিয়া— "এবং যেহেতু এই শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দ্বারা জীবের উৎপত্তি বাধিত হইল" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে, ৪২ সূত্রে জীবের উৎপত্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না— যেহেতু এই মতবাদীরা ইহাতে বিশ্বাস করে না। যে পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া রামানুজ এই সূত্রকে পল্লবিত করিয়াছেন, তাহা ১০ সূত্রের সঙ্গে ইহার তুলনা করিলেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। বাদরায়ণ 'বিপ্রতিষেধাচ্চ'— (বিরোধ হেতু)— ইত্যাদির অর্থ করিয়াছেন— সাংখ্যদর্শনে বিরোধ হেতু ইহা জ্ঞানিজন কর্তৃক অগ্রাহ্য। এখানে সূত্রকারেরও ইহাই অভিমত বলিয়া আমাদের ধারণা। ডঃ Thibaut মনে করেন— "এই বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনার অধ্যায় পরিসমাপ্তির জন্য আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই নিজের মতকে সমর্থন করিবার প্রচেষ্টা এখানে অস্বাভাবিক নহে।" কিন্তু শুধু এখানে নয়— গ্রন্থের সর্বত্র ঐ উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করিতে পারি না যে, শুধু এই সূত্র দুইটিতেই গ্রন্থকার তাঁহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অধিকন্তু, অন্য কোন ভাষ্যকারই এই আলোচিত প্রসঙ্গের মধ্যে পঞ্চরাত্রের মতবাদকে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। বল্লভাচার্য শঙ্করের মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য এই আলোচনায় শক্তিবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য এই আলোচনায় তাঁহার অভিমত পূর্বাপর

সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ২য় পাদের সমগ্র অংশই সূত্রকারের মতবিরোধী সকল মতবাদ খণ্ডনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তিনি পঞ্চরাত্র মতবাদের সমর্থক। সুতরাং তিনি এই আলোচনার মধ্যে অন্য বিষয়েরও সন্ধান পান— তাই এই কারণেই তাঁহার ব্যাখ্যা খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু পূর্বের আলোচনাসূত্রে এই গ্রন্থে ব্যাসদেবের যদি কোন কর্তৃত্ব থাকিয়া থাকে, তবে আমরা ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিতে পারি যে, এই সূত্রগুলিতে পঞ্চরাত্রের মতবাদকে খণ্ডনই করা হইয়াছে; কারণ আমরা দেখিতে পাই ব্যাসদেব গীতাতেও এই মতবাদকে গ্রহণ করেন নাই।

জীবের যথার্থ স্বরূপ

এখন আমরা ২.৩.১৬-৫৩ সূত্রগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সূত্রগুলিতে জীবের স্বরূপ এবং জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। শঙ্কর ব্যতীত সকল ভাষ্যকারই এই সূত্রগুলিতে জীবের স্বরূপকে অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরের অংশ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একমাত্র শঙ্করই মনে করেন যে, অণুত্ব, কর্তৃত্ব এবং ব্রহ্মের অংশত্ব জীবের যথার্থ স্বরূপ নহে। জীব সংসারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অথচ বাস্তবিকপক্ষে স্বরূপত জীব হইল সর্বব্যাপী এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

সূত্রকার তৈত্তিরীয় শ্রুতির— "যাহা হইতে সমগ্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে"— ইত্যাদি (৩.১) বাক্যগুলি উল্লেখ করিয়া, ২ সূত্রে ব্রহ্মকে চেতন এবং অচেতন সমন্বিত এই বিশ্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম হইতেই চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই উদ্ভব হইয়াছে। অতএব জীবগণও ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৭ সূত্রে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা সৃষ্ট-পদার্থ নয়। এইভাবে তিনি তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞারই বিরোধিতা করিয়াছেন এবং "যাঁহাকে জানিলে আর সব কিছুই জানা যায়" (ছান্দোগ্য ৬.১) এই শ্রুতির প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা করিয়াছেন। সূত্রকার প্রত্যেক স্থলেই এই প্রতিজ্ঞাকেই তাঁহার যুক্তির মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এই বিরোধের মধ্যে আমাদিগকে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সূত্রকারের প্রদত্ত ব্রহ্মের সংজ্ঞা এবং ১৭ সূত্রে তাঁহার বিবৃতি আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে, জীব দৃশ্যত এবং কার্যত সংসারী কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপে জীব চিরন্তন এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। আমরা যেইরূপে জীবকে প্রত্যক্ষ করি সেইভাবে জীবের প্রকৃতি হইল অসৎ। ১৬ সূত্রে ইহা স্পষ্টরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যাহাকে উৎপন্ন বলিয়া দেখি তাহা হইল ইহার স্থূল এবং সূক্ষ্ম গুণসমূহের সহিত ইহার একটা সম্বন্ধমাত্র। এই সম্বন্ধটি মিথ্যা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় সূত্রকার এই পাদে

কেন জীবের প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের সহিত ইহার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা দ্বারাই জীবের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতির বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রুতির বিভিন্ন উদ্ধৃতি আছে। এই পাদে তিনি এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা সমাধানের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জীব তাহার যথার্থ স্বরূপে সৃষ্ট পদার্থ নহে— ইহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু সংসারী হিসাবে জীব হইল কার্য, অণু, কর্তা এবং ব্রহ্মের অংশ। এমনকি ঈশ্বর বা ব্রহ্মও যখন মায়াদ্বারা সীমাবদ্ধ হন তখন তিনি চিরন্তন নহেন। সেইরূপ জীব যখন দেহ ও মন প্রভৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তখন তাহা চিরন্তন হইতে পারে না, কিন্তু জীব তাহার মূল প্রকৃতিতে চিরন্তন। উপাধিরহিত জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই শুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ এবং পরস্পর অভিন্ন ও এক। এইজন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ "সৎ-চিৎ-অনন্তম্ ব্রহ্ম" (২.১) এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন— "তাহা হইতেই, এই আত্মা হইতেই আকাশ জাত হইয়াছে" (২.১)। এইভাবেই সকল উপাধিরহিত আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখাইয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২.১ এবং ৩.১ শ্রুতিকে যে সূত্রকার ব্রহ্মের লক্ষণ নির্ণয় করিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইলেন একই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। এইরূপে সেই এক "সৎ-চিৎ-অনন্ত"— যাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তাহাই মায়া প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর, তাহাই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন। ইহাকেই শুকরহস্য উপনিষদের উদ্ধৃতি "এই জীবের মধ্যেই গুণরূপে কার্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে গুণরূপে কারণ বর্তমান" (শু.উ.২.১২) দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের সূত্রগুলি গঠনের পশ্চাতে সূত্রকারের এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করারই উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা, এবং আচার্য শঙ্করও এই অর্থেই এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার কোন যুক্তি-বিরোধও থাকিতে পারে না।

রামানুজের মতানুসারে জীব তত্ত্বত ব্রহ্মেরই কার্য, কিন্তু অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মের প্রকার রূপে ব্রহ্মেই বর্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ সকল পদার্থও ব্রহ্মেই স্থিত আছে। তথাপি পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলা হয়। ইহার কারণ, সৃষ্টির কালে ইহাদের প্রকৃতির একটা আবশ্যিক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু জীবের এইরূপ কোন পরিবর্তন হয় না। জীব সর্বকালেই জ্ঞানের কর্তা, কিন্তু সৃষ্টির কালে তাহাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটে। শুধু এই অর্থেই, অর্থাৎ সৃষ্টির সময় তাহাদের প্রবৃত্তির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় না, এই অর্থেই জীবকে সৃষ্ট নয় বলা হয় (শ্রীভাষ্য ২.৩.১৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সৃষ্টির সময়ে পদার্থের মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন হয় বলিয়াই তাহাদিগকে সৃষ্ট বলা হয়। বাদরায়ণ ব্রহ্মের শরীর জীব এবং প্রকৃতিকে কোথাও ব্রহ্মের কার্য বলিয়া বলেন নাই। অথবা তিনি জীব এবং পদার্থের মধ্যে কোথাও এইরূপ পার্থক্য আছে বলিয়াও বলেন নাই। আবার রামানুজের মতে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ কোন

সত্তা নন, ব্রহ্ম জীব এবং পদার্থের গুণসম্পন্ন দেহ-বিশিষ্ট সত্তা। ব্রহ্মের এইরূপ স্বরূপ-বোধ হইতে প্রমাণিত হয় যে, জীব এবং ব্রহ্মের সম্পর্ক যেন গুণ এবং গুণ-বিশিষ্ট বস্তুর সম্পর্কেরই মতো। তাহা হইলে ২.৩.৪৩ সূত্রটি নিরর্থক হইয়া যায়, যদি তথাকার 'অংশ' এই শব্দটিকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা করা হয়।

রামানুজ ৫০-৫৩ সূত্রগুলিতে অদ্বৈতের খণ্ডন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইহা মোটেই বোধগম্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ, অদ্বৈতবাদীরা কখনও বলেন না যে জীব তাহার জীবত্ব-বিশিষ্ট অবস্থায় সর্বব্যাপী। ইহা মুক্ত অবস্থাতেই সর্বব্যাপী। শঙ্কর স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, জীব নিজ অবস্থায় (জীবত্বাবস্থায়) সসীম এবং বিধি নিষেধের অধীন; কারণ ইহা স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত (২.৩.৩৮)। এমনকি ইহার স্থূল শরীরের ধ্বংসের পরেও ইহা সূক্ষ্মতর উপাধি অন্তঃকরণাদির সঙ্গে সংবদ্ধ, মৃত্যুর পরেও যেহেতু সঙ্গিরূপে অন্তঃকরণ থাকে। (৪.২.১.-৬) মৃত্যুর পরেও ইহা জীবত্বের স্বাতন্ত্র্য (২.৩.৩০) লইয়া থাকে বলিয়া স্থূল শরীরের কর্মফলাদির সম্ভোগ সম্পর্কে (২.৩.৪৯-৫০) কোন সংশয় থাকিতে পারে না। জীবের এই যে উপাধি যাহা চিরন্তন নহে— সৃষ্টমাত্র (সূ ২.৪ দ্রষ্টব্য), এবং সৃষ্ট বলিয়াই ধ্বংসশীল সেইটি যখনই খসিয়া পড়িবে, তখনই কেবল জীব তাহার সর্বব্যাপিরূপ স্ব-স্বরূপটি ফিরিয়া পাইবে। এইভাবেই রামানুজের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে আচার্য শঙ্করের এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যাই সুসঙ্গতভাবে গ্রাহ্য। সূত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব তাহার আপেক্ষিক জীবাবস্থায় অণু এবং কর্তা কিন্তু স্বরূপত সর্বব্যাপী। এই মতের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সূত্রকার অন্য যাঁহারা মনে করেন যে জীব বহু এবং জীবাবস্থাতেও আপেক্ষিক ইহা সর্বব্যাপী— তাহাদের মতবাদকেও খণ্ডন করিয়াছেন। নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্যও এই একই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বৈতমত খণ্ডনের প্রচেষ্টায় রামানুজের ব্যাখ্যা খুবই কষ্টকল্পিত এবং সূত্রকারের অভিপ্রায়ের সঙ্গে ইহার মোটেও সঙ্গতি নাই।

আচার্য নিম্বার্কও মনে করেন যে, জীব এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের কার্য। সৃষ্টির পরে পদার্থ আরও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু জীবের কোন পরিবর্তন হয় না, এই অর্থেই নিম্বার্কাচার্যও জীবকে চিরন্তন বলিয়াছেন। রামানুজের মতবাদকে যে— সকল যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে সেই সব যুক্তির বলেই এই মতকেও খণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ৪৩ সূত্রে আসিয়া জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন (ভেদাভেদ)— এইরূপ বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর ২.১.১৪ সূত্রে পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, একই বস্তুতে এইরূপ 'ভেদ' এবং 'অভেদ' দুইই সত্য হইতে পারে না— শুধু 'অভেদ'-ই হইল জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক।

এখন আমরা এই আলোচনার সমাপ্তির প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব ১৯-২৮ সূত্রগুলিতে সূত্রকার তাঁহার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে কি না। এই মতানুসারে জীব হইল অণু, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ বলা আছে, (মুঃ ৩.১.৯) এবং অন্যান্য উদ্ধৃতিতেও আছে, 'শরীর হইতে বহির্গত হয়', 'স্বর্গে যায়' ইত্যাদি। কিন্তু আবার এমন শ্রুতিও আছে যেখানে পরম ব্রহ্মকে অণু ইত্যাদি রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন "ধান্যকণা হইতে ক্ষুদ্রতর, যবকণিকা হইতেও ক্ষুদ্রতর"— ইত্যাদি (ছাঃ ৩.১৪.৩), সুতরাং আমরা কিভাবে বলিতে পারি যে, শুধু জীবই অণু এবং ঈশ্বর অণু নন? শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ব্রহ্ম সর্বব্যাপী— এই কথাই বুঝাইতে চান বলা যায়। "আকাশবৎ সর্বব্যাপী এবং সনাতন"— ইত্যাদি, "আকাশ হইতে বৃহত্তর, স্বর্গ হইতেও বৃহত্তর" ইত্যাদি হইতেও ব্রহ্মের সর্বব্যাপী অদ্বয়ভাব বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য শ্রুতি-বিশেষে জীবকেও সর্বব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে— "তিনি মহান অজাত মহান আত্মা"(বৃঃ ৪.৪.২২); "যেমন, যখন কোন ঘটকে বহন করা হয় তখন শুধু একমাত্র ঘটকেই বহন করা হয়— ইহার অভ্যন্তরের আকাশকে নহে। এইরূপভাবেই জীবের সঙ্গে আকাশের তুলনা"— ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা সর্বব্যাপী। যেহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ সেইজন্য অণুপরিমাণ জীবে বহু কায়ব্যূহ হইয়া উপাদান কারণ ব্রহ্মই সর্বব্যাপী হইয়া অণুরূপেই জগৎ শাসন করিতেছেন— এইরূপ বলারও কোন সার্থকতা নাই। সুতরাং কোন শ্রুতির দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা সর্বব্যাপিরূপ এবং অণুরূপে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু অদ্বৈতমতে এই দুই ক্ষেত্রেই যুক্তির কোন অসামঞ্জস্য নাই। ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত হইয়াই অণু— কিন্তু স্বরূপত ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। সেইরূপ জীবও তাহার প্রকৃত স্বরূপে সর্বব্যাপী, এইজন্যই যদিও অন্তঃকরণবিশিষ্ট জীবকে অণু, কর্তা ইত্যাদি মনে হয় তথাপি ইহা সর্বব্যাপী এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। প্রাথমিক শ্রুতিগুলিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এবং জীব প্রকৃত স্বরূপে সর্বব্যাপী। যে শ্রুতিতে অণুত্ব ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা গৌণ এবং দূরার্থবহ; সেইজন্যই ইহাকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।[১]

ব্রহ্ম কি সগুণ, না নির্গুণ?

এখন আমরা ৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের সেই সূত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিব যেখানে বাদরায়ণ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর, ১১ এবং ১২ সূত্রে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে সগুণ এবং নির্গুণ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার জন্যই চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। শঙ্কর প্রমাণ করিতে চান

১ সিদ্ধান্তলেশ, জীবাণুত্ববিচার।

যে, এমনকি স্থানের পার্থক্য হইতেও ব্রহ্মের দ্বিবিধ গুণের কথা কল্পনা করা চলে না, কারণ শাস্ত্র পূর্বাপর ব্রহ্মকে নির্গুণরূপেই শিক্ষা দিয়াছেন (১১)। যদি বলা হয় যে, এইরূপ পার্থক্যের কথা শাস্ত্রেই তো বলা হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা ইহার উত্তরে বলিতে পারি যে, প্রত্যেক বিষয়েই শ্রুতি ঠিক বিপরীত উক্তিও করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বাহ্য নামরূপ সত্য নহে— সকল উপাধির অন্তরালে একমাত্র নিরাকার তত্ত্বই বিরাজমান (বৃহঃ ২.৫.১. দ্রষ্টব্য) (১২)। উপরন্তু, কোন কোন শ্রুতি এইরূপই শিক্ষা দিয়াছেন (কঠ. ৪.১১ দ্রঃ) (১৩)। ব্রহ্ম নিশ্চিতই নিরাকার, কারণ ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য (১৪)। নিরাকার আলোক যেমন আকার ধারণ করে, সেইরূপ উপাধিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মও নানা আকার ধারণ করেন এবং উপাসনার উদ্দেশ্য পূরণ করেন (১৫)। ইনি শুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ (১৬)। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই ইঁহাকে নির্গুণ বলা (১৭) হইয়াছে। সূর্যের যেমন বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম এবং জগতের উপমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। রূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র, তাহাদের কোন সত্যতা নাই (১৮)।

রামানুজ এবং নিম্বার্কাচার্য কিন্তু এই সূত্রগুলিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ— ইহা এই সূত্রগুলির বিবেচ্য বিষয়ই নয়। সকল বস্তুর অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম সৃষ্ট পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া দোষযুক্ত হন কিনা— ইহাই এই সূত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। কারণ ব্রহ্ম দেহবিশিষ্ট হইলেই অপূর্ণতার দোষে দুষ্ট হন, কেন না তখন ব্রহ্ম জীবরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার অধীন হইয়া পড়েন। ইহাই ১—১০ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং রামানুজের মতে এই সূত্রগুলিতে বলা হইয়াছে যে, পদার্থ এবং জীবের মধ্যে স্থিত হইয়াও ব্রহ্ম অপূর্ণতাদি দোষে দুষ্ট হন না। কারণ শ্রুতিতে সর্বত্রই ব্রহ্মের দুই প্রকার বৈশিষ্ট্যের কথাই উক্ত হইয়াছে। তিনি সর্বদোষমুক্ত, বিশুদ্ধ এবং সকল কল্যাণ-গুণ-সমন্বিত (১১)। যদি ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮.৭ অনুসারে বলা হয় যে, ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যই বর্তমান, তথাপি দেহবিশিষ্ট জীবের সংস্পর্শে আসিয়া জীবের অন্তর্যামী ব্রহ্ম জীবের অপূর্ণতাদি দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; তবে, ইহার উত্তরে বলা যায় যে, আমরা ইহা মানিতে পারি না। কেন না, শ্রুতি সর্বত্রই ব্রহ্মের অপূর্ণতাদি দোষ অস্বীকার করিয়াছেন এই বলিয়া যে— "ব্রহ্ম অমৃত এবং সেইজন্যই সর্বদোষমুক্ত" (বৃহদারণ্যক ৩.৭.৩-২২ দ্রষ্টব্য)। জীবের অপূর্ণতার হেতু হইল জীবের কর্ম; যেহেতু ব্রহ্ম কোন কর্মের কর্তা নহেন, সুতরাং তিনি সকল অপূর্ণতাদোষ হইতে মুক্ত (১২)। ব্রহ্মের কোন আকার নাই— ইহাও বলা যায়, কারণ নাম এবং রূপের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই; এবং সেইজন্যই ব্রহ্ম দেহবিশিষ্ট জীবের ন্যায় কর্মাধীন নহেন (১৪)। উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের জীবরূপ আকারাদি মিথ্যা— এইরূপ আপত্তির উত্তরে ১৫ সূত্রে এইরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে : যদিও শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"— বলা হইয়াছে,

তথাপি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানই হইল ব্রহ্মের মূল প্রকৃতি। সেইরূপ আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্রহ্মের দুই প্রকার বৈশিষ্ট্যই বর্তমান; তাহা না হইলে এই শ্রুতিগুলি নিরর্থক হইয়া যান (১৫)। শ্রুতি বলিয়াছেন— 'তন্মাত্রম্'— অর্থাৎ ব্রহ্মের মৌলিক সত্তা হইল জ্ঞান। কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রহ্মের অন্য গুণ নাই— এই নেতিবাচক কথাও তো বলেন নাই (১৬)। শ্রুতি এবং স্মৃতি কিন্তু এইরূপ কথাই বলিয়াছেন (১৭)। এই কারণেই সূর্যের বিম্ব-প্রতিবিম্ব উপমাটি গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদিও বহুস্থানেই প্রতিবিম্বরূপে বর্তমান তথাপি সর্বদাই দুইটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন। অপরিষ্কার জলে সূর্য প্রতিবিম্বিত হইলেও সূর্য যেমন অম্লান থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মও বহু জীবে অবস্থান করিয়াও দোষযুক্ত হন না (১৮)।

১১-১৪ সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্বার্কাচার্যও প্রায় রামানুজেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ১৫ এবং ১৬ সূত্রকে তিনি ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ১১-১৪ সূত্রে যেইরূপ আলোচনা করা হইয়াছে সেইভাবে তিনি এই সূত্রগুলিতে শ্রুতির প্রামাণ্যকেই চূড়ান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৭-২১ সূত্রগুলিকে তিনি রামানুজের অনুসরণেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যদিও তিনি ২১ সূত্রকে পৃথক্ সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন; রামানুজের ন্যায় তিনি ২১ সূত্রকে ২০ সূত্রেরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

এই সূত্রগুলির উপর এই তিনটি ভাষ্যের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, যুক্তিতে এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শঙ্করের ভাষ্যই শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু শঙ্করের ভাষ্যের বিশেষ মূল্য এইজন্য যে, সাধারণ উপনিষদ্-পাঠকের নিকট ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ— এইরূপ যে একটি গূঢ় সংশয় দেখা দেয় তাহার একটি সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় শঙ্করের আলোচনার মধ্যে। কারণ, শ্রুতির উদ্ধৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও উভয় মতকেই সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। রামানুজ এবং নিম্বার্ক উভয়েই, এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া ইহা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই ইহার আলোচ্য বিষয় বলিয়া দেখিয়াছেন। দ্বিতীয়ত শঙ্কর যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে সূত্রের অন্তর্গত শব্দগুলির তাৎপর্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন রামানুজ এবং নিম্বার্ক সেইরূপ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যায় ১১ সূত্রে উভয় লক্ষণাত্মক পরস্পর বিরুদ্ধ দুই গুণের সম্পর্কে শঙ্কর যেভাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন— এই দুইজন সেইরূপ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই দুইজন, সূত্রগুলি যাহা যথার্থভাবে বুঝাইতে চায় তাহা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্যই সূত্রকার যাহা বলেন নাই এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যদি রামানুজ এবং নিম্বার্কের মতের অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা বাদরায়ণের প্রতি অবিচার করিব, কেন না সে ক্ষেত্রে বাদরায়ণ যে তাঁহার

সূত্রগ্রন্থে উপনিষদের পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন— তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে না। রামানুজ যে ১৫ এবং ১৬ সূত্রে এই বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই উভয় মতই গ্রহণীয়। তথাপি তাঁহার ১৬ সূত্রের ব্যাখ্যা অবশ্যই পল্লবিত সেইজন্যই উহা গ্রহণীয় নয়। নিম্বার্ক এই বিষয়টি মোটে আলোচনাই করেন নাই। আমরা রামানুজের মতানুসারে মনে করিতে পারি না যে, বাদরায়ণ এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা দুই একটি মাত্র সূত্রের দ্বারাই সমাপ্ত করিয়াছেন। এই অধিকরণে তিনি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ১৫ এবং ১৬ সূত্রে রামানুজের এই বিষয়ের অবতারণা এই অধিকরণের ভাবের অনুকূল নয়; এমনকি তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা অনুসারেও ইহা বিরুদ্ধ। যে-কোন ব্যক্তির নিকটই ইহা সহজেই প্রতিভাত হইবে যে, আলোচ্য বিষয়ের কোন প্রাসঙ্গিকতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি জোর করিয়াই একটি বিষয়ের অবতারণা এই সূত্রগুলির মধ্যে করিয়াছেন।

বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের মতানুসারেই এই অধিকরণের ব্যাখ্যার পর তাঁহার ২.১.১৩ সূত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইবে যে, এই সম্পূর্ণ আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন। সর্বশেষে সূর্যের বিম্ব-প্রতিবিম্বের উপমাটি শঙ্করাচার্যের ভাষ্যেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে— এই দুইজনের ভাষ্যে তেমন সুপ্রযুক্ত হয় নাই। ১৮ সূত্রে রামানুজ যে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারা শঙ্করের মতকেই আরও ভালভাবে পোষণ করা হইয়াছে।

২২-৩০ সূত্রগুলিকে শঙ্কর অন্য একটি পৃথক্ বিষয়ের অবতারণার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ২২-২৪ সূত্রগুলিকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:— এই পর্যন্ত যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে (অর্থাৎ বৃহঃ ২.৩.১ এ ব্রহ্মের দুই আকারের কথা), তাহা 'নেতি নেতি' (বৃহঃ ২.৩.৬) এই শব্দগুলির দ্বারা অস্বীকার করা হইয়াছে। এবং পরবর্তী অংশে শ্রুতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর কিছুও বলিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মকে অস্বীকার করে নাই, পূর্বে উল্লিখিত ব্রহ্মের আকারগুলিকে অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে (২২)। যেহেতু ব্রহ্ম অনুভবগোচর নহেন, সেইজন্যই ব্রহ্মকে স্বীকার করা যায় না— এই যুক্তি এখানে সিদ্ধ নয়; কারণ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম আছেন (সৎ) যদিও আমাদের অজ্ঞতা-হেতু তিনি ব্যক্ত নহেন (২৩)। অধিকন্তু শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন যে, নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় (২৪)। সুতরাং জ্ঞানের উদয় হইলে জীব অসীমের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়, এইরূপ নির্দেশই শাস্ত্রে আছে (২৬)। পরবর্তী দুইটি সূত্রে ২৫-২৬ এই দুইটি সূত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু শ্রুতিতে ভেদ এবং অভেদ উভয় বিষয়েরই উক্তি আছে সেইজন্য ইহাকে

সর্প এবং তাহার কুণ্ডলী (২৭) অথবা আলোক এবং তাহার কিরণমণ্ডলের ন্যায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে (২৮)। ২৯ সূত্রে এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে: অথবা এই সম্পর্ককে ২৫,২৬ সূত্রে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুরই অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে (৩০)।

রামানুজ ২৬ সূত্র পর্যন্ত পূর্ব অধিকরণেরই বিষয় বলিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ২২-২৬ সূত্রের তাৎপর্য হইল :— 'নেতি নেতি' শ্রুতিদ্বারা (বৃহঃ ২.৩.৬) পূর্ব-কথিত তাবৎ বিষয়কে অস্বীকার করিয়া, ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কিছুও বলার আছে বলিয়া বলা। ব্রহ্মের দুই স্বরূপ (বৃহঃ ২.৩.১) বর্ণনা দ্বারাই ব্রহ্মের গুণাবলীকে নিঃশেষ করা হয় নাই, ইহার পরেও শ্রুতি ব্রহ্মের বহু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "'নেতি নেতি' অপেক্ষা বৃহত্তর আর কিছু নাই। তাহার পর আসে নাম, 'সত্যস্য সত্যম্'; কারণ প্রাণই সত্য এবং ব্রহ্ম প্রাণেরই সত্য।" এখানে প্রাণ বলিতে জীবকেই বুঝাইয়াছে কারণ মৃত্যুকালে প্রাণ জীবেরই অনুসঙ্গী হয়। জীব সত্য, কারণ যথার্থ স্বরূপে জীবের কোন পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর এই সত্যজীবেরই সত্যস্বরূপ। চৈতন্যের তারতম্য অনুসারে জীবের সংকোচন ও প্রসারণ হয়— কিন্তু তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। গ্রন্থের পরবর্তী অংশকে এইভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার নানা গুণাবলীর সম্পর্কের বর্ণনাতেই শেষ করা হইয়াছে। 'নেতি নেতি' এই শব্দগুলি ব্রহ্মের গুণকে অস্বীকার করে না— ব্রহ্ম শুধু এই দুইটি গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন— তাহাই বুঝাইতে চায় (২২)। শ্রুতির উপদেশ এখানে অপ্রয়োজনীয় নহে— কারণ যদিও জগৎকে আমরা দেখি, তথাপি আমরা জগৎকে ব্রহ্মের আকারে ব্রহ্মের স্বরূপে দেখিতে পারি না। শুধু শ্রুতি গ্রন্থ হইতেই ব্রহ্মকে স্বরূপত জানা যায়। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন (২৩)। পুনঃপুনঃ ধ্যান ধারণাদির দ্বারা ব্রহ্মের এই দুই পৃথক্ রূপকে যেমন জানা যায় সেইরূপ, বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মকেও জানা যায় (২৫)। এই সকল কারণেই ব্রহ্মকে 'অনন্ত' বলা হইয়াছে— অনন্ত অর্থে তাঁহার অনন্তগুণরাশি বর্তমান। এইভাবে ব্রহ্মের গুণবত্তা সিদ্ধ এবং ২২ সূত্রে যে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহা যথার্থ (২৬)। ২৭-৩০ সূত্রে রামানুজ অন্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ২৭ এবং ২৮ সূত্রকে পূর্বপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। শঙ্করও এইরূপই করিয়াছেন। ২৯ সূত্রকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'পূর্ববৎ'— সূত্রের এই শব্দগুলি ২৫ এবং ২৬ সূত্রকে নির্দেশ করে না— ইহা ২.৩.৪৩ সূত্রের নির্দেশক।

২২-২৪ সূত্রে নিম্বার্ক রামানুজকেই অনুসরণ করিয়াছেন। পরবর্তী দুইটি সূত্রকে তিনি অবশ্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণে যেমন অগ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ

ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশিত হন (২৫)। ব্রহ্মকে জানিয়া জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় (২৬)। ২৭ এবং ২৮ সূত্রকে তিনি সূত্রকারের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন— প্রতিপক্ষের মতরূপে নহে। সূত্র ২৭-এ তিনি ব্রহ্ম এবং জড় জগতের সম্পর্ককে সর্প এবং তাহার কুণ্ডলী অবস্থার সঙ্গে তুলনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন (২৭)। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ককে আলোক এবং রশ্মিমণ্ডলের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন (২৮)। ২.১.২৫ সূত্রের আপত্তির উত্তর তিনি পূর্ববর্তীর ন্যায় ২.১.২৬ সূত্রেই দিয়াছেন (২৯)। উপরন্তু পরমাত্মা জীবাত্মার অপূর্ণতার দ্বারা কোনভাবেই দুষ্ট নহেন বলিয়া তিনি মনে করেন (৩০)।

আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২.৩.১ অংশের 'নেতি নেতি'- কে ব্রহ্মের দুই রূপেরই অস্বীকৃতি রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মকে শুধু 'নেতি নেতি'— এই বাক্যদ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা ব্রহ্ম নহেন। আমরা যেরূপ-ভাবে ব্রহ্মকে দেখিতেছি তিনি সেইরূপ নহেন। ব্রহ্ম এই প্রতীয়মান জগৎ হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন। শঙ্করের এই ব্যাখ্যা শাস্ত্রের শিক্ষা ও প্রবচনের সমর্থক। রামানুজ এবং নিম্বার্ক "নেতি নেতি" এই শাস্ত্রবাণীকে ব্রহ্মের এই দুই রূপেরই মাত্র নিষেধক হিসাবে সীমাবদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মের এই দুইরূপ ব্যতীত আরও বহু রূপ আছে। এই দুইরূপই সত্য এবং এই দুইটি গুণই ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মতোই সত্য। এইরূপ উক্তিকে ঔপনিষদিক জ্ঞানের ও শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে হয়। 'নেতি নেতি'— এই বাক্যটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে চারিটি পৃথক্ পৃথক্ স্থলে উক্ত হইয়াছে। রামানুজের বৃহদারণ্যকের ৩.২.৬ মন্ত্রের ব্যাখ্যা যদিও বা গ্রহণ করা যায় যতই সুদূরপ্রসারিত কল্পনা এবং বুদ্ধির কৌশলে উহা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকুক না কেন, তথাপি বৃহদারণ্যকের ৪.২.৪, ৪.৪.২২ এবং ৪.৫.১৫ মন্ত্রগুলিকে এই ব্যাখ্যার সমর্থনে কিছুতেই সুপ্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই শাস্ত্রবচনগুলি "এই আত্মাই হইলেন সেই বস্তু যাহাকে 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে"— এই কথা বলার পরই বলিয়াছে 'ইহা অনির্বচনীয়'— ইত্যাদি। অন্য শ্রুতি-বচনগুলিতেও বলা হইয়াছে আত্মা বা ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অতীত। "সেখানে চক্ষু গমন করিতে পারে না, বাক্য বা মনও গমন করিতে পারে না; আমরা ইহাকে (ব্রহ্মকে) জানি না, আমরা কিভাবে ব্রহ্ম সম্পর্কে অপরকে উপদেশ দান করিব ? ব্রহ্ম সকল জ্ঞাত বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অজ্ঞাত বস্তু হইতেও পৃথক্" (কেন ১.৩-৪); "যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে" (তৈঃ ২.৪) তৈঃ ২.৯, এবং কঠ ১.৩.১৫। এই সকল শাস্ত্র-উদ্ধৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছুই বলা চলে না। কেন উপনিষদের মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, 'ইনিই ব্রহ্ম'— এইরূপ অস্তিবাচক কোন উক্তির দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে পারি না। আমরা যাহা দেখি তাহা ব্রহ্ম নন। সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা অস্বীকার করিয়াই ব্রহ্মকে শুধু 'নেতি নেতি'

এই শব্দের দ্বারাই নির্দেশ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে ভেদ এবং অভেদ উভয়কে গ্রহণ করিয়া কোন আলোচনা আমরা দেখিতে পাই না সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আমাদের প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্য কি? ভেদ এবং অভেদ উভয়েরই সত্যতা প্রতিষ্ঠা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ইহারা পরস্পর বিরোধী। শাস্ত্র-উক্তিগুলি খুব বিচার করিয়া পাঠ করিলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যে, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুকে ধাপে ধাপে অদ্বৈত ভাবনায় লইয়া যাইবার জন্যই প্রথমে দ্বৈতভাবের উপদেশ করা হয়। এই সূত্রগুলির ভাষ্যে রামানুজ এই বলিয়া শঙ্করের সমালোচনা করিয়াছেন যে, শ্রুতি প্রথমে এই দুই ভাবকেই স্বীকার করিয়া পরবর্তী কালে ইহাকে অস্বীকার করিয়াছেন— ইহা হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ শিক্ষার পদ্ধতি আমরা শ্রুতিশাস্ত্রের অন্যত্রও সুস্পষ্টভাবেই পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতি ইন্দ্রকে এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে বরুণ ভৃগুকে এইরূপেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসু শিষ্যকে আচার্য ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যের অনুভবের স্তরে লইয়া যান। দ্বৈতভাবনার মাধ্যমেই শিষ্য সত্যের চরমতম অনুভব অদ্বৈতে উপনীত হয়। শাস্ত্রে কোথাও দ্বৈতভাবনার প্রশংসাবাক্য নাই, এবং দ্বৈতভাবনায় কোন ফল হয় বলিয়াও বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে দ্বৈতভাবনার নিন্দাসূচক উক্তিই শাস্ত্রে আছে (দ্রষ্টব্য কঠ ২.৪.১০-১১; বৃহঃ ৪.৪.৯; মৈঃ ৪.২ এবং ৬.৩)। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্র কখনও দ্বৈত ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। কিন্তু শাস্ত্রে অদ্বৈতভাবনার প্রশংসা আছে এবং অদ্বৈতজ্ঞান হইতেই যে অমৃতত্বলাভ করা যায় এইরূপ উক্তিই আছে। পূর্ব-মীমাংসার মতানুসারে হয়তো কোন বস্তুর নিজস্ব কোন ফল নাই, অথচ যাহার ফল আছে সেইরূপ কোন বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আছে— সেই ক্ষেত্রে স্বকীয় ফল বর্জিত বস্তুটি ফলবান বস্তুর অধীন মাত্র। সুতরাং দ্বৈতভাব গৌণ, ইহার নিজস্ব কোন ফল নাই। অদ্বৈতভাবনাই মুখ্য কারণ ইহাই শ্রুতিশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার শাস্ত্রে আমরা এইরূপ উক্তিও পাই— "আত্মা অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহত্তর" (কঠ ১.২.২০); "স্থূলও নহে সূক্ষ্মও নহে"— ইত্যাদি। এই সব শাস্ত্রবাক্য নিঃসন্দিগ্ধভাবেই ব্রহ্মের দ্বৈতভাবকে অস্বীকার করে এবং অসীমত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

ইহার পরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে : সব কিছুকেই যদি নস্যাৎ করা হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকিবে কি? এইরূপ নেতি নেতি পদ্ধতির দ্বারা আমরা একটা অস্তিত্ববিহীন অবস্থায় উপনীত হইব। না, এইরূপ অবস্থা হইতেই পারে না। আমরা অনন্তকাল 'নেতি নেতি' করিয়া অগ্রসর হইতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে কোন একটি মৌলিক অস্তিত্বে আসিতেই হইবে। সব কিছুর অন্তরালে এই মূল সত্তাটিই হইলেন আত্মা বা ব্রহ্ম। কোন একটি বস্তুকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন তাহার পশ্চাতে শূন্যস্থানটি থাকিয়াই যায়, সেইরূপ যখন আমরা আমাদের পরিদৃষ্ট এই জগৎকে অস্বীকার বা অপসারণ করি তখন

ইহার পশ্চাতে ব্রহ্মই থাকিয়া যান। ব্রহ্মকে নস্যাৎ করা যায় না, ব্রহ্মই সব কিছুর সাক্ষীস্বরূপ। সব কিছুকে অস্বীকার করিলেই যে আমরা অনস্তিত্ব অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইব তাহা বলা যায় না। আমরা যে এই অনস্তিত্ব অবস্থার ধারণা করিতে পারি ; ইহার পশ্চাতে প্রজ্ঞাদাতৃ সাক্ষী-চৈতন্য কোন একজন আছেন। এই তিনিই হইলেন মূল সত্তা ব্রহ্ম। এই সূত্র-গ্রন্থে সূত্রকার এই সংশয়েরই সমাধান করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রন্থে ব্রহ্মকে কোথাও অস্বীকার করা হয় নাই— ব্রহ্মের দুইটি আকারকেই মাত্র অস্বীকার করা হইয়াছে। শব্দের অর্থকে রূপান্তরিত করিয়া এবং আলোচ্য বিষয়ের ওলট-পালট (বিপর্যয়) করিয়া ব্রহ্মের দুই আকারেরই (দ্বৈতভাবের) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টার অর্থ হইল শাস্ত্রের উপদেশের মূল উদ্দেশ্যকে অবহেলা করা।

উপনিষদে মায়াবাদ

সাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণা আছে যে, শাস্ত্রগ্রন্থে মায়াবাদের কোন উল্লেখ নাই, ইহা শঙ্করের নিজস্ব একটা মতবাদ এবং এই মায়াবাদকে তিনি বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ ধারণা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। আলোচ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্রে আমরা পাই, "এখন ইহার নাম: 'সত্যস্য সত্যম্'। প্রাণশক্তিই সত্য, ব্রহ্মই ইহার সত্য" (বৃ: ২.৩.৬)। যদি প্রাণশক্তি অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (সুষুপ্তি অবস্থায় জীব), শক্তি যাহার উপাধিমাত্র, সত্য বা বাস্তব হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম এই সত্যেরও সত্য। অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্যতার মাত্রা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সত্যতার মাত্রা হইতে ভিন্ন। যদি এই জগৎ শঙ্করের মতানুরূপ মায়া না হইয়া সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইলেন এই সত্যেরও সত্য। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জগতের সত্যতা ব্রহ্মের সত্যতা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। তাই ব্রহ্মকে যখন জানা যায় তখন জগতের আর অস্তিত্বই থাকে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭.২৪.১ মন্ত্রেও অনুরূপ ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে অনন্ত ব্রহ্মকে অমৃত এবং সসীম (সান্ত) জগৎকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। শঙ্করও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম এবং জগতের সত্যতার মাত্রার ভেদ আছে। যেমন আমাদের নিকট জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থার দুইটি জগতের সত্যতার মাত্রা ভিন্ন— সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মের সত্যতার মাত্রাও ভিন্ন। সুতরাং আমরা স্বপ্নাবস্থার জগৎকে মায়া বলিতে পারি। সূত্রকারও ৩.২.৩ সূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন "মায়া মাত্রং তু"— জাগ্রৎ অবস্থার তুলনায় স্বপ্নাবস্থা অবাস্তব। অনুরূপভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের সত্যতার তুলনায় মিথ্যা বা মায়া। স্বপ্নজগতের সত্যতা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সেইরূপ যতক্ষণ আমরা অজ্ঞানের দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকি ততক্ষণই জগতের সত্যতা। আচার্য শঙ্কর কোথাও জগতের ব্যবহারিক সত্যতাকে অস্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রগ্রন্থগুলির নানাস্থলে উপমা দিয়া ব্রহ্ম এবং জগতের

সত্যতার এই মাত্রাভেদের কথা বুঝানো হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যাইতে পারে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬.১.৪ মন্ত্র। ২.১.১৪ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই শ্রুতি উল্লিখিত। এখানে বলা হইয়াছে যে, নামরূপ বিশিষ্ট বহু ঘটপটাদির সত্যতা অপেক্ষা মূল একমাত্র উপাদান মৃত্তিকা অধিকতর সত্য। আমরা বৃহদারণ্যকের ১.৬.৩ শ্রুতিতেও অনুরূপ ধারণাই পাই— "এই অমৃতসত্তা সত্যের (পঞ্চভূতের) দ্বারা আবৃত: প্রাণশক্তিই অমৃতসত্তা, এবং নাম ও রূপ সত্য; (সুতরাং) এই প্রাণশক্তি তাহাদের দ্বারাই আবৃত।" নাম এবং রূপ অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষীভূত পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্মকে বিশেষভাবে পৃথক্ করা হইল এই বলিয়া যে, ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ। ব্রহ্মের সত্যতার মাত্রা যাহাকে সত্য বলা হইল, তাহার সত্যতার মাত্রা অপেক্ষা ভিন্ন। যেহেতু এই জগতের সত্যতার মাত্রা ব্রহ্মের সত্যতার মাত্রার তুলনায় অল্পমানের বা মায়াবৎ, সেইহেতু ব্রহ্ম নিজে অপরিবর্তিত থাকিয়াও মায়াময় বহুত্ববিশিষ্ট এই জগতের কারণ হইতে পারেন। ব্রহ্মের কূটস্থ অবস্থাকে কোনক্রমে ক্ষুণ্ন না করিয়াও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবিশিষ্ট বহুত্ব অবস্থান করিতে পারে। সূত্রকার ২.১.২৮ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের ন্যায় অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট বহু মায়াজগতের অস্তিত্বের ন্যায় ব্রহ্ম জগতে প্রবিষ্ট হইলেও অপরিবর্তিত থাকিয়াই কারণরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারেন। এই আলোচনা হইতে আমরা শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, এই জগৎ হইল অদ্বৈত ব্রহ্মেরই বিবর্ত।

২৭-৩০ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর ২৯ সূত্রের 'পূর্ববৎ বা' এই উক্তিকে ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২৫-২৬ সূত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই সঙ্গত হইয়াছে। আচার্য রামানুজ ইহাকে ২.৩.৪৩ সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করায় তাহা ততটা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নিম্বার্কাচার্যের ব্যাখ্যা আরও সুদূরকল্পিত কারণ যেখানে রামানুজ ইহাকে পূর্বসূত্রের শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে নিম্বার্ক ইহাকে একটি পূর্বপক্ষ এবং ২.১-এর কোন একটি সূত্রের সিদ্ধান্ত হিসাবেও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কৃত সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যাই এই কারণে খুবই পল্লবিত বলিয়া মনে হয়।

শঙ্কর যে তাঁহার ১১-৩০ সূত্রগুলির ভাষ্যপ্রসঙ্গে সূত্রকারকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা আরও স্পষ্টতরভাবে বুঝিতে পারা যায়, যখন লক্ষ্য করা যায় যে, এই পাদে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে সূত্রকার স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির দৃষ্টান্তটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর ৩য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে বৈরাগ্য-ভাবের উৎপাদনের জন্যই এখানে জীবের জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

২য় পাদের ১-১০ সূত্রগুলিতে জীবের নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট জগতের স্থান এবং কালের সঙ্গে জাগ্রত অবস্থার স্থান ও কালের কোন মিল নাই। শঙ্করের মতে এই ব্যাপার হইতেই প্রমাণিত হয় যে, স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ মায়িক এবং সেই কারণেই জীবেরই সৃষ্টি, ব্রহ্মের সৃষ্টি নয়। ইহা হইতেই তিনি প্রমাণ করিতে চান যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ হইল এই সকল অবস্থার ঊর্ধ্বে এবং জীব স্বয়ংপ্রভ। এইভাবেই ১-১০ সূত্রগুলিতে "তৎ ত্বম্ অসি"- এই মহাবাক্যের 'ত্বম্'- এর প্রকৃত স্বরূপ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১১-২১ সূত্রগুলিতে 'তৎ' -এর স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ২২-৩০ সূত্রগুলিতে এই দুইয়ের একত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই জন্যই এই পাদের ১-১০ সূত্রগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রামানুজ এবং নিম্বার্ক মনে করেন যে স্বপ্নজগতের স্রষ্টা হইলেন ঈশ্বর, জীব নহে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে স্বপ্নজগৎও এই দৃশ্যমান জগতের মতোই সত্য হইত। ধরিয়া নেওয়া গেল ইহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, তাহা হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচিত এই পাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইহার সঙ্গতি কোথায়? ২.৩ পাদে ইহার আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইত— যেখানে সৃষ্টি হইল ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। রামানুজ ৩য় অধ্যায়ের সূচনাতেই বলিয়াছেন, তাহা হইলে ইহাকে প্রথম পাদেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল কারণ প্রথম পাদের আলোচ্য বিষয় হইল জীবের পুনর্জন্মবাদ এবং ইহারও উদ্দেশ্য একই। এইভাবেই এই আলোচনাকে ২য় পাদ হইতে বাহিরে রাখা যাইত কারণ ২য় পাদে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

৩.২.১-৩০ সূত্রগুলির উপর্যুক্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য শঙ্করই যথার্থভাবে বাদরায়ণের আলোচনার মূল উদ্দেশ্যকে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু রামানুজ এবং নিম্বার্ক নিরাশজনকভাবেই ইহা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা

পরিশেষে আমরা ৪.২.১২-১৪ এবং ৪.৪.১-৭ সূত্রগুলির পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথম সূত্রগুলির ব্যাখ্যা যেরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে বলা যায় যে, শঙ্কর অপেক্ষা রামানুজ এবং নিম্বার্কের ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। শঙ্করের মতে সূত্রগুলির ব্যাখ্যা হইল এইরূপ : যদি এইরূপ বলা হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞের প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না কারণ শ্রুতিতে এইরূপ চলিয়া যাওয়া অস্বীকার করা হইয়াছে; ইহার উত্তরে আমরা বলিব— না, এইরূপ বলা যায় না কারণ অন্য শ্রুতিতে (মাধ্যন্দিন শাখার শ্রুতিতে) জীব হইতেই প্রাণের উৎক্রান্তির কথা অস্বীকার করা হইয়াছে, শরীর হইতে নহে (১২)। অন্যান্য শাখার শ্রুতিতেও এই

উৎক্রান্তির বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে (১৩)। সুতরাং ১২ সূত্রের সিদ্ধান্ত পক্ষটি প্রথমত কাণ্ব শাখার বৃহদারণ্যক শ্রুতির (৪.৪.৬) মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরা সূত্রের শেষার্ধের উপর নির্ভর করিয়া ইহার আপত্তি করিয়াছেন এবং এই আপত্তির ভিত্তিও হইল মাধ্যন্দিন শাখার শ্রুতি। আবার এই আপত্তির খণ্ডনও করা হইয়াছে ১৩ সূত্রে কাণ্ব শাখার বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩.২.১১ মন্ত্রের দ্বারা। এইরূপ ব্যাখ্যায় "কোন কোন শাখার মতবাদ" কথাটির কোন সার্থকতাই থাকে না। বরং ১২ সূত্রের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মাধ্যন্দিন শাখার কোন শ্রুতির উল্লেখ করাই সমীচীন ছিল, একই কাণ্ব শাখার উল্লেখ ঠিক হয় নাই, কারণ, যেহেতু ইহার উপরই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

অপরপক্ষে রামানুজ এবং নিম্বার্ক সূত্র দুইটিকে (১২-১৩) অবিভক্ত অবস্থায় একটি ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ: "যদি এইরূপ বলা হয় যে, কাণ্ব শাখার বৃহদারণ্যক শ্রুতির মন্ত্রেও ব্রহ্মজ্ঞের প্রাণ চলিয়া যায় না এই বলিয়া উৎক্রান্তি (৪.৪.৬) অস্বীকার করায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ চলিয়া যায় না, তাহা হইলে আমরা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিব যে, শ্রুতিই বলিয়াছেন— প্রাণ জীব হইতে চলিয়া যায় না (অর্থাৎ প্রাণ জীবাত্মার অনুসরণ করে) এবং ইহা কোন কোন শ্রুতি অনুসারে আরও স্পষ্টতররূপেই বুঝিতে পারা যায় যেমন— মাধ্যন্দিন শাখার বৃহ:৪.৪.৬ শ্রুতি।" আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই ব্যাখ্যাই অধিকতর মনোজ্ঞ এবং যুক্তিযুক্ত কারণ এখানে সূত্রের অন্তর্গত "কোন কোন শাখা" এবং 'হি' শব্দ দুইটিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

যদিও সূত্রের অক্ষরার্থ পর্যালোচনা করিয়া রামানুজ এবং নিম্বার্কের ব্যাখ্যাকেই আমরা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হই তথাপি যদি আমরা এই আলোচনার ভিত্তি বৃহ: ৪.৪.৬ শ্রুতির বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করি এবং ২য় পাদের ১৬ পর্যন্ত সূত্রগুলিকে কিভাবে সাজানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, শঙ্করের ভাষ্যই অপর দুইটি ভাষ্য অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ। আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, সূত্রকারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য অন্যরূপ থাকিলেও তাঁহার কিছুটা ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। বৃহ: ৪.৪.৬ শ্রুতির প্রথম অর্ধে বলা হইয়াছে কিভাবে বাসনাসক্ত জীবের পুনর্জন্মলাভ হয় এবং এই বলিয়া প্রথমার্ধের সমাপ্তি করা হইয়াছে "এইরূপে বাসনাযুক্ত মানুষ জন্মান্তর লাভ করে।" দ্বিতীয় অর্ধে বাসনাশূন্য ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হইয়াছে— "যাঁহার কোন বাসনা নাই তাঁহার... এবং যাঁহার নিকট বাসনার সব বস্তুই আত্মস্বরূপ তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্গত হয় না। তাঁহার সত্তাই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়ায় তিনি ব্রহ্মেই

লীন হন।” এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রুতি কামনাসক্ত এবং বাসনামুক্ত এই দুইটি অবস্থার বৈপরীত্য প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র, এবং অনাসক্ত জীবাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। শ্রুতি এবং বেদান্ত সূত্রগুলি উভয়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, পুনর্জন্ম গ্রহণকারী জীবাত্মা মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়াদির সহিতই নিষ্ক্রান্ত হয়। সুতরাং যখন ইহার বিপরীত উক্তি:— “তাঁহার ইন্দ্রিয়রাশি উৎক্রান্ত হয় না” বলা হয়, তখন স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে, শরীর হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ অস্বীকার করা হইয়াছে, যেমন একজন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হইয়া থাকে। ইহা হইতেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মাধ্যন্দিন শাখার ‘তাহা হইতে’ এই উক্তির দ্বারা শরীরকেই বুঝানো হইয়াছে, জীবাত্মাকে নহে।

এই পর্যন্ত যে আলোচনা হইল তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবেই বলিতে পারি যে, তাঁহার ১২-১৪ সূত্রের ভাষ্যে তিনি যে দুইপ্রকার জ্ঞানের বিষয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা বাদরায়ণের মতেরই অনুসারী হইয়াছে, যদিও সূত্রের অক্ষরার্থের দিক হইতে ইহা ততটা মনোজ্ঞ হয় নাই। সূত্রকারদের সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা পূর্বদৃষ্টান্তবিহীন নয়; কেন না পূর্বমীমাংসা সূত্রের ভাষ্যে উপবর্ষ এবং শবরস্বামীকেও আমরা একই কাজ করিতে দেখিয়াছি।

এখন আমরা গ্রন্থের শেষ অংশের, যেখানে মুক্ত জীবের অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সূত্র ১-৩-এ বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানলাভ করিলেই জীব তাহার স্ব-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। ৪ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। ‘মুক্ত আত্মার স্বরূপ কি’— ইহার পর এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে, এবং ৫-৭ সূত্রে তাহার বর্ণনার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে জৈমিনি এবং ঔড়ুলোমির মতকে দেখানো হইয়াছে এবং সর্বশেষে ৭ সূত্রে বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, এই উভয় মতবাদই সত্য, কারণ ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এখন প্রশ্ন হইল মুক্ত আত্মা সম্পর্কে জৈমিনি এবং ঔড়ুলোমির মত দুইটি কি ক্রমবিশিষ্ট না এককালিক। বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, তাহারা এক এবং অভিন্ন কালেই সত্য, বিষয়টিকে আমরা আপেক্ষিক অথবা অতীন্দ্রিয় যে-কোন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি না কেন। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিরোধী সমালোচকগণ এখানে তাঁহার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচকরা বলেন যে, এই সূত্রে তিনি যথার্থরূপেই মুক্ত আত্মার উপর কতকগুলি গুণ আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন— যে-সকল গুণ স্পষ্টতই মুক্ত আত্মায় থাকিতে পারে না, কারণ এইরূপ মুক্ত আত্মার কোনরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে না। ইহার দ্বারাই তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করের ব্যাখ্যা যথার্থ নহে। এইরূপ

সমালোচনা ইহাই প্রমাণ করে যে, তাঁহারা শঙ্কর এখানে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাই ধারণা করিতে পারেন নাই। শঙ্কর এই কথা বলেন না যে, মুক্ত জীবাত্মা জৈমিনি-বর্ণিত সবগুলি গুণ নিজের মধ্যে আছে বলিয়া স্বয়ং সচেতন। কিন্তু আমরা যাহারা বদ্ধজীব তাহারা এইপ্রকার মুক্ত জীবাত্মার অবস্থার বর্ণনা দিতে এইরূপ বর্ণনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হই। বাস্তবিকপক্ষে মুক্ত জীব শুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান। কিন্তু যেহেতু শুদ্ধচৈতন্যকে আমরা ধারণা করিতে পারি না, সেইজন্যই আমাদের অজ্ঞতাবশত আমরা ইহাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নরূপ বলিয়া দেখি। কারণ শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে ঈশ্বরই হইলেন আমাদের ধারণায় সম্ভাব্য চূড়ান্ত রূপ। সকল প্রকার অজ্ঞতা হইতে মুক্ত জীবাত্মার কোন ব্যবহারই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা যাহারা অজ্ঞতার মধ্যে আছি তাহাদের পক্ষেই ব্যবহার। জৈমিনির বর্ণিত মুক্ত জীবাত্মার বর্ণনা হইল আমাদের বদ্ধজীবেরই ধারণার বর্ণনা। ঈশ্বরের অধীন গুণগুলি সাধারণ বদ্ধ জীবের গুণের ন্যায় নহে। মায়াবদ্ধ হইয়াই জীব নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ইত্যাদি মনে করে। ঈশ্বর সকল দোষের অতীত এবং সেইজন্যই মায়াধীন নহেন; এবং সেই কারণেই ঈশ্বর নিজেকে সর্বগুণান্বিত ও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে সেই সকল শক্তি বর্তমান, কারণ অজ্ঞতাবশত আমরা এই সকল গুণ তাঁহার উপর আরোপ করি। আমরা মুক্ত জীবেও এই সকল ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করি, কারণ আমরা মুক্ত জীবকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বা স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। বাদরায়ণ এবং শঙ্কর উভয়ের মতে ইহাই ৭ সূত্রের সমগ্র তাৎপর্য। সুতরাং যে দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার বিচার করা হয় সেই অনুসারে, সকল জীবাত্মার মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত মুক্ত জীবাত্মার অবস্থাকে আপেক্ষিক এবং তুরীয় এই দুইরূপ বৈশিষ্ট্য-যুক্ত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। কারণ আপেক্ষিক বিচারে ব্রহ্মেরও দুইরূপ বৈশিষ্ট্যই আছে— একটি মায়িক, অপরটি যথার্থ (দ্র: ৩.২.১১-২১)। ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভবের পর জীবাত্মা যে ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করে তাহা সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞাতার শক্তির অনুরূপ নহে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ৪.৪.১৭ সূত্রে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের ঐশ্বরিক শক্তি জগৎ ইত্যাদির সৃষ্টির শক্তির তুল্য নহে (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না), কিন্তু ইচ্ছামাত্র ভোগের সামগ্রী সৃষ্টি করিতে পারেন (৪.৪.৮)। কিন্তু ৪.৪.৫ এবং ৭ সূত্র অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভবকারী জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা হয় নাই।

নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ মুক্তির সঙ্গে সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারা অর্জিত মুক্তির মধ্যে যে একটা পার্থক্য সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ৪.১.১৯ সূত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এখানে তিনি জীবন্মুক্তের নির্গমনের কোন উল্লেখই করেন নাই। তিনি শুধুমাত্র বলিয়াছেন যে, প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মলাভ করে। তাঁহার এই উক্তি

বৃহ: ৪.৪.৬ শ্রুতির এবং বিশেষত ছান্দোগ্য ৬.১৪.২ শ্রুতির সহিত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যতদিন শরীর থাকে ততদিনই ব্রহ্মে লীন হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু 'দেবযানের পথে' ব্রহ্মলোকে গমন করাও একরূপ মুক্তি, কারণ জীবাত্মা সেখান হইতে আর মর্তলোকে ফিরিয়া আসে না। কল্পশেষে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়, ৪.৩.১০ সূত্রে এইরূপ উক্তিই আছে। যেহেতু সূত্রকার গ্রন্থের এই পাদে উপাসনার ফল মুক্তির বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন, সেইজন্যই তিনি ১-৭ সূত্রে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল এবং ৮-২২ সূত্রে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বর্ণনা করিয়াছেন। যদি রামানুজ এবং নিম্বার্ক যেমন বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রকার মুক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই— শুধু একপ্রকার মুক্তির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে— তাহা হইলে যেখানে ৪.৪.৫ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বভাবই প্রাপ্ত হন, তাহার পর এই উক্তি করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, "ইনি ইচ্ছামাত্রই সকল ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন।" অধিকন্তু পাপ, বার্ধক্য, জরা ইত্যাদি হইতে মুক্ত থাকাই যদি জীবাত্মা এবং ঈশ্বর উভয়েরই সমান গুণ হয় (ছা: ৮.১.৫), তাহা হইলে তাহা ঈশ্বরের বিশেষ সংজ্ঞা নির্দেশক বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এইক্ষেত্রে ১.৩.১৯ সূত্রের প্রথম অংশের আপত্তিকে সূত্রের দ্বিতীয় অর্ধের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। সূত্রটি এইরূপ:— "যদি এইরূপ বলা হয় যে এই পাদের পরবর্তী সূত্রগুলি হইতে 'দহর'— 'ক্ষুদ্র আকাশ' বলিতে জীবাত্মাকে বুঝায়— ইহার উত্তরে আমরা বলিব এখানে জীবের পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধির পর (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে) ব্রহ্মস্বরূপ জীবকেই বুঝাইতেছে।" পূর্বসূত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.১.১) ক্ষুদ্র আকাশ বলিতে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে— জীবকে নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীব সম্পর্কে সর্ব কলুষমুক্ত ইত্যাদি যেসব গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র আকাশের গুণ, এই সকল গুণ জীবাত্মা সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। ১৮ সূত্রের ভাষ্যের পরিসমাপ্তিতে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যে উদ্দেশ্যে ছান্দোগ্য ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীবাত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা ২০ সূত্রের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হইবে। পূর্ব উল্লিখিত ১৯ সূত্রে আর একটি নূতন আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। যেহেতু পরবর্তী শ্রুতিতে জীবের প্রসঙ্গই আলোচিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ছা: ৪.৭.১)— এখানে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি— জীবের এই তিন অবস্থার বর্ণনা আছে সেইজন্য 'ক্ষুদ্র আকাশ' বলিতে এখানে জীবকেই বুঝাইতেছে। সূত্রের দ্বিতীয় অর্ধে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এইভাবে যে, এখানে জীব বলিতে শুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মরূপে বিকশিত জীবকেই বুঝাইয়াছে (দ্র: ছা: ৮.১২.৩)। ছা: ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীবাত্মার উল্লেখের উদ্দেশ্য হইল ইহা বুঝানো যে বাস্তবিকপক্ষে জীবাত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত এবং ইহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। রামানুজের

মতানুসারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জীবেরই গুণ যদি 'দোষরাহিত্য ইত্যাদি' হয়, তাহা হইলেও ক্ষুদ্র আকাশ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায় ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না, কারণ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি আছে ১.৩.১৯ সূত্রে। অধিকন্তু ১.৩.২০ সূত্রে (তাঁহার মতে ১৯ সূত্রে) তিনি ছান্দোগ্য ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীবের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা, "এখানে জীবের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য জীব সম্পর্কে উপদেশ দান করা নহে— জীবাত্মার গুণাবলীর কারণীভূত যিনি তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা— অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানদান করা। ইহার কারণ হইল এই যে, মুক্তজীব সম্পর্কে এই সকল ধারণা স্পষ্ট থাকিলে 'ক্ষুদ্র আকাশ' (দহর) সম্পর্কে উপদেশকে আমাদের পক্ষে ধারণা করা সহজ হইবে। যে জীবাত্মা ব্রহ্মলাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটিও জানিতে হইবে, যাহাতে নিজে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া পরিশেষে অনন্ত কল্যাণ-গুণগণের পরাকাষ্ঠারূপ ঈশ্বরের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে মিলিত হইতে পারে।" কিন্তু আমরা শঙ্করের ব্যাখ্যায় জানিয়াছি যে, জীবাত্মার উল্লেখ শুধু মুক্ত-জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্যের অবলুপ্তির জন্যই করা হইয়াছে। ইহা খুবই স্পষ্ট যে এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে রামানুজের ব্যাখ্যাকে মোটেই গ্রহণ করা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীবাত্মার উল্লেখের কারণ প্রসঙ্গে এই যুক্তি মোটেই প্রয়োগ করা চলে না— এবং ইহা ছান্দোগ্য-উপনিষদের সমগ্র ৮ম অধ্যায়ের ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করের সমালোচকগণ শুধুমাত্র ১.৩.১৯ সূত্রের ভাষ্যেই তাঁহার দোষদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যদি বিরুদ্ধবাদিগণ ১৮-২০ এই সূত্রগুলি এবং যে শ্রুতির সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক আছে তাহা বিচার করিয়া সূত্রকারের উদ্দেশ্যকে বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, শঙ্করের ব্যাখ্যা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যায় রামানুজের যে-সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হইল সেই সকল ত্রুটি নিম্বার্কের ক্ষেত্রেও সমানভাবেই প্রযোজ্য।

গীতা-বাক্য শঙ্করের ব্যাখ্যার সমর্থনে

বাদরায়ণ তাঁহার সূত্রগ্রন্থে যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন— তাহার উপর পূর্বে আলোচিত তিনটি ভাষ্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সূত্রগুলির উপর আচার্য শঙ্কর যে-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি আছে। আমরা গীতাতেও একই মতের প্রকাশ দেখিতে পাই। আমরা ভূমিকার প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রের রচনায় গীতা রচয়িতার হাত থাকা অসম্ভব নহে এবং এই ব্যাপারের সত্যতার বিরুদ্ধে রামানুজ বা নিম্বার্ক কেহই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন

নাই। তাঁহাদের মতে একই ব্যক্তি বেদব্যাস উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আরও দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, শঙ্করের ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত। কারণ, আমরা আশঙ্কা করিতে পারি না যে, একই গ্রন্থকার দুইগ্রন্থে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা গীতা হইতে কিছু শ্লোক দৃষ্টান্তরূপ উদ্ধৃত করিব যাহা আচার্য শঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়।

"যাঁহাকে জানিতে হইবে ... ... সেই অনাদি পরব্রহ্মকে আমি বর্ণনা করিব। তাঁহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। ...তিনি সকল বস্তুর বাহিরে এবং ভিতরে অবস্থিত ......তিনি অবিভাজ্য, তথাপি যেন বিভক্ত হইয়াই সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজিত বলিয়া মনে হয়" (১৩.১২-১৬)— এই সকল উদ্ধৃতি ব্রহ্মের নির্গুণত্বই বর্ণনা করিয়াছে। উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে যে, অপরিবর্তনীয় একই সত্তা যেন বহুধা বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত তিনি বিভক্ত হন নাই। সুতরাং তিনি নিজেই হইলেন— "সকল ভূতগণের পালক, স্রষ্টা এবং গ্রাসকারী" (১৩.১৭ এবং ৭.৬-৭)। গীতায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সগুণ এবং নির্গুণ এই দুই রূপই আছে। নির্গুণই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ, আর সগুণ হইল মায়ার সৃষ্টি। এই তত্ত্বটি গীতার ১২.১-এ অর্জুনের প্রশ্ন এবং ১২.২-৫ শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের মাধ্যমে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপকেই স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং একই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মের সগুণ সত্তায় অনুরক্ত তাঁহারা অধিকতরভাবে যোগযুক্ত। যেহেতু ভক্তিযোগই সহজতর সেইজন্য ইহাই অর্জুনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী— এবং সাধারণ মানুষের পক্ষেও ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি একই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫.৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ অধিকতর শ্রেয়।

জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপকে গীতার ২.১১-২৫ শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে ১৬-১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইলেন সৎ, সর্বব্যাপী, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী এবং অসীম। পুনরায় ২৪ শ্লোকে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। বেদের 'তৎ ত্বম্' এই মহাবাক্যটি গীতার ৬.৩১ শ্লোকে ব্রহ্ম এবং জীবের একত্ব ঘোষণার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৯ এবং ৩০ শ্লোকে 'ত্বম' এবং 'তৎ' এর যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুনরায় ১৩.২৯-৩৪ শ্লোকগুলিতে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু মায়াবিষ্ট হইয়া বদ্ধজীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা, অণু এবং ঈশ্বরের অংশবিশেষ বলিয়া জ্ঞান করে। "গুণ এবং প্রকৃতিই সকল কর্ম করিয়া থাকে। 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা' হইয়া মানুষ আমিই কর্তা" এইরূপ জ্ঞান করে (৩.২৭)। ১৪.২৩ এবং ১৫.৭ শ্লোকেও অনুরূপ ভাবের বর্ণনা আছে।

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে: "অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত আছে বলিয়া জীবগণ মোহাবিষ্ট হইয়া আছে" (৫-১৫)। "এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত বলিয়া আমাকে জানিতে পারে না। আমার এই দৈবী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। মায়া দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া বিবেকহীন ব্যক্তিগণ আসুরিক পন্থা অবলম্বন করে"...(৭.১৩ -১৬) ; "আমি আমার যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকট হই না" (৭-২৫) ; "ঈশ্বর সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন" (১৮.৬১)। পরিশেষে, যদিও গীতাতে ভক্তির উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তথাপি কোথাও বলা হয় নাই যে, ভক্তি জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। অন্যপক্ষে গীতায় জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা আছে। "জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র এই জগতে আর কিছুই নাই" (৪.৩৭-৩৮)। "জ্ঞানী আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জ্ঞানীকে আমি আমার আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করি" (৭.১৭-১৮) ইত্যাদি।

উপসংহার

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই পর্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে আমরা ইহা বলিতে চাই না যে, সূত্রগুলির উপর আচার্য শঙ্কর যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহাই একমাত্র সত্য। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হইল ইহাই প্রমাণ করা যে, অন্যান্য মহা ভাষ্যকারের ন্যায় শঙ্করও যেভাবে সূত্রগুলির ভাষ্য করিয়াছেন তাহাও সমর্থনযোগ্য। মূল বিষয় হইল— বাদরায়ণ তাঁহার সূত্রগ্রন্থে উপনিষদের দর্শনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। উপনিষদ্‌গুলির ন্যায় তাঁহার সূত্রগুলিও সর্ববিষয় সম্বলিত। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, উপনিষদ্‌গুলি পূর্বাপর কোন একটি বিশেষ মতবাদের শিক্ষা দেয় নাই। আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার মতবাদই উপনিষদ্‌গুলিতে স্থান পাইয়াছে। উপনিষদের মতবাদগুলি পরস্পরবিরোধী নহে; বরং এই মতবাদগুলি অধিকারীভেদের নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কারণ সকলের একই সত্যকে ধারণা করিবার সমান ক্ষমতা নাই। উপনিষদের শিক্ষায় "অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের"[১] প্রাচীন পদ্ধতিটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। উপনিষদের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ই প্রথমে দ্বৈত উপদেশ বা উপাসনা লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে এবং চমৎকারভাবে অদ্বৈতে ইহাকে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রথমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সব কিছুই পরিণামে বিলীন হয়। তিনিই একমাত্র পূজ্য, বিশ্বের নিয়ন্তা এবং

১ অরুন্ধতী নক্ষত্রকে নির্দেশ করিবার পদ্ধতি হইল— প্রথমে নিকটস্থ কোন বৃহৎ নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলিয়া পরিচয় দিয়া পরে তন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র নক্ষত্র অরুন্ধতীকে দেখানো।

প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। এর পরেই আমরা দেখিতে পাই এই আচার্য-ই শিষ্যদের শিক্ষা দিতেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতি বহির্ভূত নহেন, তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রূপেই বিরাজমান। এবং সর্বশেষে ঈশ্বর সম্পর্কে এই দুই ধারণাকেই বর্জন করিয়া আচার্য শিক্ষা দেন যে, যাহা কিছু সত্য তাহাই ব্রহ্ম। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। "হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই" (পরমাত্মা ব্রহ্ম)। পরিশেষে সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে মানুষের অন্তঃস্থিত আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।[১] বাদরায়ণও উপনিষদের ঋষির এই শিক্ষা-পদ্ধতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই কোন কোন ভাষ্যকার ভ্রান্তভাবে মনে করেন যে, এই সূত্রগুলি শুধু মাত্র তাঁহাদের মতবাদকেই প্রচার করে— অন্য মতকে নহে।

অধিকারিভেদের চমৎকার নীতিই হইল উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার শিক্ষার মূল ভিত্তি। এইজন্যই মতবাদ বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল হিন্দুর নিকটই এই গ্রন্থগুলি সমানভাবে আদরণীয় এবং গৃহীত হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা মনে করিতে পারি যে, সকল ভাষ্যকারদের মধ্যে আচার্য শঙ্করই সূত্রকারের মূল উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে সর্বাধিক সমর্থ হইয়াছেন ; কারণ তিনি পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক উভয় সত্তাকেই স্বীকার করিয়াছেন।

অধ্যাস বা অধ্যারোপ

আচার্য শঙ্করের সমগ্র দর্শনকে এই শ্লোকার্ধে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আর সব কিছুই— এই বিচিত্র জগৎ— হইল অসৎ — ইহা শুধু আপাত প্রতীয়মান সত্তামাত্র। জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, এক এবং অদ্বিতীয়। শাস্ত্র (উপনিষদ্-শ্রুতি) ইহাকে সৎ-চিৎ-নিরতিশয়ানন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম (তৈ:২.১)। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ (বৃহ:৩.৯.২৮) জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব নিম্ন-উদ্ধৃত শ্রুতিগুলির মধ্যে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই ব্রহ্ম (ছা:৬.৮.৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— আমিই ব্রহ্ম (বৃ:১.৪.১০), "আত্মাকেই একমাত্র ধ্যান করিতে হইবে"— 'আত্মেত্যেবোপাসীত' (বৃ: ১.৪.৭)।

ইহার পর এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগে : সত্য যদি একই হন, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই নানাত্ব অনুভব করি কেন? সত্য অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। এইজন্যই শঙ্করকে সত্য এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে আপাত

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৩য় খ : পৃ : ২৮১,৩৭৯-৯৮

বিরোধের ব্যাখ্যা দিতে হইয়াছে। শঙ্কর বলেন জগতের এই নানাত্ব হইল মায়া। যখনই আমাদের ব্রহ্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তখনই নানাত্ব থাকে না— সুতরাং ইহার কোন সত্যতা নাই। অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় ইহা একটি ভ্রম। অবিদ্যার জন্যই এই ভ্রান্তি। এই অবিদ্যা অনাদি। এই অবিদ্যাই সকল নানাত্ব দর্শনের কারণ— এইজন্যই ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। এই অবিদ্যার কারণেই জীবাত্মা নিজেকে উপাধিযুক্ত অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত বলিয়া মনে করে। উপাধিগুলি জীবের উপর আরোপিত মাত্র। উপাধির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই জীব নিজেকে কর্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করে। যদিও যথার্থত জীবাত্মার সঙ্গে উপাধির কোন সম্পর্কই নাই— তথাপি ইহা মায়াবলে সংসারাবদ্ধ হইয়া নিজেকে জন্ম, মৃত্যু, সুখ দুঃখাদির অধীন বলিয়া মনে করে।

শঙ্কর যখন জগৎকে মিথ্যা বলেন, তখন তিনি এমন কথা বলেন না যে, জগৎটা একেবারেই কিছু নয়, তিনি ইহাই বলিতে চান যে, বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। জগতের একটা আপেক্ষিক সত্তা আছে। ইহা আপাত সত্য— কিন্তু যথার্থ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহা চিরন্তন সত্য নহে— অন্যভাবে বলা যায়, ইহা পারমার্থিক বা আত্যন্তিক সত্য নহে। মায়া বা অজ্ঞানের বাস্তব কোন সত্তা নাই। আমরা মায়ার অস্তিত্ব আছে, ইহাও বলিতে পারি না— আবার মায়ার অস্তিত্ব নাই— ইহাও বলিতে পারি না। ইহা আমাদের বুদ্ধির অতীত একটি রহস্য— ইহা অনির্বচনীয়। যেহেতু মায়ার বাস্তব কোন সত্তা নাই, সুতরাং ইহা ব্রহ্মের সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত থাকিতে পারে না— কারণ ব্রহ্ম হইলেন সত্যস্বরূপ। এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কোন সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব। ব্রহ্ম এবং মায়ার সম্পর্ক দৃশ্যত মাত্র ; ব্রহ্মের উপর মায়া আরোপিত হইলেও ব্রহ্ম কোনভাবেই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না— যেমন আরোপিত বলিয়া বিবেচিত সর্পের দ্বারা রজ্জুর কোন পরিবর্তন হয় না।

সুতরাং এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় হইল যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই মায়াসৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হওয়া। যেমন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে একমাত্র রজ্জুর জ্ঞানই সর্পের মায়াভ্রান্তিকে দূর করিতে পারে— অপর কিছুই নহে— সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারাই আপাত-সত্য সংসার হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব। "একমাত্র তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যথার্থভাবে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়— ইহা ব্যতীত চলিবার অন্য কোন পন্থা নাই" (শ্বে: ৩.৮)। "ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করিয়াছেন তাঁহাকে আর মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় না।" জ্ঞানকে বাদ দিয়া শুধু তীর্থযাত্রা, তপস্যা, পূজা এবং দান এইগুলি আমাদের মুক্তিলাভের সহায়ক হইতে পারে না। শুধু আমাদের চিত্তশুদ্ধির

জন্যই ইহাদের উপযোগিতা। এইসব আমাদের চিত্তকে সাংসারিক মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে ধারণা করিবার উপযোগী করে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তখন জীবের কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়, সেইজন্যই ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের পঠন পাঠন একান্তই অপরিহার্য।

আচার্য শঙ্করের জগৎকে মায়ারূপে ব্যাখ্যা করা হইতেই মায়াবাদ বা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে তাঁহার দর্শনকে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহাকে বিবর্তবাদও বলা হয়। বিবর্তবাদ অনুসারে ব্রহ্ম আপাত দৃষ্টিতে-ই জগতে রূপান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়— কিন্তু মূলত তিনি তাহা হন নাই। বিবর্তবাদের বিপরীত মত হইল পরিণামবাদ ; যে মতে ব্রহ্ম যথার্থই জগৎরূপে রূপান্তরিত হন বলিয়া মনে করা হয়। রামানুজের অনুগামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং বেদান্তের অন্য কোন কোন মতাবলম্বী সম্প্রদায় এই মতকে অনুসরণ করেন।

আচার্য শঙ্কর পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রপঞ্চময় এই জগৎ সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যার এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁহার সমসাময়িক কালের অন্যান্য দার্শনিকগণ আপত্তি উত্থাপন করিবেন। এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রের নিজ ভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখেন। ইহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে অথবা অবভাস বা অধ্যারোপকে বিষয়বস্তু বলিয়া একটি অধ্যায়রূপে সুপরিচিত। এই ভূমিকায় তিনি অধ্যাস বা ব্রহ্মের উপর জগৎকে আরোপ করার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অধ্যাস ব্যাপারটি একটি বাস্তব সত্য, ইহা অনুমান মাত্র নহে। তিনি প্রথমেই তাঁহার এই অধ্যাস মতবাদের বিরুদ্ধে যতগুলি আপত্তির উত্থাপন সম্ভব সবগুলিই উল্লেখ করিয়া পরে ইহাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য : ইহা সুবিদিত যে, বিষয়ী এবং বিষয় এই দুইটির ধারণার পরিধি এবং ক্ষেত্র হইল যথাক্রমে 'আমি' এবং 'তুমি'। এই দুইটি আলো এবং অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী— এইজন্যই ইহাদের এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং তাহাদের গুণাবলী এক হইতে পারে না। ফলত বাহ্য বস্তুজগৎ ও ইহার গুণাবলীরূপ বিষয়কে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বিষয়ীর উপর আরোপ করা অযৌক্তিক এবং অসম্ভব।

যদি এই জগৎ-প্রপঞ্চ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় একটি অধ্যাস বা আরোপ হয়, তাহা হইলে উহা কিসের উপর কাহাকে আরোপ করা হইল? জগৎকে কি ব্রহ্মের উপর আরোপ করা হইল? অথবা ব্রহ্মকে জগতের উপর? যদি ব্রহ্মকে জগতের উপর আরোপ করা হইয়াছে বলা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তে দেওয়া অধিষ্ঠান রজ্জুর ন্যায় জগৎ-ই সত্য হইবে। অপর পক্ষে যদি জগৎকেই ব্রহ্মের উপর আরোপিত করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে— ইহাও সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্ম রজ্জুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নহেন।

একটি বস্তু তখনই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় যখন ইহা দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা সীমিত হয়। যেহেতু ব্রহ্ম অসীম অনন্ত, সেইজন্য তিনি এই সকলের ঊর্ধ্বে। সেইজন্যই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও হইতে পারেন না এবং অধ্যাসের ভিত্তি বা অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। আবার ব্রহ্ম হইলেন সকলের অন্তরাত্মা, তাই তাঁহাকে বস্তু হইতে কখনও পৃথক্ করিয়া রজ্জুর সম্মুখস্থ ব্যক্তির ন্যায় পৃথক্‌ভাবে ভাবা যায় না। যখন জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এবং একক, তখনই জগৎকে ব্রহ্মের উপর আরোপ করা সম্ভব।

ব্রহ্মকে একই সঙ্গে বিষয়ী এবং বিষয়— কর্তা এবং কর্মের বিষয় রূপে চিন্তা করা যায় না। কারণ কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে কোন কার্যের কর্তা এবং তাহার কার্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। বিষয় বা কর্ম হইল এমন একটি বস্তু যাহার উপর কর্তার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বা নির্ভর করে— সুতরাং কর্ম বা বিষয়কে কর্তা হইতে পৃথক্ কোন সত্তা হইতেই হইবে। পুনরায় যদি ধরা যায় যে, ব্রহ্ম অন্য কোন প্রকার জ্ঞানের দ্বারা বিমূর্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন— তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বয়ং প্রকাশত্ব তিরোহিত হইবে এবং তিনি সসীম হইয়া যাইবেন। এইরূপে ব্রহ্মের ধারণা শাস্ত্রে নাই। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় সব অধ্যাসের ক্ষেত্রেই যে-বস্তুকে আরোপ করা হইবে তাহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী একটি যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই, জগৎকে যদি ব্রহ্মের উপর আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে জগৎ সম্পর্কে আমাদের একটি 'যথার্থজ্ঞান' থাকা আবশ্যক। জগতের সম্পর্কে 'যথার্থজ্ঞান' হইলে জগৎ সত্য হইয়া যায়— সেই ক্ষেত্রে জগৎ-প্রপঞ্চের নিরোধ বা অবসান সম্ভব হয় না— তাহা হইলে মুক্তিও অসম্ভব হইয়া যায়। এইরূপে, যে-কোন ভাবেই চেষ্টা করা হউক না কেন, অধ্যাসের মতবাদকে আমরা কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না।

তথাপি আচার্য শঙ্কর বলেন যে, এই অধ্যাস অজ্ঞ মানুষের একটি স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ অভিজ্ঞতা। মানুষ অজ্ঞতাবশত পরস্পরবিরোধী বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে সক্ষম নয়। এইজন্যই তাহারা বিষয় এবং বিষয়ীকে তাহাদের গুণাবলীর সহিত পরস্পরের উপর আরোপ করিয়া, সত্য এবং মিথ্যাকে মিশাইয়া ('অহং-মম') — 'এই আমি'— 'ইহা আমার' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আত্মা কিন্তু সম্পূর্ণ অ-বিষয় (অ-বস্তু) ও নহেন। কারণ আত্মাই অহংবোধের বিষয়। আত্মা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ধারণাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না। যদিও আমাদের অন্তরাত্মা (ব্রহ্ম) হইলেন অ-বিষয় এবং অংশরহিত তথাপি আমাদের অনাদি এবং অনির্বচনীয় অজ্ঞতার জন্য আমরা আত্মার উপর শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির আরোপ করি। আমরা মনে করি যেন আত্মা কর্তা, ভোক্তা, বহু-অংশ বিভক্ত এবং নানাত্ববিশিষ্ট। বাস্তবিকপক্ষে তিনি এই সকলের কিছুই নহেন। তথাপি আমরা

এইভাবে আত্মাকে বিষয়রূপে জ্ঞান করি। যথার্থ আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। উপাধিবিশিষ্ট আত্মার (জীবাত্মার) পক্ষেই অহংবোধ (অহংসচেতনতা) সম্ভব। এই যুক্তিকে 'চক্রাকার যুক্তি' বলিয়া মনে হয়। কেন না অধ্যাসকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আত্মাকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শুধু আবার আত্মাতে উপাধির অধ্যাস বা আরোপ করিয়া আত্মাকে উপাধিবিশিষ্ট করিয়াই বিষয়রূপে গণ্য করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা বিষয় নহে। ইহা বৃক্ষ এবং বৃক্ষের বীজের সম্পর্কের ন্যায়। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়— আবার বৃক্ষ হইতেই বীজের জন্ম। বীজেই আবার ভবিষ্যৎ বৃক্ষের কারণ... এইরূপেই চলে। সুতরাং অনাদি ভ্রান্তির এই প্রবাহে আত্মা হইলেন বর্তমান অধ্যাসের অধিষ্ঠান; এই আত্মাই আবার অতীতের অন্য এক অধ্যাসের বিষয়— এবং সেই অধ্যাসেরও অধিষ্ঠান ছিলেন আত্মা— এইরূপভাবে কোথাও ইহার শেষ হইবে না। অর্থাৎ চলিবে অনবস্থা। বিশুদ্ধ-চৈতন্য উপাধিরহিত বলিয়া কখনও অধ্যাসের ভিত্তি বা অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। উপরের দৃষ্টান্তের সসীম উপাধিগুলি যুক্ত হইলেই একটি গুণবিশিষ্ট আত্মার পক্ষে একই কালে কর্তা এবং ক্রিয়ার বিষয় হওয়া সম্ভবপর।

অজ্ঞতাবশতই যখন আমাদের অধ্যাসের প্রতীতি হয়; সুতরাং আরোপিত বস্তুর জ্ঞান যে সত্যই হইবে এমন কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাই। আমাদের যে-কোন একটি জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট; ইহাকে যে যথার্থ জ্ঞানই হইতে হইবে তাহা নহে— ইহা নিজেই অপর একটি ভ্রান্তজ্ঞানও হইতে পারে। আমাদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারণা আছে যে, আত্মা নামক একটি বস্তু আছেন; ইহা সর্বজন বিদিত— ইহা না থাকিলে পৃথিবীর কোন বস্তুকেই আমরা ধারণা করিতে পারিতাম না। "তাঁহার দীপ্তিতেই এই বিশ্বের সব কিছু দীপ্তিমান"— "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (কঠ ২.২.১৫)। আমরা ইহার মধ্যে, ইহার দ্বারাই বস্তুজগৎকে জানি; ইহাকে বাদ দিলে আমাদের পক্ষে কোন চেতনা বা কোন অভিজ্ঞতা লাভ করাই সম্ভব নয়। সকলেই নিজ নিজ আত্মা সম্পর্কে সচেতন, কেহই মনে করে না যে 'আমি নাই'। অথবা অধ্যাসের অধিষ্ঠানকে যে আমাদের সম্মুখে বিমূর্ত কিছু হইতে হইবে তাহাও নহে— কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, আকাশ অদৃশ্য হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে অধ্যাসের অধিষ্ঠান রূপে ব্যবহার করে। আকাশের উপর নীলত্ব, গোলত্ব ইত্যাদি গুণ আরোপ করিয়া 'আকাশ নীল', 'আকাশ গোলাকার', ইত্যাদি বলিয়া থাকে। সুতরাং অধ্যাস হইল একটি প্রতিষ্ঠিত তথ্য।

কিন্তু দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যাহা অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য জ্ঞানোপায়েরও ভিত্তি। তাহা এই জগতের নানাত্বকেই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে অস্বীকার করিয়া ইহার বিরুদ্ধে কিভাবে শাস্ত্র আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন

করিতে পারে? ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে-সকল শাস্ত্র-উদ্ধৃতি জগতের নানাত্বকে অস্বীকার করিয়া একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, সেই সকল শাস্ত্রবাক্যকে এমনভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা আমাদের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ না হয়। এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ শাস্ত্র (শ্রুতিসমূহ) হইলেন নৈর্ব্যক্তিক, শাশ্বত, স্বয়ংপ্রকাশ ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত। তাহাদের প্রামাণ্য হইল প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট এবং স্বয়ংসিদ্ধ— এবং এইজন্যই অভ্রান্ত। শ্রুতি শাস্ত্রাদি স্বয়ং-ই একটি স্বাধীন জ্ঞানের উৎস। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যকেও প্রমাণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটি প্রামাণ্য জ্ঞানের নিজস্ব একটা ক্ষেত্র আছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে তাহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মূল্য সর্বাধিক। সেখানে শত সহস্র শাস্ত্রের বচনও ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। তেমনি, অন্যপক্ষে শ্রুতিশাস্ত্রাদিরও একটি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে যেখানে তাহাদের প্রামাণ্যই চরম— সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোন মূল্যই নাই। শাস্ত্রের ক্ষেত্র হইল অতীন্দ্রিয় জ্ঞান— যেখানে অন্য কোন উপায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এখানে যে অতি-প্রাকৃত সত্যের উপলব্ধি হয় তাহার প্রামাণ্য চরম; প্রত্যক্ষ যুক্তি বা অন্য কোন জ্ঞানের উপরেই তাহা নির্ভরশীল নহে। শাস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভিজ্ঞতার মূল্যকে অস্বীকার করে না— উহার আত্যন্তিক এবং অতীন্দ্রিয়তার মূল্যকে অস্বীকার করে।

অধ্যাসের লক্ষণ

আচার্য শঙ্করের মতে অধ্যাস হইল— "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ"। অধ্যাস একপ্রকার 'অবভাস'— অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তুর অপরবস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয় মাত্র, এবং উহা স্মৃতিজ্ঞানের মতো পূর্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয়। ইহা একটি আপাত প্রতীতি অর্থাৎ আপাত সত্য, যাহা পরবর্তী সময়ে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় ইহা একটি মিথ্যা-জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে ইহাই হইল অধ্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণের বাকি অংশ শঙ্কর প্রদত্ত লক্ষণকে অন্যান্য দার্শনিক প্রদত্ত লক্ষণ হইতে পৃথক্ করিয়াছে। কিন্তু রত্নপ্রভা টীকার রচয়িতা "অন্য কোন বস্তুর উপর আপাত প্রতীতি"— এই অংশকে অধ্যাসের বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে শঙ্করের মতের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এইরূপই বলিয়াছেন— "কিন্তু এই লক্ষণগুলির সব কয়টিই এই বিষয়ে একমত যে, অধ্যাস হইল কোন বস্তুর গুণকে অপর বস্তুর উপর আরোপ করিয়া ইহাকে আপাত সত্য রূপে দেখা।"

দুইটি বস্তুকে পরস্পর না মিশাইয়া যেহেতু ভ্রান্তজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, সেইজন্যই আমরা সংজ্ঞার মধ্যে "কোন কিছু পূর্বদৃষ্ট বস্তু" এই শব্দগুলি পাই। এই শব্দগুলি 'আপাত

প্রতীতি' এই শব্দগুলির সঙ্গে মিলাইলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আরোপিত বস্তুটি কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট আসল বস্তুটি নয়, কিন্তু ইহারই অনুরূপ একটা কিছু। এখানে যাহা প্রয়োজন তাহা হইল একটি অভিজ্ঞতা—সত্য বস্তু নয়। এইজন্যই 'দৃষ্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রতীতি বর্তমান প্রতীতি নয়— ইহা অতীত প্রতীতি তাই 'পূর্ব' শব্দটি ব্যবহারের সার্থকতা। সুতরাং আরোপিত বস্তুটি মিথ্যা বা অসৎ বস্তু। কিন্তু যে বস্তুটির উপর আরোপ করা হইল তাহা সত্যবস্তু। 'স্মৃতিরূপ' এই শব্দটি দ্বারা বস্তুটির পূর্ব দৃষ্ট সকল ক্ষেত্রই এখানে অস্বীকার করা হইল। যেমন একটি ব্যক্তিকে পূর্বে কোথাও দেখার পর পুনরায় সেই লোকটিকেই অন্যত্র দেখিলাম— এখানে এইরূপ দেখা নহে। স্মৃতির ব্যাপারে পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি আবার নূতনভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় না। অধ্যাসের ক্ষেত্রে শুধু স্মৃতিমাত্রই কার্য করে।

অধ্যাসের এই লক্ষণের বিরুদ্ধে মীমাংসকগণ একটি আপত্তি উত্থাপন করেন। তাহাদের মতে একটি অসত্যবস্তু আমাদের প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে সকল জ্ঞানই সত্য, মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া কিছুই হইতে পারে না। তাঁহারা সকল জ্ঞানেরই স্বকীয় যথার্থ মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন ; কারণ তাঁহাদের মতে প্রত্যেক জ্ঞানই একটা নিশ্চয়াত্মক ধারণা উৎপাদন করে এবং সেই সময়ের মতো আমাদের মনে ঐ জ্ঞান সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। যদি ঐরূপ নিশ্চয়াত্মিকা প্রতীতি না থাকে তাহা হইলে সর্বদাই আমরা সন্দেহের মধ্যে থাকিব এবং স্থির কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। সুতরাং প্রত্যেকটি জ্ঞানই সাময়িকভাবে সত্য, হয়তো পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায় ইহা মায়ার ন্যায় অলীক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শঙ্কর প্রদত্ত অধ্যাসের লক্ষণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে-কোন বস্তু প্রতীতির বিষয় হইয়াছে বলিয়াই যে উহা সত্য হইবে তাহা নহে। একটি বস্তু অলীক বা মিথ্যা হইয়াও আমাদের প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। তাহা না হইলে মরীচিকার জল সত্য-ই হইত— কিন্তু আমরা জানি বস্তুত ইহা মিথ্যা।

মীমাংসার প্রভাকর-মতাবলম্বীরা আর এক নূতন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। জগৎ কিভাবে মিথ্যা বা অস্তিত্ববিহীন হইতে পারে? অনস্তিত্ব ধারণার নিজস্ব কোন শ্রেণী বা জাত নাই— অন্যের কোন যথার্থ বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হইলেই ইহার ধারণা সম্ভব। আমরা নাস্তিত্বের কথা তখনই বলিয়া থাকি, যখন একটি সত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য একটি সত্যবস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারি। যখন আমরা 'ঘট'কে 'পট' বলিয়া ধারণা করি, তখনই আমরা ঘটে পটের অনস্তিত্ব বিষয়ের কথা বলিতে পারি। অনস্তিত্ব বলিতে মোটের উপর ইহাই বুঝায়— ইহার অতিরিক্ত কোন সত্যতা ইহার নাই (অর্থাৎ ইহা মিথ্যা)।

একটা অসৎ বস্তু কখনও আমাদের প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং এই জগৎ যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে ইহা কখনও আমাদের প্রতীতির বিষয় হইতে পারিত না।

এই যুক্তিকেই মরীচিকার দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মীমাংসকদের মতে সত্যবস্তু— বায়ুস্তরের মধ্যে প্রতিসরিত সূর্য-কিরণ— হইল 'জলের অনস্তিত্ব' মাত্র, এবং ইহা হইতেই স্বতঃ প্রমাণিত হয় যে, যে-বস্তুকে আমরা প্রতীতি করিতেছি (দেখিতেছি) তাহা জল হইতে পারে না। মীমাংসকেরা ইহাও বলিতে পারেন না যে, মরীচিকায় দৃষ্ট জল সত্য নহে— কারণ এখানে জলের প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং মরীচিকায় দৃষ্ট জল সত্যও নহে— মিথ্যাও নহে— আবার ইহা একই কালে সত্য এবং মিথ্যা উভয়াত্ম হইতে পারে না। এইজন্যই এই জগৎ-প্রপঞ্চকে আমাদের ধারণার বহির্ভূত অনির্বচনীয় বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল আচার্য শঙ্করের যথার্থ অভিমত।

আচার্য শঙ্কর বলেন যে, প্রত্যেক বস্তুরই সৎ এবং অসৎ দুইটি স্বভাব আছে। সৎ ভাবটি বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে স্বতই প্রকাশ; কিন্তু অসৎ ভাবটির প্রতীতি নির্ভর করে অন্য কোন বস্তুর উপর। মরীচিকাতে সূর্যের কিরণাবলী-ই সত্য— কিন্তু জলরূপে ইহাদের প্রতীতি মিথ্যা। এই মিথ্যাত্ব প্রতীতির পূর্বে অন্যত্র জল দর্শনাদি দর্শন-সংস্কারের উপর নির্ভরশীল। সত্য চিরকালই সত্য, কিন্তু মিথ্যা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম চিরকালই অপরিবর্তিত থাকেন। কিন্তু মায়া এবং ইহার প্রপঞ্চ সৃষ্টি, যাহা ব্রহ্মেই আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, সত্য নহে। অসত্য বলিয়াই মায়া সদা পরিবর্তনশীল— তথাপি ইহার প্রতীতি আমাদের হইয়া থাকে। জগৎ-প্রপঞ্চ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, আবার সত্যাসত্যও নহে— ইহা অনির্বচনীয়।

অন্যান্য সম্প্রদায় অনুযায়ী অধ্যাসের লক্ষণ

বৌদ্ধধর্মের চারিটি শাখাই অধ্যাসকে— "একটি বস্তুর গুণকে অপর বস্তুর উপর আরোপ করা"— বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, অধ্যাস প্রতীতির মধ্যে জ্ঞানের আকৃতিগুলি অথবা বিষয়াকারে আকারিত অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাবগুলি অন্য কোন বাহ্যবস্তুর উপর আরোপ করা হয়, সেই বাহ্যবস্তু নিজেই যথার্থ অথবা মায়িকও হইতে পারে। প্রভাকর-মতাবলম্বিগণ বৌদ্ধদের এই লক্ষণকে খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ বৌদ্ধদের মতে বিজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা বলিয়া আর পৃথক্ কোন সত্তা নাই। আত্মা হইল বিজ্ঞানেরই একটি রূপ। যদি কোন ভ্রান্ত প্রতীতিতে একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সর্পও এক প্রকার জ্ঞানের আকার প্রাপ্ত হইল। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতীতি এইরূপ হওয়া উচিত ছিল— "আমি একটি সর্প" অথবা 'আমার সর্প'— এবং "ইহা একটি

সর্প” এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত ছিল না। সেইজন্যই প্রভাকর-মতবাদিগণ অধ্যাসের এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন— “যাহা আরোপিত হইল এবং যাহার উপর আরোপিত হইল তাহাদের উভয়ের পার্থক্যের অনুপলভ্যমান ভ্রান্তিই অধ্যাস।” এখানে কোন নিশ্চিত ভ্রান্তি অথবা মিথ্যাজ্ঞান নাই, শুধুমাত্র দুইটি বাস্তব প্রতীতির মধ্যে পার্থক্যের অনুপলব্ধি আছে— ইহাদের একটি প্রতীতি হইল পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ। যখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম করা হয়, তখন পূর্বদৃষ্ট রজতের স্মৃতির সঙ্গে সদ্য দৃষ্ট শুক্তির পার্থক্যের প্রতীতি হয় না। নৈয়ায়িকগণ এই বলিয়া এই লক্ষণকে খণ্ডন করেন যে শুধুমাত্র পার্থক্যের অপ্রতীতি কোন ক্রিয়ার প্ররোচক হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শুক্তিতে দৃষ্ট রজতখণ্ডকে লাভ করিবার প্রলোভনই আমাদের ক্রিয়াশীল করে। যেখানে স্পষ্ট কোন জ্ঞান নাই, যেমন সুষুপ্তিকালে— সেখানে কোন ক্রিয়াশীলতাও নাই। নিশ্চিত জ্ঞানই আমাদের ক্রিয়াশীলতার জন্য দায়ী— আমরা স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থা দুইটি হইতেই ইহা বুঝিতে পারি। শুধুমাত্র স্মৃতিও আমাদিগকে কর্মে প্রণোদিত করিতে পারে না। সুতরাং ভ্রান্তির মধ্যেও আমরা আমাদের সম্মুখস্থ রজতের সত্যতা সম্পর্কে সচেতন— শুধুমাত্র রজতের স্মৃতি সম্পর্কে নহে।

সুতরাং নৈয়ায়িকের মতে অধ্যাসের লক্ষণ এইরূপ :— “কতকগুলি গুণের ভ্রান্ত কল্পনা রজতের গুণের ন্যায় যাহা বস্তুর (শুক্তির) স্বভাবের বিরুদ্ধ তাহার উপর রজতের গুণ আরোপ করা।”— অর্থাৎ যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহারই বিপরীত ধর্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। “যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্মত্ব কল্পনা”— হইল অধ্যাস। এখানে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত বস্তু (শুক্তি) এবং স্মৃতিতে অবস্থিত রজতের মধ্যে একটি ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রজত কিন্তু বর্তমানে এখানে উপস্থিত নাই— কল্পিত মাত্র— শুধু আমাদের স্মৃতিতেই আছে এবং বাস্তব রজত অন্যত্রই অবস্থান করিতেছে। ভ্রান্ত ব্যক্তিটি কিন্তু সচেতন নয় যে, ইহা রজতের একটা স্মৃতি মাত্র— বাস্তবিক রজত নহে। অন্যত্র দৃষ্ট রজতের সঙ্গে শুক্তির ঐক্য অনুভবই ভ্রান্তি উৎপাদনের হেতু। এইরূপে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা নিশ্চিত ভাব আছে যাহা প্রভাকরের লক্ষণে নাই। তথাপি একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দূরস্থিত রজত কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে আসিতে পারে? রজতকে আমাদের সম্মুখে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করার জন্য শুধু রজতের স্মৃতিমাত্র নহে, রজতেরই সাক্ষাৎ উপস্থিতি প্রয়োজন। যদি বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়ের একটা “অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ” ইহার সহিত যুক্ত আছে, তাহা হইলে যেখানে “ধূম হইতে অগ্নির অনুমান” করা হয় সেখানেও আমরা বলিতে পারি যে— এখানে একটা “অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ” আছে। এইরূপ হইলে অনুমিতিকে জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া গণ্য করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে,

ভ্রান্তির মধ্যে একটা অনির্বচনীয় রজতের উৎপত্তি হয় যাহা সাময়িকভাবে সত্যই। এই উৎপন্ন রজতই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় হইয়া 'ইহা রজত'— এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি করে। শুক্তিতে যে রজত দর্শন হয় তাহা অন্যত্র থাকে না, কারণ, তাহা হইলে তাহা এই মুহূর্তে এইস্থানে প্রতীতির বিষয় হইতে পারিত না। ইহা মনেও অবস্থান করে না। ইহা একেবারে সত্তাহীন কিছুও নহে; কারণ, তাহা হইলে ইহা প্রতীতির বিষয় হইতে পারিত না। আবার ইহা শুক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্তা হিসাবেও থাকিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে ইহা পরবর্তী কালে বিলীন হইতে পারে না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, রজতের বাস্তব অস্তিত্ব কোথাও নাই, শুধু তাহার একটা আপাতদৃষ্ট একটা সত্তা আছে যাহা অনির্বচনীয়।

এই অধ্যাসকে রূপক হিসাবে অবিদ্যা বলা হয়, কেন না এখানে কার্যকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অভাব বুঝায় না, বুঝায় সেই জ্ঞানকে যাহা পরবর্তী কালে বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। অবিদ্যার বিপরীতকে বলা হয় জ্ঞান— বিদ্যা। যখন আত্মাকে বৈদান্তিক উপদেশ এবং শ্রবণ মনন ও সাধনা দ্বারা সসীম উপাধির বন্ধন হইতে পৃথক্ করা হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান হইলেই অধ্যাসের বিলোপ হয়। এখানে শুধুমাত্র বুদ্ধিজাত জ্ঞানের কথা বলা হয় নাই, যথার্থ উপলব্ধির কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু অধ্যাসের দ্বারা বস্তু দুইটির পরস্পরের ভাল মন্দ কোন গুণেরই কোন প্রকার হানি হয় না, সেইজন্য যখন যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় তখন ইহা অজ্ঞান এবং তাহার সমস্ত কার্যকে সমূলে উৎপাটিত করে যাহার ফলে অজ্ঞানের পুনরুৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ইহার পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইত যদি অধ্যাসের ফলে আত্মা কোন প্রকারে অ-নাত্মা ও তাহার অবগুণের দ্বারা কলুষিত হইতেন।

অজ্ঞতাজনিত এই অধ্যাসই হইল আনুমানিক ভিত্তি যাহার উপর আমাদের জ্ঞানলাভের উপায়ের তারতম্য, জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞাতা, আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত। কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক সকল ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিও হইল এই অধ্যাস। আমাদের জীবনের সকল অভিজ্ঞতার এই ভ্রান্তি হইতেই আরম্ভ। এই ভ্রান্তিই, (অধ্যাস) আমাদের আত্মাকে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে এক করিয়া দেখায়। সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও জ্ঞানের ব্যাপার এই ভ্রান্ত দেহাত্মৈক্যকে ধরিয়া নিয়াই অগ্রসর হয়। কারণ এই অধ্যাস বা ভ্রান্তি না থাকিলে শুদ্ধ আত্মা কখনও জ্ঞাতা হইতে পারেন না, এবং জ্ঞাতা পুরুষ না থাকিলে শুদ্ধজ্ঞানলাভের উপায়ও কার্যকর হইতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধ জ্ঞানলাভের উপায়গুলিও এবং শাস্ত্রাদির উপদেশক গ্রন্থরাশি অবিদ্যার রাজ্যেরই অন্তর্গত। যাহারা এখনও অবিদ্যার অধীন, এবং যাহারা এখনও আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই তাহাদের

জন্যই শাস্ত্রাদির প্রয়োজন যতদিন পর্যন্ত না চরম সত্য লাভ হয়, ততদিন পর্যন্তই শাস্ত্রাদির প্রয়োজনীয়তা— শাস্ত্রাদির একটা আপেক্ষিক মূল্য মাত্র আছে। কিন্তু পারমার্থিক সত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদের তথাকথিত জ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবশ্য তাহাদের যথেষ্ট মূল্যই আছে— কারণ শাস্ত্রাদি আমাদিগকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করিতে পারে। আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান যে মোটে জ্ঞান নহে ইহার আরও প্রমাণ হইল এই যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে পশুর সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য নাই। যেমন একটি গরু উদ্যত যষ্টিহস্ত কোন লোক দেখিলে পলায়ন করে এবং তৃণহস্ত কোন ব্যক্তির কাছে অগ্রসর হইয়া যায়; সেইরূপ অধিকতর বুদ্ধিমান জীব মানুষও অসিহস্ত আক্রমণোদ্যত দুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে পলায়ন করে কিন্তু ইহার বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তির প্রতি অগ্রসর হয়। ইন্দ্রিয়জ প্রতীতির ব্যাপারে প্রাণীদের ব্যবহার যে অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভালভাবেই আমরা জানি। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে যতদিন মানুষ মায়ার অধীন ততদিন তাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ব্যাপারাদিও অনুরূপভাবে অজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত ।

এমনকি শাস্ত্রাদিও অবিদ্যাভূমির কবলিত— এই কথাটা আমাদের নিকট প্রথমে বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হইতে পারে। যদিও সাধারণ ব্যাপারের প্রতীতির সময় অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকার জন্য আমাদের ব্যবহারের সঙ্গে পশুর ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তথাপি যাগযজ্ঞাদি ধর্মীয় আচরণের সময় যজমানের এই জ্ঞান থাকে যে, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। তাহা না হইলে মৃত্যুতে দেহের ধ্বংসের পরও সে স্বর্গে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল ভোগ করার প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, যদিও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তির স্পষ্টতই এই জ্ঞান থাকে যে, আত্মা শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তথাপি বেদান্তশাস্ত্রাদি বর্ণিত আত্মার যথার্থ স্বরূপটি তাহার অধিগত আছে একথা বলা চলে না, বরং আত্মা সম্পর্কে এইরূপ যথার্থ জ্ঞান তাহার পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে কেন না যে-ব্যক্তি আত্মাকে অ-ভোক্তা অ-কর্তা ইত্যাদি বলিয়া জানে সে কিভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে? "ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য"— ইত্যাদি শাস্ত্র উপদেশ এই অনুমানের উপরই কার্যকর হইতে পারে যে— জাতি, বর্ণ, আশ্রম, বয়স এবং পরিস্থিতি প্রভৃতি উপাধিগুলি আত্মার (ব্রহ্মের) উপর আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির কোনটাই আত্মার উপাধি নহে। অবিদ্যার অধীন ব্যক্তির জন্য শুধু যে কর্মকাণ্ডের বিধানই দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে— বেদান্তের চর্চার বিধানও দেওয়া হইয়াছে। কারণ জ্ঞানলাভের উপায়, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতার পার্থক্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে বেদান্তের শ্রুতি বচনাদির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। যে-ব্যক্তি এই সকল পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন, সে দ্বৈত জগতে বাস করে বলিয়াই অবিদ্যার অধীন। কিন্তু বেদান্ত এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে

পার্থক্য আছে। কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হইল স্বর্গাদি ভোগ—যাহা অবিদ্যারই অধীন। আর বেদান্ত আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সহায়তা করে— এবং এই আত্মোপলব্ধিই সকল অজ্ঞানের করে মূলোচ্ছেদ।

অজ্ঞান কিভাবে আমাদিগকে জ্ঞানে লইয়া যাইতে পারে? (ব্যবহারিক) জ্ঞান ব্যবহারিক সত্তার মধ্য দিয়া আমাদিগকে পারমার্থিক জ্ঞানে লইয়া যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনিন্দ্য ভাষায় বলা যায়:— "যখন আমাদের হাতে কাঁটা বিদ্ধ হয়, তখন আমরা আর একটি কাঁটা দিয়া উহা বাহির করি এবং শেষে উভয় কাঁটাকেই ফেলিয়া দেই।" সেইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানই আপেক্ষিক অজ্ঞতাকে— যাহা জীবকে অন্ধ করিয়া রাখে— দূর করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান এবং এইরূপ অজ্ঞান উভয়েই, একইভাবে অবিদ্যার অধীন। সুতরাং যিনি চরম জ্ঞানের অধিকারী হন, যিনি পরম অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সকল দ্বৈতভাবনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পরিশেষে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদের প্রামাণ্যকে (বিধানগুলিকে) প্রশ্নাতীতভাবেই মানিয়া নিতে হয়। কারণ যে পর্যন্ত সেই পরমব্রহ্মের জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে বিরত রাখা সম্ভব নয়। শুধু ব্রহ্মানুভূতির পরই শাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। তাহার পূর্ব পর্যন্ত— "কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্র (শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি) তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাত হইয়া কর্মাধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া কর্মের অনুষ্ঠান কর।" (গীতা ১৬।২৪) কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় তখন— "যে জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহার নিকট সকল বেদের প্রয়োজন ততটুকু, মহা প্লাবনের সময় ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন যতটুকু মাত্র থাকে।" (গীতা ২।৪৬)। শুধুমাত্র ব্রহ্মজ্ঞের নিকটই শাস্ত্রাদির প্রয়োজন নাই— অন্যের নিকট নহে।

ব্রহ্ম-সূত্র

প্রথম অধ্যায় । প্রথম পাদ ।

অধিকরণ ১ : ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ইহার প্রাথমিক প্রয়োজন।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।। ১ । ১ । ১ ।।

অথ (এখন) অতঃ (সেইজন্য) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা
(ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা)।

১. এখন (প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক গুণগুলি অর্জনের পর) সেইজন্য (যেহেতু যজ্ঞাদি হইতে উৎপন্ন ফলরাশি ক্ষণস্থায়ী এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল চিরস্থায়ী) জিজ্ঞাসা (প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে) ব্রহ্মের (পরস্পর বিরোধী বহু দার্শনিক মতবাদের জন্য যে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।)

[১. যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল ক্ষণস্থায়ী জানার পর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয় গুণগুলি অর্জন করিয়া সর্বপ্রকার সংশয়-মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আলোচনার প্রয়োজন।]

গ্রন্থের প্রারম্ভেই ব্রহ্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি—এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে।

আপত্তি— ব্রহ্ম সম্পর্কে এইরূপ জিজ্ঞাসার কোন সার্থকতাই নাই। কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সাধারণত যে বস্তুটি সুবিদিত, অথবা যাহার জ্ঞানের দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এমন কোন বিষয়ে জানিবার আগ্রহও প্রকাশ করে না। প্রয়োজনের তাগিদেই সে কর্মচেষ্টায় পরিচালিত হয়। ব্রহ্ম হইলেন এইরূপই একটি বস্তু। যেহেতু ব্রহ্ম হইলেন শুদ্ধ এবং অনিয়ন্ত্রিত সেইজন্য ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা থাকিতেই পারে না। কারণ, আমরা ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ জানি— "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ২.১)।

যেহেতু ব্রহ্ম আত্মা হইতে অভিন্ন এবং বেদান্তও এই কথাই বলেন, সেইজন্য ব্রহ্ম সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, আত্মা হইলেন 'আমি' বা অহং ধারণার অবলম্বন বস্তুমাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মা যে আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন তাহা আমাদের নিকট সুবিদিত। উপরন্তু কেহই নিজের

অস্তিত্বকে সন্দেহ করে না। সুতরাং ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের কোন অনিশ্চয়তাই থাকিতে পারে না যাহার জন্য আমরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইব। এই জীবাত্মা হইল অনাত্ম বস্তুর আত্মার উপর অধ্যাস এবং আত্মবস্তুর অনাত্মাতে অধ্যাস ; সুতরাং ইহা যথার্থ আত্মা নহেন— যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়— তাহাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বস্তুর মধ্যে এইরূপ অধ্যাস মোটেই সম্ভবপর নহে।

পুনশ্চ, আমাদের সকলেরই ওই আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে যে একটা জ্ঞান আছে বলিয়া উপরে বলা হইয়াছে সেই জ্ঞান আমাদের জগৎপ্রপঞ্চের ধারণাকে নস্যাৎ করিয়া মুক্তিলাভের সহায়ক হইতে পারে না— কারণ জগৎ এবং ব্রহ্মের যুগপৎ অস্তিত্বের এই ধারণা স্মরণাতীত-কাল হইতেই আমাদের মধ্যে একত্র বর্তমান রহিয়াছে। এবং যেহেতু আমাদের অহংবোধ ব্যতীত আত্মা সম্পর্কে অন্য কোন জ্ঞান নাই— যে জ্ঞানকে আমরা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে পারি— সেইজন্য আমাদের জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে ধারণার অবসান হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অন্য কথায় বলিতে পারা যায়— জগৎ আমাদের কাছে সত্য-ই, মায়া বা অলীক নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষলাভের পক্ষে কোনই সহায়ক হইতে পারে না। এই সব কারণেই ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা অভিপ্রেত নহে।

আপত্তির খণ্ডন :—

ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে, কারণ এ সম্পর্কে আমাদের বহু অনিশ্চয়তা বর্তমান, কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কেও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পরস্পর বিরোধী ধারণা দেখিতে পাই। নানা দার্শনিক সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন। জীব যদি যথার্থই আত্মা হইত তাহা হইলে অধ্যাস অসম্ভব হইত এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তাই থাকিত না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাহা নহে। শ্রুতি আত্মাকে সব উপাধিমুক্ত, অসীম, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অদ্বিতীয় ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্র আত্মার এই স্বরূপকে পুনঃপুনঃ শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আত্মার এই সকল লক্ষণকে গৌণ বা আলংকারিক বিশেষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু জীবকে নির্দিষ্ট কোন স্থান এবং আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়াই আমাদের মনে হয়, যখন আমরা বলি— 'আমি এই গৃহের মধ্যে আছি' 'আমি শত দুঃখ অনুভব করিতেছি' 'আমি অজ্ঞ'— ইত্যাদি। আমাদের এই প্রকার ধারণাকে কিভাবে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বলিয়া মনে করিতে পারি ? সীমাহীন আত্মাকে সসীমরূপে, মনে করাটাই তো একটা ভ্রান্তি বা মায়া। সুতরাং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অধ্যাস একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ

জ্ঞানের ফলশ্রুতি হইল মুক্তিলাভ। সুতরাং এই জ্ঞান আমাদের খুবই মূল্যবান উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রহ্ম বিষয়ক জিজ্ঞাসার অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং এই বিচারে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য।

সূত্রে 'অথ' এই শব্দটি একটি নূতন বিষয়ক প্রস্তাব আরম্ভ করার জন্য প্রযুক্ত হয় নাই। অবশ্য এই অর্থেই অন্যত্র 'অথ' শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হইয়া থাকে, যেমন— যোগসূত্র এবং পূর্বমীমাংসা-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ অর্থেই 'অথ' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। 'অথ'—অতঃপর, এই শব্দটি একটি বিষয়ের পূর্বানুবৃত্তি বুঝায়। অব্যবহিত পূর্বের কোন একটি বিষয়ের অনুসরণ করার অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্য কোন অর্থে নহে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অব্যবহিত পূর্বে কতকগুলি সর্ত আছে— যাহা পূর্ণ হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে এবং এই সর্ত পূর্ণ না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব নহে। এই পূর্ব সর্ত বেদাধ্যয়ন নহে, কারণ স্বাধ্যায় পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত উভয় পন্থার জন্যই প্রয়োজন। অথবা কর্মকাণ্ডের জ্ঞান এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য পূর্ব সর্ত নহে; কারণ জ্ঞানলাভেচ্ছুকে এই ক্রিয়াকাণ্ড কোন ভাবেই সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং এই 'অথ' শব্দটি কিছু অত্যাবশ্যক আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিকেই বুঝাইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি হইল :— (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিচার, (২) ইহলোকের বা পরলোকের সকল প্রকার কর্মফল ভোগ ত্যাগ, (৩) ছয়টি সাধন-সম্পদ যথা— শম এবং দম— বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, উপরতি— ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-চিন্তা হইতে বিরতি— তিতিক্ষা — সর্বপ্রকার সহনশীলতা, (৪) সমাধান— ঈশ্বরের নিয়ত ধ্যান ও চেষ্টা, (৫) শ্রদ্ধা এবং (৬) মুমুক্ষুত্ব— মুক্ত হইবার প্রবল ইচ্ছা।

অধিকরণ ২ : ব্রহ্মের লক্ষণ।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ।।১।১।২।।

জন্মাদি (উৎপত্তি প্রভৃতি—স্থিতি এবং ধ্বংসও) অস্য (ইহার— এই জগতের) যতঃ (যাহা হইতে)।

২. (ব্রহ্ম হইলেন সেই সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী কারণ) যাহা হইতে সৃষ্টি (স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি)— ইহার (জগতের) আরম্ভ।

[২. জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।]

পূর্ব সূত্রে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কারণ ইহা আমাদের মুক্তির সহায়ক। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির উপায়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য

ব্রহ্মের কতকগুলি লক্ষণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। যাহা না হইলে আমরা এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের এইরূপ কোন লক্ষণ নাই যাহার দ্বারা ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়, আর ব্রহ্মের সংজ্ঞা না থাকিলে ব্রহ্মকে জানাও সম্ভব নয় এবং ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে মুক্তিও সম্ভব নয়।

এই সূত্রে পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। "যিনি এই জগতের কারণ তিনিই ব্রহ্ম"— এই লক্ষণের মধ্যে কল্পিত 'জগতের কারণ' শব্দটিই হইল ব্রহ্মের নির্দেশক। ইহাকে তটস্থ লক্ষণ বলা হয়। তটস্থ লক্ষণে কোন বস্তুর বর্ণিত গুণগুলি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না হইলেও ইহারা বস্তুটির সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভ করিতে সাহায্য করে। সূত্রে প্রদত্ত লক্ষণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের গুণগুলি হইল জগতের স্বভাব, এবং সেইজন্যই ব্রহ্মের সঙ্গে এইগুলির কোন সম্পর্কই নাই, কারণ ব্রহ্ম হইলেন শাশ্বত এবং পরিবর্তনহীন। তথাপি রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিয়া যেমন আমরা বলি সর্প রজ্জুই তেমনি আমরা জগতের গুণগুলিকেই ব্রহ্মের উপর আরোপ করিয়া কল্পনা করি ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

শাস্ত্রগুলি ব্রহ্মের আর একটি লক্ষণ নির্দেশ করে যাহাতে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"। ইহাকে স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়— কারণ এখানে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি যদিও সাধারণ কথোপকথনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথাপি ইহারা এক অবিভাজ্য অখণ্ড ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে, যেমন পিতা পুত্র ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিবিধতাহেতু একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতে পারে।

ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, জগতের আদি কারণ ব্রহ্মকে এই সূত্রের মাধ্যমে অনুমান প্রভৃতি যুক্তির সহায়তায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ন্যায় জানা যাইবে। শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত ব্রহ্মকে জানা সম্ভবপর নহে। যদিও জগৎরূপ কার্য হইতে— ইহার একটি কারণ অবশ্যই আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি, তথাপি আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না এই কারণের স্বরূপটা কি। যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন সেই জন্য আমরা বলিতে পারি শুধু ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ— অপর আর কিছু নহে। কার্য এবং কারণের মধ্যে তখনই সম্পর্কস্থাপন করা সম্ভব যখন উভয় বস্তুই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অনুমান ইত্যাদি প্রক্রিয়া ব্রহ্মকে জগতের আদি কারণ বলিয়া একটা দৃঢ় সঙ্কেত মাত্র দিতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যতই দৃঢ়ভাবে পরিকল্পিত হউক না কেন, অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করিয়া অন্যথা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। মানুষের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে যুক্তিও সীমাহীন— এইজন্য যুক্তি

সত্য নির্ধারণে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং সব যুক্তিরই ভিত্তি হওয়া উচিত শাস্ত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যই বেশি। শাস্ত্ররাশি হইল সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, আপ্তবাক্য বলিয়াই ইহার প্রামাণ্য। এইজন্যই শাস্ত্ররাশি অভ্রান্ত। সুতরাং জগতের আদি কারণ-নির্ণয়-ব্যাপারে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

সুতরাং এই সূত্রের প্রধান উদ্দেশ্য অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা নহে, ইহার উদ্দেশ্য হইল সেই সকল শাস্ত্রবাক্য পর্যালোচনা করা যাহার দ্বারা ব্রহ্মকে আদি কারণ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই শ্রুতিগুলি এইরূপ "যাঁহা হইতে এই সকল ভূতগণ জাত হইয়াছে, জন্মের পর যাঁহার সাহায্যে ইহারা বাঁচিয়া আছে, এবং মৃত্যুর পর ইহারা যাঁহাতে প্রবেশ করে— তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩.১)। এই সূত্রটি ব্রহ্মের পূর্ণ অভিজ্ঞার জন্য বেদান্ত শ্রুতিগুলির সমাহার করিয়াছে। যেখানে শাস্ত্র-বাক্য ব্রহ্মকে বিশ্বের আদি কারণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে, যুক্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ততটুকুই সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে যতটুকু শাস্ত্রবাক্যের অ-বিরোধী; বরং যতটুকু বেদান্তবাক্য উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক ও পরিপূরক। এই সকল যুক্তিকে সাধনালব্ধ সত্যের প্রমাণকারী হইতে হইবে। এই জাতীয় যুক্তির মধ্যে থাকিবে শাস্ত্রবাক্যাদির শ্রবণ, শ্রুত শাস্ত্রাদির অর্থের মনন এবং সিদ্ধান্তিত বিষয়ের উপর নিবিড় ধ্যান বা নিদিধ্যাসন। ইহা হইলেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞা বলিতে চিত্তবৃত্তির এমন একটা রূপান্তর বুঝায় যাহা লাভ হইলে ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের সকল অজ্ঞান দূর হয়। যখন এই চিত্তবৃত্তির বিবর্তনের মাধ্যমে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়, তখনই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধারণ প্রতীতির ক্ষেত্রে যখন আমরা কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করি তখন আমাদের চিত্ত বাহ্য বস্তুটির আকারে আকারিত হয়, ইহার দ্বারা ঐ বস্তু বিষয়ক অজ্ঞান দূর হয় এবং চিত্তবৃত্তির বিবর্তিত অবস্থার উপর চৈতন্য প্রতিফলিত হইলেই আমাদের বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিবর্তন অজ্ঞতাকে বিনাশ করে— আর বিশুদ্ধ চৈতন্য, অমায়িক স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন। এইজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকে 'নেতি', 'নেতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন— এবং এইভাবেই ব্রহ্ম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাকে দূর করিয়াছেন। কোথাও ব্রহ্মকে 'ইহাই ব্রহ্ম', 'ইহাই ব্রহ্ম'— এইরূপ ইতিবাচক শব্দদ্বারা বর্ণনা করেন নাই।

এইভাবেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ধর্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। ধর্ম জিজ্ঞাসার ব্যাপারে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। পূর্বমীমাংসা বলেন যে, যদি তুমি এই এই কর্ম কর, তাহা হইলে এই এই ফললাভ করিবে। এই ফল ভাবী 'অদৃষ্ট', সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ফল পাওয়া যাইবে না। তাই একমাত্র শাস্ত্রবিশ্বাস ব্যতীত এই সকল উক্তির সত্যতা প্রমাণ

করিবার অন্য কোন অবলম্বন নাই। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের চর্চা করে, যে ব্রহ্ম স্বতঃই বিরাজমান একটি সত্তা এবং যাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ মনুষ্যের চেষ্টার উপর নির্ভরশীল নহে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাসের পরেও ইহার উক্তির সত্যতাকে প্রমাণ করার অন্য অনেক উপায়ও আছে। এইজন্যই বেদান্ত-চর্চায় যুক্তি প্রভৃতিরও স্থান আছে।

অধিকরণ ৩ : একমাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১। ১। ৩ ॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (যথার্থ জ্ঞানের উপায় হইল শাস্ত্র)।

*৩. শাস্ত্ররাশি (একমাত্র) হইল যথার্থ জ্ঞানের উপায় (ব্রহ্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের উপায়। ২ সূত্রের প্রতিজ্ঞাত বিষয়, এখানে সমর্থিত হইয়াছে।)

[৩. শাস্ত্ররাশিই হইল ব্রহ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উপায়।]

এই সূত্র ২ সূত্রের ভাবকে আরও স্পষ্টতর করিয়াছে। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ ইহা শুধু শ্রুতি বাক্যের দ্বারাই প্রমাণ করা যায়, অনুমান ইত্যাদির দ্বারা নহে— এই বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এই সূত্রের দ্বারা দূর হইবে। এই সূত্রটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে, একমাত্র শ্রুতিই ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রমাণ।

আপত্তি :— ব্রহ্ম হইলেন ঘটাদির ন্যায় পূর্ব হইতেই বর্তমান একটি বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মকে শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে যথার্থ জ্ঞানলাভের অন্য উপায়গুলির দ্বারাও জানা সম্ভব।

উত্তর :— ব্রহ্ম আকারাদি বর্জিত। সুতরাং ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীতির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বহ্নির প্রতি ধূমের ন্যায় ব্রহ্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কোন লক্ষণ বর্তমান না থাকায় ইহাকে অনুমান বা উপমান কোন কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্মকে শুধুমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই জানা সম্ভব। শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন— " যে শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ, সে সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না।" পূর্ববর্তী সূত্রে বলা হইয়াছে যে, অভ্রান্ত জ্ঞানের জন্য এই জাতীয় প্রমাণেরও প্রয়োজন আছে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠার পরই কেবল পরিপূরক হিসাবে ইহাদের উপযোগিতা, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

---

* এই সূত্রকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। ২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিচিত্র জগৎকারণ ব্রহ্মকে স্বাভাবিক কারণেই সর্বদর্শী হইতে হইবে। এই সূত্রে ইহার সমর্থন আছে। সেই ক্ষেত্রে সূত্রটির পাঠকে এইরূপ করিতে হইবে— "যেহেতু ব্রহ্ম হইতে শাস্ত্র সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে (সেইজন্য ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান হইতেই হইবে)"। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, ঈশ্বর নিজের নিঃশ্বাস হইতে বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যিনি এই অনন্ত জ্ঞানরাশির আকর শাস্ত্রসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান না হইয়াই পারেন না।

অধিকরণ ৪ : সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ব্রহ্ম।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ১।১।৪ ॥

তৎ (তাহা) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ (কারণ, ইহাই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়)।

৪. কিন্তু সেই (ব্রহ্মকে শুধুমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই জানিতে হইবে, নিরপেক্ষভাবে অন্য কোন উপায়ের দ্বারা নহে— ইহা প্রমাণিত হইয়াছে) কারণ ব্রহ্মাই হইলেন (সকল বেদান্ত শাস্ত্রের) মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

[৪. সকল উপনিষদ্ শাস্ত্রদ্বারাই মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জানিতে হইবে।]

পূর্বমীমাংসাবাদীদের আপত্তিঃ— বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলি ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না। বেদও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, সনাতন ব্রহ্মজাতীয় বস্তুর জ্ঞানদানের বিষয়কে প্রতিপাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না— কারণ, ব্রহ্মকে অন্য উপায়ের দ্বারাও জানা যায়। যে সকল বস্তুকে অন্য উপায়ের দ্বারা জানা যায় না, সেই সকল বস্তুর কথা এবং সেই বস্তু লাভের উপায়ের কথাই সাধারণত বেদে বলা হইয়াছে। পুনশ্চ, ব্রহ্ম যিনি আমাদেরই নিজস্ব আত্মা তিনি আমাদের গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য কোনটাই হইতে পারেন না। এইজন্যই ব্রহ্ম মানুষের প্রযত্নসাধ্য হইতে পারেন না। সুতরাং যে শাস্ত্ররাশি সদা বর্তমান ব্রহ্ম সম্পর্কে কতকগুলি উক্তি মাত্র করেন এবং যে ব্রহ্ম আমাদের কাম্য বা বর্জনীয় কোনটাই নন বলিয়া নিরর্থক, সেই শাস্ত্রের কোন সার্থকতা নাই বলিয়াই মনে হয়।

বেদের মন্ত্রগুলির তখনই সার্থকতা থাকে যখন ইহা কোন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেইজন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য উহাকে কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইবে এবং ঐ কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশকও হইতে হইবে। সুতরাং বেদান্তের জীবাত্মা সম্পর্কিত উক্তিগুলি কর্তাকেই নির্দেশ করিয়াছে; ব্রহ্ম সম্পর্কিত শ্রুতিগুলি দেবতাকে এবং সৃষ্টি সম্পর্কিত শ্রুতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধনাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। সেইক্ষেত্রে কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসাবে বেদান্তের উক্তিগুলির একটা সার্থকতা থাকিবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বেদান্ত বাক্যগুলি শুধুমাত্র ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহারা নিরর্থক হইয়া যায়; কারণ, সে ক্ষেত্রে তাহারা কোন কর্মানুষ্ঠানের সহায়ক হইতে পারে না।

আপত্তির উত্তর :— সূত্রের অন্তর্গত 'তু' শব্দটি সকল আপত্তিকেই খণ্ডন করিয়াছে। বেদান্ত বাক্যগুলি শুধুমাত্র ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে ; কারণ, ইহাদের সকলেরই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইলেন ব্রহ্ম। নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেই কোন শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যায় : (১) উপক্রম এবং উপসংহার, (২) পুনরুক্তি, (৩) বিষয়বস্তুর অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি। এই ছয়টিই কোন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল বিষয় বা প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা বুঝিতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সব কয়টি অনুচ্ছেদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন ব্রহ্ম; কারণ, এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যই এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার আরম্ভ হইল— "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সৎ-ই ছিলেন" ("সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ছাঃ ৬.২.১); এবং ইহার উপসংহার হইল এই বলিয়া, "এই সদাখ্য বস্তুর দ্বারাই এই সমস্ত আত্মবান; তিনিই আত্মা"। "তদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (৬.১৬.৩) এখানে সৎ বা ব্রহ্মের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ উক্তির মধ্যে— "হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই"। এখানে 'সেই' শব্দে একই আত্মা বা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অপূর্বতা খুবই সুস্পষ্ট, কারণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোন উপায়েই জানা যায় না যেহেতু ব্রহ্মের কোন আকার বা গুণ নাই। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য শাস্ত্র এখানে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন মৃত্তিকা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ জগতের সব কিছুই এই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মকে যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অর্থবাদ বা প্রশংসা মাত্র। ইহার ফল কি তাহাও বলা হইয়াছে; "ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা হইয়া যায়"। যখন আমরা ব্রহ্মকে সর্বজনীন সত্তা বলিয়া অনুভব করি, তখন আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুকেও ইঁহারই অন্তর্নিহিত বলিয়া জানিতে পারি। সুতরাং এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন পূর্বোক্ত ব্রহ্ম।

পুনশ্চ, এই সকল শাস্ত্রের উক্তি যে কর্তা প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে এমন বলা চলে না; কারণ, কর্মকাণ্ড বহির্ভূত বিশেষ কোন অধ্যায়েই এই সকল শ্রুতি আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রুতিগুলিকে নিষ্প্রয়োজনও বলা যায় না, কারণ এই শ্রুতিবচনের ধারণা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের আলোচনা না করিয়াও, 'ইহা রজ্জু, সর্প নহে' ইত্যাদি উক্তি মাত্রের দ্বারা ভ্রান্তিকে দূর করার সহায়তা হয়। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রজ্ঞান কোন ব্যক্তিকে মোক্ষলাভে সাহায্য করে না, তাই যথার্থ উপলব্ধিকেই এখানে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

আপত্তি :— শাস্ত্রগুলির বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে— যেহেতু ইহাতে মানুষের আচরণীয় কতকগুলি বিধি লিপিবদ্ধ আছে। এই বিধানগুলি মানুষকে কোন কার্যে প্রবৃত্ত অথবা কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করে। 'শাস্ত্র' শব্দটির অর্থই হইল এই [শাসন করা, কিছু করিতে বা না করিতে বলা]। বেদান্ত শাস্ত্রগুলিতেও কিছু বিধি-নিষেধ আছে, সুতরাং ইহারও একটা উদ্দেশ্য আছে। কেন না যদিও ব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি শ্রুতি শুধু ব্রহ্মের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের মাধ্যমে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, সেই বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মাকে জানিতে হইবে, আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে মনন

করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে" ইত্যাদি শ্রুতি বচনগুলিতে শাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনার মাধ্যমে সাধককে ব্রহ্মের সম্পর্কে ধারণা দিয়া, কিভাবে মনন, চিন্তন এবং ধ্যান-ধারণাদি সাহায্যে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হইবে তাহারও বিধান দিয়াছেন। এইরূপে শাস্ত্রগুলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্পর্কিত কতকগুলি বিধান রচনা করিয়াছেন।

আপত্তির উত্তর :— "যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।" ("ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" মুঃ ৩.২.৯) ইত্যাদি শ্রুতিবচন দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানার অর্থ হইল, একেবারে ব্রহ্মই হইয়া যাওয়া। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম পূর্ব হইতেই অস্তিত্ববান একটি সত্তা, সেই হেতু আমরা ব্রহ্মলাভ করার ব্যাপারকে একটি ক্রিয়া বলিয়া মনে করিতে পারি না; ইহা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মরূপ ফললাভ ব্যাপারের ন্যায় নহে। যখন আমাদের অজ্ঞান দূর হয়, তখন ব্রহ্ম স্বতই প্রকাশিত হন, ঠিক যেমন সর্পের ভ্রান্তি দূর হইবামাত্র রজ্জু স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে রজ্জু কোন ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট বস্তু নহে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— আমিই ব্রহ্ম (বৃহঃ ১.৪.১০)- প্রভৃতি শ্রুতি, যেখানে জীবকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে— ইহা একটি কল্পনা বিলাস মাত্র নহে। ইহা একটি বাস্তব সত্য। সেইজন্যই যে সকল শ্রুতিতে ধ্যান এবং ভক্তিপূর্বক পূজা ইত্যাদির বিধান করা হইয়াছে তাহার সহিত ইহার পার্থক্য আছে। যেমন "মনই ব্রহ্ম, মনে ইত্যাকার উপাসনা করিবে" এবং 'আদিত্যই ব্রহ্ম' (ছাঃ৩.১৮.১; ৩.১৯.১)— ইত্যাদি শ্রুতি। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যচেষ্টার উপর নির্ভরশীল নহে। সেইজন্যই ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মসম্পর্কিত কোন জ্ঞানকে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা অসম্ভব। ব্রহ্মকে আবার মানুষের জ্ঞানলাভরূপ ক্রিয়ার বিষয় বলিয়াও বলা যায় না। কারণ এইরূপ শ্রুতিবচন আছে— "ইনি (ব্রহ্ম) জ্ঞাত বস্তু হইতে পৃথক্ এবং ইনি অজ্ঞাত বস্তুরও অতীত।" ("অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি", কেনঃ ১.৪) এবং "হে মৈত্রেয়ি! কিসের দ্বারা জ্ঞাতাকে জানা যাইবে?" (বৃহঃ ২.৪.১৪)। ঠিক এইরূপ ভাবেই ব্রহ্ম যে উপাসনার বস্তু নন তাহাও বলা হইয়াছে— " একমাত্র তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, লোকে এখানে যাঁহার উপাসনা করিতেছে তিনি ব্রহ্ম নন" ("তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" কেন ১.৫)। সেইজন্যই শ্রুতি কখনও ব্রহ্মকে 'ইনি' 'উনি' ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করেন নাই, শুধু মিথ্যা বহুত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন। যেমন এই সকল শ্রুতি:— "ব্রহ্মের মধ্যে নানাত্ব নাই" ("নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" কঠ ২.১.১১) এবং "যে ইহার মধ্যে নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে" (কঠ ২.১.১০)। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

অধিকন্তু, ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির ফল হইল কোন কিছুর সৃষ্টি, সংস্কার, শুদ্ধি অথবা প্রাপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে ইহাদের কোনটারই সম্পর্ক নাই কারণ ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তিরই স্বরূপ। যদি মুক্তি বা মোক্ষ সৃষ্ট বা সংস্কৃত কোন বস্তু হইত তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইত না, এবং

সেই ক্ষেত্রে কোন দার্শনিক মতবাদের সাধকই এই মুক্তি লাভের জন্য এতটা অনিশ্চয়তার পথে অগ্রসর হইতেন না। ব্রহ্ম যেহেতু আমাদেরই (অন্তরাত্মা, সেইজন্য কোন কর্মের দ্বারাই তিনি প্রাপ্তব্য নহেন) যেমন আমরা গমন রূপ কর্মের দ্বারা কোন গ্রামে উপনীত হই, (সেইরূপে কোন কর্মের দ্বারা ব্রহ্মে উপনীত হওয়ার ব্যাপার নাই)। আর ব্রহ্ম যেহেতু অনাদি কাল হইতেই শুদ্ধ, সুতরাং কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে পরিশুদ্ধ করারও কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ, জ্ঞানকেও মনের কোন ক্রিয়া বলা যায় না। ক্রিয়া মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, কোন বস্তুর ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তা ইচ্ছা করিলে কোন কার্য করিতে পারেন, না-ও করিতে পারেন, আবার অন্যভাবেও করিতে পারেন। অন্য পক্ষে, জ্ঞান মানুষের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না, বস্তু নিজের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান হইল অস্তিত্বশীল কোন বস্তুর উপর বিশুদ্ধ মানস পদ্ধতি দ্বারা লব্ধ ফল। সুতরাং জ্ঞানকে উৎপাদন, জ্ঞানের উৎপাদনকে রোধ, অথবা জ্ঞানকে রূপান্তরিত করা চলে না। যদিও জ্ঞান একটি মানস ব্যাপার, তথাপি ইহা এই জাতীয় উপাসনা হইতে ভিন্ন:— "হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি," "নারীই অগ্নি"— ইত্যাদি (ছাঃ ৫.৭.১; ৫.৮.১)।

সুতরাং যেহেতু ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নাই, সেইজন্য শাস্ত্রের বিধি নিষেধের সঙ্গেও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং— "আত্মাকে জানিতে হইবে"— ইত্যাদি শ্রুতি যদিও অবশ্য করণীয় কর্তব্যকে বুঝায়, তথাপি ইহা বিশেষ কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধান নির্দেশ করে না। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, যে মন সাধককে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া এই ব্যবহারিক জগতে নিমজ্জিত রাখিয়াছে— সেই মনকে অভ্যন্তরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আর ইহাও সত্য নয় যে, শাস্ত্র যদি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি বা নিষেধ বিধান করে তাহা হইলেই উহার সার্থকতা। কারণ শুধুমাত্র অস্তিত্বশীল কোন বস্তুর বর্ণনার মধ্য দিয়াও শাস্ত্র বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে, যদি সেই বর্ণনা দ্বারা মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয়। আর যে ব্রহ্মজ্ঞান মানুষকে মুক্তিরূপ ফল দান করে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর আর কি হইতে পারে? ব্রহ্মের ধারণার জন্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। শুধুমাত্র শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা বা লাভ করা যায় না। মনন এবং নিদিধ্যাসনও ব্রহ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণার গৌণ সহায়ক। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, শাস্ত্র এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য বিধান দিয়াছেন। ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে ধারণা করার পর যদি মনে হয় যে, ইহা শাস্ত্রবিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, ঐ বিধানগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের পরিপূরক মাত্র ছিল।

সুতরাং ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির সঙ্গে ব্রহ্মের কোনভাবেই সম্পর্ক নাই। সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রই একটি মাত্র স্বতন্ত্র বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, যাহা হইল ব্রহ্ম। এই শাস্ত্ররাশিই এই ব্রহ্মের একমাত্র প্রমাণ, কারণ অন্য কোন কিছুর মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা সম্ভব নয়।

এযাবৎ উল্লিখিত পূর্ব সূত্রগুলিতে দেখানো হইয়াছে যে, বেদান্তশাস্ত্র একান্তভাবে শুধুমাত্র ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনাই করে, ইহার সহিত কর্মানুষ্ঠানের কোন সম্পর্কই নাই, এবং ব্রহ্ম হইলেন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ইত্যাদির কারণ। এখানে সাংখ্যবাদিগণ একটি আপত্তি উত্থাপন করেন:—সৃষ্টি বিষয়ক বেদান্ত শ্রুতিগুলিতে ব্রহ্মের কোন উল্লেখ নাই—কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অচেতন প্রধানকে প্রথম কারণ বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু কার্য বিষয়ে প্রধান হইলেন সর্বশক্তিমান। আবার প্রধানের অন্যতম উপাদান হইল সত্ত্ব। গীতা স্মৃতির (১৪.১৭) মতে জ্ঞান হইল সত্ত্বেরই একটি গুণ। সুতরাং প্রধানকে গৌণভাবে সর্বজ্ঞ বলা যায়, কারণ প্রধানের সকল জ্ঞানের ক্ষমতাই আছে। অন্য পক্ষে ব্রহ্মের উপর সর্বজ্ঞত্ব বা অল্পজ্ঞত্ব আরোপ করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম হইলেন স্বতন্ত্র এবং শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। উপরন্তু, যেহেতু প্রধানের তিনটি উপাদান আছে, তাই সঙ্গত কারণেই মনে হয় যে একমাত্র প্রধানই মৃত্তিকার ন্যায় নাম রূপের বহু বিচিত্র বস্তুর মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইতে পারেন; কিন্তু উপাদান রহিত সমসত্ত্ব এবং অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম পরিবর্তিত হইতে পারেন না। অধিকন্তু, প্রথম কারণ হইল পূর্ব হইতেই বর্তমান একটি সত্তা; সুতরাং ইহাকে কার্য হইতে কারণের ন্যায় অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ করা যাইতে পারে এবং শাস্ত্রও কার্য হইতে কারণের অনুমোদনই করেন। সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলিতে যাইয়া প্রথম কারণ সম্পর্কে যাহা বলেন তাহা যুক্তিযুক্ত এবং প্রধান সম্পর্কে ইহা ভালভাবেই প্রযোজ্য। সুতরাং শ্রুতিগুলি এখানে প্রথম কারণকেই নির্দেশ করিয়াছেন।

অধিকরণ ৫ : প্রথম কারণ, একটি জ্ঞানময় সত্তা।

৫-১১ সূত্রগুলিতে সাংখ্যবাদীদিগের মতকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মকেই প্রথম কারণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখানকার আলোচনাটি প্রধানত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়কে অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে।

ঈক্ষতের্ন, অশব্দম্ ।। ১ । ১ । ৫ ।।

ঈক্ষতেঃ (চিন্তা করার জন্য, দেখার জন্য) ন (নহে) অশব্দম্ (শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়)।

৫. চিন্তা করেন বলিয়া (সৃষ্টির আদি কারণ প্রধানের উপর এই গুণ আরোপ করা হইয়াছে) নহে (সাংখ্যবাদীরা আদি কারণ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন), ইহা (প্রধান) শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত নহে।

[৫. জগতের আদি কারণের চিন্তা, দর্শন ইত্যাদির কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অচেতন প্রধানের কথা শাস্ত্রে নাই বলিয়া প্রধানকে প্রথম কারণ বলিলে উহা অশাস্ত্রীয় উক্তি হইবে।]

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, 'আদি কারণ' সৃষ্টির পূর্বে ইচ্ছা করিয়াছিলেন (বা চিন্তা করিয়াছিলেন)। "হে সৌম্য, এই বিশ্ব প্রথমে 'সৎ' ছিল, এই সৎ ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি (আত্মা) মনে করিলেন 'এক আমি বহু হইব, আমি জগৎকে বিস্তার করিব।' সুতরাং ব্রহ্ম এই জগৎসমূহ সৃষ্টি করিলেন" (ঐঃ ১.১. ১-২)। অচেতন প্রধানের পক্ষে এইরূপ চিন্তন বা ঈক্ষণ সম্ভবপর নহে। এইরূপ কার্য ব্রহ্মের ন্যায় চৈতন্যসম্পন্ন সত্তার পক্ষেই সম্ভব।

প্রধানের মধ্যে সত্ত্বাংশটি আছে বলিয়া ইহার উপর সর্বজ্ঞ গুণটি আরোপ করা সঙ্গত হইবে না কারণ প্রধানের মধ্যে সত্ত্বগুণটি মুখ্য নহে, তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। ইহার পরও যদি বলা হয় যে, প্রধান সত্ত্ব জ্ঞান উৎপাদন করিতে সক্ষম, তাহা হইলে অপর দুইটি গুণ (রজঃ এবং তমঃ)-ও অবশ্যই একইভাবে জ্ঞান উৎপাদনের প্রতিবন্ধকও হইতে পারে। সুতরাং সত্ত্ব যখন ইহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন রজঃ এবং তমঃ ইহাকে অল্পজ্ঞ বলিয়া দেখাইবে। ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ।

ব্রহ্ম স্বয়ং বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়া ব্রহ্মের পক্ষে সর্বজ্ঞত্ব এবং স্রষ্টৃত্ব অসম্ভব— ইহাও সত্য নহে। কারণ ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে সর্বজ্ঞ এবং সৃষ্টি-সক্ষম হইতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্ম, উপনিষদে যাঁহাকে 'সৎ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন (ঐক্ষত)— তিনিই জগতের আদি কারণ।

আদি কারণের উপর দর্শন (বা ইচ্ছার) কর্তৃত্বাদির গুণ আরোপ করার জন্য যে চিন্তার অসুবিধা হইয়াছে তাহা পরিহার করার জন্য সাংখ্যবাদিগণ এইরূপ বলেন :- উপরি উল্লিখিত শ্রুতিতেই পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে, "সেই তেজ (অগ্নি) ঈক্ষণ করিলেন 'আমি বহু হইব, আমি জাত হইয়া প্রকট হইব।' তেজ জল সৃষ্টি করিলেন; জল ইচ্ছা করিলেন...। ইহা হইতে মৃত্তিকা (ক্ষিতি) সৃষ্ট হইল" ("তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত" ছা: ৬.২.৩-৪)। এখানে তেজ (অগ্নি) এবং অপ্ (জল) পদার্থ সত্তা মাত্র। তথাপি তাহাদের উপর ইচ্ছাদি ক্রিয়া আরোপ করা হইয়াছে। 'ঠিক' এইভাবেই মূল শ্রুতিতে সৎ-কর্তৃক ঈক্ষণাদি কার্য যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে আলংকারিক উপমাদি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান, যদিও অচেতন, তথাপি সৃষ্টির প্রথম কারণ হইতে পারেন।

ইহার পরবর্তী সূত্রটি এই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছে।

গৌণশ্চেৎ, ন, আত্মশব্দাৎ ॥১।১।৬॥

গৌণঃ (অপ্রধান — আলংকারিক) চেৎ (যদি, যদি বলা হয়) ন (না) আত্মশব্দাৎ আত্মা— এই শব্দের জন্য)।

৬. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ইচ্ছা করিলেন) এই শব্দটি গৌণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে (সৎ-সম্পর্কে); (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) না, এইরূপ নহে, কারণ 'আত্মা' এই শব্দটি (যে শব্দের দ্বারা শ্রুতি আদি কারণকে বুঝাইয়াছেন)।

[৬. শ্রুতি গৌণ অর্থে 'ঈক্ষণ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিলে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না; কারণ শ্রুতি অবশেষে জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে আত্ম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।]

পূর্বসূত্রে উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যে সৎ তেজ, জল ইত্যাদি সৃজন করিয়া ইচ্ছা করিলেন, এখন আমি এই তিনটিতে (অগ্নি, জল এবং ক্ষিতিতে) জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নাম এবং রূপে প্রকাশিত হইব ("অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"। ছাঃ ৬.৩.২)। আদি কারণ সৎ বলিতে এখানে চৈতন্য সত্তাকেই বুঝাইয়াছে, জীবকে ইহার আত্মারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অচেতন প্রধান জীবকে তাঁহার আত্মা বা তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন না। সাংখ্যবাদিগণ পুনরায় এই আপত্তিকে এই দৃষ্টান্ত দিয়া খণ্ডন করিতে চান যে, 'আত্মা' শব্দটি চেতন অ-চেতন উভয় প্রকার বস্তু বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ইহা ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রধান প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

পরবর্তী সূত্রটি এই যুক্তিকে খণ্ডন করিবে।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

তন্নিষ্ঠস্য (যিনি 'সৎ' বিষয়ে নিষ্ঠ, অনুরাগী, তাঁহার জন্য) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ লাভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে)।

৭. (সেই প্রধানকে যে 'আত্মা' শব্দদ্বারা নির্দেশ করা যায় না— ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে) কারণ যিনি সৎরূপীতে (প্রথম কারণে) নিষ্ঠ বা অনুগত তিনি মোক্ষলাভ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে।

[৭. আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্ত হন, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে (প্রধানে) 'সৎ' ও 'আত্মা' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়টি শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দিয়াই সমাপ্ত হইয়াছে, "তুমিই সেই (আত্মা বা ব্রহ্ম)"। শ্বেতকেতুর মতো চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তাকে অচেতন প্রধানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায় না। উপরন্তু এই অধ্যায়ের ১৪ খণ্ডের ২-৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহারই ব্রহ্ম লাভ হইবে। এই মোক্ষলাভ অচেতন প্রধানের ধ্যান ধারণা হইতে কিছুতেই সম্ভব নহে। এই সকল কারণেই, যে সকল কারণ পূর্ব পূর্ব সূত্রে এবং এই সূত্রেও প্রদর্শন করা হইল— আদি কারণ 'সৎ' কখনও প্রধানকে লক্ষ্য করে না, ইহা কোন চৈতন্যময় সত্তাকেই নির্দেশ করে।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১।৮॥

হেয়ত্বাবচনাৎ (হেয় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য এই কথা [শাস্ত্রের দ্বারা] উক্ত না হওয়ায়) চ (এবং)।

৮. এবং যেহেতু (শাস্ত্রদ্বারা) ইহা উক্ত হয় নাই যে, ইঁহাকে (সৎ আত্মাকে) পরিত্যাগ করিতে হইবে, (প্রধানকে 'সৎ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না)।

[৮. যদি অচেতন প্রধান শ্রুতির দ্বারা সৎ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতেন, তাহা হইলে শ্রুতি এই সকলকে হেয় (ত্যাজ্য) বলিয়া অবশ্যই উপদেশ করিতেন।]

যদি শাস্ত্রের এইরূপ অভিপ্রায় থাকিত যে সাধককে ধাপে ধাপে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর সত্যে লইয়া যাইবেন, যে পর্যন্ত না সাধক আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমে শাস্ত্র সাংখ্যবাদীদের মতে প্রধানকেই 'সৎ' শব্দদ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে পরবর্তী কালে শাস্ত্রে এইরূপ কোন উক্তি থাকিত যাহার দ্বারা প্রধানকে পরিহার করা হইত, কারণ প্রধান যথার্থ আত্মা নহেন। কিন্তু আলোচ্য শাস্ত্রে এই জাতীয় কোন উক্তির উল্লেখ নাই। বরং বিপরীত ক্রমে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে অধ্যায়ে এই শ্রুতি আছে তাহার সর্বত্রই আত্মাকে সৎ ব্যতীত আর কিছুই বলা হয় নাই। উপরন্তু এই অধ্যায়টি এই প্রশ্ন দ্বারাই সূচনা করা হইয়াছে— "সেই বস্তুটি কি, যাঁহাকে জানিলে সবই জ্ঞাত হওয়া যায়?" যদি প্রধানই প্রথম কারণ হইতেন, তাহা হইলে প্রধানকে জানিলেই সব জানা হইয়া যাইত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। ভোক্তা (পুরুষ) ইহা হইতে ভিন্ন। পুরুষ ভোগ্যবস্তুর ন্যায় প্রধান হইতে উৎপন্ন নন। সুতরাং প্রধানকে জানিলে পুরুষকে জানা সম্ভব নহে। সুতরাং শাস্ত্র "যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়" বলিয়াছেন সেই প্রথম কারণ প্রধান নহেন। এইরূপ মত প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ।

স্বাপ্যয়াৎ ॥১।১।৯॥

স্বাপ্যয়াৎ (নিজের আত্মাতে, স্ব-সত্তায় লীন হইয়া যায় বলিয়া)।

৯. যেহেতু (জীবাত্মা) নিজের আত্মসত্তায় লীন হইয়া যান (অথবা পরমাত্মা, যাঁহাকে সৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সুষুপ্তিতে তাহাতে লীন হইয়া যান, সেইজন্য প্রধানকে 'আত্মা' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না)।

[৯. "সুষুপ্তিকালে জীব সৎ-এ অর্থাৎ আত্মাতে লীন হয়"— এইরূপ শ্রুতি থাকায় প্রধান জগতের কারণ হইতে পারেন না।]

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬.৮.১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে:— "হে সৌম্য, যখন কোন মানুষ সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে, তখন সে সৎরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়— সে নিজের স্বরূপে লীন হইয়া যায়।" এখানে এই উপদেশ করা হইল যে, জীবাত্মা সৎ-এর সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যান। যেহেতু চৈতন্যবান আত্মার পক্ষে অচেতন প্রধানের মধ্যে বিলীন হওয়া অসম্ভব, সেইজন্যই শাস্ত্র যাঁহাকে সৎ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন সেই প্রথম কারণ কিছুতেই অচেতন প্রধান হইতে পারেন না।

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১০॥

গতিসামান্যাৎ (সিদ্ধান্তগুলির—মতগুলির সাদৃশ্যহেতু)।

১০. কারণ (সব বেদান্তশাস্ত্রই) একই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে (চৈতন্যময় সত্তাই হইলেন প্রথম কারণ, তাই ব্রহ্মকেই প্রথম কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে)।

[১০. সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলা যায় না।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭.২৬.১., প্রশ্ন ৩.৩, তৈত্তিরীয় ২.১ (সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি)— ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। এই সব কয়টি শ্রুতিই বলিয়াছেন, "যাঁহাকে সকল বেদই প্রাপ্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন" (কঠ ১.২.১৫)।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥১।১।১১॥

শ্রুতত্বাৎ (সকল বেদেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া) চ (এবং)

১১. (একমাত্র সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই যে এই জগতের প্রথম কারণ) কারণ (সাক্ষাৎভাবেই এইরূপ জানা যায়) বেদগুলি হইতেও।

[১১. ব্রহ্মই যে জগৎকারণ তাহা সমস্ত বেদই (শ্রুতি শাস্ত্রই) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। সুতরাং প্রধানের জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।]

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬.৯ মন্ত্রে আছে :— "তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি; (জীবাত্মা) তাঁহার কোন জনকও নাই, অধিপতিও নাই।" এখানে 'তিনি' বলিতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই বুঝাইয়াছে।

সুতরাং ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইল যে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মই হইলেন জগতের আদি কারণ, অচেতন প্রধান বা অন্য কিছুই আদি কারণ নহেন।

১২ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত নূতন একটি (বিষয়ের) আলোচনার সূচনা হইয়াছে। বিষয়টি হইল এই যে, উপনিষদে কতকগুলি পদ বর্ণিত আছে— ঐ সকল পদ কি সাধারণ বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুনশ্চ উপনিষদে দুই প্রকারের ব্রহ্মের কথা বলা আছে—নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মই হইলেন সৃষ্টির ধারণার অন্তর্গত এবং উপাস্য। এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে এবং উপাসনার ফলেরও বিভিন্নতা আছে। অপর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্ম হইলেন সগুণ ব্রহ্মের সকল কল্পিত গুণাবলীর সীমার অতীত। তিনি সগুণ ব্রহ্ম হইতে অন্য প্রকার এবং জ্ঞানের বিষয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাক্ষাৎ মুক্তি দিতে পারে না। ইহা খুব বেশি করিলে ক্রমমুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব। কিন্তু উপনিষদের অনেক স্থলেই ব্রহ্মকে আপাত দৃষ্টিতে সগুণ হিসাবেই নানা বিশেষগুণে ভূষিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও শাস্ত্র বলেন যে, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ। যদি ব্রহ্মকে ঐ সকল গুণে ভূষিত করিয়া সীমিত মনে করিয়া উপাসনা করা হয় তাহা হইলে এইরূপ মুক্তি তাহার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে যদি এই সকল গুণরাশিকে শ্রুতি চরম লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করেন নাই, শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে এই সব বিশেষগুণের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন বলা যায়। সুতরাং ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সাক্ষাৎ মুক্তি লাভই হয়। এইজন্যই যুক্তির সাহায্যে আমাদের এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা স্পষ্টত সন্দিগ্ধার্থক এই শ্রুতিগুলির যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারি।

সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আলোচনাই যে এখানে পূর্বাপর ধারাবাহিক ভাবে করা হইয়াছে তাহা নহে; কারণ, বহু স্থলেই আলোচনাটি শুধু সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, সগুণ ব্রহ্ম এবং জীবাত্মা বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কেও রহিয়াছে।

অধিকরণ ৬ : ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব বিষয়ক।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১ । ১ । ১২ ॥

আনন্দময়ঃ ('আত্মা আনন্দময়') অভ্যাসাৎ (কারণ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে) বলিয়া।

১২. (এই শ্রুতিবচনে) 'আনন্দময় ব্রহ্ম'—ইত্যাদি (ব্রহ্মকে যদিও পুচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি ব্রহ্মকে স্বাধীন সত্তা হিসাবেই গণ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে আনন্দময় সত্তার অধীন কোন বস্তু বলিয়া মনে করা হয় নাই— ব্রহ্ম নিজেই আনন্দময়।) পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায় (ঐ অধ্যায়ের বহু শ্রুতিবচনে ব্রহ্মই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।)

[১২. ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, ইহাই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত এবং শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলা হইয়াছে।]

৫ অধিকরণে 'ঐক্ষত' শব্দটিকে প্রথম কারণের গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে ঐক্ষত শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়া ইহার দ্বারা চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্মকেই জগতের প্রথম কারণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গৌণ বা আলঙ্কারিক অর্থে ব্যাখ্যা করিলে প্রধানকেই প্রথম কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইত, তাই গৌণার্থটি সন্দেহজনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মকে আদি কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব; কারণ শব্দগুলি অংশমাত্রকে বুঝাইয়াছে বলিয়া সন্দেহের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না যে, শ্রুতিগুলি ব্রহ্মকেই উদ্দিষ্ট করিয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ইহা আপত্তি হিসাবে বর্তমান আলোচনাকে সর্বশেষ আলোচনার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছে।

আলোচ্য প্রসঙ্গের সংশ্লিষ্ট অংশটি হইল এই:— "এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে পৃথক্ অথচ ইঁহার অভ্যন্তরস্থ আর একটি আত্মা আছেন তিনি আনন্দময়। ...প্রিয় ইঁহার মস্তক, হর্ষ ইঁহার দক্ষিণবাহু, প্রমোদ ইঁহার বাম বাহু, সুখসামান্য ইঁহার দেহ মধ্যভাগ, ব্রহ্ম ইঁহার প্রতিষ্ঠা বিধায়ক পুচ্ছ।" (তৈত্তিরীয় উঃ ২.৫)। এখানে সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে যদিও পুচ্ছ বলা হইয়াছে তথাপি ইহাকে একটি পৃথক্ স্বাধীন সত্তা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে—আনন্দময় সত্তার অংশ হিসাবে নহে। কেননা এখানে পুচ্ছ শব্দটি একটি অঙ্গ বিশেষকে বুঝায় নাই, যদিও সাধারণত সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে পুচ্ছ বলিতে জীবাত্মার আনন্দময় স্থিতিস্থান ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে কারণ ব্রহ্মই হইলেন কল্পিত জীবাত্মার মূল ভিত্তি। এখানে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মই হইলেন উদ্দিষ্ট

বক্তব্য; কারণ, তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অংশে পুনঃ পুনঃ-যে কোন ভাবেই হোক এই ব্রহ্মেরই কথা বলা হইয়াছে।

[বৃত্তিকার (খুব সম্ভব, ইনি উপবর্ষ) ১২-১৯ সূত্রগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:— তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২.১-৪) আত্মাকে প্রথম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করিয়া পরে (২.৫ শ্রুতিতে) বিজ্ঞানময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই বিজ্ঞানময় কি জীবাত্মাকে না ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে? বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, ইহা জীবাত্মাকেই নির্দেশ করিয়াছে, কারণ, 'আনন্দময়' শব্দটি একটি বিকার বুঝায়; সুতরাং ইহা অবিকারী ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। উপরন্তু এই আনন্দময়ের পাঁচটি বিভিন্ন অংশেরও উল্লেখ এখানে আছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই অংশ বিভাগ কল্পনা সম্ভব নয় কারণ ব্রহ্ম হইলেন অখণ্ড। ১২-১৯ সূত্রগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে মনে করা হইয়াছে যে, এই আনন্দময় বলিতে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অংশে আনন্দময় শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পুনঃ পুনঃ উক্তিকেই আলোচ্য বিষয় বস্তুটিকে নির্ধারণ করিবার একটি বিশেষ উপায়রূপে গ্রহণ করা যায়। ব্রহ্মই হইলেন বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় (১ অঃ পাঃ ১. সূত্র ৪)। সুতরাং 'আনন্দময়' বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। উপরন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর সূচনাতেই "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (২.১) এবং "তিনিই সব কিছু বিস্তার করিলেন" (২.৬) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই হইলেন আলোচ্য বিষয়। 'আনন্দময়' শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয়টিও ব্রহ্ম সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক নহে,—কারণ এখানে প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দের প্রাচুর্যকেই বুঝাইয়াছে। এখানে ব্রহ্মের দেহ এবং দেহের অংশাদিরও কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ইহার অব্যবহিত পূর্বেই ব্রহ্মের সসীম গুণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন বিজ্ঞানময় ইত্যাদি যাহা বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্মের গুণ হইতে পারে না। সুতরাং 'আনন্দময় ব্রহ্ম' হইলেন পরব্রহ্ম।]

[আচার্য শঙ্কর সূত্রগুলির এইরূপ ব্যাখ্যার আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, 'আনন্দময়' পরব্রহ্ম হইতে পারেন না। প্রথমত পূর্বে বিজ্ঞানময়, প্রাণময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'ময়ট্' প্রত্যয়কে বিকারার্থে গ্রহণ করিয়া পরে হঠাৎ 'আনন্দময়ের' ক্ষেত্রে ময়ট্ প্রত্যয়কে প্রাচুর্যার্থে পরিবর্তন করিয়া 'আনন্দময়' বলিতে ব্রহ্মকে নির্দেশ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পুনশ্চ ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বের অধিক গুরুত্ব বা প্রাচুর্যের ধারণাটিই আমাদিগকে এই ধারণাও দেয় যে, যত অল্পই হউক ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখও আছে। ব্রহ্মসম্পর্কে এইরূপ দুঃখময়ত্বের কল্পনাও অসম্ভব সেইজন্যই আনন্দগিরি বৃত্তিকারের ভাষ্য বলিয়া এই সূত্রগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

তাহাকে খণ্ডন করিয়া আচার্য শঙ্কর অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যাহা উপরে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।]

বিকারশব্দান্নেতি চেৎ, ন, প্রাচুর্যাৎ ।। ১।১।১৩ ।।

বিকারশব্দাৎ (যেহেতু 'পুচ্ছ' শব্দটি অংশ অর্থে ব্যবহৃত) ন (না) ইতি চেৎ, (যদি ইহা বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে) প্রাচুর্যাৎ (প্রাচুর্যবশত, যে শব্দটি অংশকে বুঝাইয়াছে তাহার প্রাচুর্য)।

১৩. যদি বলা হয় যে (ব্রহ্ম) নন (উদ্ধৃত শ্রুতিতে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে বলা হইয়াছে) 'পুচ্ছ' শব্দটি দ্বারা অংশকে বুঝাইয়াছে বলিয়া, (ইহার উত্তরে আমরা বলিব)— না এইরূপ নহে; কারণ (যে শব্দ দ্বারা অংশকে বুঝাইয়াছে) তাহার আনন্দ প্রাচুর্যের জন্য।

[১৩. ময়ট্ প্রত্যয় যে শুধু 'বিকার' অর্থেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। ময়ট্ প্রত্যয় 'প্রাচুর্য' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।]

অংশ বা অঙ্গ বুঝাইতে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২.১.৫ শ্রুতিতে শব্দার্থের বহুত্বের জন্য 'পুচ্ছ' শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করার কারণ হইল এই যে, পরবর্তী আলোচনায় ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে একটি সঙ্গতি রক্ষা করা। কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রহ্ম বাস্তবিকপক্ষেই 'আনন্দময়' আত্মার অংশই এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করা হয় নাই। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল যথার্থ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া। যদি 'আনন্দময় সত্তা' যথার্থ ব্রহ্ম হইতেন তাহা হইলে শাস্ত্র শ্রুতির পরিসমাপ্তিতেও ইহারই উল্লেখ করিতেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শ্রুতি তাহা করেন নাই; বরং পক্ষান্তরে শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মই হইলেন শাস্ত্রের যথার্থ ও আলোচ্য বিষয়। ব্রহ্মকে 'পুচ্ছ' বলার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম অংশ—পরন্তু ব্রহ্ম হইলেন সবকিছুর মুখ্য আশ্রয় ও অধিষ্ঠান।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ।। ১।১।১৪ ।।

তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ (কারণ, ইহাকে উহার কারণ বলা হইয়াছে) চ (এবং)।

১৪. এবং যেহেতু (ব্রহ্মই) ইহার কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (সেইজন্যই ব্রহ্মকে 'আনন্দময়' সত্তার অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না)।

[১৪. ব্রহ্মই জীবের আনন্দের হেতু—শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ থাকায় 'আনন্দময়' শব্দের বাচ্য ব্রহ্মই—অংশ বা জীব নহেন।]

ব্রহ্ম সব কিছুরই কারণ— আনন্দময় সত্তারও কারণ। তিনি পূর্বোক্ত চারিটি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়— এই সবেরও কারণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২.৬ মন্ত্রে আছে— "এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে— তাহা সবই তিনি সৃজন করিয়াছেন।" সুতরাং কারণ কখনও কার্যের অংশ হইতে পারেন না।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ।। ১।১।১৫।।

মান্ত্রবর্ণিকম্ (যাহা মন্ত্রঅংশে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে) এব (তাহা-ই) চ (উপরন্ত, বিশেষ ভাবে) গীয়তে (গীত হয়)।

১৫. উপরন্ত যে ব্রহ্মকে শাস্ত্রের মন্ত্র অংশে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ব্রহ্মকেই (এই ব্রাহ্মণ অংশে পুচ্ছ বলা হইয়াছে)।

[১৫. মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মকেই 'পুচ্ছ' শব্দের দ্বারা কীর্তন করা হইয়াছে।]

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে, "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পর ব্রহ্মে উপনীত হন", "ব্রহ্ম হইলেন সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমসত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মকেই পরবতী উপসংহারে 'পুচ্ছ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা না হইলে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব থাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ মন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই হইলেন মুখ্য বিষয়বস্তু তাই ব্রহ্ম কখনও 'আনন্দময়' সত্তার অংশ মাত্র হইতে পারেন না।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ।। ১।১।১৬।।

ন (নহে) ইতরঃ (অপর কিছু-জীবাদি) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু অসম্ভব)।

১৬. (একমাত্র ব্রহ্মই) অন্য কিছু নহে (এখানে জীবকে বুঝাইয়াছে), কারণ ইহা অসম্ভব (জীবকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা)।

[১৬. শ্রুতি 'আনন্দময়'কে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন তাহা একমাত্র ব্রহ্মেই থাকা সম্ভব— জীবে বা অন্য কিছুতে নহে।]

এই আলোচ্য অংশে 'আনন্দময়' ইত্যাদি বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা বলিয়া কথিত, "এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে— তাহার সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন" (তৈত্তিরীয় ২.৬)। এই সৃষ্টি কার্য সম্ভবত জীবের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুতরাং 'আনন্দময়'কে এখানে আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য বলা যায় না, ব্রহ্মই উদ্দেশ্য।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ।।১।১।১৭।।

ভেদব্যপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্য সম্পর্কে উক্তি আছে) চ (এবং)।

১৭. এবং যেহেতু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যসূচক উক্তি আছে (দুইয়ের মধ্যে— 'আনন্দময়' সত্তা এবং জীব যাহা এই আলোচ্য অংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীব এই আলোচনার উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না)।

[১৭. যেহেতু 'আনন্দময়' এবং জীবের ভেদ সম্পর্কে উপদেশ আছে, সেইজন্য 'আনন্দময়' অর্থ ব্রহ্মই— জীব নহে।]

এই আলোচ্য অংশে যাঁহাকে 'আনন্দময়' ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে— তিনি রসস্বরূপ— তাঁহাকে লাভ করিলেই জীব লব্ধানন্দী, হইয়া যায়। "ইনি (এই অংশে যাঁহাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে—সেই 'আনন্দময়' সত্তা) রসস্বরূপ এই রসস্বরূপকে জানিলেই জীব লব্ধানন্দী হইয়া যায় (তৈঃ ২.৭)। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" সুতরাং রসস্বরূপের জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হইতে পারেন না। এইজন্যই জীব এই আলোচ্য অংশের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ।।১।১।১৮।।

কামাৎ ('আনন্দ' এই শব্দটির জন্য— আনন্দ আক্ষরিকার্থে 'ইচ্ছা'কে— অর্থাৎ ব্রহ্মকেই বুঝায়) চ (এবং) নানুমানাপেক্ষা (আনন্দময়ও) এখানে ব্রহ্মরূপে অনুমিত হইতে পারেন না।

১৮. এবং এই 'আনন্দ' শব্দটির জন্য— যাহার আক্ষরিক অর্থ হইল 'ইচ্ছা' যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে (তুমি) অনুমান করিতে পার না (আনন্দময় ও ব্রহ্ম কারণ বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে)।

[১৮. অন্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মের স্বীয় ইচ্ছাই কারণ— শ্রুতিতে এইরূপই উক্ত হওয়ায়, অনুমানকল্পিত প্রধান আনন্দময় শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।]

শাস্ত্রে 'আনন্দ' শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি না যে, 'আনন্দময়' শব্দ দ্বারাও ব্রহ্মকেই বুঝায়— কারণ 'ময়ট্' এই প্রত্যয় হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা (ব্রহ্মের) বিকার। ইহার দ্বারাই বৃত্তিকারের ১২ সূত্রের ব্যাখ্যাকে সামগ্রিকভাবেই খণ্ডন করা হইল।

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥ ১ । ১ । ১৯ ॥

অস্মিন্ (ইহার মধ্যে) অস্য (ইহার জীবের) চ (এবং) তদ্‌যোগং (তাহাতে নিমজ্জন— একীভবন) শাস্তি (শাস্ত্রে) উপদিষ্ট হইয়াছে।

১৯. (বেদসমূহ)ও ইহার (জীবের) বিষয়ে শিক্ষা দেন যে (জ্ঞানের উদয় হইলে) ইহার সহিত এক হইয়া যায় (আলোচ্য উদ্দিষ্ট ব্রহ্মের সহিত জীব এক হইয়া যায়)।

[১৯. আনন্দময়ের সংযোগে জীবও আনন্দময়ত্ব লাভ করে। শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।]

যেহেতু জীব জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উদ্দিষ্ট সত্তার সঙ্গে এক হইয়া যায়, সেইজন্যই আলোচ্য বিষয়ের প্রতিপাদ্য অবশ্যই ব্রহ্ম।

সুতরাং 'আনন্দময়' সত্তাটি কিছুতেই এই সকল শ্রুতির মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতে পারেন না। সব কিছুর অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্মই স্বাধীন এবং অন্যনিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে এই সকল শ্রুতির আলোচ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন।

অধিকরণ ৭ : আদিত্য এবং চক্ষুর অন্তঃস্থিত পুরুষই ব্রহ্ম।

অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ॥ ১ । ১ । ২০ ॥

অন্তঃ (অভ্যন্তরে) তদ্ধর্মোপদেশাৎ (যেহেতু তাঁহার গুণসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে)।

২০. (সেই অভিন্ন পুরুষ) অভ্যন্তরে (সূর্য এবং চক্ষুর অভ্যন্তরে যিনি আছেন তিনি হইলেন ব্রহ্ম), কারণ তাঁহার (ব্রহ্মের) গুণগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে (তাঁহার মধ্যে)।

[২০. সূর্যমণ্ডল এবং চক্ষুর মধ্যস্থিত পুরুষ সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও থাকা সম্ভব নহে; সুতরাং ঐ পুরুষ জীব নহেন— ব্রহ্মই।]

"অতঃপর সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে সুবর্ণময় শ্মশ্রু ও কেশবিশিষ্ট সুবর্ণময় পুরুষ আছেন তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি সকল আবরণের ঊর্ধ্বে উদিত (উৎ+ইত) হইয়াছেন; ঋক্ এবং সাম তাঁহার গ্রন্থি। তিনি দেবতাদের সকল প্রার্থিত বস্তুর ঊর্ধ্বে এবং সূর্যমণ্ডলের পারে তিনি সকল জগতের ঈশ্বররূপে বিরাজমান (ছা: ১.৬.৬-৮ য)।" "অতঃপর যে পুরুষকে অক্ষিগোলকের মধ্যে দেখা যায় তিনিই হইলেন ঋক্"— তিনিই সাম, উক্থ, যজুঃ— তিনিই ব্রাহ্মণ। অক্ষিগোলকের অন্তর্বর্তী পুরুষের আকৃতি সূর্যমণ্ডলের অন্তর্বর্তী পুরুষের ন্যায় একই রূপ, একের গ্রন্থি অপরের গ্রন্থির ন্যায় এক, একের নাম অপরের নামের সঙ্গে অভিন্ন। তিনিই শরীরের অভ্যন্তরস্থ জগতের এবং মানুষের সকল প্রার্থনীয় বস্তুর নিয়ন্তা ঈশ্বর (ছা: ১.৭.৫-৮)"। সর্বশেষ অধিকরণে, নানা বিরুদ্ধ বস্তুর উল্লেখ থাকিলেও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ উল্লেখই আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে যে, ব্রহ্মই শাস্ত্রের ঐ সকল উদ্ধৃতির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই যুক্তি অনুসারেই আশ্রয়স্থল, আকৃতি, সসীমতা প্রভৃতিরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ শাস্ত্রে থাকায় ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, জীবও কোন ভাবে প্রাধান্যলাভ করিয়া সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরবর্তী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন— এবং ব্রহ্ম এখানে অবস্থিত নহেন। সুতরাং এই অধিকরণের শাস্ত্রোক্ত বিষয় ব্রহ্ম নহেন, কোন জীবই— এইরূপ একটা আপত্তি করা যাইতে পারে।

এই আপত্তির খণ্ডন করিয়া এই সূত্র ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, আলোচ্য পুরুষটি হইলেন পরব্রহ্মই; কারণ, এখানে তাঁহার এই সব গুণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা তিনি সকল পাপের ঊর্ধ্বে সকল কিছুরই সত্তা, ঋক্, যজুঃ, সাম তাঁহার স্বরূপ (তাঁহার এই অল্প কয়েকটি গুণেরই দৃষ্টান্তরূপে এখানে উল্লেখ করা হইল), তিনিই সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ জগতেরও ঈশ্বর— নিয়ন্তা। বিশেষ কোন কোন অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের কথা যেমন সূর্যমণ্ডল এবং অক্ষিগোলক, আকৃতি, শ্মশ্রুযুক্ততা, সুবর্ণবর্ণত্ব, সসীমতা প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে কেবলমাত্র উপাসনার জন্য। পরমেশ্বর তাঁহার ভক্তদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মায়ার সাহায্যে যথেচ্ছারূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন। উপাসনার সৌকর্যের জন্যই ব্রহ্মসম্পর্কে এইরূপ সসীমতার কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বস্বরূপে ব্রহ্ম এই সকল সসীম গুণের ঊর্ধ্বে।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥১।১।২১॥

ভেদব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহাদের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে) চ (এবং) অন্যঃ (পৃথক্)।

২১. এবং যেহেতু পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেইজন্যও (অন্য একটি শ্রুতিতে সূর্যের অন্তর্বর্তী পুরুষ এবং সূর্যের প্রতীক জীব— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে) (সেইজন্যই নিয়ন্তা ঈশ্বর) পৃথক্ (জীব হইতে পৃথক্)।

[২১. ভেদের উপদেশ থাকাতেও ঐ পুরুষ যে জীব হইতে ভিন্ন, তাহাই বুঝা যায়।]

"যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর্বর্তী, যাঁহাকে আদিত্যও জানেন না, যাঁহার শরীর আদিত্য, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন— তিনিই তোমার জিজ্ঞাস্য আত্মা, অন্তর্যামী— অমৃত (বৃ: ৩.৭.৯)।" —এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর আদিত্যের অন্তর্বর্তী অথচ সূর্যদেবতা অভিমানী জীব হইতে ভিন্ন। ইহা সর্বশেষ সূত্রের সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে (যে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য)।

অধিকরণ ৮ : আকাশ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

পূর্ববর্তী অধিকরণের আলোচনায় 'সর্বপাপের ঊর্ধ্বে' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অস্পষ্ট হইলেও ব্রহ্ম সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে— আদিত্যাভিমানী দেবতা সম্পর্কে নহে। এবং প্রসঙ্গত ইহাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের রূপাদি কল্পনা সাধকের উপাসনার সুবিধার্থেই করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় ব্রহ্মের যে-সব গুণের কথা উল্লেখ করা হইবে তাহাতে অর্থবোধের কোন সন্দেহই থাকিবে না। এই বিশেষণগুলি স্পষ্টতই দ্রব্যবাচক আকাশ সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে। তাহা হইলে এই শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়? ইহা বিরোধী পক্ষেরই একটা আপত্তি বলিয়া মনে হয়।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ১।১।২২ ॥

আকাশঃ ('আকাশ' এই শব্দটি) তল্লিঙ্গাৎ (যেহেতু সেই ব্রহ্মের বিশেষগুণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে)।

২২. আকাশ (এই শব্দটি) (হইলেন ব্রহ্ম)— যেহেতু ইহা ব্রহ্মের বিশেষগুণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

[২২. আকাশ অর্থ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই। কারণ উল্লিখিত গুণসমূহ ব্রহ্মেরই গুণ— অন্য কাহারও নহে।]

"এই জগতের গতির শেষ কোথায়?"— তিনি (আচার্য) বলিলেন, 'আকাশ', কারণ সকল ভূতসমূহ আকাশ হইতেই উৎপন্ন এবং আকাশেই লয় হয়। এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি

হইতে আকাশ বৃহত্তর। ইহাই (আকাশই) তাহাদের শেষ গতি। আকাশই পরম উদ্‌গীথ...। ...যিনি ইহা জানিয়া পরম উদ্‌গীথের উপাসনা করেন..... ইত্যাদি (ছা: ১.৯.১-২)। এখানে আকাশ বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে ভূতাকাশকে নয়। কারণ সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয়ে বিলয় স্থল ব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য ভূতাকাশেরও এই গুণগুলি থাকিতে পারে কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন যে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া পরিশেষে চক্রক্রমে পুনরায় এই সকল আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। যদি ভূতাকাশ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে প্রযুক্ত "এই সব কিছু" এবং 'এব'— একমাত্র (আকাশ) এই শব্দ দুইটির গুরুত্ব থাকে না। শ্রুতির এই গুরুত্ব রক্ষার জন্য বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ইহা সব কিছুরই এমনকি আকাশেরও মূলীভূত কারণ সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং একমাত্র ব্রহ্মই হইতে পারেন সেই আদি কারণ। আকাশ শব্দটি ব্রহ্মকে বুঝাইতে অন্য শ্রুতিতেও ব্যবহৃত হইয়াছে: "যাহাকে আকাশ বলা হয় তাহাই নামরূপের প্রকাশস্বরূপ" (ছা: ৮.১৪.১)। পুনশ্চ একমাত্র ব্রহ্মই "সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাদের চরম গতি" হইতে পারেন— শাস্ত্রে ইহাই বলা আছে। অন্যান্য শাস্ত্রীয় উক্তিতেও, যেমন— "তিনি পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, তিনি স্বর্গ হইতেও বৃহত্তর" (ছা: ৩.১৪.৩), "ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। যিনি হবনক্রিয়া করেন তাঁহার চরম গতি ব্রহ্ম" (বৃ: ৩.৯.২৮)— ব্রহ্মের 'বৃহত্তর' এবং "সকল কিছুর আশ্রয়রূপ" গুণের কথা উল্লিখিত আছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে উদ্‌গীথ বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাকে আকাশের প্রতীকরূপে নহে— ব্রহ্মেরই প্রতীকরূপে উপাসনা করিতে হইবে।

অধিকরণ ৯ : প্রাণ শব্দদ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

অত এব প্রাণঃ ॥১।১।২৩॥

অত এব (এই একই কারণে) প্রাণঃ (প্রাণ শব্দটি) (ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে)।

২৩. এই একই কারণে প্রাণ (এই শব্দটিও ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে)।

[২৩. প্রাণ শব্দও ব্রহ্মবাচকই, কারণ ঐসকল লক্ষণ ব্রহ্মেরই, প্রাণবায়ুর হইতে পারে না।]

"সেই দেবতাটি কে?"

তিনি (আচার্য) বলিলেন, "প্রাণ। কারণ এই সকল ভূতজাত প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাণেই লীন হয়" (ছা: ১.১১.৪-৫)। এখানে প্রশ্ন হইতেছে (সামবেদের একটি অংশ) 'প্রস্তাব'— কি প্রাণের প্রতীক না ব্রহ্মের প্রতীক? এখানে প্রাণ বলিতে জীবনী- শক্তিকে

বুঝায় নাই— ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। 'প্রাণের প্রাণ' (বৃ: ৪.৪.১৮) বলিতে শ্রুতি যাঁহাকে বুঝাইয়াছেন— এখানেও প্রাণ বলিতে তাহাই (ব্রহ্মকে) বুঝাইয়াছে। কিরূপে জানিব?— কারণ এখানে ব্রহ্মের যে বিশেষ গুণ "এই সব সৃষ্ট পদার্থ প্রাণেই লীন হয়" ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে। সকল জীবই প্রাণে লীন হয়— ইহা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি প্রাণ বলিতে আমরা ব্রহ্মকেই বুঝি এবং 'জীবনী শক্তি'কে (সাধারণ অর্থে যাহা বুঝায়) না বুঝি; ইন্দ্রিয়সমূহ সুষুপ্তিকালে একমাত্র তাহাতেই লীন হইয়া থাকে।

অধিকরণ ১০ : জ্যোতিঃ শব্দটিকে ব্রহ্ম বাচক জানিতে হইবে।

পূর্ববর্তী দুইটি অধিকরণে উল্লিখিত শ্রুতিতে ব্রহ্মের গুণাদির অস্তিত্বের জন্য সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হইয়াছিল যে, ঐ সকল শ্রুতির উদ্দিষ্ট বিষয় হইলেন ব্রহ্ম। পরবর্তী সূত্রের আলোচ্য শ্রুতিটির মধ্যে ব্রহ্মের কোন গুণের উল্লেখ নাই— কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতির পূর্ববর্তী শ্রুতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১ । ১ । ২৪ ॥

জ্যোতিঃ (জ্যোতি) চরণাভিধানাৎ (চরণ এই শব্দটির উল্লেখ হেতু)।

২৪. জ্যোতি (এই শব্দটি ব্রহ্মবাচক) কারণ চরণ এই শব্দটির উল্লেখ আছে (পরিপূরক শ্রুতি বচনে)।

[২৪. জ্যোতি শব্দও ব্রহ্মবোধক, কারণ পরে চরণ বা পাদ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে।]

"অতঃপর যে জ্যোতি এই স্বর্গের উপরে, সকল কিছুর ঊর্ধ্বে আলোক বিস্তার করিতেছে......সাধক পুরুষ সেই জ্যোতির ধ্যান করিবে" ইত্যাদি (ছা: ৩.১৩.৭)। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই ধ্যান কি সাধারণ আলোক বা জ্যোতির ধ্যান, না ইহা ব্রহ্মের ধ্যান? সূত্রের বক্তব্য হইল এখানে 'জ্যোতি' বলিতে প্রাকৃত আলোক যেমন সূর্যাদির আলোক যাহা মানুষের দৃষ্টির সহায়ক— তাহাকে বুঝায় নাই কিন্তু ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে, কারণ পূর্ববর্তী কোন শ্রুতিতে চরণ (পাদ) শব্দের উল্লেখ আছে: "ইহাই গায়ত্রী ব্রহ্মের মহিমা, ইহার অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেন পুরুষ। ইহার এক পাদ হইল সমগ্র বিশ্ব-জগৎ আর অবশিষ্ট তিন পাদ হইল স্বর্গের অমৃত" (ছা: ৩.১২.৬)। শ্রুতির এই অংশে যে- ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাকেই এই শ্রুতির প্রথমাংশেও স্বীকার করা হইয়াছে। সেখানেও যে জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে সেই জ্যোতিও স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত। ব্রহ্ম যে শুধু পূর্বোক্ত শ্রুতিরই বিষয়বস্তু তাহা নহে, পরবর্তী শ্রুতিতেও ব্রহ্মেরই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কেননা আলোচ্য অংশের (ছা: ৩.১৪) অব্যবহিত পরের শ্রুতিতেও ব্রহ্মই হইলেন মুখ্য বিষয়। সুতরাং খুব সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, মধ্যবর্তী অংশেও (ছা: ৩.১৩) ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনাই করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে 'জ্যোতি' বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। 'জ্যোতি' শব্দটি ব্রহ্মের দ্যোতক হিসাবেই ব্যবহার করা যায়, কারণ ব্রহ্ম যেমন জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন জ্যোতিও তেমনি সকল বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে। 'জ্যোতি' এই সসীম বিশেষণকে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে শুধুমাত্র উপাসনার জন্য।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেৎ, ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ, তথা হি দর্শনম্ ।। ১ । ১ । ২৫ ।।

ছন্দোঽভিধানাৎ (গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া) ন (ইহা নহে) চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না), তথা (সেইরূপভাবে) চেতোঽর্পণনিগদাৎ (মনঃসংযোগ করার ব্যাপারটিও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে) তথা হি (যেহেতু এইরূপ) দর্শনম্ (অন্য শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়)।

২৫. যদি বলা হয় যে, এখানে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয় নাই, কারণ (গায়ত্রী) ছন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র (তাহার উত্তরে আমরা বলিব) না, কারণ সেইরূপভাবে (অর্থাৎ ছন্দের ব্যবহারের দ্বারা) মনের সংযোগকে (ব্রহ্মের ধ্যানের বিষয়ে) এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; কারণ এইরূপ ভাবে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে বিশিষ্টগুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া ধ্যানের বিষয় করা) (অন্য শ্রুতিতেও) দৃষ্ট হয়।

[২৫. গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ থাকায় জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবোধক নহে এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ তাহাতে মনোনিবেশের যে কথা আছে তাহার অর্থ হইল গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা ব্রহ্মে মনোনিবেশ করিতে হইবে।]

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় শ্রুতিতে যে, "ইহার একপাদ হইল সমগ্র ভূতসমূহ", উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে নাই, কারণ এই শ্রুতির পূর্বাংশের আরম্ভ হইল— "এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই গায়ত্রী" ইত্যাদি। সুতরাং পূর্বসূত্রে যে 'পাদের' উল্লেখ আছে তাহা এই ছন্দকেই উদ্দেশ্য করিয়াছে, ব্রহ্মকে নহে। এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়:— না, এইরূপ হইতে পারে না; কারণ "এই সব কিছুই গায়ত্রী" ইত্যাদি শ্রুতি এই শিক্ষাই দেয় যে, আমাদের ব্রহ্মেরই উপাসনা করা উচিত কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের সংযোগ আছে। কেননা ব্রহ্মই যখন সব কিছুরই কারণ তখন ব্রহ্ম গায়ত্রীরও কারণ হিসাবে গায়ত্রীর সঙ্গেও সম্পৃক্ত। এইজন্যই সেই ব্রহ্মই হইলেন উপাস্য।

এই ব্যাখ্যাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য শ্রুতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, যথা "তিনি যিনি এই ব্রহ্ম" (ছা : ৩.১২.৭) এবং "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" (ছা :৩.১৪.১) যেখানে ব্রহ্মই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বিশেষ গুণযুক্ত সসীম ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের কার্যের উপর উপাসনা সংক্রান্ত অন্য শ্রুতিও দৃষ্ট হয়। যথা— "বহ্ ঋক্ উপাসকগণ যাঁহার উপাসনা করেন তিনি হইলেন এই শ্রেয়সী ছন্দ" (ঐ : আ : ৩.২.৩.১২)। সুতরাং ব্রহ্মই এখানে লক্ষিত, ছন্দোরূপা গায়ত্রী নহেন।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ।। ১।১।২৬ ।।

ভূতাদিপাদব্যপদেশঃ (ভূতসমূহকে ইত্যাদি পাদরূপে কল্পনা করা) উপপত্তেঃ (সম্ভব) চ (এবং) এবম্ (এইরূপ ভাবে)।

২৬. এইরূপ ভাবেও (আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পূর্ব শ্রুতিতে যেখানে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে, সেখানেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বিষয়) কারণ (একমাত্র এইভাবেই) ভূতাদিকে (গায়ত্রীর) পাদরূপে কল্পনা করা সম্ভব।

[২৬. কেবল চিত্ত সমাধানের কথা আছে বলিয়াই নহে; এই গায়ত্রীকে ভূত, পৃথিবী, শরীর এবং হৃদয় এইরূপ চারিপাদসম্পন্ন বলাতেও গায়ত্রীর অর্থ এখানে ব্রহ্মই।]

ভূত, পৃথিবী, শরীর এবং হৃদয় একমাত্র ব্রহ্মেরই পাদ হইতে পারে, কয়েকটি শব্দ সমবায়ে গঠিত ছন্দোরূপা গায়ত্রীর পাদ এই সকল হইতে পারে না।(ছা : ৩.১২.২-৪ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং এখানে গায়ত্রী অর্থে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে— কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে গায়ত্রী ছন্দের সম্পর্ক আছে। গায়ত্রীর দ্বারা এই ব্রহ্মকে এতই বিশেষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে ইহাকে সকল ভূতরাশির আত্মা (স্বরূপ) বলিয়া শ্রুতিতে বলা হইয়াছে— "গায়ত্রী-ই সব কিছু"— ইত্যাদি। এই ব্রহ্মকেই আবার (ছা : ৩.১৩.৭) শ্রুতিতে জ্যোতি রূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

উপদেশভেদান্নেতি চেৎ, ন, উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ।। ১।১।২৭ ।।

উপদেশভেদাৎ (উপদেশের ভিন্নতা হেতু) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না) উভয়স্মিন্ অপি (উভয় প্রকার বর্ণনাতেই) অবিরোধাৎ (কারণ ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই)।

২৭. যদি এইরূপ বলা হয় (যে গায়ত্রী শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা জ্যোতিঃ সম্পর্কিত শ্রুতিতে প্রযোজ্য হইবে না) কারণ ইহাদের মধ্যে পার্থক্যবোধক চিহ্ন আছে। (ইহার উত্তরে বলা যায়)— না, ইহাদের মধ্যে কোনটির বর্ণনাতে এমন কোন বিরোধ নাই, যাহার দ্বারা ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

[২৭. উপদেশের ভিন্নতাহেতু ইহা ব্রহ্ম নহে এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ ঐ দ্বিবিধ উপদেশের অর্থ প্রকৃতপক্ষে একই।]

গায়ত্রী শ্রুতিতে স্বর্গকে ব্রহ্মের আবাস স্থল হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, পরন্তু অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম স্বর্গের ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন। তাহা হইলে ইহা কিভাবে বলা যাইতে পারে যে, দুই শ্রুতিতে একই ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে? ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে; এখানে কোন বিরোধভাব নাই। যেমন যখন আমরা বলি যে, পাখিটি বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়াছে— তখন আমরা পাখিটি গাছের উপর বা গাছের ঊর্ধ্বে বসিয়াছে— উভয় রূপেই বলিতে পারি। 'দিব্'— শব্দের সঙ্গে বিভক্তি সংযোগের পার্থক্যটি মোটেই বিবেচ্য নহে; কারণ শাস্ত্রে গৌণ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগও বহু ক্ষেত্রেই আছে। সুতরাং 'জ্যোতিঃ' এই শব্দটিকে ব্রহ্ম অর্থেই বুঝিতে হইবে।

অধিকরণ ১১ : প্রতর্দনের প্রতি ইন্দ্রের উপদেশ।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৮॥

প্রাণঃ (প্রাণ) তথা (সেই রূপ) অনুগমাৎ (এই ভাবেই বুঝিতে হইবে— শ্রুতির তাৎপর্য হইতে)।

২৮. প্রাণ ব্রহ্মই (শ্রুতির তাৎপর্য হইতে) ইহা বুঝিতে পারা যায়।

[২৮. প্রাণ শব্দও ব্রহ্মার্থক, কারণ শ্রুতিবাক্যসমূহের পূর্বাপর সামঞ্জস্য ঐ অর্থেই হইয়া থাকে।]

পূর্ববর্তী আলোচ্য প্রসঙ্গে "ব্রহ্মের তিনপাদ স্বর্গে অবস্থান করে" বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের বুঝিতে সুবিধা হইয়াছে যে, যে জ্যোতি স্বর্গের ঊর্ধ্বলোকে অবস্থান করেন তিনিও সেই একই ব্রহ্ম। স্বর্গের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্কই এখানে ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। এখানে অপর একটি শ্রুতির আলোচনার অবতারণা করা হইতেছে যেখানে (ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য) এইরূপ নিশ্চিত কোন সূত্র নাই।

কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র এবং প্রতর্দনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত এই কথোপকথনটি আছে, যেখানে প্রতর্দন ইন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি নিজেই বিচার করিয়া আমাকে সেই বরটি-ই প্রদান করুন— যাহা মনুষ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর।" ইন্দ্র বলিলেন, "একমাত্র আমাকেই জান, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর বলিয়া আমি মনে করি... ... আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই প্রাণ এবং অমৃত মনে করিয়া উপাসনা কর......এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, অবিকারী এবং অমৃতস্বরূপ" (কৌ: ৩.১-৮)। এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই শ্রুতিগুলিতে কি ইন্দ্রদেবতাকে অথবা জীবাত্মাকে, অথবা প্রাণশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, না ব্রহ্মকে? সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু এই শ্রুতিতে ইন্দ্রদেবতা, জীবাত্মা, অথবা প্রাণের লক্ষণ অপেক্ষা ব্রহ্মের লক্ষণগুলিই অধিকতরভাবে প্রকট হইয়াছে সেইজন্য ব্রহ্মই এই শ্রুতির লক্ষ্য; সুতরাং এখানে প্রাণের অর্থ হইলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যেসব লক্ষণ এখানে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইল: (১) মানুষের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর কি, প্রতর্দনের এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলিলেন, "আমাকে জান, আমি প্রাণস্বরূপ" ইত্যাদি। যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই হইলেন মানুষের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণকর বস্তু সেইজন্য ইন্দ্রের উত্তর ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। (২) প্রাণকে লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, উহা আনন্দ অবিকারী এবং অমৃত স্বরূপ। এইগুলি একমাত্র ব্রহ্ম সম্পর্কেই সত্য। (৩) এই প্রাণের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হইলেও সকল পাপ মুক্ত হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; "যে আমাকে এইরূপ বলিয়া জানে, কোন কর্মই তাহার সিদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে না, এমন কি মাতৃপিতৃ হত্যার দ্বারাও তাহা নষ্ট হয় না।" (কৌ: ৩.১)

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্ ।। ১ । ১ । ২৯ ।।

ন (নহে) বক্তুঃ (বক্তার) আত্মোপদেশাৎ (তাঁহার নিজের সম্পর্কে উপদেশ দানের জন্য) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা (অভ্যন্তরস্থ অন্তর্যামী আত্মার বহু উল্লেখ আছে) হি (যেহেতু) অস্মিন্ (ইহার— [এই অধ্যায়ের] মধ্যে)।

২৯. যদি ইহা বলা হয় যে (ব্রহ্ম) নহেন (এই শ্রুতিবচনে যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে) যেহেতু বক্তা নিজের সম্পর্কেই উপদেশ দিয়াছেন; (উত্তরে আমরা বলিব, না এইরূপ নহে), কারণ (এই অধ্যায়ে) অন্তর্যামী আত্মা সম্পর্কেও বহু উল্লেখ আছে।

[২৯. ঐ শ্রুতিতে 'আমাকেই জান' ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ উপদেশ দিবার জন্য, প্রাণ শব্দ ব্রহ্মবোধক নহে বলিয়া যদি আশঙ্কা করা হয়— তাহা ঠিক নহে। কারণ শ্রুতির ঐ অধ্যায়েই পরমাত্ম বিষয়কই বহু উপদেশ রহিয়াছে।]

এইরূপ একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, পূর্ববর্তী সূত্রে 'প্রাণ' শব্দটি ব্রহ্মবোধক হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্র 'আমিই প্রাণ'— এই উপদেশদ্বারা প্রাণ শব্দে নিজেকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু (ইন্দ্র প্রতর্দনের) এই সংলাপের মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত আছে— যাহা পূর্বে ২৮ সূত্রের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অন্তরাত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কেই এই অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা আছে। তাই, এখানে প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। উপরন্তু ইন্দ্রের নিজেকে প্রাণ বলিয়া বর্ণনা করা যথার্থই হইয়াছে— যেহেতু তিনি নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন জ্ঞান করিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন। ঋষি বামদেবও এইরূপভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ।।১।১।৩০।।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রসম্মতভাবে যথার্থ জ্ঞানলাভ করার পর) তু (কিন্তু) উপদেশঃ (শিষ্যকে ব্রহ্মসম্পর্কে উপদেশ) বামদেববৎ (যেমন বামদেব করিয়াছিলেন)।

৩০. কিন্তু (ইন্দ্রের) উপদেশ (প্রতর্দনের প্রতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল) শাস্ত্রসম্মতভাবে সত্য (ব্রহ্ম) জ্ঞানলাভের দ্বারা (অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ) যেমন উপদেশ করিয়াছিলেন (ঋষি) বামদেব।

[৩০. ইন্দ্রের উপদেশ এখানে বামদেব ঋষির ন্যায়। এইরূপ বলা শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছে।]

ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর বলিয়াছিলেন, "আমিই ছিলাম মনু, এবং আমিই ছিলাম আদিত্য"— ইত্যাদি। এই উক্তিকেই এই শ্রুতির দ্বারা সমর্থন করা হইতেছে: "দেবগণের মধ্যে যে কেহই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন তিনিই ব্রহ্ম হইয়া গেলেন" (বৃ: ১.৪.১০)। ইন্দ্রের উপদেশও ঐরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর "তুমিই সেই ব্রহ্ম"— শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে— সেই অনুসারে তিনি পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করিয়াই এই উপদেশ দিয়াছেন।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ, আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্‌যোগাৎ ।।১।১।৩১।।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবাত্মার এবং প্রাণের লক্ষণের জন্য) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ হইতে পারে না) উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ

(কারণ ইহার তিন প্রকার উপাসনার উপদেশ আছে) আশ্রিতত্বাৎ (যেহেতু প্রাণকে ব্রহ্ম অর্থে অন্যত্রও গ্রহণ করা হইয়াছে) ইহ (এখানে) তদ্‌যোগাৎ (কারণ ব্রহ্ম বুঝাইতে প্রাণ শব্দের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে)।

৩১. যদি এইরূপ বলা হয় যে, এখানে (ব্রহ্মের) উল্লেখ করা হয় নাই কারণ, এখানে জীবাত্মা এবং প্রাণের লক্ষণগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে, (তাহার উত্তরে আমরা বলিব) না, তাহা নহে। কারণ (এইরূপ ব্যাখ্যা) তিনপ্রকার উপাসনার বিধান দিয়া থাকে; কারণ প্রাণ শব্দকে (অন্যত্র ব্রহ্ম অর্থে) গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু এখানেও (ব্রহ্ম-বোধক শব্দগুলি) প্রাণকে বুঝাইতে উল্লিখিত হইয়াছে (সেই হেতু ইহা ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে বলিয়াই জানিতে হইবে)।

[৩১. প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মকে বুঝাইবে না, কারণ জীববোধক এবং মুখ্যপ্রাণবোধক কথা থাকায় —যদি এইরূপ বলা হয়? তাহা ঠিক নহে, কারণ ব্রহ্ম উপাসনার ত্রৈবিধ্যত্ব শাস্ত্রোপদিষ্ট এবং শ্রুতিতে অন্যত্র ব্রহ্মবোধক ধর্মের উল্লেখ থাকায় প্রাণকে ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মবোধক শব্দের যোগ থাকায় প্রাণশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।]

আলোচ্য শ্রুতিগুলি জীবাত্মা এবং প্রাণকেও বুঝাইতে পারে কারণ ইহাদের লক্ষণগুলিও এখানে পাওয়া যায়: "বক্তাই জ্ঞাতব্য বাক্য প্রষ্টব্য নহে" (কৌ: ৩.৮) "প্রাণ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে উর্ধ্বে উত্তোলন করায় (ঐঃ ৩.৩)"। এই সূত্র এই জাতীয় ধারণাকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করে যে, প্রাণ বলিতে শুধু ব্রহ্মকেই বুঝায়। কারণ উপরি উক্ত ব্যাখ্যায় তিন প্রকার উপাসনার কথা আছে— যথা জীবাত্মা, মহাপ্রাণ এবং ব্রহ্ম উপাসনা। ইহা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। একই শ্রুতিকে বিভক্ত করিয়া তিন প্রকার উপাসনার এইরূপ উপদেশ পাওয়ার প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। উপরন্তু এই শ্রুতির প্রারম্ভেই আমরা পাই— "শুধু আমাকেই জান," ইহার পরেই আছে 'আমিই প্রাণ' এবং সবশেষে আমরা পাই— "সেই প্রাণই হইলেন প্রজ্ঞানাত্মা, আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী এবং অমৃত"। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখানে পূর্বাপর একই বিষয়ের আলোচনা রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাণ শব্দটিকে ব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে— কারণ ব্রহ্মের লক্ষণগুলিই এই শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং পূর্বেই ১.১.২৮ সূত্রে ইহার উল্লেখও করা হইয়াছে। প্রাণের এই অর্থে ব্যবহার অন্য শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়, সুতরাং ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমরা ইহাকে ব্রহ্ম অর্থেই এখানেও গ্রহণ করিতে পারি— কারণ এখানেও ব্রহ্ম অর্থেই প্রাণ সম্পর্কিত শব্দগুলির প্রয়োগ হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সূত্র

প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

প্রথম পাদের শেষাংশে শাস্ত্রে ব্যবহৃত কিছু শব্দ যেগুলিকে সাধারণত ভিন্নার্থ বোধক যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ঐ শব্দগুলি ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। ফলত কতকগুলি শ্রুতিবচনের অর্থ অস্পষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মের লক্ষণগুলি আছে বলিয়া ঐগুলিকেও ব্রহ্মজ্ঞাপক হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতঃপর বর্তমান আলোচ্য পাদে এবং ইহার পরবর্তী পাদেও আরও কতকগুলি সন্দেহার্থক শ্রুতিকে আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে— যাহাদের মধ্যে ব্রহ্মের লক্ষণগুলিকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।

অধিকরণ ১ : ব্রহ্মের মনোময়ত্ব (নিরূপণ)।

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥

সর্বত্র (শাস্ত্রের সর্বত্র) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ কারণ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে (ব্রহ্মই হইলেন) সুপ্রসিদ্ধ।

১. (যিনি মনোময়— তিনিই ব্রহ্ম) কারণ (শাস্ত্রে) এইরূপই উপদেশ আছে। (সেই ব্রহ্মই) সুপ্রসিদ্ধ (বিশ্বের কারণ হিসাবে) সর্বত্র (শাস্ত্রের)।

[১. ব্রহ্মের যে-সকল লক্ষণ (মনোময়ত্ব, কারণত্ব ইত্যাদি) শ্রুতিতে সর্বত্র আছে, এখানেও তাহারই উপদেশ রহিয়াছে।]

১-৮ সূত্রগুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে যে, মনোময় (হইলেন ব্রহ্ম)— এবং শ্রুতিতে মনোময়কেই উপাসনার বিষয়রূপে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত ব্রহ্মই, কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয়, ও তাঁহাতে জীবিত থাকে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। ......মনই যাঁহার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ (মনোময়) যাঁহার দেহ (লিঙ্গ শরীর) প্রাণ"— ইত্যাদি (ছা : ৩.১৪.১-২) ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে, জীবকে নহে। কেন ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে? কারণ, শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দ্বারা। এই শ্রুতিতে, বিশ্বের সব কিছুর কারণ যে- ব্রহ্মের কথা অন্য সব শ্রুতিতে আলোচনা করা হইয়াছে— সেই ব্রহ্মেরই কথা এখানেও বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতির প্রারম্ভে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে সেইজন্যই শেষে যেখানে 'মনোময়ের' কথা আছে তাহাও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন, কারণ ব্রহ্মের

প্রসিদ্ধ কতকগুলি লক্ষণ উহাতে আছে। তাহা না হইলে প্রথমে গৃহীত প্রসঙ্গকে বাদ দিয়া হঠাৎ নূতন একটি প্রসঙ্গ গ্রহণ করার জন্য একটা অসঙ্গতি দেখা দিত। অধিকন্তু শাস্ত্রে এখানে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে; সেইহেতু অন্যসব শাস্ত্রে যেখানে ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, জীবকে কোথাও উপাস্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, সেইজন্য এখানেও ব্রহ্মকেই উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। অধিকন্তু শাস্ত্রে যে শান্ত হইয়া উপাসনার কথা বলা আছে তাহা একমাত্র ব্রহ্মকে উপাসনার দ্বারাই সম্ভব—কারণ, ব্রহ্মই হইলেন একমাত্র ক্রোধ হিংসাদি রহিত।

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ।।১।২।২।।

বিবক্ষিত গুণোপপত্তেঃ (কারণ যে-সকল গুণ উদ্দিষ্ট এবং প্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়) চ (অধিকন্তু)।

২. অধিকন্তু বাঞ্ছিত গুণসমূহে যাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন তাহা যথার্থই (শুধু ব্রহ্ম সম্পর্কেই এবং তাহাই এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে)।

[২. উপাস্যের যে-সকল গুণ থাকা শাস্ত্রোপদিষ্ট এবং বাঞ্ছিত, এখানেও সেই সকল গুণের কথাই বলা হইয়াছে।]

"মনই যাঁহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, লিঙ্গ শরীর যাঁহার দেহ, চৈতন্যদীপ্তিই যাঁহার রূপ, তিনি সত্য-সংকল্প, আকাশাত্মা,...... যিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান, অদৃশ্য" ইত্যাদি (ছা : ৩.১৪.২)— এই শ্রুতিতে উল্লিখিত গুণগুলিকে উপাসনার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গুণগুলি একমাত্র ব্রহ্মেরই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, এইরূপ গুণভূষিত ব্রহ্মই (সগুণ ব্রহ্মই) একমাত্র উপাস্য।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ।।১।২।৩।।

অনুপপত্তেঃ (কারণ) (এইগুলি) (যথাযথ নয়) তু (অপর পক্ষে) ন (নয়) শারীরঃ (জীব)।

৩. অপর পক্ষে জীব নহে (শ্রুতিতে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে) কারণ এই গুণগুলি (ইহার পক্ষে) যথোপযুক্ত নহে।

[৩. পূর্বোক্ত গুণসকল শারীর জীবাত্মায় সম্ভব নহে বলিয়াও এখানে ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।]

কর্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥

কর্ম (প্রাপ্য, বিষয়, কর্মকারক পদ) কর্তৃ (ক্রিয়ার কর্তা, প্রাপক) ব্যপদেশাৎ (যেহেতু উল্লিখিত হইয়াছে) চ (এবং)।

৪. এবং প্রাপ্য-প্রাপকরূপে উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া (মনোময় শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে, জীবকে নহে)।

[৪. ঐ পুরুষ 'কর্ম' এবং জীব 'কর্তা' এইরূপ উপদেশ থাকাতেও ঐ মনোময় পুরুষ জীব হইতে পারেন না— তিনি ব্রহ্মই।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের একই অধ্যায়ে এই শ্রুতিটি আছে: "দেহত্যাগের পর আমি তাঁহাকেই পাইব" (ছা: ৩.১৪.৪)। এখানে তাঁহাকে বলিতে 'মনোময়' ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে। কারণ ইহার পূর্ববর্তী শ্রুতিতে উপাস্য হিসাবে 'মনোময়ের' কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি (মনোময় ব্রহ্ম) অবশ্যই উপাসক হইতে ভিন্ন। এখানে 'আমি' এই সর্বনাম পদের দ্বারা উপাসক জীবকেই বুঝাইয়াছে।

শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥

পার্থক্যহেতু (বিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা সূচিত) শব্দগুলির।

[৫. শব্দের বিভক্তি প্রয়োগের পার্থক্য থাকাতেও বুঝা যায় এখানে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে জীবকে নহে।]

শতপথব্রাহ্মণের এই শ্রুতিতে একই ভাষায় এই ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে "যেমন ভাবে একটি ধান্য বা যবকণিকা ...... তেমনি আত্মাতে হিরণ্ময় পুরুষ" (১০.৬.৩.২)। এখানে জীব এবং 'মনোময়' (ব্রহ্মকে) স্পষ্টভাবেই দুইটি ভিন্ন সত্তা হিসাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ 'মনোময়' শব্দকে কর্তৃকারকে প্রয়োগ করিয়া তিনি অধিকরণ কারকযুক্ত জীবে অবস্থান করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই আলোচ্য শ্রুতিতে জীবকে উদ্দেশ্য করা হয় নাই।

স্মৃতেশ্চ ॥১।২।৬॥

স্মৃতেঃ (স্মৃতি শাস্ত্র হইতে) চ (এবং)।

৬. স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [আমরা জানিতে পারি যে, জীব আলোচ্য শ্রুতিতে উদ্দিষ্ট (মনোময় ব্রহ্ম) হইতে ভিন্ন]।

[৬. স্মৃতি (এখানে গীতা) শাস্ত্রেও এইরূপ ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।]

এখানে যে স্মৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল— "হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন" ইত্যাদি (গীতা ১৮.৬১)। অবশ্য, আমাদের কিছুতেই বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, অদ্বৈত বেদান্তের মতানুসারে এই পার্থক্য কল্পিতমাত্র, যথার্থ নহে। যতক্ষণ আমাদের অজ্ঞতা থাকিবে, যতক্ষণ আমরা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের মর্মার্থের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিব— ততক্ষণ পর্যন্তই আমাদের এই ভেদবুদ্ধির অস্তিত্ব।

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ।। ১।২।৭।।

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ (অবস্থানভূমির ক্ষুদ্রত্বের উল্লেখ থাকায়) তদ্ব্যপদেশাৎ (তাঁহাকে এইরূপ [অর্থাৎ ক্ষুদ্র] আখ্যা দেওয়ার জন্য) চ (এবং) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না— এইরূপ হইতে পারে না) নিচায্যত্বাৎ [উপাসনার (মননের) নিমিত্ত] এবং (এইরূপ) ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) চ (এবং)।

৭. যদি এইরূপ বলা হয় যে, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই— কারণ এখানে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র আবাস (হৃদয়ের) উল্লেখ আছে এবং এখানে ব্রহ্মকে সূক্ষ্ম বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে; (তাহার উত্তরে আমরা বলিব) না, এইরূপ হইতে পারে না (কারণ ব্রহ্মকে এইভাবে বিশিষ্ট গুণান্বিত করা হইয়াছে) উপাসনার (ধ্যানের) সৌকর্যের জন্য এবং যেহেতু এই বর্ণনাকে (গবাক্ষ) ব্যোমবৎ (ক্ষুদ্র হিসাবেই) বুঝিতে হইবে।

[৭. "স্বল্পায়তনবিশিষ্ট এবং অতিসূক্ষ্ম" ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় তিনি ভূমাস্বরূপ ব্রহ্ম পদবাচ্য হইতে পারেন না, যদি বল, তাহা ঠিক নহে; কারণ তাঁহাকে আকাশবৎ বলা হইয়াছে।]

" হৃদয় পদ্মমধ্যে অবস্থিত উক্ত গুণবিশিষ্ট আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব ...অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর" (ছা: ৩.১৪.৩) ইত্যাদি— শ্রুতির একই অংশে বর্ণিত আছে— যে অংশে 'মনোময় ব্রহ্মের' কথাও আছে। এখানে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে এইজন্যই যে, যেহেতু এই সসীম লক্ষণগুলি ব্রহ্মসম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে না, ইহা জীব সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতে পারে— সুতরাং এখানে 'মনোময়' ইত্যাদি জীব সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূত্র এই আপত্তিকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, ব্রহ্মকে এখানে এইরূপ সসীম লক্ষণবিশিষ্ট করা হইয়াছে ধ্যানের সৌকর্যের জন্য; তাহা না হইলে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে

ধ্যান করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইত। ব্রহ্মকে এইরূপ করায় ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব ক্ষুণ্ন হইবে না— কারণ এই সসীমত্বাদি গুণ ব্রহ্মে আরোপিত কল্পনা মাত্র— ইহা যথার্থ নহে। ব্রহ্মের ক্ষুদ্রত্ব কল্পনাটি আকাশকে সূচীছিদ্রের পরিমিতরূপে কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। সূচীছিদ্রে আকাশকে সসীম এবং ক্ষুদ্র বলিয়া আখ্যাত করিলেও বাস্তবিকপক্ষে আকাশ সর্বব্যাপী।

সংভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥ ১ । ২ । ৮ ॥

সংভোগপ্রাপ্তিঃ (ব্রহ্মের সুখদুঃখ বেদনার অনুভব হয়) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) বৈশেষ্যাৎ (কারণ তাহাদের স্বভাবধর্মের পার্থক্য আছে)।

৮. যদি এইরূপ বলা হয় যে (যেহেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সেইজন্য ইহার সকল জীবের হৃদয়ের সঙ্গেই সংযোগ আছে এবং তাহার ফলে ব্রহ্মও) সম্ভোগ করেন (সুখ এবং দুঃখের) ;— (ইহার উত্তরে আমরা বলিব)— না, তাহা হইতে পারে না, কারণ (এই দুইয়ের— জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে) প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে।

[৮. তাহা হইলে হৃদয়স্থিত আত্মা জীবের ন্যায় সুখ দুঃখের ভোক্তা হইবেন— এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, না, তাহা নহে, কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য রহিয়াছে।]

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং সকল জীবের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জীবের ন্যায় চেতনাসম্পন্ন হইলেও তিনি সুখ-দুঃখের অধীন (ভোক্তা) নহেন। কারণ জীব সুকৃতি দুষ্কৃতির কর্তা বলিয়া সুখ-দুঃখেরও ভোক্তা। অপরপক্ষে ব্রহ্ম কোন কার্যের কর্তা নহেন, সেইজন্য তিনি সুখ অথবা দুঃখ কিছুরই ভোক্তা নহেন। এইরূপ একটি ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণা প্রায়ই করা হয়, যেহেতু স্বরূপত ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন, সেইজন্য ব্রহ্মও জীবের ন্যায় সুখদুঃখের ভোক্তা। কিন্তু সেইক্ষেত্রে এই অভিন্নত্ব জীবেরও অজ্ঞতাবশত এই সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বকে খণ্ডন করে। কারণ বাস্তবিকপক্ষে পরিণামে জীবেরও কোন অস্তিত্ব নাই— সুখদুঃখেরও অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জীবের অভিন্নত্বের যুক্তিকে বিপরীত ক্রমে প্রয়োগ করিয়া চির বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে ভোক্তৃত্বাদি দোষের অধীন করা সম্ভব নহে।

অধিকরণ ২: অত্তা (ভোক্তা) হইলেন ব্রহ্ম।

পূর্ববর্তী অধিকরণে ব্রহ্মের সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এখানে, এই অধিকরণে পূর্ববর্তী অধিকরণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়াই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের কর্তৃত্বও নাই।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯॥

অত্তা (ভোক্তা) চরাচরগ্রহণাৎ (কারণ স্থাবর এবং জঙ্গম— সমগ্র বিশ্বকে) গ্রহণ করা হইয়াছে (তাঁহার খাদ্য রূপে)।

৯. ভোক্তা (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ, স্থাবর এবং জঙ্গম— এই উভয় প্রকার (সমগ্র বিশ্বকে) গ্রহণ করা হইয়াছে (তাঁহার খাদ্য রূপে)।

[৯. শ্রুতিতে যে তাঁহাকে অত্তা (ভোক্তা) বলা হইয়াছে— তাহা কর্মফল-ভোক্তা নহে— তিনি চরাচর জগতের সংহার কর্তা, এই অর্থে তাঁহাকে অত্তা বলা হইয়াছে।]

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্নস্থানীয় এবং মৃত্যু যাঁহার শাকাদিস্থানীয়, সেই পরমাত্মা যেখানে অবস্থিত, তাহা কে এবম্প্রকারে (অর্থাৎ যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়) জানিতে পারে" (কঠ ১.২.২৫)?— এই শ্রুতি বলে যে, ভোক্তা (অত্তা) বলিয়া কেহ আছেন। এই ভক্ষকটি কে?— তিনি কি অগ্নি— যাঁহাকে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'অন্নাদ' বলা হইয়াছে?— "সোমই অন্ন, এবং অগ্নি অন্নাদ"(বৃ: ১.৪.৬)। অথবা ইনি কি জীব যাঁহাকে মুণ্ডক উপনিষদে ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে?— "উহাদের মধ্যে একটি স্বাদুফল ভক্ষণ করে" (মু: ৩.১.১)। এই সূত্রে বলা হইয়াছে ইঁহাদের কেহই ভোক্তা নহেন, পরব্রহ্ম (ঈশ্বর)-ই অত্তা। কারণ এখানে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার মধ্যেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় লয়প্রাপ্ত হয়। যে-মৃত্যু অন্য সব কিছুকেই ধ্বংস করিয়া দেয়, সেই মৃত্যুকেই তিনি উপসেচন (ব্যঞ্জনাদি) রূপে গ্রাস করিয়া ফেলেন— ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁহার অন্ন (খাদ্য)। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণকে দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তাঁহারাই হইলেন মুখ্য। এইরূপ মহাবিশাল বস্তুর ভক্ষক (ভোক্তা) একমাত্র ব্রহ্মই হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১।২।১০॥

প্রকরণাৎ (সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ হইতে) চ (এবং)।

১০. এবং যেহেতু (ব্রহ্মই) এই প্রকরণে আলোচ্য বিষয় (সেইজন্য ব্রহ্মই এখানে উদ্দিষ্ট)।

[১০. শ্রুতির যে প্রকরণে 'অত্তা' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মপ্রকরণ; সুতরাং 'অত্তা' অর্থ ব্রহ্মই, জীব নহে।]

পূর্ববর্তী এক শ্রুতিতে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করেন: "ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম

হইতে ভিন্ন, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে-বস্তুকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহাই আমায় বলুন" (কঠ: ১.২.১৪)। এই শ্রুতিতে জিজ্ঞাস্য হইলেন ব্রহ্ম। তাহার উত্তরে যম বলিলেন, "আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব— তিনি হইলেন ওম্" (তদেব, ১.২.১৫)। তিনি (যম) আরও বলিলেন, "ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই" (তদেব, ১.২.১৮)। এবং পরিশেষে এই অত্তা কে তাহা বলিয়া শ্রুতি সমাপন করিলেন। এই সব আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মই এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয়— সুতরাং ব্রহ্মই 'অত্তা'। ব্রহ্মকে জানার দুরধিগম্যতার এবং তাঁহার লক্ষণের অভিনবত্ব হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই এই আলোচনার বিষয়।

এখানে এই যুক্তি দেখাইয়া একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, শ্রুতি নিজেই অন্যত্র ব্রহ্মকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করেন না: "অন্যজন (ব্রহ্ম) কিছু আস্বাদন না করিয়া দ্রষ্টা মাত্র" (মু: ৩.১.১)। কিন্তু এই শ্রুতিতে 'ভক্ষণ' অর্থে সুখদুঃখের অভিজ্ঞতাকেই বুঝাইয়াছে, পক্ষান্তরে আলোচ্য শ্রুতিতে ইহার অর্থ হইল প্রলয়ের সময় বিশ্বের বিলীন হওয়া, শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই ইহা সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মেই এই গুণ আরোপ করেন।

অধিকরণ ৩ : হৃদয়গুহাতে যে দুইজন প্রবিষ্ট আছেন তাঁহারা হইলেন জীব এবং ব্রহ্ম।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি, তদ্দর্শনাৎ ॥ ১ । ২ । ১১ ॥

গুহাং (গুহাতে [হৃদয়গুহাতে]) প্রবিষ্টৌ (যে দুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন) আত্মানৌ (দুই আত্মা— জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) হি (নিশ্চিত) তদ্দর্শনাৎ (কারণ এইরূপই দৃষ্ট হন)।

১১. যে দুইজন (হৃদয়) গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন তাঁহারা নিশ্চিতই জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, কারণ, এইরূপই (ইঁহারা) দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

[১১. গুহায় প্রবিষ্ট বলিয়া শ্রুতি যে দুইটি আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা, কারণ শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্রই জীবাত্মা পরমাত্মা সম্পর্কে ঐরূপ বলা হইয়াছে।]

কঠোপনিষদে এই শ্রুতিটি আছে— "নিজকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগকারী যে দুইজন পুরুষ ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে ...প্রবিষ্ট আছেন"— (কঠ: ১.৩.১)। এখন প্রশ্ন হইতেছে এখানে যে দুইজন পুরুষ উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা কি জীব ও ব্রহ্ম— না, জীব এবং বুদ্ধি? বিরুদ্ধবাদিগণ পূর্ব অধিকরণের যুক্তি অনুসারে বলিতে পারেন যে এখানে জীব এবং বুদ্ধিকেই বুঝাইয়াছে। পূর্ব অধিকরণে 'মৃত্যু'— এই শব্দটির সান্নিধ্য হইতে

আমাদিগকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বলিতে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎকে বুঝাইবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। এইরূপ ভাবেই 'ভোগ' শব্দটির সান্নিধ্য হইতে আমরা শ্রুতিতে বর্ণিত সগুণ ও সসীম জীব এবং বুদ্ধিকেই বুঝিতে পারি। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের এই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, 'দুইজন পুরুষ' বলিতে এখানে জীব এবং ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে, কারণ সংখ্যাবাচক শব্দ সমজাতীয় বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে। যখন একটি গরুকে আমাদের নিকট আনা হইল, তখন যদি আমরা বলি 'আর একটি আন', তাহা হইলে ইহার দ্বারা ইহাই বুঝাইবে যে আর একটি গরুকে আন। সেইরূপভাবে যদি চৈতন্যময় আত্মার সঙ্গে বলা হয় যে অপর একজন হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, একজন চেতনসম্পন্ন সত্তাই প্রবেশ করিয়াছেন— অচেতন বুদ্ধি নহে। উভয়ই কৃতকর্মের ফল ভোগ করেন— এই উক্তিটি পরব্রহ্মের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। এই বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: কোন কোন ক্ষেত্রে সমষ্টির অন্তর্গত কোন ব্যষ্টির গুণকে পরোক্ষভাবে গোষ্ঠীর সকলের উপরই প্রয়োগ করা চলে। যেমন, যদি আমরা বলি, 'ছত্রধারী ব্যক্তিটি'— যেখানে সমষ্টির মধ্যে মাত্র একজনেরই ছাতা আছে— সকলের ছাতা নাই। সেইরূপ এখানেও। যদিও একজনই কর্মফল ভোগ করে তথাপি উভয়েই ভোগ করে বলিয়া বলা হয়।

বিশেষণাচ্চ ।। ১ । ২ । ১২ ।।

বিশেষণাৎ (পার্থক্যসূচক বিশেষগুণ হইতে) চ (ও)।

১২. এবং (পরবর্তী শ্রুতিতে দুইটির) পার্থক্যসূচক গুণাবলীর উল্লেখ দ্বারা।

[১২. উভয়ের ভেদ বিশেষণদ্বারাও প্রদর্শিত হইয়াছে।]

আলোচ্য শ্রুতির পরবর্তী অংশে হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট দুইজনের বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি হইল জীব এবং ব্রহ্ম। "আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে" (কঠ: ১.৩.৩), এবং "তিনি সংসার-মার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন— উহাই সর্বোত্তম ও সুবিশাল অধিষ্ঠান বিষ্ণুরূপ" (তদেব, ১.৩.৯)— এখানে দুইজনের একজনকে প্রাপক এবং অপরজনকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে— অর্থাৎ ইহাদের একজন জীব এবং অপর জন ব্রহ্ম। পূর্ববর্তী কোন একটি শ্রুতিতেও দুইজনের মধ্যে একজনকে ধ্যাতা এবং অপরজনকে ধ্যেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে "সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগ সহায়ে সাক্ষাৎ করিয়া ধীরব্যক্তি সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন" (তদেব, ১.২.১২)।

অধিকরণ ৪ : চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী অধিকরণে শ্রুতির প্রথমেই উল্লেখিত 'দ্বা'— (দুইটি) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; তাহাদের উভয়টিই সমজাতীয় অর্থাৎ দুইটি সচেতন সত্তা এবং পরবর্তী কালে তাঁহারা যে হৃদয়-গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া আছেন— ইত্যাদি, যথাযথভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য হইল যে, এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয়েও পূর্বপ্রকরণে অনুসৃত যুক্তিরই অনুসরণ করা হউক। অর্থাৎ অক্ষিগোলকের পুরুষকে চক্ষের উপর প্রতিবিম্ব হিসাবেই প্রথমে শ্রুতিতে যেমন আছে সেইভাবেই গ্রহণ করা হউক এবং পরবর্তী অংশে বর্ণিত অমৃতত্ব অভীত্ব প্রভৃতি গুণকে অর্থবাদ বা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হউক। এই বিপরীত পদ্ধতি— অর্থাৎ প্রথমত এই শব্দগুলিকে ব্রহ্মজ্ঞাপক হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং এইভাবে চক্ষে অবস্থানকারী পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করা সমীচীন নয়। এইভাবে বিরুদ্ধবাদীরা দেখাইতে চান যে, পূর্বগৃহীত পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ কারণ, তাহা হইলে শ্রুতির অন্য অংশ ব্যাখ্যা করিতে আমাদের অসুবিধা হইবে।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ । ২ । ১৩ ॥

অন্তরঃ (ভিতর-চক্ষু) উপপত্তেঃ (যথার্থতার জন্য)— (গুণগুলির)।

১৩. (পুরুষটি) ভিতরে (চক্ষু মধ্যস্থিত-ব্রহ্মই) কারণ (সেখানে যেসব গুণের উল্লেখ আছে) যথার্থ বলিয়া (একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই)।

[১৩. ছান্দোগ্য শ্রুতিতে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ যে পুরুষের কথা আছে, তিনি ব্রহ্মই, জীব নহেন।]

"অক্ষিগোলকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। ইনি অমর ও ভয়াতীত, ইনি ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪.১৫.১)। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই, যে-পুরুষটির কথা এখানে বলা হইল ইনি কি অক্ষিগোলকের উপর প্রতিফলিত কোন পুরুষের প্রতিবিম্ব, না, জীব, অথবা আদিত্য—যিনি দৃষ্টিশক্তির সহায়ক, অথবা ইনি ব্রহ্ম? এই সূত্র বলে যে, অক্ষিগোলকে স্থিত এই পুরুষটি ব্রহ্মই, কারণ অমৃত, অভীঃ ইত্যাদি বিশেষণগুলি যে-পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া এখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা শুধুমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই সত্য হইতে পারে অন্যভাবে ইহাদের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১ । ২ । ১৪ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাৎ [(কারণ স্থান ইত্যাদি—যথা নাম এবং রূপ) ইহার উপর আরোপ করা হইয়াছে] চ (এবং)।

১৪. এবং যেহেতু স্থান ইত্যাদি (যথা নাম এবং রূপ) ইহার (ব্রহ্মের) উপর আরোপ করা হইয়াছে (অন্য শ্রুতির দ্বারাও উপাসনার জন্য)।

[১৪. (উপাসনার সুবিধার জন্য) যেহেতু স্থানাদির নির্দেশ অন্য শ্রুতিতেও আছে, সেইজন্য (ব্রহ্মকে অক্ষিগোলকস্থ পুরুষ বলা দোষাবহ নহে)।]

কিন্তু প্রশ্ন হইল, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম কিভাবে এই সীমিত অক্ষিগোলকের মতো স্থানে অবস্থান করিতে পারেন? সর্বব্যাপী ব্রহ্মের নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থিতির কল্পনা শুধুমাত্র উপাসনার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও আদিত্য-গোলক, হৃদয়-গুহা এমনকি চক্ষুও (বৃহঃ ৩.৭.১৮)— এবং আরও বহু পবিত্র স্থানসমূহকে ব্রহ্মের ধ্যানের আধার হিসাবে গ্রহণ করার উপদেশ আছে। এইভাবেই এখানে ব্রহ্মকে অক্ষিগোলকে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। শুধু আধারই নহে, এমনকি উপাসনার সৌকর্যের জন্য ব্রহ্মে নাম এবং রূপেরও আরোপ করা হইয়াছে, কারণ গুণের দ্বারা বিশিষ্ট না হইলে ব্রহ্ম ধ্যেয় হইতে পারেন না (দ্রঃ ছাঃ ১.৬.৬-৭)।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ।। ১ । ২ । ১৫ ।।

সুখবিশিষ্ট-অভিধানাৎ (যেহেতু [ব্রহ্মকে] সুখাদিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সেইজন্য) এব (নিশ্চিতই) চ (এবং)।

১৫. এবং নিশ্চিতই যেহেতু (ব্রহ্মকে ব্রহ্মসম্পর্কিত শ্রুতিতে) সুখাদিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (এই প্রকরণের সূচনাতেই)।

[১৫. অক্ষিস্থিত পুরুষ সুখস্বরূপ বলাতে তিনি যে ব্রহ্ম তাহা নিশ্চিতভাবেই বুঝিতে পারা যায়।]

"অগ্নিগণ উপকোসল কামলায়নকে ব্রহ্ম সম্পর্কে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন— প্রাণ ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪.১০.৫)। এবং এই ব্রহ্মকেই তাঁহার আচার্য তাঁহার নিকট আরও স্পষ্ট করিয়া উপদেশ দিয়াছেন 'অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ'-ও ব্রহ্ম।

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ।। ১ । ২ । ১৬ ।।

শ্রুত-উপনিষৎক-গতি (উপনিষদের সত্য যাঁহারা জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের পন্থা) অভিধানাৎ (বলা হইয়াছে বলিয়া) চ (এবং)।

১৬. (মৃত্যুর পর) যাঁহারা উপনিষদের সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের গতি

কি হয় সেই সম্পর্কে উক্তি আছে বলিয়া (ব্রহ্মজ্ঞেরা-অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ সম্পর্কে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন)।

[১৬. উপনিষদ্-রহস্য অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তির গতি এবং অক্ষিগত পুরুষের গতি একই—ব্রহ্মই।]

প্রশ্ন উপনিষদের ১.১০ শ্রুতিতে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা মৃত্যুর পর দেবযান পন্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করেন, এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও এই কথা আছে। এখানেও এই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের জ্ঞাতাও মৃত্যুর পর দেবযানের মাধ্যমে উত্তরণ করেন, এবং যেহেতু ইহা অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞেরাই মৃত্যুর পর দেবযানকে অতিক্রম করেন— অন্য কেহ নহে— সেই হেতু অক্ষিস্থিত পুরুষটি অবশ্যই ব্রহ্ম।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ।।১।২।১৭।।

অনবস্থিতেঃ (সর্বদা থাকেন না বলিয়া) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) চ (এবং) ন (নহে) ইতরঃ (অন্য কেহ)।

১৭. (অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ হইলেন পরব্রহ্ম) এবং অপর কেহ নহেন (জীব বা অন্য কিছু) যেহেতু ইহারা সর্বদা থাকে না; এবং যেহেতু ইহা সম্ভবপরও নহে (যে অক্ষি-পুরুষের গুণগুলি ইহাদের কাহারও মধ্যে থাকিতে পারে)।

[১৭. অক্ষিগত পুরুষ (ব্রহ্মই) অন্য কেহ হইতে পারেন না— কারণ উহাদের কেহই সর্বদা চক্ষুতে থাকেন না এবং অমৃতত্বাদি গুণও ইহাদের নাই।]

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, চক্ষের মধ্যে প্রতিবিম্ব সর্বদা থাকে না, এবং এই প্রতিবিম্বকে অমৃতত্ব নির্ভয়ত্ব গুণাদি-বিশিষ্ট বলিয়াও যথার্থভাবে বর্ণনা করা চলে না। সুতরাং এখানে অক্ষিপুরুষ হিসাবে যাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনি পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন।

অধিকরণ ৫ : অন্তর্যামী ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী অধিকরণে, অক্ষিপুরুষকে ব্রহ্ম হিসাবেই গ্রহণ করার প্রসঙ্গে ইহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে যে, উপাসনার সুবিধার জন্যই বৃহঃ উপনিষদের ৩.৭.১৮ শ্রুতিতে অক্ষিকেই ব্রহ্মের আবাসস্থল বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে এবং সেইজন্য এখানেও অক্ষিকেই আবাসস্থল বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। বর্তমান অধিকরণে বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতিকেই আলোচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গিয়াছে— যাহাকে পূর্ব অধিকরণে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

অন্তর্যামী, অধিদৈবাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ ।। ১।২।১৮।।

অন্তর্যামী (অন্তরের নিয়ন্তা, শাসক), অধিদৈবাদিষু (দেবতা প্রভৃতির মধ্যে) তদ্ধর্ম-ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহার [ব্রহ্মের] গুণগুলি বর্ণিত হইয়াছে।)

১৮. দেবতা এবং অন্যান্যদের অন্তরের শাসক (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ সেই (ব্রহ্মের) গুণগুলির উল্লেখ আছে।

[১৮. 'অধিদৈবত'— 'অধিলোক' ইত্যাদি শ্রুতিতে যিনি 'অন্তর্যামী' বলিয়া বর্ণিত, তিনি পরমাত্মাই, কারণ পরমাত্মার গুণসমূহই তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে।]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "তুমি এই অন্তর্যামীকে জান কি ?" ইত্যাদি (বৃহঃ ৩.৭.১) এবং "যিনি পৃথিবীদেবতার অন্তর্বর্তীরূপে বিদ্যমান থাকেন, পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না... তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা" (বৃহঃ ৩.৭.৩)। 'যঃ পৃথিব্যাং'...এখানে অন্তর্যামীরূপে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন ব্রহ্ম, সিদ্ধিসম্পন্ন জীব, (সিদ্ধই) অধিদেবতা অথবা অন্য কেহ তিনি নন। কারণ উদ্ধৃত শ্রুতির শেষ অংশে ব্রহ্মের লক্ষণগুলিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে অন্তর্যামীকে জীবের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করিয়া অমর বলা হইয়াছে। এই অমৃতত্ব প্রভৃতি গুণ একমাত্র ব্রহ্মের ক্ষেত্রেই সত্য। শ্রুতির এই অংশে তাঁহাকে সর্বব্যাপীরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে যেহেতু তিনি পৃথিবী, সূর্য, জল, অগ্নি, আকাশ, ব্যোম, ইন্দ্রিয়সকল প্রভৃতি সব কিছুরই অন্তর্যামী এবং নিয়ন্তা; এবং এই গুণটিও, সর্বব্যাপিত্ব, একমাত্র ব্রহ্মের ক্ষেত্রেই সত্য হইতে পারে।

ন চ স্মার্তম্, অতদ্ধর্মাভিলাপাৎ ।। ১।২।১৯।।

ন (নহে) চ (এবং) স্মার্তম্ (সাংখ্য স্মৃতিতে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে) অতৎ-ধর্ম-অভিলাপাৎ (কারণ ইহার স্বভাবের বিপরীত ধর্মগুলিরই যেহেতু এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

১৯. এবং (অন্তর্যামী)-ও নহেন যাঁহার সম্পর্কে (সাংখ্য) স্মৃতিতে আলোচনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ প্রধান নহেন), কারণ ইঁহার স্বভাবের বিপরীত ধর্মগুলিরই (এখানে) উল্লেখ করা হইয়াছে।

[১৯. সাংখ্য স্মৃতিবর্ণিত প্রধানও অন্তর্যামী নহেন। কারণ এখানে যে-সকল ধর্মের উল্লেখ আছে তাহা প্রধানের বিপরীত।]

প্রধান এই অন্তর্যামী পুরুষ নহেন। কারণ 'তিনি অমৃত'; "অদৃশ্য হইলেও তিনি দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা" (অন্তর্যাম্য... বৃঃ ৩.৭.২৩) প্রভৃতি গুণ অচেতন প্রধানের ক্ষেত্রে সত্য নহে।

শারীরশ্চ, উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ।। ১ । ২ । ২০ ।।

শারীরঃ (জীব) চ (এবং) ন (নহে) উভয়ে অপি (উভয়েরই অনুসরণকারী) [কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন] হি (কারণ) ভেদেন (ভেদরূপে) এনম্ (এই জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন)।

২০. জীবও (অন্তর্যামী নহে), কারণ জীবকে পৃথক্‌রূপেই পাঠ করা হইয়াছে (অন্তর্যামী হইতে) উভয় শাখার অনুগামীদের দ্বারা (বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয় শাখার দ্বারা)।

পূর্ববর্তী সূত্র হইতে এখানে নেতিবাচক 'ন' গ্রহণ করিতে হইবে।

[২০. কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই জীব ও অন্তর্যামীর ভেদ উক্ত হইয়াছে। অতএব অন্তর্যামী শব্দটি জীব-বাচ্য হইতে পারে না।]

"যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) বাস করেন"— ইত্যাদি বৃহঃ ৩.৭.২২— হইল কাণ্বশাখার পাঠ; এখানে বিজ্ঞান বলিতে জীবকে বুঝাইয়াছে কারণ ইহা (জীব) বিজ্ঞানময়। "যিনি আত্মাতে বাস করেন"— এইটি হইল একই শ্রুতির মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ। এখানে, আত্মা বলিতে জীবাত্মাকে (জীবকে) বুঝাইয়াছে। এই দুইটি উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয় পাঠই জীবাত্মাকে অন্তর্যামী হইতে পৃথক্‌রূপেই বর্ণনা করিয়াছে। কারণ অন্তর্যামী হইলেন জীবেরও নিয়ন্তা।

এখানে পুনরায় আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, অন্তর্যামী পরমেশ্বর এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য আছে, জীব মায়ার সৃষ্টিমাত্র। আমাদের অন্তরে একজন আত্মাই আছেন, কেননা দুই আত্মার অস্তিত্ব কখনও সম্ভব নহে। কিন্তু সসীম গুণ আরোপ করার জন্যই একই আত্মাকে যেন দুইটি বলিয়া মনে করা হয়।

অধিকরণ ৬ : যাঁহাকে দেখিতে পারা যায় না তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ববর্তী অধিকরণে অন্তর্যামীকে পরমেশ্বররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, প্রধান বলিয়া নহে; কারণ দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি গুণ অচেতন প্রধানের পক্ষে বিরুদ্ধ—অথচ এই সকল গুণের কথা সেখানে উল্লেখ আছে। এখন এমন কতকগুলি শ্রুতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে যে-সকল শ্রুতিতে এই সকল গুণাবলীর উল্লেখ না থাকাতে প্রধান যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তাহা বুঝা যাইবে।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥ ১ । ২ । ২১ ॥

অদৃশ্যত্বাদি-গুণকঃ (অদৃশ্যত্ব ইত্যাদি গুণযুক্ত) ধর্মোক্তেঃ (ধর্ম-[গুণ]) গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া)।

২১. অদৃশ্যত্বাদি গুণসম্পন্ন (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ (ইঁহার লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইয়াছে)।

[২১. মুণ্ডক উপনিষদে যাঁহাকে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে তিনি ব্রহ্ম, কারণ শ্রুতি তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।].

"সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অনাদি, শাশ্বত, সর্বব্যাপী সুসূক্ষ্ম... ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে বিবেকীরা দর্শন করেন" (মুঃ ১.১.৬)। যিনি সকল ভূতবর্গের কারণ তিনি প্রধান নন, তিনি ব্রহ্মই— কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা (তদেব ১.১.৯)— ইত্যাদি গুণ একমাত্র ব্রহ্ম সম্পর্কেই সত্য, অচেতন প্রধান সম্পর্কে নহে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল গুণ দ্বারা সসীম জীবকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে না।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং নেতরৌ ॥ ১ । ২ । ২২ ॥

বিশেষণ-ভেদ-ব্যপদেশাভ্যাং (যেহেতু বিশেষগুণগুলি এবং পার্থক্য [দুইই] উল্লেখ করা হইয়াছে) ন (নহে) ইতরৌ (অন্য দুইটি)।

২২. অপর দুইটি (জীব এবং প্রধান) নহে (আলোচ্য শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয় নাই); কারণ ব্রহ্মের লক্ষণগুলি এবং পার্থক্য ('সর্বভূতের কারণ' হইতে জীব ও প্রধানের পার্থক্য) উল্লেখ করা হইয়াছে।

[২২. (ব্রহ্মের) লক্ষণগুলি এবং ইহার সহিত অপরের ভেদের উল্লেখ থাকায় জীব ও প্রধান এখানে উদ্দিষ্ট নয়—ব্রহ্মই।]

"যেহেতু সর্ব-মূর্তি-বিবর্জিত জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বর্তমান, সেইজন্যই তিনি জন্মরহিত; প্রাণশূন্য ও মনোহীন বলিয়া তিনি শুদ্ধ এবং সেইজন্যই তিনি (স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপ) শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" (মুঃ ২.১.২.)। 'জ্যোতির্ময়', 'জন্মরহিত', 'শুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পক্ষেই প্রযোজ্য—সসীম স্বরূপ, অবিশুদ্ধ শরীরী জীব সম্পর্কে নহে। "অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ (প্রধান)"— এই বিশেষণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বসূত্রে সর্বভূতের কারণ বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি প্রধান নহেন, প্রধান হইতে ভিন্ন কিছু।

রূপোপন্যাসাচ্চ ।।১।২।২৩।।

রূপ-উপন্যাসাৎ (রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া) চ (এবং)।

২৩. এবং যেহেতু (ইহার) রূপের উল্লেখ আছে (আলোচ্য শ্রুতির উদ্দিষ্ট ব্রহ্মই)।

[২৩. রূপের বর্ণনা হইতেও ঐ পুরুষ যে পরমাত্মা তাহাই বুঝিতে পারা যায়।]

পূর্ববর্তী সূত্রে যে শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পরেই আমরা এই শ্রুতিটি পাই— "এই পুরুষই কর্মাত্মক এবং জ্ঞানাত্মক বিশ্ব"— ইত্যাদি (মু: ২.১.১০) শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে "সকল ভূতের কারণ"— বলিয়া এই আলোচ্য শ্রুতিতে যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তিনি পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না— কারণ ইনিই হইলেন সকল ভূতের স্বরূপ।

অধিকরণ ৭ : বৈশ্বানর ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী অধিকরণে অদৃশ্যত্বের সাধারণ গুণ যাহা ব্রহ্ম এবং প্রধান উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু পরবর্তী শ্রুতিতে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণগুলি ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করে বলিয়া অদৃশ্যত্ব দ্বারাও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে— এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়াই বিরোধী পক্ষ এমন কতকগুলি শ্রুতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন এবং ইহা আলোচনা করিয়া শ্রুতিতে উক্ত বৈশ্বানর বলিতে সাধারণ অগ্নিকেই বুঝাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কারণ পরবর্তী শ্রুতিতে বৈশ্বানরকে 'যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা' বলিয়া বিনির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ।।১।২।২৪।।

বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর) সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ (যেহেতু ইহা সমজাতীয় শব্দ-সমূহের [বৈশ্বানর এবং আত্মা] বিশিষ্টতা জ্ঞাপক গুণ হিসাবে ব্যবহৃত)।

২৪. বৈশ্বানর (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ এক জাতীয় শব্দের বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিশেষণরূপে ব্যবহার (বৈশ্বানর এবং আত্মা)।

[২৪. বৈশ্বানর শব্দও পরমাত্মাবাচক, কারণ সাধারণ অর্থ ব্যতীত এখানে ইহার বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে।]

"কিন্তু কেহ যদি এই প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তবে তিনি সকল লোকে সকলের মধ্যে এবং সকল আত্মাতে অন্ন আহার

করেন;"... "দ্যুলোকই উক্ত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু"— ইত্যাদি (ছা: ৫.১৮.১-২)। এখন প্রশ্ন হইতেছে— এই বৈশ্বানর আত্মাটি কে? সাধারণ অর্থে বৈশ্বানর বলিতে অগ্নিকে বুঝায়, অগ্নিদেবতাকে বুঝায় এবং জঠর-অগ্নিকেও বুঝায়। 'আত্মা' বলিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায়। এই শ্রুতিতে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? এই শব্দ দুইটির সাধারণ অর্থ যাহাই হউক না কেন, সূত্রে এখানে পরমাত্মাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, কারণ ঐ শব্দগুলির বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণগুলি হইল: "বৈশ্বানর আত্মার মস্তক হইল দ্যুলোক, আদিত্য চক্ষু"— ইত্যাদি। এই বিশেষণগুলি একমাত্র পরমাত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহা ব্যতীত এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনার ফলের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে— সকল কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি এবং সর্ব পাপ হইতে মুক্তি (দ্রঃ ছাঃ ৫.২৪.৩)। যদি পরমাত্মারূপে ইহার অর্থ করা হয় তাহা হইলেই ইহা সত্য হইতে পারে। উপরন্ত এই অধ্যায়ের সূচনাই হইয়াছে এই জিজ্ঞাসা দ্বারা— "আমাদের আত্মা কে? কে এই ব্রহ্ম?"— এখানে ব্রহ্ম শব্দ প্রাথমিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে— সুতরাং এইরূপ মনে করাই সমীচীন যে, এই অধ্যায়ে ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা-ই বিশদভাবে হইয়াছে।

স্মর্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ।।১।২।২৫।।

স্মর্যমাণম্ (স্মৃতিতে বর্ণিত) অনুমানম্ (জ্ঞাপক চিহ্ন) স্যাৎ (অবশ্যই হইবে) ইতি (কারণ)।

২৫. কারণ সেই (পরব্রহ্মের বিশ্বরূপ) যাহার বর্ণনা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে তাহা অবশ্যই একটি সূচক চিহ্ন হইবে (যাহা হইতে আমরা এই আলোচ্য শ্রুতির অর্থ নির্ধারণে উপনীত হইতে পারিব)।

[২৫. স্মৃতি এই সকল রূপ পরব্রহ্মেরই বলিয়াছেন এবং স্মৃতি আপনার মূল শ্রুতির অর্থ অনুসরণ করায় বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে।]

স্মৃতিশাস্ত্র হইল শ্রুতি শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং যেখানে শ্রুতির অর্থবোধে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে স্মৃতি শাস্ত্রকে আলোচনা করিয়াই ঐ বিষয়ের উপর আলোক সম্পাৎ করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পরব্রহ্মের বিরাট বিশ্বরূপকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে: "যাঁহার মুখ অগ্নি, দ্যুলোক যাঁহার শীর্ষ ... ...দিকসমূহ যাঁহার কর্ণ— সেই বিশ্বরূপকে প্রণাম করি"। আলোচ্য শ্রুতির ব্রহ্ম সম্পর্কীয় বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আলোচ্য শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ, অসম্ভবাৎ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ।। ১।২।২৬ ।।

শব্দাদিভ্যঃ (শব্দ ও অন্যান্য কারণে) অন্তঃ (ভিতরে) প্রতিষ্ঠানাৎ (ইহার অবস্থানের জন্য) চ (এবং) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে) তথা (সেইরূপ) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (এইরূপ ধারণা করার জন্য উপদেশ থাকায়) অসংভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া) পুরুষম্ (পুরুষ রূপে) অপি (ও) এনম্ (তাঁহাকে) চ (এবং) অধীয়তে (বাজসনেয়ী শাখা বর্ণনা করেন)।

২৬. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (বৈশ্বানর ব্রহ্ম নহেন) কারণ ইঁহার 'জঠরাগ্নি' বলিয়া সুনির্দিষ্ট নাম আছে এবং অন্য কারণও আছে এবং ইহা উদরের অভ্যন্তরে থাকে বলিয়া ইহা (প্রকৃতপক্ষে জঠরাগ্নিই বটে) ; ইহার উত্তরে আমরা বলিব, না, এইরূপ হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মকে 'জঠরাগ্নি'-রূপে ধারণা করার উপদেশ শাস্ত্রে রহিয়াছে ; কারণ জঠরাগ্নির পক্ষে ইহা অসম্ভব (যে দ্যুলোক ইত্যাদি ইহার মস্তক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবে)। ইহার অন্য কারণও এই যে বাজসনেয়ী শাখার অনুগামিগণ তাঁহাকে (বৈশ্বানরকে) পুরুষ রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন (জঠরের অগ্নিরূপে নহে)।

[২৬. "বৈশ্বানর হইলেন জঠরাগ্নি, তাহাতে আহুতি দানের এবং তাঁহার দেহের অভ্যন্তরে অবস্থানের কথা থাকায় তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায় না", একথা ঠিক নহে। কারণ, এখানে জঠরাগ্নিরূপে পরমাত্মার ধ্যানের উপদেশ রহিয়াছে। স্বর্গ তাঁহার শির ; এবং শ্রুতিও তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরমাত্মা না হইলে তাঁহার পক্ষে এই সব উক্তি সম্ভব হইত না। অতএব বৈশ্বানর পরমাত্মাই।]

আপত্তি :— বৈশ্বানর শব্দের সাধারণ অর্থ হইল অগ্নি এবং শ্রুতিও বলেন যে, ইনি অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন— "মানুষের অভ্যন্তরস্থ বৈশ্বানরকে যিনি জানেন"— (শতঃ ব্রাঃ ১০.৬.১.১১)— এই শ্রুতিটি একমাত্র জঠরাগ্নি সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সুতরাং একমাত্র জঠরাগ্নিকেই শ্রুতি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মকে নহে।

এই সূত্রটি উপরি উক্ত আপত্তিকে খণ্ডন করে। প্রথমত শ্রুতি এখানে উপাসনার নির্দেশ দানের জন্যই জঠরাগ্নিতে ব্রহ্মের আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন, যেমন এইরূপ উপদেশ আছে (ছা : ৩.১৮.১-এ) "ব্রহ্মকে মনরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত জঠরাগ্নির পক্ষে স্বর্গশীর্ষাদি লক্ষণ থাকিতে পারে না। তৃতীয়ত বাজসনেয়ী শাখার অনুগামিগণ

বৈশ্বানরকে পুরুষ হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন, "এই বৈশ্বানর অগ্নি একজন পুরুষ"— ইত্যাদি (শতঃ ব্রাঃ ১০.৬.১.১১)। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সুতরাং পুরুষরূপেও তিনি কল্পিত হইতে পারেন।

অত এব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১। ২। ২৭॥

অতএব (এই কারণেই) ন (নহে) দেবতা (দেবতা) ভূতং (সৃষ্ট পদার্থ) চ (এবং)।

২৭. এই একই কারণে (বৈশ্বানর) দেবতা (অগ্নি) নহেন অথবা ভূতরূপ (অগ্নি)-ও নহেন।

[২৭. পূর্বোক্ত কারণে বৈশ্বানরকে অগ্নিদেবতা বা ভৌতিক অগ্নিও বলা যায় না।]

এই একই যুক্তিতে— পূর্বসূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই যুক্তি অনুসারে।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১। ২। ২৮॥

সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) অপি (ও) অবিরোধং (কোন বিরোধ নাই) জৈমিনিঃ (ঋষি এইরূপ বলেন)।

২৮. এমনকি (যদি বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎভাবেও (উপাসনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয়) তাহা হইলেও কোন বিরোধ হয় না— ইহা জৈমিনি ঋষির অভিমত।

[২৮. জৈমিনি বলেন, জঠরাগ্নিরূপে নহে, সাক্ষাৎভাবেই অগ্নিরূপে পরমাত্মার উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে বলিলেও কোন বিরোধ হয় না।]

পূর্বসূত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, জঠরাগ্নিরূপে ব্রহ্মের উপাসনা— একটা প্রতীক হিসাবে উপদেশ করা আছে। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, 'বৈশ্বানর' শব্দকে সাক্ষাৎভাবেই ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে— ধ্যেয় হিসাবে, কারণ এই 'বৈশ্বানর' হইলেন ঠিক সেই বৈশ্বানর যাহার অর্থ হইল ব্রহ্মাণ্ড পুরুষ— অর্থাৎ স্বয়ং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১। ২। ২৯॥

অভিব্যক্তেঃ (প্রকাশের জন্য) ইতি (এইরূপ) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্য ঋষি) (বলেন)।

২৯. প্রকাশিত হন বলিয়া (সসীম আকারেও তিনিই পরব্রহ্ম)— আশ্মরথ্য ঋষি এইরূপ বলেন।

[২৯. আশ্মরথ্য মুনি বলেন, পরমাত্মা অসীম হইলেও উপাসকদিগের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়াই বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হন।]

আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত বিস্তৃত বৈশ্বানরের বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যদিও পরমাত্মা সর্বব্যাপী তথাপি তিনি উপাসকদের প্রতি করুণায় স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত যে-কোন সসীম রূপেও প্রকট হইতে পারেন।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥১।২।৩০॥

অনুস্মৃতেঃ (অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিবার জন্য), বাদরিঃ (বাদরি মুনি) (এইরূপ বলেন)।

৩০. অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করিবার সুবিধার জন্যই (ব্রহ্মের রূপ কল্পনা)— বাদরি ঋষি বলেন।

[৩০. বাদরি মুনি বলেন ধ্যানের নিমিত্তই তাঁহাকে প্রাদেশ পরিমাণ বলা হইয়াছে।]

পরব্রহ্মকে 'প্রাদেশমাত্র'ও বলা যায় অন্য অর্থে; কারণ তাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায়, যেমন আমার হৃদয়ে অবস্থান করে— আর হৃদয়ের পরিমাপ হইল 'বিতস্তি' মাত্র।

সংপত্তেরিতি জৈমিনিঃ, তথা হি দর্শয়তি ॥১।২।৩১॥

সংপত্তেঃ (ধ্যানের বা কাল্পনিক একত্বের জন্য) ইতি (এইরূপ) জৈমিনিঃ (জৈমিনি বলেন), তথা হি (এইরূপই) দর্শয়তি (শ্রুতি) উপদেশ করিয়াছেন।

কাল্পনিক ঐক্য অনুভবের নিমিত্ত (পরব্রহ্মকে বিতস্তি মাত্র) বলা যাইতে পারে— জৈমিনি মুনি এইরূপ বলেন; কারণ (শ্রুতিতেও) এইরূপ উপদেশ আছে।

[৩১. জৈমিনি আরও বলেন, পরমাত্মার সহিত অভেদত্ব প্রতিপাদনের জন্য তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপ আছে দেখা যায়।]

সম্পদ্ উপাসনা হইল একপ্রকারের ধ্যান যেখানে সদৃশ কোন বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য হেতু একরূপতা কল্পনা করা হয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে যে, উপাসকের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া পরব্রহ্মের (পুরুষের)ও শীর্ষ দেশ হইতে চিবুক

পর্যন্ত নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কল্পনা করিয়া উপাসনা করা হয়। সাধকের শির হইল স্বর্গ, চক্ষুদ্বয় আদিত্য এবং চন্দ্র— এবং এইরূপে অন্যান্য অঙ্গাদি। এই উপাসনাতে পরমপুরুষকে মস্তক হইতে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃতমাত্র আকারে সীমাবদ্ধ করা হয়। এইজন্যই জৈমিনি বলিয়াছেন যে, আলোচ্য শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে বিতস্তিমাত্র আকারে পরিণত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ১।২।৩২ ॥

আমনন্তি (উপদেশ করেন) চ (অধিকন্তু) এনম্ (ইঁহাকে) অস্মিন্ (ইহার মধ্যে)।

৩২. অধিকন্তু (জাবাল মতানুসারী শাখা) উপদেশ করেন যে, এই (পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হইবে) ইহার মধ্যবর্তী স্থানে (মস্তক হইতে চিবুক [হনু] পর্যন্ত স্থানের মধ্যে)।

[৩২. পরমাত্মার প্রাদেশ-পরিমাণ স্থানে অবস্থানের কথা অন্যান্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে।]

জাবাল উপনিষদ্ ১ দ্রষ্টব্য।

২৭-৩২ সূত্রগুলি পরব্রহ্মকে 'প্রাদেশমাত্র' শব্দদ্বারা উল্লেখ করাকে সমর্থন করা হইয়াছে— "স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ব্যাপ্ত" অথবা 'বিতস্তি-পরিমিত'— এই শ্রুতিবচনের দৃষ্টান্তদ্বারা।

ব্রহ্ম-সূত্র

প্রথম অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

পূর্ববর্তী পাদে অস্পষ্টার্থক শ্রুতিগুলিকে ব্রহ্মবাচক বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে ব্রহ্মই যে সকল ভক্তিমূলক উপাসনার একমাত্র বস্তু— এই ধারণাটি বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। এই পাদে আরও কতকগুলি সন্দেহার্থক শ্রুতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আলোচনা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, এই সকল শ্রুতিও পরব্রহ্মের লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানকার এই বিশদ ব্যাখ্যায় ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় পদার্থ— এই বিষয়টির উপরই বেশি পরিমাণে নির্ভর করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১: স্বর্গ, পৃথিবী ইত্যাদির আয়তন ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী অধিকরণের শেষ অংশে উল্লিখিত 'বৈশ্বানর' শব্দটিকে, যাহা সাধারণ জঠরাগ্নিকে বুঝায়— তাহাকে ব্রহ্মার্থেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে— এবং ইহার কারণ এই যে— "ইঁহার মস্তক হইল স্বর্গ" এই শব্দ কয়টি আলোচিত শ্রুতির শেষে আছে। এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বিরুদ্ধপক্ষ আর একটি শ্রুতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়া আলোচনা মুখে প্রমাণ করিতে চান যে, এই শ্রুতির 'অমৃত' শব্দটির দ্বারা প্রধানকেই লক্ষ্য করা সমীচিন—ব্রহ্মকে নহে। ইহার যুক্তিতে বিপক্ষ বলেন যে, যেহেতু 'সেতু' শব্দটি শ্রুতিবচনের শেষে আছে। একটি সেতু পরপারের কিছুর সঙ্গে আমাদিগকে যুক্ত করে। এবং যেহেতু ব্রহ্মের পরে বা পারে কিছুই থাকিতে পারে না সেইজন্য 'সেতু' শব্দটি ব্রহ্মকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এবং সেইজন্যই 'অমৃত' শব্দটি ব্রহ্মকে না বুঝাইয়া প্রধানকেই বুঝায়।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্ব-শব্দাৎ ॥১।৩।১॥

দ্যু-ভূ-আদি-আয়তনং (স্বর্গ ও পৃথিবী ইত্যাদির আশ্রয়স্থল— [আধার]) স্ব-শব্দাৎ ('আত্মা' স্ব-শব্দ থাকার জন্য)।

১. স্বর্গ, পৃথিবী ইত্যাদির আশ্রয়স্থল (আয়তন) (হইলেন ব্রহ্ম) আত্মা এই শব্দটি থাকার জন্য (অথবা শ্রুতির যথার্থ শব্দগুলির জন্য যাহারা এই আয়তনের নামকরণ করিয়াছে)।

[১. স্বর্গলোক, পৃথিবী প্রভৃতির আধার বলিয়া শ্রুতি যাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্মবাচক 'আত্মা' শব্দ ঐ শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।]

"যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং ইন্দ্রিয়বর্গসহ অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে (তোমাদের ও সর্বপ্রাণীর) সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও; এবং অনন্তর অপর সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়।" (মুঃ ২.২.৫) যাঁহাকে আয়তন বলা হইল, যাঁহাতে পৃথিবী স্বর্গ প্রভৃতি গ্রথিত আছে, তিনি হইলেন ব্রহ্ম। কারণ 'আত্মা' এই শব্দটির উল্লেখ আছে এবং এই শব্দটি যদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের উল্লেখ থাকে তবে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝাইতে পারে, প্রধানকে অথবা সূত্রাত্মাকে বুঝায় না। অথবা আরও বহু শ্রুতি আছে যেখানে যথার্থভাবেই ব্রহ্মকেই আয়তন হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে— যথার্থ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় : "হে সৌম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়।" (ছাঃ ৬.৮.৪) ইহা ব্রহ্মকেও বুঝাইতে পারে কারণ এই আলোচ্য শ্রুতির পূর্বের এবং পরের শ্রুতিতেও অর্থাৎ মুঃ ২.১.১০ এবং ২.২.১১-তেও ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসাই সমীচীন যে, এই আলোচ্য-মধ্যবর্তী শ্রুতিতেও ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

উপরে আমরা যে-সকল শ্রুতির উল্লেখ করিলাম যেখানে একটি আয়তন, এবং সেই আয়তনে যিনি বাস করেন তাঁহার কথা হইতে এবং (মু: ২.২.১১) শ্রুতি "এই জগৎ এই শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ষ ব্রহ্মই"— ইত্যাদি হইতে আমরা যেন মনে না করি যে, ব্রহ্ম হইলেন বহু, বিচিত্রস্বভাব এবং একটি বৃক্ষের ন্যায় পত্র-শাখাদি বিশিষ্ট। এই ধারণা আমাদিগকে বহু-ঈশ্বরবাদের দিকে চালিত করিবে। অদ্বৈতবাদ ইহাকে সমর্থন করে না। সুতরাং এই জাতীয় সংশয় দূরীকরণের জন্য আলোচ্য শ্রুতি বলেন— "একমাত্র (তাঁহাকেই) আত্মাকেই জান", অর্থাৎ একমাত্র আত্মাকেই জান, ইঁহার মধ্যে যাহা আছে তাহাকে নয়— আত্মা ব্যতীত আর সব কিছুই মায়ার সৃষ্টি মাত্র, এইসবকে মিথ্যা জানিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥১।৩।২॥

মুক্ত-উপসৃপ্য (মুক্তপুরুষগণের দ্বারা প্রাপ্তব্য) ব্যপদেশাৎ (এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া)।

২. (শ্রুতিতে) এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া (যে) মুক্ত পুরুষগণ কর্তৃক তাহা প্রাপ্তব্য।

[২. "মুক্তপুরুষেরাও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন"— এইরূপ উপদেশ থাকায় স্বর্গ পৃথিব্যাদির আয়তনবিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্মই।]

এই আলোচ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহার পক্ষে অন্য আর একটি যুক্তি দেওয়া হইতেছে। ইহাই হইল মুক্তপুরুষগণের লক্ষ্য (মুঃ ২.২.৯, ৩.২.৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই লক্ষ্য হইতে পারেন একমাত্র ব্রহ্মই।

নানুমানম্, অতচ্ছব্দাৎ ॥১।৩।৩॥

ন (নহে) অনুমানম্ (অনুমানের সাহায্যে যাহাকে পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রধান) অতৎ-শব্দাৎ (এইরূপ অর্থবাচক কোন শব্দের উল্লেখ না থাকার জন্য)।

৩. (স্বর্গাদির আয়তন) অনুমানের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় (অর্থাৎ প্রধান) তাহা নহে, কারণ এইরূপ অর্থসূচক কোন শব্দ নাই।

[৩. সাংখ্যোক্ত অনুমানগম্য প্রধান ও স্বর্গ পৃথিব্যাদির আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ হইতে পারেন না। কারণ তদর্থবোধক কোন শব্দ ঐ শ্রুতিতে নাই।]

স্বর্গাদির আয়তনবিশিষ্ট বস্তু প্রধান হইতে পারেন না, কারণ শ্রুতিতে তদর্থবাচক কোন শব্দ নাই, কারণ আমরা ব্রহ্মবাচক 'আত্ম' শব্দই সেখানে পাই। অচেতন বস্তুজ্ঞাপক কোন শব্দই সেখানে নাই, বরং বিপরীতপক্ষে চৈতন্যদ্যোতক শব্দরাশিই শ্রুতিতে আছে: "যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ"— ইত্যাদি (মুঃ ১.১.৯)।

প্রাণভৃচ্চ ॥১।৩।৪॥

প্রাণভৃৎ (প্রাণী বা জীব) চ (এবং) (ন-নহে)।

৪. (অথবা) জীবও নহে।

[৪. জীব বুঝাইতে পারে এইরূপ কোন শব্দও ঐ শ্রুতিতে নাই।]

পূর্ববর্তী সূত্র হইতে 'ন' এই শব্দটি গ্রহণ করিতে হইবে।

জীব যদিও চৈতন্যময়সত্তা তথাপি জীবও 'আত্ম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। কারণ জীব সর্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন বা আধার হইতে পারে এইরূপ কল্পনা করাও সম্ভব নহে।

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৫॥

ভেদ-ব্যপদেশাৎ (কারণ, ভেদ [পার্থক্য] উল্লেখ করা হইয়াছে)।

৫. (এবং) যেহেতু ভেদের উল্লেখ আছে (জীব এবং স্বর্গাদির আয়তনের মধ্যে)।

[৫. জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এইরূপ ভেদের উপদেশ থাকাতেও জীব দ্যুলোকাদির আয়তন হইতে পারে না।]

আলোচ্য শ্রুতিতে আছে— "একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে"— ইহার দ্বারা মুক্তিকামী জীব এবং স্বর্গাদির আয়তনবিশিষ্ট-পুরুষ জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্যের মধ্যে ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

প্রকরণাৎ ॥১।৩।৬॥

৬. আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতে (জানা যায় ব্রহ্মই)।

[৬. এই প্রকরণ জীব সম্বন্ধে নহে, পরমাত্মা সম্বন্ধেই, সুতরাং, ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা নহে, ব্রহ্ম।]

উপনিষদের সূচনাতেই আছে— "কোন্ বস্তুটি সুবিদিত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়? (মু: ১.১.৩)। এবং ইহার পরিসমাপ্তি হইল এই শ্রুতিবচনের দ্বারা— "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান"— (মু: ৩.২.৯)। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, পূর্বাপর উপনিষদের বিষয়বস্তু হইলেন ব্রহ্ম-ই। সুতরাং সেই ব্রহ্মই স্বর্গাদির আয়তনবিশিষ্ট— ইত্যাদি শব্দের দ্বারাও উপদিষ্ট হইয়াছেন।

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥১।৩।৭॥

স্থিতি-অদনাভ্যাম্ (অনাসক্ত হইয়া অবস্থান এবং ভক্ষণ [উল্লেখ থাকার] জন্য) চ (এবং)।

৭. এবং (দুইটি অবস্থার উল্লেখের) জন্য, অনাসক্তভাবে অবস্থান এবং ভক্ষণ (যাহা হইল পরব্রহ্ম এবং জীবের যথাক্রমিক)।

[৭. একের উদাসীনভাবে অবস্থান এবং অন্যের কর্মফল ভোক্তৃত্ব, শ্রুতির এই বাক্য হইতেও জীব নহে, পরব্রহ্মই লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।]

"সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে (মুঃ ৩.১.১)। এখানে ব্রহ্মকে দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে এবং জীবাত্মাকে শুভাশুভ কর্মের ফলভোক্তা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভোক্তৃত্বের জন্যই জীব

ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। দুইটির মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শনকারী এই বর্ণনা তখনই যথার্থ মনে হইবে যখন স্বর্গাদি আয়তনবিশিষ্ট পুরুষকে ব্রহ্ম হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। তাহা না হইলে এই প্রকরণের আলোচনার আর ধারাবাহিকতা থাকে না। এই শ্রুতি যে, শুধু জীবাত্মার স্বরূপের বর্ণনার জন্যই উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নহে— কারণ শ্রুতির কোথাও জীবাত্মার বর্ণনার উদ্দেশ্য দৃষ্ট হয় না। যেহেতু কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি হিসাবে জীবের পরিচয় সকলেরই জানা আছে। শ্রুতির সর্বদাই উদ্দেশ্য হইল সাধারণের কাছে জ্ঞাত নহেন এইরূপ ব্রহ্মের বর্ণনা করা এবং ব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠা করা।

অধিকরণ ২ : ভূমা ব্রহ্মই।

পূর্ব পাদে স্বর্গাদি আয়তন ইত্যাদিকে ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কারণ শ্রুতিতে আত্মা— এই শব্দটি ছিল। এখন এখানে বিরুদ্ধপক্ষ একটি শ্রুতির দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিবেন যেখানে এই যুক্তি অনুসারে 'আত্মা' শব্দটি আছে কিন্তু ইহা প্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে— ব্রহ্ম অর্থে নহে। এই প্রসঙ্গে ছাঃ ৭.২৩ এবং ২৪ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী এই সূত্রটি প্রমাণ করে যে এখানেও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, প্রাণকে নহে।

ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১।৩।৮॥

ভূমা (ভূমা) সংপ্রসাদাৎ-অধি (সুষুপ্তির [এখানে প্রাণের] পারে, অতিক্রান্ত স্থলে) উপদেশাৎ (এইরূপ উপদেশ আছে বলিয়া)।

৮. ভূমা (ব্রহ্মই) কারণ ইহাকে সুষুপ্তির পরপারে বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে (ইহা প্রাণেরও পারে যে প্রাণ সুষুপ্তিকালেও সক্রিয় থাকে)।

[৮. ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে—ব্রহ্ম। কারণ শ্রুতি প্রাণের উপরে এই ভূমার স্থিতি উপদেশ করিয়াছেন।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে সনৎকুমার নারদকে কিছু জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি 'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যের উপদেশ দিয়া পরিশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য ভূমা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।... "ভূমাই (অনন্ত) সুখ... ভূমাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে... যাঁহাতে কেহ অপর কিছু দেখে না, অপর কিছু শোনে না, অপর কিছু জানে না— তিনিই ভূমা।" (ছাঃ ৭.২৩ এবং ৭.২৪) এখন প্রশ্ন হইতেছে— এই ভূমা বলিতে কাহাকে বুঝায়? বিরুদ্ধবাদীরা

বলেন— ইহা হইল প্রাণ। তাহাদের যুক্তি হইল এই: সনৎকুমার নারদকে নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত সকল জ্ঞানের উপদেশ প্রদানের পর নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞাতব্য কিছু আছে কি?" ইহার উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন, 'হ্যাঁ, আছে।'— ইহা বলিয়া তিনি আরও উচ্চতর সত্যের প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রাণের সম্পর্কে উপদেশ লাভের পর নারদ তাঁহাকে ইহার পরেও উচ্চতর কোন সত্য আছে কি না এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করেন নাই। নারদের কোন জিজ্ঞাসা ইহার পর না থাকিলেও সনৎকুমার তাঁহাকে ভূমা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এই ভূমা পূর্ব উপদিষ্ট প্রাণ হইতে ভিন্ন নহেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রাণের জ্ঞাতাকে অতিবাদী (যিনি পূর্ব উক্তিকে অতিক্রম করিয়া উক্তি করেন) বলিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাণই গরিষ্ঠ সত্য। ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই তিনি আরও বিশ্লেষণ করিয়া ভূমাকেই সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

এই সূত্রটি উক্ত যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছে এবং ব্যাখ্যা করিয়াছে যে ভূমাই ব্রহ্ম। কারণ যদিও সূত্রটিতে প্রাণের জ্ঞাতাকে অতিবাদী বলা হইয়াছে তথাপি ইহাও বলা হইয়াছে যে, "যিনি এইরূপ সত্যকে আশ্রয় করিয়া অতিবাদী হন, তিনিই কিন্তু প্রকৃত অতিবাদী" (ছাঃ ৭.১৬.১)। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই শ্রুতি প্রাণ অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্যের কথাই বলিয়াছেন, যাঁহাকে জানিলে ইহার জ্ঞাতা যথার্থ অতিবাদী হন। এইভাবে একটি নূতন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা হইল বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়— বিষয়টি হইল গরিষ্ঠ সত্য ব্রহ্ম সম্পর্কে, যদিও নারদের কোন জিজ্ঞাসা ছিল না প্রাণের পর আর কোন উচ্চতর সত্য আছে কি না। সনৎকুমার, নারদের সত্যকে জানিয়া অতিবাদী হইবার বাসনা আছে বুঝিয়া তাঁহাকে এইবার ধাপে ধাপে ভূমার সত্যে লইয়া চলিলেন এবং বুঝাইলেন যে, এই ভূমাই ব্রহ্ম। অধিকন্তু যদি প্রাণই ভূমা হইতেন তাহা হইলে, এই সূত্র বলিতেছেন যে, শ্রুতি এই বিষয়ে কোন উপদেশ দিতেন না, কিন্তু উপরে দেখানো হইয়াছে ছাঃ ৭.২৪.১ এই সম্পর্কে উপদেশ করিয়াছেন— এবং ইহার পূর্বেও ১৫(পঞ্চদশ) খণ্ডে এই সম্পর্কে উপদেশ আছে।

ধর্মোপপত্তেশ্চ ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥

ধর্ম-উপপত্তেঃ (কারণ ধর্ম [লক্ষণ] গুলি যথার্থ-ই) চ (এবং)।

৯. এবং যেহেতু গুণগুলি (শাস্ত্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে) যথাপ্রযুক্ত (ব্রহ্ম সম্পর্কেই মাত্র) হইয়াছে।

[৯. ভূমার যে-সকল গুণ ও ধর্ম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমাত্মাতেই সম্ভব, তাই ভূমা অর্থ এখানে পরমাত্মা-ই।]

যে সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহা হইল: সত্য, স্বমহিমা-প্রতিষ্ঠ, অদ্বৈত, আনন্দ, সর্বব্যাপিত্ব, অমৃতত্ব— ইত্যাদি; আলোচ্য শ্রুতিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। এই সকল গুণ একমাত্র ব্রহ্মের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে— প্রাণের পক্ষে নহে। প্রাণ হইল একটি কার্য মাত্র এবং সেইজন্যই এই সকল গুণের কোনটিই ইহাতে থাকিতে পারে না। উপরন্তু এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে "আত্মবিদ্ দুঃখকে অতিক্রম করেন"— এই বাক্যের দ্বারা। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, আত্মা বা ব্রহ্মই হইলেন একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। সেইজন্যই পরবর্তী শ্রুতিসমূহে এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অধিকরণ ৩: অক্ষর ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী পাদে যেহেতু 'সত্য' শব্দটিকে সাধারণত ব্রহ্ম বাচকরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে— সেইজন্য ভূমাকেও ব্রহ্মরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে চান যে, 'অক্ষর' শব্দটি-র অর্থও শ্রুতি বর্ণিত 'ওম্'-এর বাচক হউক। এবং ইহাই এই অংশে আলোচিত হইবে, কারণ সাধারণ অর্থে অক্ষর বলিতে বুঝায় শব্দ বা শব্দাংশ।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১।৩।১০॥

অক্ষরম্ (অক্ষর) অম্বর-অন্ত-ধৃতেঃ (যেহেতু) ইহা আকাশ (মহাব্যোম) পর্যন্ত সকল কিছুকেই ধারণ করিয়া আছে।

১০. অক্ষর (যিনি ক্ষয়রহিত) (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ ইহা ধারণ করিয়া আছে (সব কিছু) আকাশ (মহাব্যোম) পর্যন্ত।

[১০. অক্ষর অর্থ ব্রহ্ম, কারণ আকাশ পর্যন্ত সমস্ত পদার্থকেই তিনি ধারণ করিয়া আছেন— শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে।]

"হে গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন", ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৮.৮)। এখানে প্রশ্ন হইল, 'অক্ষর' কি 'ওম্'-শব্দাংশ অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? সন্দেহের কারণ এই যে, 'অক্ষর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল শব্দাংশ এবং সেইজন্য সাধারণ অর্থে ইহা 'ওম্' যাহা এই শব্দাংশকে বুঝাইয়া থাকে; আবার ধ্যানের একটি

প্রতীকও বটে। কিন্তু সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এখানে অক্ষর বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ শ্রুতিতে আছে, "গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে" (বৃঃ ৩.৮.১১)। সবকিছুকে, এমনকি আকাশকেও ধারণ করিয়া অবস্থান করার গুণটি— যে আকাশ সৃষ্টির ক্রমে আদিতম সত্তা, একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই সত্য হইতে পারে। পুনশ্চ "ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ"-ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৮.৮) হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইঁহাতে কোন আপেক্ষিক গুণ নাই। সুতরাং 'অক্ষর' হইলেন ব্রহ্মই।

সা চ প্রশাসনাৎ ॥১।৩।১১॥

সা (এই ধারণক্ষমতা [ধৃতি]) চ (এবং) প্রশাসনাৎ (শাসন করার ক্ষমতা হইতে)।

১১. শাসন করা হেতু (অক্ষরের প্রতি আরোপিত গুণ) এই (ধারণ ক্ষমতা) (শুধুমাত্র পরব্রহ্মেরই কৃতি হইতে পারে— প্রধানের নহে)।

[১১. শ্রুতিতে শাসনপূর্বক ধারণ করার কথা থাকায়, অক্ষর অর্থে পরমাত্মাকেই বুঝায়, অন্য কিছু নহে।]

"হে গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছেন"— (বৃঃ ৩.৮.৯)। এই আদেশ বা শাসন করার ক্ষমতা অচেতন প্রধানের কার্য হইতে পারে না। সুতরাং যে-অক্ষর আকাশ পর্যন্ত সব কিছুকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন— তিনি প্রধান হইতে পারেন না।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১।৩।১২॥

অন্য-ভাব-ব্যাবৃত্তেঃ (কারণ, ব্রহ্মের গুণ ব্যতীত অন্য কাহারও গুণগুলিকে অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া) চ (এবং)।

১২. এবং যেহেতু ব্রহ্মের গুণ ব্যতীত অন্য সকলের গুণ (শ্রুতির দ্বারা) অস্বীকৃত হইয়াছে।

[১২. অক্ষর হইতে পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ— শ্রুতিতে এইরূপ কোন উপদেশ না থাকায় অক্ষর অর্থে জীব বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না।]

এই আলোচ্য শ্রুতিতে অন্য যে-সকল গুণের উল্লেখ আছে, যথা— দর্শন, শ্রবণ, বেদন, মনন ইত্যাদি (বৃ: ৩.৮.১১) তাহাদের সব কয়টিই একটি চৈতন্যময়

সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া এবং সেইজন্যই প্রধান প্রভৃতি অচেতনকে অস্বীকার করে। ইহা জীবও হইতে পারে না— কারণ অক্ষরকে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে জীব সেইরূপ সসীম গুণযুক্ত নহে।

অধিকরণ ৪ : সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যেয় পুরুষ হইলেন পরব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী আলোচিত অংশে 'অক্ষর' শব্দটিকে — যাহার সাধারণ অর্থ হইল শব্দ বা শব্দাংশ, ব্রহ্ম অর্থেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কারণ ইঁহার সবকিছুকে ধারণ করিয়া অবস্থান করার ক্ষমতা আছে এবং ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবলম্বন করিয়া — অর্থাৎ যাঁহার ধ্বংস বা পরিবর্তন নাই— তিনিই হইলেন 'অক্ষর' অর্থাৎ ব্রহ্ম — এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছিল। ঠিক অনুরূপভাবেই পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ের শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ বলিতে চাহেন যে, ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিতে আমরা অপর ব্রহ্মকে অথবা আপেক্ষিকভাবে উচ্চতর বলিয়া কথিত হিরণ্যগর্ভকেই গ্রহণ করিব, কিন্তু উচ্চতর (পর) ব্রহ্মকে নহে।

ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১।৩।১৩॥

ঈক্ষতি-কর্ম (দর্শনের বিষয়) ব্যপদেশাৎ (কারণ তাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া) সঃ (তিনি)।

১৩. কারণ যেহেতু তাঁহাকে দর্শন (কার্যের) বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সেইজন্য, তিনি (যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে— ব্রহ্মই)।

[১৩. ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার কর্মরূপে যে ধ্যেয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কার্য ব্রহ্ম নহেন, তিনি পরব্রহ্ম।]

"যে ব্যক্তি কিন্তু অ, উ এবং ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষররূপ প্রতীকে পরম পুরুষকে ধ্যান করেন" ইত্যাদি (প্র: ৫.৫)। এখানে একটি সন্দেহ উদয় হয় যে, এখানে পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম কাঁহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে?— কারণ ৫.২ শ্রুতিতে উভয়ের কথাই আছে, আবার একথাও বলা আছে যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পরমপুরুষের উপাসনার ফলস্বরূপই হইয়া থাকে। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেন পরব্রহ্মই, এবং হিরণ্যগর্ভ নহেন। অপর ব্রহ্ম কেন নহেন? কারণ এই অনুচ্ছেদটি এইভাবে সমাপ্ত হইয়াছে— "তিনি পরমপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন"— ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সাধক সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে উপলব্ধি করেন অথবা কার্যত

তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যান। ইহা শুধুমাত্র কল্পনা নহে, ইহা একটি বাস্তব অনুভব। কেন না আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা উপলব্ধি করি যে, দর্শন কার্যের বিষয়টি একটি বাস্তব সত্তা। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ হইলেন একটি কল্পিত সত্তা— যেহেতু ইহা অজ্ঞানের সৃষ্টি। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝায়; পরব্রহ্ম একটি বাস্তব সত্তা এবং এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে পরব্রহ্মকেই ধ্যানের অবলম্বন করার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে— কারণ একের বস্তুকে ধ্যান করিয়া অপরের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকে পরম পুরুষের উপাসনার অকিঞ্চিৎকর ফল বলিয়া মনে করা সমীচিন নয়, কারণ ইহা ক্রমমুক্তির একটা সোপান। প্রথমে উপাসক এই লোক প্রাপ্ত হইয়া পরে পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

অধিকরণ ৫ : ক্ষুদ্রাকাশ বা দহর-ও ব্রহ্ম-ই।

পূর্ববর্তী আলোচিত অংশে 'সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ' এই নামটি সাধারণ অর্থে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ব্যাখ্যার পরও সেই অর্থেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এখন বিরোধী পক্ষ এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী সূত্রে আলোচ্য শ্রুতিতে উল্লিখিত 'আকাশ' শব্দটিকে আকাশ অর্থেই গ্রহণ করিয়া আলোচনার পর বলিতে চাহেন যে, শ্রুতির 'আকাশ' বলিতে সাধারণ অর্থে গৃহীত আকাশ (ব্যোম)-কেই বুঝাইবে।

দহর উত্তরেভ্যঃ ।।১।৩।১৪।।

দহরঃ (ক্ষুদ্র) উত্তরেভ্যঃ (কারণ পরবর্তী শ্রুতিতে আছে)।

১৪. ক্ষুদ্র (আকাশ— দহর) (ব্রহ্মই), কারণ পরবর্তী শ্রুতিগুলিতে (এই অর্থেই বহুলভাবে ব্যবহৃত)।

[১৪. ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দহরাকাশের কথা আছে, তাহা ব্রহ্মই— কারণ পরবর্তী শ্রুতিতে এইরূপই উপদেশ করা হইয়াছে।]

"অনন্তর ব্রহ্মনগর স্থানীয় এই শরীরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ প্রাসাদ আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম আছেন। সেই হৃদয়পদ্মে যে অন্তরাকাশ, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে" (ছা: ৮.১.১)। এখানে 'ক্ষুদ্র আকাশ' (দহর) ব্রহ্মই, ইহার অর্থ আকাশ (ব্যোম)—

নহে— যদিও সাধারণ অর্থে ইহা ব্যোমকেই বুঝায়; ইহা জীব বা জীবাত্মাও হইতে পারে না, যদিও ক্ষুদ্র এই বিশেষণটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সসীম কিছু হইবে। কেন?— কারণ আলোচ্য শ্রুতির শেষ অংশেই ব্রহ্মের গুণগুলির উল্লেখ আছে, "এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ" (ছা: ৮.১.৩)।— ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে 'দহরাকাশ' ক্ষুদ্র নহে। উপরন্ত আকাশের তুলনা আকাশেরই সঙ্গে হয় না, তেমনি ক্ষুদ্র সসীম জীবকে সর্বব্যাপী আকাশের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সেইজন্যই এই উভয়কেই বর্জন করিতে হইবে। ইহার পরেই আমরা ব্রহ্মের লক্ষণগুলি পাই, "দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয়ই ইহার মধ্যে সংস্থাপিত" (তদেব, ৮.১.৩)।— ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই আকাশ সমগ্র সৃষ্টিরই আধার। "ইনিই আত্মা এবং ইনি পাপশূন্য, জরাহীন" (তদেব, ৮.১.৫)— এই সবগুলিই স্পষ্টত পরব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য।

গতিশব্দাভ্যাং, তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১।৩।১৫॥

গতিশব্দাভ্যাম্ (যাওয়া এবং শব্দ হইতে) তথা হি (সেইরূপে) দৃষ্টং (দেখিতে পাওয়া যায়) লিঙ্গম্ (বুঝিবার পক্ষে লক্ষণ) চ (এবং)।

১৫. ক্ষুদ্র আকাশ (ব্রহ্ম-ই), কারণ গমন করা (ব্রহ্মে মিলিত হওয়া) এবং শব্দটির জন্য (ব্রহ্মলোক এই শব্দটি থাকার জন্য); ইহা (জীবের ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া) সম্ভাব্যরূপেই দৃষ্ট হয় (অন্যান্য শ্রুতিগ্রন্থে); এবং (প্রাত্যহিক গতি) হইল বুঝিবার পক্ষে একটি পরিচায়ক লক্ষণ (যাহার দ্বারা আমরা ব্রহ্মলোক এই শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে পারি)।

[১৫. দহরই জীবের গম্য ও ব্রহ্মলোক বলিয়াও শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ থাকায় এবং অন্যত্রও জীবের প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমনের কথা থাকা হেতু ঐ দহর যে পরব্রহ্ম-ই তাহা প্রতিপন্ন হয়।]

এই সূত্রটি আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহ যুক্তি দেখাইতেছে যে, 'ক্ষুদ্র আকাশ' বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। "জীবগণ প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) এই ব্রহ্মরূপ লোকে গমন করিয়াও তাঁহাকে লাভ করে না;" ইত্যাদি (ছা: ৮.৩.২)। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সুষুপ্তিকালে প্রতিদিনই সকল জীব 'ক্ষুদ্র আকাশে' গমন করে। এখানে 'ক্ষুদ্র আকাশ'-কেই ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে (ব্রহ্মলোক = ব্রহ্মের অধিষ্ঠান), এইরূপেই প্রমাণ করা হয় যে, 'ক্ষুদ্র আকাশ'— ব্রহ্ম-ই। অন্য শ্রুতিতেও আমরা দেখিতে

পাই যে, জীব প্রতিদিনই সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে প্রবেশ করে, "তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন" (তদেব, ৬.৮.১)। 'ব্রহ্মলোক'— এই শব্দটিকে স্বয়ং ব্রহ্ম-রূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ব্রহ্মার লোক বা আবাস হিসাবে নহে। কারণ, ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে লক্ষণগুলি উক্ত হইয়াছে— যেখানে বলা হইয়াছে যে, জীব প্রতিদিনই তাহার 'লোকে' গমন করিয়া থাকে; যেহেতু প্রতিদিনই ব্রহ্মার লোকে যাওয়া সম্ভব নহে।

ধৃতেশ্চ, মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ॥১।৩।১৬॥

ধৃতেঃ (ধারণ করেন বলিয়া) (আকাশ জগৎকে ধারণ করেন) চ (অধিকন্তু) অস্য মহিম্নঃ (এই মহিমার) অস্মিন্ (ব্রহ্মের মধ্যে) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

১৬. অধিকন্তু ধারণ করেন বলিয়া (জগৎকে ক্ষুদ্র আকাশ ধারণ করেন বলিয়া— ইনি ব্রহ্মই) কারণ এই মহিমা ইঁহাতে দৃষ্ট হয় (অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের এইরূপ মহিমা বর্ণিত আছে)।

[১৬. পরব্রহ্মের জগৎ ধারণরূপ কার্যের মহিমার কথা প্রসিদ্ধ আছে। এখানে দহরাকাশে জগৎ-ধারণরূপ কার্যের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশ যে পরব্রহ্ম তাহাই বুঝা যায়।]

"যিনি আত্মা, তিনি (যেন) সেতু স্বরূপ (অর্থাৎ বাঁধ)— এই সকল লোক যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, এইজন্য ইনি ইহাদের ধরিয়া রাখিয়াছেন" (ছা: ৮.৪.১)। এই শ্রুতিতে 'ক্ষুদ্র আকাশের' মহিমা বুঝিতে পারা যায় যে, মহিমার দ্বারা তিনি বিচ্ছিন্ন জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। অন্য শ্রুতি হইতেও ইহা সন্দেহাতীত ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে (বিশ্বকে) ধারণ করার এই মহিমা একমাত্র ব্রহ্মেরই আছে। "এই অক্ষরেরই প্রশাসনে হে গার্গি, সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছেন"— (বৃ: ৩.৮.৯)। দ্রষ্টব্য— তদেব, ৪.৪.২২।

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১।৩।১৭॥

প্রসিদ্ধেঃ (যেহেতু ইহার [অর্থ] বিশেষভাবেই জানা) চ (এবং)।

১৭. এবং যেহেতু ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ জানা আছে (আকাশ ব্রহ্ম বলিয়া, 'ক্ষুদ্র আকাশ'ও ব্রহ্মই)।

[১৭. 'আকাশ' শব্দের পরব্রহ্ম অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। অতএব দহরাকাশও পরব্রহ্মই।]

"যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন"— (ছা: ৮.১৪.১), "এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়" (তদেব ১.৯.১)।— এই সকল শ্রুতিতে 'আকাশ' ব্রহ্ম অর্থেই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, ন, অসম্ভবাৎ ॥১।৩।১৮॥

ইতর-পরামর্শাৎ (যেহেতু অন্যটিরও [জীবেরও] উল্লেখ আছে) সঃ (তিনি— জীবাত্মা) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়) ন (না) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব)।

১৮. যেহেতু অন্যটির (জীবের— পরিপূরক শ্রুতিতে) উল্লেখ আছে ইহাই যদি বলা হয় যে তিনি (জীবাত্মা) (এবং 'ক্ষুদ্র আকাশ' বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায় না)— (ইহার উত্তরে আমরা বলিব)— না, (এইরূপ অনুমান) অসম্ভব (বলিয়া তাহা হইতে পারে না)।

[১৮. বাক্যের শেষে ব্রহ্ম শব্দের যেমন উল্লেখ আছে, তেমনিই জীব শব্দেরও উল্লেখ আছে। কাজেই 'দহরাকাশ' জীবও তো হইতে পারে? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ যে-সকল ধর্মের উল্লেখ আছে তাহা জীবের ধর্ম নহে, পরমাত্মারই ধর্ম।]

অথ য এষ... "আবার এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন"— ইত্যাদি (ছা: ৮.৩.৪)। যেহেতু পরিপূরক এই শ্রুতিতে জীবাত্মাকে উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে সেইজন্য কেহ বলিতে পারে যে. (ছা: ৮.১.১) এ উক্ত 'দহরাকাশ'ও জীব। ইহা হইতে পারে না; কারণ যাবান্ বা ... (ছা: ৮.১.৩) শ্রুতিতে 'দহরাকাশ' এবং আকাশের মধ্যে একটা তুলনা করা হইয়াছে। যদি দহরাকাশ বলিতে জীবকে বুঝানো হয় তাহা হইলে এখানে তুলনা চলে না, কারণ জীবাত্মার মতো সীমাবদ্ধ বস্তুর সঙ্গে সর্বব্যাপী আকাশের তুলনা হয় না। আলোচ্য শ্রুতির 'পাপ মুক্ত'— ইত্যাদি ধর্ম যাহা আকাশে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা জীবাত্মার ক্ষেত্রে সত্য নয়। সুতরাং ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

উত্তরাচ্চেৎ, আবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥১।৩।১৯॥

উত্তরাৎ (পরবর্তী শ্রুতি হইতে এই অধ্যায়ের) চেৎ (যদি) আবির্ভূত-স্বরূপঃ (নিজের স্বভাব প্রকৃতভাবে প্রকট অবস্থায়) তু (কিন্তু)।

১৯. যদি (এইরূপ বলা হয় যে) পরবর্তী শ্রুতি হইতে (যেখানে দহরাকাশ রূপে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে) (আমরা বলিব) কিন্তু (জীব সম্পর্কে সেখানে উল্লেখ এইভাবে হইয়াছে যে ইহা তাহার) যথার্থ স্বভাব (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হিসাবেই) প্রকটিত হইয়াছে।

[১৯. পরবর্তী বাক্য হইতে যদি দহর অর্থ জীব বলা হয়, তাহা হইলে তাহা ঠিক হইবে না। সর্বপাপমুক্ত ইত্যাদি গুণ জীবে স্বাভাবিক নহে। স্বরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জীবের ঐ-সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।]

দহরাকাশ বলিতে জীবাত্মাকে-ই বুঝায় ইহা সমর্থন করিবার জন্য আর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ ৮ম অধ্যায়ের ৭-১১ খণ্ডে জীবাত্মার নানা অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। ৭ম খণ্ডের আরম্ভে আছে—য আত্মা... "যে আত্মা নিষ্পাপ ... তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত"— ইত্যাদি। ইহার পরেই আমরা পাই— "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, (জীবাত্মা) ইনিই আত্মা" (য এষ... ছা: ৮.৭.৪); "এই যিনি স্বপ্নে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা"(য এষ... ছা: ৮.১০.১); "যিনি এতাদৃশ নিদ্রায় মগ্ন হন যে, সমস্ত ও সম্প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নদর্শন হইতেও বিরত হন তিনিই আত্মা" (তদ যত্রৈতৎ... ছা: ৮.১১.১)। এবং আত্মার এই বর্ণনার প্রত্যেকটিতেই ইঁহার গুণ হিসাবে আমরা "অমৃত এবং অভয়" এই শব্দগুলি পাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ইনি অপাপবিদ্ধ। এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে পরব্রহ্মকে নহে; কারণ পরব্রহ্ম জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইতে মুক্ত; এবং ইঁহাকে পাপবিমুক্তও বলা হয়। সুতরাং দহরাকাশ যাঁহাকে পূর্ববর্তী খণ্ডে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি জীবাত্মাই পরব্রহ্ম নহেন।

এই সূত্রটিতে উপরিউক্ত বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে সেখানে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপে— ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হিসাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শুধুমাত্র জীব হিসাবে নহে। "পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। তিনিই উত্তম পুরুষ" (পরং জ্যোতি... ছা: ৮.১২.৩)। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হিসাবেই জীব অপাপবিদ্ধ ইত্যাদি হন, শুধুমাত্র জীব হিসাবে নহেন।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥১।৩।২০॥

অন্যার্থঃ (অন্য একটি উদ্দেশ্যে) চ (এবং) পরামর্শঃ (উল্লেখ করা হইয়াছে)।

২০. এবং (জীবাত্মার) উল্লেখ অন্য উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

[২০. জীবের স্বরূপ আবির্ভাবের মূল যে পরমাত্মা তাহা বুঝাইবার জন্যই জীব শব্দ ঐ স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে।]

জীবাত্মার তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে জীবাত্মার জীবত্ব স্বভাব বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু পরিণামে ব্রহ্ম হইতে জীবের অভিন্নত্বরূপ, যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করার জন্যই।

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥১।৩।২১॥

অল্পশ্রুতেঃ (শ্রুতি ইহার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ করার জন্য) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়?) তৎ (তাহা) উক্তম্ (পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

২১. যদি এইরূপ বলা হয় যে, যেহেতু শ্রুতি ইহার সসীমত্ব বর্ণনা করিয়াছেন (এই আকাশের, সুতরাং ইহা সর্বব্যাপী ব্রহ্মের জ্ঞাপক হইতে পারে না); (তাহার উত্তরে আমরা বলিব)— তাহা তো পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (কেবলমাত্র ভক্তিমূলক উপাসনার জন্যই— ১.২.৭ দ্রষ্টব্য)।

[২১. দহর শব্দের অর্থ অল্প, সূক্ষ্ম;— সুতরাং বিভু পরমাত্মা ইহার বাচ্য হইতে পারেন না, যদি এইরূপ বলা হয়— তবে ইহার উত্তরে আমরা বলিব, ইহার উত্তর তো পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।]

অধিকরণ ৬ : যাঁহার জ্যোতিতে সব কিছু জ্যোতির্ময় তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ববর্তী আলোচিত অংশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে (ছা: ৮.১২.৩) 'পরমজ্যোতি' সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এখন এই আলোচ্য অংশটির অবতারণা করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, যেখানে যেখানে শ্রুতিতে 'জ্যোতি' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্যোতিই যে ব্রহ্ম তাহা প্রমাণ করার জন্যই এখানে আরও কিছু শ্রুতির আলোচনা করা হইতেছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ১।৩।২২॥

অনুকৃতেঃ (অনুকরণ করার জন্য) তস্য (ইঁহার, ব্রহ্মের) চ (এবং)।

২২. অনুকরণ করার জন্য (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে জ্যোতির্ময় হইবার জন্য) (যাঁহার জ্যোতিতে সব কিছু জ্যোতির্ময়) এবং (যেহেতু) ইঁহার (জ্যোতিতে সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়)।

[২২. জীব তাঁহার অনুসরণ করে মাত্র। অতএব জীব সেই নিত্য আবির্ভূতস্বরূপ দহর হইতে পারে না।]

"সূর্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না চন্দ্রও ...... তিনি দেদীপ্যমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ দীপ্তিমান হয়" (মু: ২.২.১০)— এখানে 'তিনি' বলিতে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে, সূর্য এবং চন্দ্রের পশ্চাতে অন্য কোন ভৌত জ্যোতির্ময় পদার্থকে নহে। একটি জ্যোতি অপর একটি জ্যোতিকে প্রজ্বলিত করিয়াছে এইরূপ কল্পনা অবাস্তব। পরন্তু আমরা সূর্যের পশ্চাতে এমন কোন ভৌত জ্যোতির অস্তিত্বের কথাও জানি না যাহা ইহাকে জ্যোতির্ময় করিতে পারে। "তিনি দেদীপ্যমান হইলেই অপর সকলে দীপ্তিমান হয়"— এই উক্তি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, ইনি সর্বপ্রথম দীপ্তিমান বিজ্ঞানময় সত্তা। "ইঁহার দীপ্তিতেই সকল কিছু দীপ্তিমান"— ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই জ্যোতি বিজ্ঞানময়, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই জ্যোতি যাহা জ্যোতির্ময় বা জ্যোতিঃবিহীন সকল কিছুকেই দীপ্তিময় করে। ব্রহ্ম যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহা আমরা এই জাতীয় শ্রুতি হইতেও বুঝিতে পারি, "তিনি হইলেন জ্যোতিরও জ্যোতিঃ"।

অপি চ স্মর্যতে ॥১।৩।২৩॥

অপি চ (অধিকন্তু) স্মর্যতে (স্মৃতি শাস্ত্রেও কথিত আছে)।

২৩. উপরন্তু স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা আছে যে (ইনি হইলেন ব্রহ্মাণ্ড-জ্যোতিঃ)।

[২৩. স্মৃতিশাস্ত্রেও ঐরূপ উক্তি আছে।]

"যাঁহাকে সূর্য প্রকাশিত করিতে পারে না"— ইত্যাদি (গীতা ১৫.৬) এবং "সূর্য চন্দ্র এবং অগ্নিতে যে যে তেজ অবস্থিত, যাহা নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে" (গী: ১৫.১২)।

অধিকরণ ৭ : 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'ই ব্রহ্ম।

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥১।৩।২৪॥

শব্দাৎ (শব্দ হইতে) এব (ইহাই) প্রমিতঃ (পরিমিত)।

২৪. শব্দটি হইতেই ('পুরুষ' শব্দটি যে শব্দদ্বারা ব্রহ্মকে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে (সেই সত্তাকে) পরিমিত করা হইয়াছে ('অঙ্গুষ্ঠমাত্র'-ই হইলেন ব্রহ্ম)।

[২৪.শ্রুতিশাস্ত্রের শব্দ হইতেই জানা যায় যে, তিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র'-পরিমিত পুরুষ।]

"যিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষরূপে শরীর মধ্যে অবস্থিত তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এইরূপ দর্শন হইলে লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। তিনিই সেই আত্মা।" (কঠ: ২.১.১২) এখানে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে তিনি ব্রহ্মই, কারণ তাঁহাকে ঈশান অথবা অতীত এবং ভবিষ্যতের নিয়ন্তা শাসকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি জীব হইতে পারেন না— যদিও ইঁহার আকারের সসীমতা এবং দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ হইতে মনে হইতে পারে যে, ঐ সকল গুণ জীবের পক্ষেই অধিকতরভাবে প্রযোজ্য। অধিকন্তু নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে যমরাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' পরিমাণ-ই, "তুমি যাঁহাকে জানিতে চাও তিনি— ইনিই (অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই)।"

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১।৩।২৫॥

হৃদি-অপেক্ষয়া (হৃদয়কে উল্লেখ করা প্রসঙ্গে) তু (কিন্তু) মনুষ্য-অধিকারত্বাৎ (একমাত্র মানুষই সক্ষম বলিয়া)।

২৫. কিন্তু হৃদয় মধ্যে (স্থানের) অবস্থিতির প্রসঙ্গে (বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ); (এবং যেহেতু) একমাত্র মানুষই অধিকারী (বেদ অধ্যয়নে)।

[২৫. শাস্ত্রপাঠে এবং উপাসনায় একমাত্র মানুষেরই অধিকার, তাই সকল মানুষের হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলা হইয়াছে।]

পূর্বসূত্রে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা হইয়াছে তাহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?— যেহেতু হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ স্থানের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, এবং যেহেতু ব্রহ্মকে ঐস্থানের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে, সেইজন্যই ব্রহ্মকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যেহেতু সকল জীবেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণের পরিমিত করা হইল কেন? ইহার কারণ একমাত্র মানুষই বেদাদি শাস্ত্রপাঠের এবং ঐ-সকল শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্ম উপাসনার অধিকারী। সুতরাং মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মের পরিমাপ বুঝাইতে অঙ্গুষ্ঠের পরিমাণকে মাপক বা মাত্রা রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

অধিকরণ ৮ : বেদাধ্যয়নে দেবতাদের অধিকার প্রসঙ্গ।

তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১।৩।২৬॥

তদুপরি (তাঁহাদের উপরে) অপি (ও) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণের মতানুসারে) সম্ভবাৎ (সম্ভব হয় বলিয়া)।

২৬. (জীবগণ) তাঁহাদের (মানুষের) উপরিস্থিতিও) (বেদাধ্যয়নে অধিকারী) কারণ (ইহা) সম্ভবপর (তাঁহাদের পক্ষেও জ্ঞান লাভ করা) বাদরায়ণের (মতানুসারে)।

[২৬. বাদরায়ণ বলেন যে, মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও এই অধিকার আছে; কারণ তাঁহাদের পক্ষেও মোক্ষলাভেচ্ছু হওয়া সম্ভব।]

আলোচ্য এই অংশে ২৬-৩৮ সূত্রগুলিতে মূল বিষয় হইতে পৃথক্ বিষয়ান্তরের আলোচনা আছে। পূর্ববর্তী সূত্র হইতে আমাদের একটি সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, যেহেতু বলা হইয়াছে একমাত্র মানুষই বেদাধ্যয়নের অধিকারী, সেইজন্য বুঝি দেবতাদের বেদপাঠে কোন অধিকার নাই। এই সন্দেহ দূর করার জন্যই ঐ সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাদরায়ণের মতে দেবতাগণও ইহার অধিকারী। ইহা তাঁহাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? ইহা সম্ভব এইজন্য যে, দেবতারাও দেহধারী, তাঁহাদেরও ব্রহ্মলোক অথবা পরাজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আছে— এবং এই জ্ঞানলাভের জন্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবার যথাযোগ্য গুণ আছে। শ্রুতিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য-জীবন যাপন করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিতে পাই যে, বরুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার পুত্র ভৃগুকে শিক্ষা দিতেছেন।

বিরোধঃ কর্মণীতি চেৎ, ন, অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥১।৩।২৭॥

বিরোধঃ (বিরোধ) কর্মণি (যজ্ঞাদি কর্ম বিষয়ে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়?) ন (না, তাহা নহে) অনেক-পতিপত্তেঃ (বহুদেহ ধারণ করার অনুমান) দর্শনাৎ (দৃষ্ট হয় বলিয়া) —(শ্রুতিশাস্ত্রাদিতে)।

২৭. যদি এইরূপ বলা হয় (যে, দেবতাদের বহু দেহধারণত্ব বিষয়টি উৎপাদন করিবে যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের বিপর্যয়); (ইহার উত্তরে বলা যায়)— না, তাহা হইতে পারে না, কারণ (শাস্ত্রাদিতে) আমরা দেখিতে পাই যে (দেবতাগণ) (একই সময়ে) বহু দেহ ধারণ করিতে পারেন।

[২৭. দেবতারা দেহধারী হইলেও একই দেবতার যজ্ঞাদিতে একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? হ্যাঁ, তাহা সম্ভব। কারণ শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করিতে পারেন।]

যদি দেবতারা দেহধারী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে একই সময়ে, একাধিক স্থানের যজ্ঞাদিতে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইবে না। ইহাই হইল আপত্তি। এই আপত্তির খণ্ডন এই সূত্রের শেষাংশে করা হইয়াছে। খণ্ডনের যুক্তি এই যে, যোগীদের ন্যায় দেবতাগণও যোগবলে বহুদেহ ধারণ একই সময়ে (কায়ব্যূহ) করিতে সক্ষম। (ছাঃ ৭.২৬.২ দ্রষ্টব্য) যেমন একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যজমান বিশেষ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতে পারেন, তেমনি বহু যজমানও একই সময়ে একই দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতে পারেন, যেমন বহু ব্যক্তি একই সঙ্গে কোন একজন ব্যক্তিবিশেষকে প্রণাম করিতে পারে।

শব্দ ইতি চেৎ, ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥১।৩।২৮॥

শব্দে (বৈদিক শব্দ বিষয়ে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন, (না), অতঃ (এই শব্দরাশি হইতে) প্রভবাৎ (সৃষ্ট হয় বলিয়া) প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ (সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অনুমান হইতে)।

২৮. যদি এইরূপ বলা হয় (যে দেবতাদের দেহধারণত্ব একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে) (বৈদিক) শব্দ বিষয়ে, (তদুত্তরে আমরা বলিব) না, কারণ সৃষ্টির (জগতের সৃষ্টির সঙ্গে দেবতাদেরও সৃষ্টির) এই (শব্দরাশি) হইতে (যাহা জানা যায়) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা, (শ্রুতিশাস্ত্র হইতে) এবং অনুমান (স্মৃতিশাস্ত্র) (হইতে)।

[২৮. দেবতারা শরীরবিশিষ্ট হইলে বৈদিক শব্দের নিত্যতা কি করিয়া সম্ভব?— হ্যাঁ, সম্ভব। কারণ শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণে 'সৃষ্টি শব্দপূর্বিকা'— তাহা জানা যায়।]

দেবতাদের শরীরধারণত্ব ব্যাপারটির বিষয়ে আরও একটি আপত্তি দেখা দেয়। যদি দেবতারা দেহধারী হন তাহা হইলে তাঁহারাও মনুষ্যের ন্যায় জন্ম মৃত্যুর অধীন হইবেন। কিন্তু পূর্বমীমাংসার মতে বেদের সমস্ত শব্দই নিত্য। সুতরাং শব্দের দ্যোতক রূপ এবং আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুটিও নিত্য। নাম এবং নামীর সম্পর্কও নিত্য। শব্দ বা নাম এবং ইহার দ্যোতক বস্তু এবং তাহাদের মধ্যে সম্পর্কও নিত্যতার বিভিন্ন রূপ মাত্র।

বেদে আমরা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নাম পাই। যদি এই দেবতাগণ নিত্য হন, যেহেতু তাঁহারা শরীরধারী, তাহা হইলে এই শব্দগুলির নিত্যতাসম্পন্ন কোন প্রতিপাদ্য বস্তু পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বেদের নিত্যতা এবং প্রামাণ্য— যাহা বেদের শব্দ, এবং শব্দার্থের নিত্য সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটা কল্পনামাত্র হইত। ইহাই হইল মুখ্য আপত্তি। এইভাবে এই আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে: বেদের প্রত্যেকটি শব্দেরই একটি অর্থদ্যোতক বস্তু আছে, এই বস্তুটি ব্যক্তি বিশেষ নহে— ইহা একটি সাধারণ ধর্মসূচক প্রতীক বা জাতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'গৌ' এই শব্দটির একটি প্রতীক বস্তু আছে— এই সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট প্রতীকটি (গৌ-জাতিটি) নিত্য। এই গৌ-জাতিত্ব নিত্যত্ব কোন 'ব্যক্তি'-গৌ-এর জন্ম বা মৃত্যুর উপর নির্ভরশীল নহে। ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। দেবতাদের দ্যোতক শব্দের বাচ্য বস্তুগুলি কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহে— ইহা একটি সাধারণধর্মী জাতি। যেমন রাজা বলিতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না; রাজত্বধারী যে-কোন ব্যক্তিকেই বুঝায়, তেমনি ইন্দ্র বলিতে যে-কোন ব্যক্তিকেই বুঝায়— যিনি সেই পদে উন্নীত হইতে পারেন। সুতরাং বৈদিক শব্দের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নাই। বাস্তবিকপক্ষে দেবতাদিসহ এই জগৎ প্রপঞ্চ বৈদিক শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, বৈদিক শব্দগুলিই এই জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ। ইহার উপাদান কারণ একমাত্র ব্রহ্মই— তাহা সূত্র ১.১.২-তে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা হইলে এখানে কি বুঝাইতে চাওয়া হইয়াছে? ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় জগৎ এবং ইহার অন্তর্গত বস্তু নিচয়ের প্রকাশের জন্য নাম এবং রূপের অস্তিত্ব একটি বিশেষ শর্তস্বরূপ। নাম এবং রূপের শর্তাতীত কোন চিত্তবৃত্তি-ই সম্ভব নয়। আমাদের মানসিক ধারণা প্রথমে একটি শব্দের এবং পরে একটি বস্তুর দেহবিশিষ্ট আকারে প্রতিভাত হয়। ধারণাটি (নাম) হইল যেন রসাল শাঁস, আকার-বিশিষ্ট দেহটি (রূপ) যেন বাহিরের আবরণ। ব্যক্তি মানসের ক্ষেত্রে যাহা সত্য বিশ্বচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। একমাত্র এই অর্থেই বিশ্বকে সৃষ্টপদার্থ বলা হয়।— বরং বৈদিক শব্দ হইতে বিকশিত বলা যায়। শ্রুতি এবং স্মৃতিও ইহাকে সমর্থন করে। বেদে বলা আছে যে, বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টির পূর্বে বিধাতা বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য— বৃহঃ ১.২.৪), "সৃষ্টির আদিতে তিনি (ঈশ্বর) বেদের শব্দরাশি হইতে গ্রহণ করিয়া বস্তুর নাম, ক্রিয়া এবং অবস্থার রূপদান করিয়াছিলেন" (মনু: ১.২১)।

অত এব চ নিত্যত্বম্ ।।১।৩।২৯।।

অত এব (এই কারণে-ই) চ (এবং) নিত্যত্বম্ (বেদের নিত্যতা)।

২৯. এই কারণেই (উৎপন্ন হইয়াছে) নিত্যতা (বেদের)।

পূর্বের বিচিত্র নাম-রূপ লইয়া প্রকটিত হইয়া উঠে। যেমন প্রলয়ে বিশ্বজগৎ, একেবারে বিলীন ও অস্তিত্বহীন হইয়া যায় না, সেইরূপ বেদের শব্দ এবং অক্ষর বাক্যার্থের মধ্যে সম্পর্কের নিত্যত্বও বিলীন হয় না, সুতরাং ইহার কোন বিরোধ বা বিপর্যয় না থাকায়, বেদের প্রামাণ্য থাকিয়াই যায়। বিশ্বজগতের স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে পর্যায়ক্রমে এই নিত্য অস্তিত্ব এবং একই ভাবে নাম ও রূপের একরূপতার ব্যাপারটি শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। "পূর্বকালে যখন সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি সূর্য ও চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী এবং আকাশকে আদেশ করিলেন" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ : ১০.১৯০.৩)।

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১।৩।৩১॥

মধ্বাদিষু (মধুবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনায়) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া) অনধিকারং (অযোগ্যতা অধিকারহীনতা) জৈমিনিঃ (ইহা জৈমিনি মুনির মত)।

৩১. (দেবতাদের পক্ষে) অসম্ভব হেতু—মধুবিদ্যা ইত্যাদির অধিকারী হওয়া—জৈমিনি মুনি (মনে করেন যে দেবতাগণ) অধিকারী নহেন (উপাসনা অথবা ব্রহ্মজ্ঞান কোন কিছুর জন্যই)।

[৩১. মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্যাদি দেবতারাই উপাস্য, সুতরাং ঐ বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির মত।]

বহু উপাসনার ক্ষেত্রেই কোন দেবতা-বিশেষের রূপের উপর ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মধুবিদ্যা উপাসনায় উপাসককে মধুরূপী আদিত্যের ধ্যান করিতে বলা হয়। কিন্তু আদিত্যদেবতার পক্ষে এইরূপ ধ্যান করা অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন উপাসনায় কোন দেবতা-বিশেষের স্বরূপকে ধ্যান করিতে উপদেশ করা হয় তাহা হইলে সেই দেবতার পক্ষে নিজের ধ্যান করা সম্ভব হইবে না, কারণ একই ব্যক্তির পক্ষে উপাস্য এবং উপাসক হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই জৈমিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতারা মধুবিদ্যার ন্যায় প্রতীক অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিবার অধিকারী নহেন।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥১।৩।৩২॥

জ্যোতিষি, (জ্যোতির পিণ্ডরূপেই) ভাবাৎ (যেহেতু এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে) চ (এবং)।

৩২. এবং (দেবতাগণ এইসকল বিদ্যার অধিকারী নহেন) কারণ (সূর্য,

[২৯. সৃষ্টি শব্দ-পূর্বিকা, অতএব বৈদিক শব্দ ও তদর্থ উভয়ই নিত্য।]

যেহেতু পদার্থসমূহ নিত্য— অর্থাৎ দেবতা ইত্যাদি জাতি হিসাবে নিত্য, সেইজন্য বৈদিক শব্দরাশিও নিত্য। ইহা হইতেই বেদের নিত্যত্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। উহারা অপৌরুষেয় এবং নিত্য। ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা মাত্র, বেদের কর্তা (রচয়িতা) নহেন। "তাঁহাদের পূর্বকৃত সুকৃতির জন্য (পুরোহিতগণ) বেদের অর্থগ্রহণে সক্ষম হইয়াছিলেন; (তাহার পরে) তাঁহারা বেদের জ্ঞানরাশিকে ঋষিদের মধ্যে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।" (ঋক্-বেদ ১০.৭১.৩) ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদ নিত্য।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো- দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১।৩।৩০॥

সমান-নামরূপত্বাৎ (নাম এবং রূপের একরূপতার জন্য) চ (এবং) আবৃত্তৌ (বিশ্বসৃষ্টির চক্রের আবর্তনে) অপি (এমনকি) অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব) দর্শনাৎ (শ্রুতি হইতে) স্মৃতেঃ (স্মৃতি হইতে) চ (এবং)।

৩০. এবং নাম এবং রূপের একরূপতার জন্য (সৃষ্টির প্রতিটি নূতন কল্পে) কোন বিরোধ নাই (বৈদিক শব্দরাশির নিত্যত্ব সম্পর্কে); এমনকি বিশ্ব সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনের সময়েও, শ্রুতি এবং স্মৃতিতে এইরূপই দৃষ্ট হয়।

[৩০. পূর্বকল্পে সৃষ্টি যেমন নামরূপবিশিষ্ট ছিল পরকল্পেও তাহা তদ্রূপ নামরূপবিশিষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হয়— ইহা শ্রুতি স্মৃতি পাঠে জানা যায়।]

এখানে একটি আপত্তি উঠিয়াছে। যেহেতু একটি কল্পের অবসানে সব কিছুই সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরবর্তী কল্পে আবার নূতনভাবে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়, সেইজন্য এই উভয়ের মধ্যে অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার মধ্যে একটা ছেদ দেখা দেয়। সুতরাং জাতি হিসাবেও দেবতারা নিত্য নহেন। এই আপত্তি বৈদিক শব্দ এবং তাহার বাচ্য অর্থের মধ্যে সম্পর্কের নিত্যতাকে ব্যাহত করে— এবং ইহারই পরিণতি হিসাবে বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্বও নস্যাৎ হইয়া যায়। এই সূত্রটি উক্ত আপত্তিকে খণ্ডন করিয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি সুষুপ্তির পর জাগরিত হইয়া জাগ্রৎ অবস্থার সঙ্গে কোন ছেদ বা বিরতি অনুভব করে না, ঠিক সেইভাবেই প্রলয়ের কালে, কল্পান্তে, বিশ্বজগৎ একটি অব্যক্ত অবস্থায়, বীজাকারে তমসাচ্ছন্ন থাকে, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া যায় না; পরবর্তী কল্পের আরম্ভেই পুনরায় ইহা একটি স্থূল আকারে

পূর্বের বিচিত্র নাম-রূপ লইয়া প্রকটিত হইয়া উঠে। যেমন প্রলয়ে বিশ্বজগৎ, একেবারে বিলীন ও অস্তিত্বহীন হইয়া যায় না, সেইরূপ বেদের শব্দ এবং তাহার বাচ্যার্থের মধ্যে সম্পর্কের নিত্যত্বও বিলীন হয় না, সুতরাং ইহার কোন বিরোধ বা বিপর্যয় না থাকায়, বেদের প্রামাণ্য থাকিয়াই যায়। বিশ্বজগতের স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে পর্যায়ক্রমে এই নিত্য অস্তিত্ব এবং একই ভাবে নাম ও রূপের একরূপতার ব্যাপারটি শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। "পুরাকালে যখন সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি সূর্য ও চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী এবং আকাশকে আদেশ করিলেন" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ : ১০.১৯০.৩)।

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১।৩।৩১॥

মধ্বাদিষু (মধুবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনায়) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া) অনধিকারং (অযোগ্যতা অধিকারহীনতা) জৈমিনিঃ (ইহা জৈমিনি মুনির মত)।

৩১. (দেবতাদের পক্ষে) অসম্ভব হেতু—মধুবিদ্যা ইত্যাদির অধিকারী হওয়া—জৈমিনি মুনি (মনে করেন যে দেবতাগণ) অধিকারী নহেন (উপাসনা অথবা ব্রহ্মজ্ঞান কোন কিছুর জন্যই)।

[৩১. মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্যাদি দেবতারাই উপাস্য, সুতরাং ঐ বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির মত।]

বহু উপাসনার ক্ষেত্রেই কোন দেবতা-বিশেষের রূপের উপর ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মধুবিদ্যা উপাসনায় উপাসককে মধুরূপী আদিত্যের ধ্যান করিতে বলা হয়। কিন্তু আদিত্যদেবতার পক্ষে এইরূপ ধ্যান করা অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন উপাসনায় কোন দেবতা-বিশেষের স্বরূপকে ধ্যান করিতে উপদেশ করা হয় তাহা হইলে সেই দেবতার পক্ষে নিজের ধ্যান করা সম্ভব হইবে না, কারণ একই ব্যক্তির পক্ষে উপাস্য এবং উপাসক হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই জৈমিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতারা মধুবিদ্যার ন্যায় প্রতীক অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিবার অধিকারী নহেন।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥১।৩।৩২॥

জ্যোতিষি, (জ্যোতির পিণ্ডরূপেই) ভাবাৎ (যেহেতু এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে) চ (এবং) ।

৩২. এবং (দেবতাগণ এইসকল বিদ্যার অধিকারী নহেন) কারণ (সূর্য,

চন্দ্র ইত্যাদি শব্দ দেবতাবাচক হিসাবেই কথিত)— কিন্তু এই শব্দগুলি শুধুমাত্র জ্যোতির মণ্ডল (গোলক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে)।

[৩২. দেবতারা স্বপ্রকাশ জ্যোতিরূপে ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। অতএব মধুবিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার থাকা সম্ভব নহে।]

অন্য একটি আপত্তিও এখানে উঠিয়াছে। এমন কোন প্রমাণ নাই যে, হস্ত-পদবিশিষ্ট দেবতাগণের অস্তিত্ব আছে এবং তাঁহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহার পরবশ হইয়া তাঁহারা উপাসনা বা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। এইগুলি হইল কতকগুলি গ্রহ এবং জ্যোতিষ্কের নামমাত্র সুতরাং ইহারা কতকগুলি অচেতন জড় পদার্থমাত্র। সুতরাং ফলত ইঁহারা শাস্ত্রবিহিত কোন উপাসনারই অধিকারী নহেন।

ভাবং তু বাদরায়ণঃ, অস্তি হি ॥১।৩।৩৩॥

ভাবং (অস্তিত্ব—দেবতাদের উপাসনার অধিকার) তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (ঋষি বাদরায়ণ বলেন) অস্তি (অবশ্যই আছে) হি (কারণ)।

৩৩. কিন্তু ঋষি বাদরায়ণ বলেন যে, (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতাদের অধিকার) আছে কারণ (দেহ এবং ইচ্ছা যাহা এই জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন) তাহা আছে (দেবতাদের ক্ষেত্রে)।

[৩৩. ঋষি বাদরায়ণ বলেন যে, সূর্যাদি দেবতারও মধুবিদ্যায় অধিকার আছে।]

বাদরায়ণ মনে করেন যে, সূর্য চন্দ্রাদি জ্যোতির্ময় গোলকের প্রত্যেকেরই এক একজন শরীর, বুদ্ধি, এবং আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন সেই সেই নামের অধিদেবতা আছেন সুতরাং তাঁহাদের উপাসনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সবগুলি গুণ আছে। তাই দেবতারাও উপাসনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। সূর্যদেবতা সূর্যের ধ্যান করিতে পারে না বলিয়া তিনি যে মধুবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন না ইহা ঠিক নয়, অথবা তিনি যে অন্য উপাসনা বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন না— তাহাও ঠিক নহে। অন্য দেবতাদের পক্ষেও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

অধিকরণ ৯ : শূদ্রের বেদ অধ্যয়নের অধিকার প্রসঙ্গ।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ, তদাদ্রবণাৎ, সূচ্যতে হি ॥১।৩।৩৪॥

শুক্ (শোকবেদনা) অস্য (তাহার) তৎ-অনাদরশ্রবণাৎ (তাহার— ঋষির অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া) তৎ (সেই শোক) আ-দ্রবণাৎ (তাহার নিকট গিয়া প্রার্থনা করার জন্য) সূচ্যতে (উক্ত আছে এই বিষয়ে) হি (কারণ)।

৩৪. তাঁহার (রাজা জনশ্রুতির) শোক (উৎপন্ন হইয়াছিল) অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া (হংসরূপী ঋষির নিকট) এই উপস্থিতির জন্য (রৈক্বের নিকট শোকাভিভূত হইয়া) সেই (শোক)-হেতু (রৈক্ব জনশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন) ইহার কারণ (শোক-কে) এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে (রৈক্বকর্তৃক— যিনি জনশ্রুতির মানসিক অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন)।

[৩৪. রৈক্বমুনি জনশ্রুতিকে শোকাভিভূত জানিয়াই শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহার দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বলিয়া বুঝায় না।]

পূর্বসূত্রে দেখানো হইয়াছে যে, দেবতাগণ বেদাধ্যয়নের এবং ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। এই সূত্রে আলোচনা করা হইতেছে শূদ্রেরাও উহাতে অধিকারী কি না— কারণ শূদ্রদেরও দেবতাদের ন্যায় দেহ, শক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি আছে, এবং স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে তাহারাও অধিকারী। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪.২.৫ শ্রুতিতে আছে যে, রৈক্ব প্রথমে জনশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করেন এবং উপায়নসহ ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয় বার রৈক্বের নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি জনশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াও তাঁহার উপায়ন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং এই কাহিনী হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, শূদ্রদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে।

বর্তমান সূত্রটি এই ধারণাকে খণ্ডন করিয়াছে এবং জাতি হিসাবে শূদ্রের বেদপাঠের অধিকারকে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, শ্রুতিতে উল্লিখিত 'শূদ্র' শব্দটি জাতিগত শূদ্রকে বুঝায় নাই, যদিও সাধারণত জাতি হিসাবেই আমরা শূদ্রের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, আসলে রাজা জনশ্রুতি কিন্তু ক্ষত্রিয়ই ছিলেন (ছাঃ ৪.১.৩)। এখানে শূদ্র শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে— যাহার অর্থ হইল, "তিনি শোকে অভিভূত"— অথবা "তিনি শোকগ্রস্ত অবস্থার অব্যবহিত পরই রৈক্বের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।" এর পরবর্তী সূত্র হইতেও জানা যাইবে যে, জনশ্রুতি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন।

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥১।৩।৩৫॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ (তাঁহার, ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হইবার পর) চ (এবং) উত্তরত্র (পরবর্তী কালে) চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ (চিত্ররথ বংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজার সহিত তাঁহার উল্লেখের সূত্র হইতে)।

৩৫. এবং যেহেতু (জনশ্রুতির) ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে পরবর্তী কালে জানা যায় এই সূত্র হইতে যে (তাঁহার উল্লেখ আছে) (ক্ষত্রিয়বংশীয়) চিত্ররথের এক বংশধরের সঙ্গে।

[৩৫. পরে ক্ষত্রিয় বংশীয় চিত্ররথের বংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে জনশ্রুতির উল্লেখ থাকায় তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব অবধারিত হয়।]

এই একই বিদ্যার অধ্যয়ন প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সঙ্গে জনশ্রুতির উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, জনশ্রুতিও একজন ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, কারণ সাধারণ নিয়মানুসারে একমাত্র সমজাতীয় ব্যক্তিদেরই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ।। ১।৩।৩৬ ।।

সংস্কার-পরামর্শাৎ (উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়ার উল্লেখ থাকায়) তৎ-অভাব-অভিলাপাৎ (ইহার অভাবের উল্লেখ আছে বলিয়া) চ (এবং)।

৩৬. কারণ উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে (দ্বিজাতির ক্ষেত্রে) এবং এই ক্রিয়াদির অভাবের কথাও বলা আছে (শূদ্রদের পক্ষে)।

[৩৬. দ্বিজাতির ক্ষেত্রে সংস্কারের উল্লেখ আছে এবং শূদ্রের পক্ষে এই ক্রিয়াদির নিষেধ আছে বলিয়া শূদ্রদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।]

উপনয়নাদি সংস্কার ক্রিয়া যে-কোন জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের জন্যই আবশ্যিক প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু এই সকল বিধান শুধু উচ্চবর্ণের লোকের জন্যই বিহিত। শূদ্রদের ক্ষেত্রে এই সকল সংস্কার প্রযোজ্য নহে— এইরূপ কথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। "শূদ্র নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিলেও পাপ হয় না এবং তাহার কোন সংস্কারবিধিও নাই"— ইত্যাদি (মনু: ১০.১২.৬)। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই।

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ।। ১।৩।৩৭ ।।

তদভাব-নির্ধারণে (সেই [শূদ্রত্বের] অভাব নির্ধারণ করিতে পারিয়াই) চ (এবং) প্রবৃত্তেঃ (কর্মের প্রেরণা হইতে)।

৩৭. এবং যেহেতু এই কর্মে প্রবৃত্তি (গৌতম ঋষির দ্বারা সত্যকামকে উপদেশ দান দৃষ্ট হয়) একমাত্র শূদ্রত্বের অভাব জানার পরই (সত্যকাম জাবালের ক্ষেত্রে)।

[৩৭. জাবাল সত্যকাম শূদ্রজাতীয় নহে, গৌতম ঋষি তাহা অবগত হইয়াই তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করিয়াছিলেন।]

শূদ্রগণ যে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহে তাহা এই বিষয় হইতেও জানা যায় যে, গৌতমের ন্যায় বিখ্যাত আচার্যগণ ব্রহ্মবিদ্যাদানের পূর্বে নিশ্চিত হইতেন যেন জাবাল সত্যকামের ন্যায় বিদ্যার্থী শূদ্র না হয় (দ্রষ্টব্য- ছাঃ ৪.৪.৫)।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ।। ১।৩।৩৮ ।।

শ্রবণ-অধ্যয়ন-অর্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু বেদের শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং অর্থজ্ঞান সম্পর্কে নিষেধ আছে) স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রে) চ (এবং)।

৩৮. যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রদের বেদ শ্রবণ, বেদপাঠ, বেদার্থজ্ঞান এবং বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পর্কে নিষেধ আছে— সেইজন্য তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে।

[৩৮. যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রেও শূদ্রদের বেদের শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং তদর্থজ্ঞান নিষিদ্ধ, সেইজন্য শূদ্রদের ব্রহ্মজ্ঞানলাভেরও অধিকার নাই।]

৩৪-৩৮ সূত্রগুলিতে বেদাধ্যয়নের দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অযোগ্যতার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে পুরাণ এবং (রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায়) মহাকাব্যের মাধ্যমে সেই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

২৬. সূত্র হইতে মূল বিষয়ের যে-প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখানে সমাপ্ত হইয়া পুনরায় মূল বিষয়ের আলোচনার সূচনা হইল।

অধিকরণ ১০ : যে-প্রাণে সবকিছুই কম্পিত তিনি ব্রহ্ম-ই।

৭ম অধিকরণে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে যেহেতু স্বরূপত জীব ব্রহ্মই। কিন্তু বর্তমান আলোচিতব্য শ্রুতিতে 'প্রাণ' শব্দটি ব্রহ্মার্থক হইতে পারে না, সেইজন্য প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সম্ভব নহে। ইহা বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি বলিয়াই মনে হয়, এইজন্যই বিরুদ্ধবাদিগণ ইহাকে আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

কম্পনাৎ ।। ১।৩।৩৯ ।।

কম্পনাৎ (কম্পন হেতু)।

৩৯. (প্রাণ ব্রহ্মই) কারণ কম্পনের জন্য (সমগ্র জগৎ-ই কম্পিত হয় বলিয়া কথিত আছে)।

[৩৯. শ্রুতিতে 'কম্পন' শব্দের উল্লেখ থাকায় অঙ্গুষ্ঠমান পুরুষ যে পরব্রহ্ম তাহাই বুঝায়।]

"এই বিশ্বে যাহা কিছু বর্তমান তাহার সব কিছুই এই প্রাণের কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"— ইত্যাদি (যদিদং কিঞ্চ ... কঠ: ২.৩.২)। এখানে প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝানো হইয়াছে— প্রাণশক্তিকে নহে। কেন?— ইহার প্রথম কারণ হইল— আলোচ্য বিষয়ের প্রকরণ বা বিষয়বস্তু। ব্রহ্মই হইলেন ইহার পূর্ব এবং পরবর্তী উভয় প্রকরণগুলির আলোচ্য বিষয়। পুনরায় "সমগ্র বিশ্বই প্রাণে কম্পমান"— এখানে আমরা ব্রহ্মের একটি গুণের উল্লেখ পাই। ব্রহ্ম সকল বিশ্বের আধার বলিয়া ইহা ব্রহ্মাণ্ডের জীবনীশক্তির এমন কি প্রাণেরও কারণ। পরিশেষে, যিনি এই প্রাণকে জানেন তিনি অমৃতত্বলাভ করেন— এইরূপ ঘোষণাও করা হইয়াছে এবং শ্রুতিতে বহুক্ষেত্রেই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১১ : 'জ্যোতিঃ'-ই ব্রহ্ম।

পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে পূর্বের আলোচনায় প্রাণকে ব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকরণের আলোচ্য শ্রুতিতে এইরূপ কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই যাহা হইতে আমরা 'জ্যোতি'কে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিতে পারি— বিরুদ্ধ পক্ষের ইহাই হইল আপত্তি।

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥১।৩।৪০॥

জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) দর্শনাৎ (কারণ ব্রহ্ম দৃষ্ট হন)।

৪০. জ্যোতিঃ (হইলেন ব্রহ্ম) কারণ (ব্রহ্ম) শ্রুতিতে দৃষ্ট হন। (শ্রুতির বিষয়বস্তু রূপে)।

[৪০. ব্রহ্মবোধক জ্যোতিঃ শব্দের উল্লেখ শ্রুতিতে থাকায় জ্যোতিঃ ব্রহ্মই।]

"তেমনি এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতিলাভ করেন (এবমেবৈষ......ছাঃ ৮.১২.৩)"। এখানে 'পরমজ্যোতিঃ' ব্রহ্মের বাচক হিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কিভাবে বুঝা যায়? কারণ ব্রহ্মই সমগ্র অধিকরণের আলোচ্য বিষয়। ঐ শ্রুতিরই পরবর্তী অংশে এই পরমজ্যোতিঃকেই 'পরমপুরুষ' বলা হইয়াছে। এই জ্যোতির সঙ্গে যিনি এক হইয়া যান তিনিই দেহ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অশরীরীভাব অথবা মুক্তি একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নত্বলাভ করিতে পারিলেই সম্ভব হয়।

অধিকরণ ১২ : নাম-রূপ যাহা হইতে উৎপন্ন সেই আকাশই ব্রহ্ম।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ।।১।৩।৪১।।

আকাশঃ (আকাশ) অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ (কারণ ইহা পৃথক্ কিছু বলিয়া উল্লিখিত ইত্যাদি)।

৪১. আকাশ (ব্রহ্ম-ই) কারণ ইহাকে পৃথক্ কিছু ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (নাম এবং রূপ হইতে তথাপি ইহাদের প্রকাশক।)

[৪১. (ছান্দোগ্য উপনিষদে) আকাশ শব্দের উল্লেখ আছে— (তাহা ভূতাকাশ নহে, ব্রহ্ম। কারণ) এখানে অর্থান্তরের অবকাশ আছে।]

"যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা" (ছাঃ ৮.১৪.১)। এখানে 'আকাশই' ব্রহ্ম। কেন ? যেহেতু নাম এবং রূপ আকাশেই আছে বলিয়া বলা হয়, সুতরাং আকাশ নাম-রূপ হইতে ভিন্ন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সব কিছুই নাম এবং রূপের দ্বারা ব্যাকৃত—একমাত্র ব্রহ্মই নামরূপের ঊর্ধ্বে। আকাশকেই নামরূপের প্রকাশক বলা হয়; এবং নাম-রূপের জগতের একমাত্র অন্তর্যামীরূপে এই আকাশ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। উপরন্তু 'অনন্ত' 'অমৃত' 'আত্মা' ইত্যাদি বিশেষণ বুঝাইয়া দেয় যে, আকাশ এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

অধিকরণ ১৩ : বিজ্ঞানময় আত্মা জীব নহেন, ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী আলোচনায় যেহেতু আকাশ নাম-রূপ হইতে পৃথক্ সেইজন্য ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বিরোধী পক্ষ এই যুক্তিতে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম বাস্তবে অভিন্ন হইলেও ইঁহাদের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। এইজন্যই এই প্রকরণে ইহার আলোচনা করা হইতেছে।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ।।১।৩।৪২।।

সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ (গভীরনিদ্রা—সুষুপ্তি এবং মৃত্যুতে) ভেদেন (যেইরূপ পৃথক্)।

৪২. যেইরূপ পরমাত্মাকে (জীবাত্মা হইতে) সুষুপ্তি এবং মৃত অবস্থায় পৃথক্ বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

[৪২. (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) জীবাত্মার সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি বর্ণনার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে।]

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'কতম আত্মা'— 'আত্মা কোন্‌টি?' (৪.৩.৭) এই প্রশ্নের উত্তরে একটি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই আত্মা কি পরমাত্মা না জীবাত্মা। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, ইনি পরমাত্মাই। কেন পরমাত্মা? কারণ, ইহাকে সুষুপ্তি এবং মৃত্যুর সময়ে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "এই পুরুষ (প্রত্যগাত্মা) পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না" (বৃহঃ ৪.৩.২১); ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুষুপ্তিতে পুরুষ যিনি জীবাত্মারই প্রতিরূপ তিনি পরমাত্মা হইতে পৃথক্; যাঁহাকে এখানে পরম বিজ্ঞানময় বলা হইয়াছে।

"পুরুষটি হইলেন জীবাত্মা, কারণ, সুষুপ্তি অবস্থায় বাহিরের এবং অন্তরের সব কিছু সম্পর্কে অজ্ঞতা জীবাত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যেহেতু জীবাত্মা হইলেন জ্ঞাতা এবং পরম বিজ্ঞানময় আত্মা হইলেন ব্রহ্ম, কারণ এইরূপ পরম-বিজ্ঞানময়ত্ব একমাত্র ব্রহ্মের ক্ষেত্রেই সম্ভব। মৃত্যুকালের ক্ষেত্রেও একই রূপ অবস্থা (বৃহঃ ৪.৩.৩৫)। সুতরাং ব্রহ্মই হইলেন এই পাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এই পাদে জীবাত্মা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে জীবাত্মার জীবত্ব প্রমাণ করার জন্য নহে, বাস্তবিকপক্ষে জীব এবং ব্রহ্ম যে স্বরূপত একই তাহা প্রমাণ করার জন্যই।

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥১।৩।৪৩॥

৪৩. 'পতি' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকার জন্য (আলোচ্য শ্রুতিতে আত্মা বলিতে পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে।)

[৪৩. পতি শব্দের উল্লেখ থাকাতেও আকাশ অর্থ যে জীব নহে, পরমাত্মাই তাহা বুঝা যায়।]

'পতি', 'ঈশ্বর', 'নিয়ামক' ইত্যাদি আত্মা সম্পর্কিত বিশেষণগুলি, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৪.৪.২২) যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইগুলি শুধু ব্রহ্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কারণ এই বিশেষণগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যাঁহার সম্পর্কে এইগুলি বলা হইয়াছে তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। সুতরাং 'আত্মা' শব্দটি পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে, জীবকে নহে॥

ব্রহ্ম-সূত্র

প্রথম অধ্যায় । চতুর্থ পাদ

প্রথম পাদের পঞ্চম প্রকরণে দেখানো হইয়াছে যে, যেহেতু সাংখ্যদর্শনের প্রধান শ্রুতি শাস্ত্রের প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন এবং যেহেতু সকল শ্রুতিশাস্ত্রই প্রথম কারণ হিসাবে একটি বিজ্ঞানময় সত্তাকেই স্বীকার করেন, সেই হেতু ব্রহ্মই হইলেন সেই আদি কারণ। পরবর্তী প্রথম তিনটি পাদের সব কয়টি সূত্রেই দেখানো হইয়াছে কিভাবে সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছেন। এখন, প্রধান যে শ্রুতিপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষরা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং এখানে এই আপত্তিগুলিরই খণ্ডন করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চতুর্থ পাদই সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ হইতে উত্থাপিত আপত্তিগুলির খণ্ডন করিয়াছে।

অধিকরণ ১ : কঠোপনিষদের মহৎ এবং অব্যক্ত সাংখ্যের ধারণার অন্তর্গত নহে।

পূর্বপাদের শেষ প্রকরণে, সুবিজ্ঞাত জীবাত্মার একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞাত ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকরণে বিরোধিপক্ষ মনে করেন যে, উল্লিখিত শ্রুতিতে বর্ণিত অব্যক্তকে সুবিদিত সাংখ্য শাস্ত্রীয় ধারণা অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ, ন, শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেঃ, দর্শয়তি চ ।।১।৪।১।।

আনুমানিকম্ (যাঁহাকে অনুমান করা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রধান,) অপি (ও) একেষাম্ (কোন কোন শাখার শ্রুতিতে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ হইতে পারে না) শরীর-রূপক-বিন্যস্ত-গৃহীতে (যেহেতু শরীরের সহিত উপমা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে) দর্শয়তি (শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন) চ (ও)।

১. যদি এইরূপ বলা হয় যে, বেদের কোন কোন শাখায় সাংখ্যে যাঁহাকে অনুমান করা হয়, সেই প্রধানকে-ই উল্লেখ করা হইয়াছে— তাহার উত্তরে

আমরা বলিব, না, তাহা নহে, কারণ কঠোপনিষদে উল্লিখিত 'অব্যক্ত' শব্দটি শরীরের সহিত উপমা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে (এবং শরীর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, সাংখ্যবাদীদের প্রধানকে বুঝাইতে নহে); শ্রুতিশাস্ত্রও ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

[১. যদি বলা হয় যে, কাঠক শ্রুতি অনুসারে অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত প্রধানও শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, "না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, রূপকের সাহায্যে অব্যক্ত শব্দদ্বারা শরীরকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধানকে নহে"।]

এখানে সাংখ্যবাদীরা আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রধানও শাস্ত্রপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ কোন কোন বেদের শাখা যেমন কঠ-শাখা এমন কতকগুলি শ্রুতিবচন উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে প্রধানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যথা— 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"— ইত্যাদি— মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ (কঠ: ১.৩.১১)। তাঁহারা বলেন যে, এখানে অব্যক্ত শব্দটি প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়াছে— কারণ, মহৎ, অব্যক্ত এবং পুরুষ শব্দগুলিকে যে ক্রমানুক্রমিকভাবে সাংখ্যদর্শনে উল্লেখ করা হইয়াছে, ঠিক সেইভাবেই শ্রুতিতেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি ব্যবহৃত এই শব্দগুলিকে সাংখ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

এই আলোচ্যমান সূত্রটি প্রথমে এই আপত্তিটি উত্থাপন করিয়া পরে এইভাবে ইহার খণ্ডন করিতেছে: 'অব্যক্ত' এই শব্দটি শরীরসংক্রান্ত উপমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার লক্ষ্য প্রধান নহেন। এ শব্দটির মধ্যে আমরা পূর্ববর্তী কোন শ্রুতিতে উল্লিখিত অন্য একটি বিষয়ের অবগতি লাভ করি, "জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে। জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বগণের গমনের পথ বলিয়া থাকেন"— ইত্যাদি (কঠঃ ১.৩.৩-৪)। এই মন্ত্রগুলিতে যাহা বলিতে চাওয়া হইয়াছে তাহা হইল এই : "ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, এবং অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই"— ইত্যাদি (কঠঃ ১.৩.১০-১১)।

এখন এই দুইটি উদ্ধৃতির তুলনা করা যাউক। ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি পূর্ববর্তী শ্রুতিতে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই পরবর্তী শ্রুতিতেও পাওয়া যাইতেছে। পূর্ববর্তী

শ্রুতির আত্মা-কেই পরবর্তী শ্রুতিতে পুরুষ বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্রুতির মহৎ বলিতে মহাবিশ্বের সামগ্রিক বুদ্ধিকেই বুঝাইয়াছে এবং ইহা পূর্ববর্তী শ্রুতিতে উল্লিখিত বুদ্ধিরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে ইহা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত বুদ্ধির সামগ্রিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন শুধু অবশিষ্ট আছে পূর্বশ্রুতির শরীর এবং পরবর্তী শ্রুতির অব্যক্ত; এবং সেইজন্যই এখানে অব্যক্ত বলিতে শরীরকে বুঝাইয়াছে, প্রধানকে নহে। সাংখ্যের পরিভাষায় শ্রুতিবচনকে ব্যাখ্যা করিলে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কোন শ্রুতিবাক্যকে বুঝিবার উদ্দেশ্যে স্মৃতির বচনের সহিত তুলনা করা সমীচীন নহে, উপরে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কোন সমজাতীয় শ্রুতির তুলনা করাই যুক্তিযুক্ত।

সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ ॥১।৪।২॥

সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম) তু (কিন্তু) তদর্হত্বাৎ (কারণ ইহাকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই এইরূপ বলা চলে)।

২. কিন্তু সূক্ষ্মকে (অব্যক্ত শব্দদ্বারা শরীরের কারণকেই বুঝানো হইয়াছে) যেহেতু যথার্থভাবেই এইরূপ আখ্যা দেওয়া যায়।

[২. 'অব্যক্ত' শব্দ সূক্ষ্ম পদার্থবাচক। স্থূল শরীরও সূক্ষ্মেরই স্থূলাবস্থা মাত্র (১৯১)। কাজেই অব্যক্ত অর্থ শরীরই।]

এখানে একটি আপত্তি উঠে। শরীর হইল স্থূল এবং পরিবর্ধিত। ইহাকে কিভাবে অব্যক্ত (অপরিবর্ধিত) বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তর হইল এই : এখানে স্থূল শরীরকে বুঝানো হয় নাই, যে পঞ্চ উপাদানে শরীরটি গঠিত সেই কারণ-বস্তুগুলিকে বুঝানো হইয়াছে। এই উপাদানগুলি সূক্ষ্ম এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত নহে এবং যেহেতু ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে সেইজন্য ইহাদিগকে যথার্থ ভাবেই 'অব্যক্ত' এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণদ্বারা কার্যকে বুঝানো একটা সাধারণ পদ্ধতিও বটে এবং সেই অনুসারেই এখানে পরোক্ষভাবে স্থূল শরীরকেই বুঝাইয়াছে; যেমন বলা হয়, "গরুর (অর্থাৎ দুগ্ধের) সহিত সোমরসকে মিশ্রিত কর"— (ঋক্-বেদ ৯.৪৬.৪)।

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১।৪।৩॥

তদধীনত্বাৎ (ইহা তাহার অধীন বলিয়া) অর্থবৎ (যুক্তিযুক্তভাবেই অর্থবহ)।

৩. (ঈশ্বরের) অধীন বলিয়া ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে (আমাদের মতানুসারে)।

[৩. উপনিষদে বর্ণিত অব্যক্ত (প্রধান বা প্রকৃতি) ঈশ্বরের অধীন বলিয়া সৃষ্টির সহায়ক হইতে পারেন।]

ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি এইরূপভাবে স্থূল জগতের একটি সূক্ষ্ম কারণ অবস্থাকে মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা প্রধানকে স্বীকার করিয়া নেওয়ারই নামান্তর হইল। এই সূত্রটি এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করিয়াছে। সাংখ্যবাদীদের প্রধান হইলেন একটি স্বাধীন সত্তা আর এখানে স্বীকৃত সূক্ষ্ম কারণাবস্থা হইল পরমেশ্বরের অধীন। এইরূপ একটি কারণাবস্থাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ইহা ব্যতীত ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য করিতে পারেন না। ইহা হইল প্রচ্ছন্ন শক্তি, যে শক্তি অব্যক্ত কারণরূপে ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত। ইহা হইল মায়া। এই মায়াশক্তির স্বীকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তির জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হয়, তখন সেই মুক্ত আত্মার পুনরায় আর বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই অজ্ঞানের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনটাই নহে, ইহা একটি মায়া বা ভ্রম। সুতরাং ইহাকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'অব্যক্ত' বলা চলে। এই অজ্ঞান বা সৃজনী-শক্তি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পভ্রম রজ্জু ব্যতীত শুধু মায়ার দ্বারা উৎপাদন করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে ঈশ্বররূপ মূল সত্তা ব্যতীত শুধুমাত্র মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের অধীন। তথাপি ঈশ্বর কোনভাবেই মায়ার দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নহেন, যেমন সর্পের মধ্যে বিষ থাকিলেও সর্প বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। "প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে" (শ্বেতাঃ ৪.১০)। সুতরাং অব্যক্ত বেন সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের সহায়ক। সেইজন্য ঈশ্বরের অধীন এইরূপ সহায়ক একজন অব্যক্তের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই আছে এবং এইজন্যই অব্যক্তকে স্বীকার করিতে হইবে ইহাই এই সূত্রের বক্তব্য।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।৪।৪॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ (যেহেতু ইহার উল্লেখ করা হয় নাই যে, কোন সত্তা হিসাবে ইহার জ্ঞাতব্যতা থাকিতে পারে বলিয়া) চ (এবং)।

৪. এবং যেহেতু ইহা বলা হয় নাই যে, 'অব্যক্ত' জ্ঞাতব্য হইতে পারেন— (সেইজন্য ইহা সাংখ্যের প্রধান হইতে পারেন না)।

[৪. শ্রুতি অব্যক্তকে জ্ঞেয় বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান জ্ঞেয় বলিয়া উক্ত হওয়ায় উভয়ে একার্থবাচক হইতে পারে না।]

সাংখ্যমতে তখনই মানুষ মুক্তিলাভ করে, যখন সে পুরুষ এবং অব্যক্তের (প্রকৃতির) মধ্যে পার্থক্যকে জানিতে পারে। সুতরাং অব্যক্ত তাঁহাদের নিকট জ্ঞেয়। কিন্তু এখানে

(শ্রুতিতে) অব্যক্তকে জ্ঞাত হইবার কোন প্রশ্নই নাই, সুতরাং ইহা কখনই সাংখ্যবাদীর প্রধান হইতে পারে না।

বদতীতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ।।১।৪।৫।।

বদতি (বলেন, বলিয়াছেন) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা হইতে পারে না) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ আত্মা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (আলোচ্যমান বিষয়বস্তু হইতে বুঝিতে পারা যায়)।

৫. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (শ্রুতি) বলিয়াছেন (যে, অব্যক্ত জ্ঞেয় এবং সেইজন্যই ইহা প্রধান); তাহার উত্তরে আমরা বলিব, "না, তাহা নহে, কারণ এখানে প্রাজ্ঞ আত্মাকেই বুঝানো হইয়াছে যেহেতু আত্মা-ই এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয়।"

[৫. যদি বলা হয় যে, শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব উল্লিখিত আছে, তাহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রকরণ হইতে পরমাত্মাকেই জ্ঞেয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।]

"যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন" (কঠঃ ১.৩.১৫)। সাংখ্যবাদিগণ মনে করেন যে, এই শ্রুতিতে প্রধানকে জ্ঞাত হইয়াই মুক্তিলাভ করার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে, এখানে যে-সত্তার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত প্রধানের সাদৃশ্য আছে এবং প্রধানও মহৎ হইতে ঊর্ধ্বে। এই সূত্রটি সাংখ্যের এই মতকে খণ্ডন করিয়াছে এই যুক্তিতে যে, 'মহতঃ পরং' বলিতে এখানে বিজ্ঞানময় পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে— এবং পরমাত্মাই এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়।

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ।।১।৪।৬।।

ত্রয়াণাম্ (তিনটির) এব (শুধুমাত্র) চ (এবং) এবম্ (এইরূপ) উপন্যাসঃ (প্রসঙ্গ, জ্ঞাতব্য) প্রশ্ন (প্রশ্ন) চ (এবং)।

৬. এবং এইরূপভাবে এখানে প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা (উত্তর) মাত্র তিনটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া (এবং প্রধান ইহাদের একটিও নহেন) (এই তিনটিই এখানে প্রাসঙ্গিক)।

[৬. এই প্রকরণে মাত্র তিনটি প্রশ্ন এবং তিনটি প্রাসঙ্গিক উত্তর। এখানে প্রধানের কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই।]

কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করেন, যথা অগ্নি সম্পর্কে, জীবাত্মা সম্পর্কে এবং পরমাত্মা সম্পর্কে। এখানে প্রধানের কোন উল্লেখ-ই নাই। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি না যে, যম তাঁহার মূল বক্তব্যকে অতিক্রম করিয়া যে-প্রধান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করা হয় নাই সেই সম্পর্কে উপদেশ দিবেন।

মহদ্বচ্চ ॥১।৪।৭॥

মহদ্বৎ (মহৎ শব্দের ন্যায়) চ (এবং)।

৭. এবং মহৎ শব্দের ন্যায় ('অব্যক্ত' শব্দটি সাংখ্যোক্ত অর্থের সমানার্থ-বাচক হইতে পারে না)।

[৭. সাংখ্যোক্ত মহৎ এবং শ্রুতিতে উপদিষ্ট মহৎ একার্থ-বাচক নহে।]

সাংখ্যবাদিগণের মতানুসারে, মহতের অর্থ হইল প্রথম-জাত, বিশ্ব-প্রজ্ঞা; (মহা বিজ্ঞানস্বরূপ), কিন্তু বৈদিক শ্রুতিতে মহৎ শব্দটি 'আত্মা' 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম' শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। "বুদ্ধি হইতে আত্মা (মহৎ-হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ" (কঠঃ ১.৩.১০)—এই শ্রুতিটি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্‌রূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহা নানা অভিধায় 'আত্মা' বা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে। একইভাবে, যদিও 'অব্যক্ত' শব্দটি সাংখ্যদর্শনে প্রধান বা প্রকৃতি অর্থের দ্যোতক হইতে পারে তথাপি শ্রুতিশাস্ত্রে ইহার অর্থ ভিন্ন। সুতরাং প্রধান শ্রুতি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন, ইহা একটি অনুমান নির্ভর বস্তুমাত্র।

অধিকরণ ২ : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌বর্ণিত ত্রিবর্ণা অজা সাংখ্যোক্ত প্রধান নহেন।

পূর্ববর্তী প্রকরণে বিরোধীপক্ষের যুক্তিকে এই বলিয়া খণ্ডন করা হইয়াছিল যে, শুধুমাত্র 'অব্যক্ত' শব্দটির উল্লেখ-ই সাংখ্য অর্থে ব্যবহৃত প্রধান শব্দের সঙ্গে সমার্থক বলিয়া প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না। এখানে বিরুদ্ধপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রুতি হইতে আরও সমজাতীয় দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করিতেছেন।

চমসবদবিশেষাৎ ॥১।৪।৮॥

চমসবৎ (অর্ধগোলক পাত্র বা 'হাতার' ন্যায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ কোন লক্ষণ-বিহীন)।

৮. ('অজা' শব্দটি প্রধান অর্থে গ্রহণীয় নহে) কারণ ইহার কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, যেমন চমসের (গোল বাটি বা 'হাতার') ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

[৮. শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে) বর্ণিত 'অজা' শব্দ প্রধান-বাচক নহে। কারণ 'চমস' এই শব্দটি বিশেষ আকারের নির্দিষ্ট কোন পাত্রকে বুঝায় না— সেইরূপ।]

"আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজা"—(শ্বেতাশ্বতর ৪.৫)। এখন প্রশ্ন হইল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌বর্ণিত এই 'অজা' শব্দটি কি সাংখ্য বর্ণিত প্রকৃতিকে অথবা সূক্ষ্ম উপাদান অগ্নি, জল এবং ক্ষিতিকে বুঝায়? সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, এখানে 'অজা' শব্দটি প্রধানকেই বুঝায়; অজ, অর্থাৎ অজাত-জন্মরহিত। এবং রক্ত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ ইহার তিনটি উপাদান— সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ— এই তিনটি গুণকে বুঝায়। এই সূত্রদ্বারা উপরের যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিশেষ কোন লক্ষণের উল্লেখ না থাকায় এইরূপ বিশেষ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। এই শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যাও সম্ভব। "নিম্ন বিবর ও ঊর্ধ্ব-বর্তুল একটি চমস আছে" (বৃঃ ২.২.৩)। এই শ্রুতিমাত্র হইতে নির্ধারণ করা অসম্ভব যে, এখানে কিরূপ পাত্রের কথা বলা হইয়াছে। সেইরূপ শুধু শ্রুতি হইতে অজা শব্দের অর্থ নির্ণয় করাও অসম্ভব। চমস বলিতে কি প্রকার পাত্র বুঝায় তাহা জানার জন্য যেমন শ্রুতি সহায়ক শাস্ত্রের প্রয়োজন সেইরূপ অজা শব্দের ক্ষেত্রেও। অজার অর্থ প্রধানই এইরূপ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না।

জ্যোতিরূপক্রমা তু, তথা হ্যধীয়ত একে ।।১।৪।৯।।

জ্যোতিরূপক্রমা (পদার্থসমূহ) জ্যোতি হইতে আরম্ভ করিয়া তু (কিন্তু) তথা (এইরূপভাবে) হি (কারণ) অধীয়তে (পাঠ করা হয়) একে (কোন কোন বেদের শাখায়)।

৯. কিন্তু (পদার্থসমূহ) জ্যোতি হইতে আরম্ভ করিয়া (অজা শব্দের অর্থবোধক রূপে) যেহেতু কোন কোন শাখাতে এইরূপ পাঠ আছে।

[৯. জ্যোতিরূপক্রমার অর্থ যাহা ব্রহ্ম হইতে জাত। এই অজা যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা বেদের একটি শাখা পাঠে অবগত হওয়া যায়।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থ অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকার বর্ণ হইল যথাক্রমে রক্ত, শুভ্র ও কৃষ্ণ (ছাঃ ৬.২.২-৪ এবং ৬.৪ দ্রষ্টব্য)।

এই শ্রুতিবচনটি এখানে 'অজা' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতেছে। এখানে তিনটি মৌলিক উপাদান যথা অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জলের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা হইতে অন্য সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা কিন্তু ত্রিগুণময়ী সাংখ্যের প্রকৃতি নহেন। এখানে প্রথম ব্যাখ্যানুসারে তিনটি বর্ণকে তাহাদের প্রাথমিক রং-এর অর্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র গৌণ অর্থেই তাহাদিগকে ত্রি-গুণাত্মক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। উপরন্তু এখানে শ্রুতির স্বীকৃতির উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে— অর্থাৎ শ্রুতির অন্যত্র যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে নিঃসন্দেহভাবে সেইভাবেই এখানেও অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ স্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়া শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা শ্রুতি দিয়া শ্রুতিকে প্রতিষ্ঠা করা-ই অধিকতর যুক্তিসম্মত।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১।৪।১০॥

কল্পনোপদেশাৎ (উপমার সাহায্যে উপদেশদান ব্যাপারে) চ (এবং) মধ্বাদিবৎ (মধুবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেইরূপ) অবিরোধঃ (কোন বিরোধ নাই)।

১০. উপমার মাধ্যমে উপদেশ দিলেও কোন অসঙ্গতি হয় না, (যেমন) মধুবিদ্যার ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছে (আন্তরিক উপাসনার জন্য সূর্যের স্থলে মধুবিদ্যার কথা) এবং এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

[১০. উপমা হিসাবে ব্রহ্মকে অজা বলাতে কোন বিরোধ নাই, যেমন আদিত্যকে মধুবিদ্যার উপাসনায় 'মধু' বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।]

'অজা' শব্দটি 'যাহা জাত নহে' এইরূপ কিছুকে বুঝায়; সুতরাং ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত তিনটি কারণ-উপাদানকে কিভাবে বুঝাইতে পারে?— কেন না, উপাদানগুলি তো সৃষ্ট পদার্থ? বিরোধীরা বলেন, এখানেই অসঙ্গতি।

এই আপত্তির উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, এখানে কোন অসঙ্গতি নাই— কারণ, এখানে শুধু একটা উপমা প্রসঙ্গেই (অজার সঙ্গে) এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন শ্রুতিতে মধুবিদ্যার উপদেশ প্রসঙ্গে সূর্যকেই মধু বলা হইয়াছে, "ঐ আদিত্যই দেবগণের মধু" (ছাঃ ৩.১.১), ঠিক সেইরূপভাবেই তিনটি প্রাথমিক উপাদানকে ছান্দোগ্য অজারূপে বর্ণনা করিয়াছে। একটি অজা কৃষ্ণ, শুক্ল এবং রক্তবর্ণ হইতে পারে এবং সে তাহারই ন্যায় নানা বর্ণের সন্তান প্রসব করিতে পারে। সেইরূপে, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জলের সমবায়ে ক্রমান্বয়ে রক্ত, কৃষ্ণ, শুভ্রাদি সমজাতীয় বর্ণের বহু প্রাণযুক্ত এবং প্রাণহীন বস্তুর সৃষ্টি হয়। এখানে, অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্মচাপের

সমবায়কে কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টান্ত হিসাবে ত্রিবর্ণবিশিষ্ট 'অজা'রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এইজন্যই ইহাকে অজা বলা হইয়াছে— যাহার অর্থ যথার্থই অজাত নহে।

অধিকরণ ৩ : বৃহদারণ্যকের 'পঞ্চ-পঞ্চজন' (৪.৪.১৭) সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি, নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ।। ১ । ৪ । ১১ ।।

ন (নহে) সংখ্যোপসংগ্রহাদপি (সংখ্যাগণনা হইতেও) নানাভাবাৎ (নানাত্বহেতু) অতিরেকাৎ (আধিক্যহেতু) চ (এবং)।

১১. সংখ্যাগণনা হইতেও (পঞ্চ পঞ্চজনা—অর্থাৎ শ্রুতির পঞ্চবিংশতি সংখ্যা) ইহা নহে (যে শ্রুতি সাংখ্যের প্রধানকে এখানে লক্ষ্য করিয়াছেন), নানাত্বহেতু (সংখ্যার হিসাবের) এবং আধিক্যবশত (সাংখ্যের তত্ত্বগুলির সংখ্যা অপেক্ষা)।

[১১. উপনিষদ্‌বাক্যে যে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ আছে তাহাকে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (প্রধান) বলা যায় না। কারণ, উপনিষদে অতিরিক্ত দুইটি পদার্থেরও উল্লেখ আছে।]

"পাঁচটি পঞ্চজন এবং অব্যাকৃত যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমরব্রহ্ম বলিয়া মনে করি"— ইত্যাদি (বৃঃ ৪.৪.১৭)। পঞ্চ গুণিত পঞ্চ হইল পঞ্চবিংশতি এবং এই সংখ্যাই হইল অবিকল সাংখ্যের তত্ত্বের সংখ্যা। সুতরাং সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, এখানেই তাঁহাদের দর্শনের শাস্ত্রপ্রমাণ। এই সূত্রে এই অনুমানকেই খণ্ডন করা হইয়াছে। কারণ সাংখ্যের এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে কোন সমজাতীয় ভিত্তিতেই সমান পঞ্চভাগে বিভক্ত করা যায় না— যেহেতু পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিটিই পরস্পর হইতে ভিন্ন। দ্বিতীয়ত শ্রুতিতে উল্লিখিত আকাশকে পৃথক্ তত্ত্ব হিসাবে গণনা করায় তত্ত্বের সর্বমোট সংখ্যা হইবে ষড়বিংশতি, ইহাও সাংখ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধ।

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ।। ১ । ৪ । ১২ ।।

প্রাণাদয়ঃ (জীবনীশক্তি ইত্যাদি) বাক্যশেষাৎ (বাক্যশেষে ইহাদের উল্লেখ আছে বলিয়া)।

১২. (যে পঞ্চজনের উল্লেখ আছে তাহারা হইল) প্রাণাদি শক্তি ইত্যাদি, কারণ, (আমরা এইরূপ দেখিতে পাই) পরবর্তী শ্রুতির বাক্যশেষে।

[১২. শ্রুতিতে উক্ত পঞ্চজন অর্থ হইল প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি, কারণ বাক্যশেষে এই পাঁচটিরই উল্লেখ আছে।]

"যাঁহারা প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, অন্নেরও অন্ন, মনেরও মনকে জানেন" (বৃহৎ মাধ্যন্দিন শাখা ৪.৪.২১)। পঞ্চজন এই পাঁচটি প্রাণকে এবং শ্রুতিতে উল্লিখিত বাকি চারটিকে ব্রহ্ম অর্থে বুঝায়।

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১ । ৪ । ১৩ ॥

জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা) একেষাম্ (কাহারও কাহারও শাখাতে) অসতি অন্নে (অন্নের উল্লেখ না থাকায়)।

১৩. (শ্রুতিতে) কোন কোন শাখায় (যেমন কাণ্ব শাখায়) অন্নের উল্লেখ না থাকিলেও (পূর্ব সূত্রে যাহা আছে বলিয়া বলা হইয়াছে) (সংখ্যার পূরণ হইয়া যায়) জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা (পূর্ববর্তী শ্রুতিতে যাহার উল্লেখ আছে)।

[১৩. কাণ্ব শাখায় 'অন্ন' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও জ্যোতিঃ শব্দের উল্লেখ হেতু পঞ্চসংখ্যা ঠিকই থাকে। শাখাভেদে পাঠের বিভিন্নতা হইলেও সংখ্যা ঠিক আছে।]

"সেই জ্যোতির্ময়দিগের অমর জ্যোতিকে দেবগণ আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন" (বৃ: ৪.৪.১৬)। যদিও পূর্ব সূত্রে কাণ্ব শাখার শতপথ ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত শ্রুতিতে অন্ন শব্দের উল্লেখ নাই তথাপি সেই শ্লোকের উল্লিখিত চারিটির সঙ্গে উপযুক্ত শ্রুতির জ্যোতিঃ শব্দটি যুক্ত হইয়া 'পঞ্চজন' এই পঞ্চ সংখ্যাটি ঠিকই হইয়া যায়।

অধিকরণ ৪ : ব্রহ্মই যে আদি কারণ এই বিষয়ে শ্রুতিতে কোন বিরোধ নাই।

পূর্ববর্তী তিনটি প্রকরণে দেখানো হইয়াছে যে, সাংখ্যের প্রধানের স্বীকৃতি কোন শাস্ত্রসম্মত নহে। এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমগ্র শ্রুতি-শাস্ত্রই ব্রহ্মকেই আদি কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রতিপক্ষবাদীরা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যেহেতু বেদান্ত শাস্ত্রে সৃষ্টির ক্রম এবং প্রক্রিয়া বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি আছে, সেইজন্য তাহাদের প্রামাণ্য সন্দেহজনক। সুতরাং অনুমান এবং যুক্তি মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রধানকেই সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে গ্রহণ করাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১ । ৪ । ১৪ ॥

কারণত্বেন (প্রথম কারণরূপে) চ (এবং) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতি বিষয়ে) যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (যেভাবে অন্য সব শ্রুতিতে উপদেশ করা হইয়াছে— সেইভাবে এখানেও)।

১৪. (যদিও) আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি বিষয়ে বেদান্ত শ্রুতিগুলির মধ্যে বিভিন্নতা আছে, তথাপি (ব্রহ্ম বিষয়ে কোন বিভেদ নাই) ইহার প্রথম কারণত্ব বিষয়ে, (কারণ) অন্যান্য শ্রুতিতে যেরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সেইরূপ (এখানেও করা হইয়াছে)।

[১৪. ব্রহ্মই যে আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থের একমাত্র আদি কারণ সেই বিষয়ে শ্রুতিতে কোন মতভেদই নাই।]

সাংখ্যবাদিগণ মনে করেন যে, যদিও শ্রুতি অনুসারে প্রধান আদিকারণরূপে গৃহীত হইতে পারেন না, সেইরূপভাবে ব্রহ্মও শ্রুতি-উপদিষ্ট আদি কারণ হইতে পারেন না। কেন হইতে পারেন না? কারণ সৃষ্টির ক্রম সম্পর্কে শ্রুতির মধ্যে বিরোধ আছে; যেহেতু কোন শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে, কোন শ্রুতি বলেন প্রথমে প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে আবার অন্য শ্রুতি বলেন যে, অগ্নি-ই প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টপদার্থ বিষয়ে অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রম বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও— সৃষ্টির ক্রম বর্ণনা করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে— এই ক্রমের পার্থক্যের জন্য কিছু যায় আসে না। শ্রুতির এই উপদেশের মুখ্য বিষয় হইল এই যে, ব্রহ্মই আদি কারণ। এই আদিকারণত্ব বিষয়ে শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই, যেহেতু, সকল শ্রুতিই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই আদি কারণ।

সমাকর্ষাৎ ।।১।৪।১৫।।

১৫. সংযোগ আছে বলিয়া (যে-সব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সব স্থলে অসৎ অর্থ সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব নহে)।

[১৫. শ্রুতি যে স্থলে অসৎ হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়াছেন সেই 'অসৎ' অর্থ অভাবার্থক নহে, শ্রুতির সকল বাক্যের সামঞ্জস্য বিধানে ইহা 'সৎ' বলিয়াই প্রমাণিত।]

আরও একটি আপত্তি উঠিয়াছে; কারণ আদি কারণ বিষয়েও শাস্ত্রে নানা বিরুদ্ধ উক্তি আছে। ঐতরেয় আরণ্যক (২৪.১.২-৩) বলেন যে আত্মাই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অন্য শ্রুতি (তৈ: ২.৭) বলেন যে অসৎ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন কোন শ্রুতিতে সৎকেই প্রথম কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে (ছা: ৬.২.১-২)। আবার অব্যাকৃতকেও কোন শ্রুতি প্রথম কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (বৃ: ১.৪.৭)। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতির জন্য বলা যায় না যে, সকল বেদান্ত শাস্ত্রই একইভাবে ব্রহ্মকে সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই আপত্তিগুলির উত্তরে এইরূপ বলা যায়— "অসৎ-ই সর্বপ্রথমে ছিলেন"—

"এই অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মই ছিলেন" (তৈ: ২.৭)। অসৎ বলিতে এখানে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব কিছু বুঝায় না— কিন্তু অব্যাকৃত— নামরূপহীন একটা অবস্থা বুঝায়। প্রথমে সৃষ্টি নামরূপহীন অবস্থায় অব্যাকৃত ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিশ্চিতভাবেই অসৎ হিসাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। "ব্রহ্মকে যে অসৎ বলিয়া মনে করে, সে অসৎসমই হইয়া থাকে; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎস্বরূপে জানেন, তবে (ব্রহ্মবিদ্গণ) তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন" (তৈ: ২.৬)। এই ব্রহ্মই আবার বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। "ইহা কিরূপে হইতে পারে; অসৎ হইতে কিরূপে সৎ জাত হইতে পারে?" (ছা: ৬.২.২)— এই শ্রুতিটি এই জাতীয় সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। "সেই এই জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল" (বৃহ: ১.৪.৭)— এই শ্রুতিটি কোন স্রষ্টা ব্যতীত স্বয়ং সৃষ্টির কথা স্বীকার করে না। কারণ, এই শ্রুতির সহিত অন্য একটি শ্রুতির সংযোগ আছে যেখানে বলা হইয়াছে, "এই আত্মা নিখিলদেহে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন" (বৃহ: ১.৪.৭)। এখানে এই আত্মা বলিতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই বুঝাইয়াছে। সুতরাং অব্যক্তে যিনি নিহিত ছিলেন সেই ব্যাকৃত ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে মানিয়া লইতে হইবে। অনুরূপভাবেই যেই ব্রহ্ম কোন শ্রুতিতে 'সৎ' শব্দ দ্বারা বর্ণিত তাঁহাকেই আবার অন্যত্র সকলের সত্তারূপে আত্মা শব্দদ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং সকল শ্রুতিই একইভাবে ব্রহ্মকেই আদি কারণরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং এই বিষয়ে কোন মতবিরোধই নাই।

অধিকরণ ৫ : আদিত্য ও চন্দ্রাদির স্রষ্টা হইলেন ব্রহ্ম, প্রাণ বা জীবাত্মা নহেন।

পূর্ববর্তী প্রকরণে উল্লিখিত কোন একটি শ্রুতিতে 'সৎ' শব্দটি থাকায় অন্য শ্রুতিতে উল্লিখিত 'অসৎ' শব্দটির যথার্থ অর্থবোধ করার পক্ষে উহা সহায়ক হইয়াছিল। এখানে 'অসৎ' বলিতে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব বুঝাইতেছে না, অব্যাকৃত অবস্থাকেই বুঝাইতেছে। এখন বিরুদ্ধবাদিগণ নূতন একটি আপত্তির অবতারণা করিয়া বলিতে চান যে, 'প্রাণ' ইত্যাদি শব্দ যাহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও সঙ্গতভাবে ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করা যায় না, যদিও ইহা অন্য একটি শ্রুতিতেও উল্লিখিত হইয়াছে।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১ । ৪ । ১৬ ॥

জগৎ-বাচিত্বাৎ (যেহেতু ইহা জগৎ-শব্দ বাচক)।

১৬. (এই বিশ্বজগৎ যাঁহার কর্ম তিনিই ব্রহ্ম) কারণ (এই কর্ম বলিতে) জগৎ-কেই বুঝাইয়াছে।

[১৬. "সমস্ত পুরুষের (জগতের) কর্তাকে জান"— এই শ্রুতির কর্তা ব্রহ্মই, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন।]

"হে বালাকি! তুমি যাঁহাকে এই জগতের কর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ এবং এই সমগ্র বিশ্বই যাঁহার সৃষ্টি— একমাত্র তাঁহাকেই জানিতে হইবে" (কৌষীতকী ৪.১৮)। উপনিষদের এই অধ্যায়ে বালাকি প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত কতিপয় জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অজাতশত্রু বলিলেন যে, এই জীবাত্মাসমূহ যথার্থ ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম কি তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন: "এই পুরুষগণের যিনি স্রষ্টা— একমাত্র তাঁহাকেই জানিতে হইবে, এই পুরুষগণকে নহে।" এখানে প্রশ্ন হইল সূর্য-চন্দ্রাদির স্রষ্টা বা কর্তা কে? বিরুদ্ধপক্ষরা বলেন যে, প্রধান প্রাণ বা জীবাত্মাই কর্তা। প্রধান প্রাণ-ই সেই কর্তা; কারণ, কার্য সম্পাদনে যে গতি বা শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা প্রাণ হইতেই আসে এবং এই প্রাণ শব্দটি পরবর্তী সমার্থজ্ঞাপক একটি শ্রুতিতেও উল্লিখিত হইয়াছে— "অতঃপর তিনি একমাত্র প্রাণের সহিতই এক হইয়া গেলেন" (কৌ: ৪.২০)। ইহা জীবও হইতে পারে, কারণ এই শ্রুতিতেই আছে, "প্রভু যেমন তাঁহার অনুগতগণকে ভরণ পোষণ করেন... তেমনিভাবে বিজ্ঞানবান আত্মা অন্যান্য আত্মাকে পোষণ করেন।" (কৌ: ৪.২০) এই আলোচ্যমান সূত্রটি পূর্বপক্ষের এইসব যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, শ্রুতিতে উল্লিখিত কর্তা বা স্রষ্টা হইলেন ব্রহ্মই; কারণ, এখানে ব্রহ্ম সম্পর্কেই উপদেশ করা হইয়াছে। "আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মের সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিব"। পুনশ্চ, 'ইহা' বলিতে জগৎ স্রষ্টার কর্মকেই, জগৎকেই বুঝাইয়াছে এবং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 'তিনি' বলিতে একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। সুতরাং স্রষ্টা বলিতে পরমেশ্বরকেই বুঝাইয়াছে— প্রাণকেও নহে, জীবাত্মাকেও নহে।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১।৪।১৭॥

জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ (যেহেতু জীব এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণসমূহের উল্লেখ আছে) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাতম্ (পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

১৭. যদি এইরূপ বলা হয় যে, যেহেতু জীব এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণসমূহের (উল্লেখ আছে শ্রুতিতে সেইজন্য ব্রহ্ম) নহেন (এই শব্দের দ্বারা শ্রুতিতে বলা হয় নাই), (ইহার উত্তরে আমরা বলিব)— ইহার ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

[১৭. বাক্য শেষে শ্রুতিতে জীব ও মুখ্য প্রাণের উল্লেখ আছে— যদি এই কথা বলা হয়, তাহার উত্তরে বলিব যে, ইহার ব্যাখ্যা তো পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।]*

---

* ১.১.৩১ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১।৪।১৮॥

অন্যার্থং (অন্য উদ্দেশ্যে) তু (কিন্তু) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) প্রশ্ন ব্যাখ্যানাভ্যাম্ (প্রশ্ন এবং ইহার ব্যাখ্যা যেহেতু দেওয়া হইয়াছে) অপি চ (অধিকন্তু) এবম্ (এইরূপে) একে (কেহ কেহ বলেন)।

১৮. কিন্তু জৈমিনি মুনি (মনে করেন যে, যেহেতু শ্রুতিতে জীবের উল্লেখ আছে) প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য ইহার অন্য উদ্দেশ্য আছে; অধিকন্তু এইভাবে কোন কোন শাখা (বাজসনেয়ী শাখা) (তাঁহাদের শাখার শ্রুতিতে এইরূপ পাঠ করেন)।

[১৮. জৈমিনি মুনি বলেন প্রশ্নোত্তর হইতেই বুঝা যায় যে, জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ ব্রহ্ম-স্বরূপকে নির্ণয় করার জন্যই ঐ বাক্যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে।]

কৌষীতকী উপনিষদের ঐ অধ্যায়ে জীবের উল্লেখের অন্য উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য জীবকে প্রাধান্য দেওয়া নহে, ব্রহ্মকেই প্রাধান্য দেওয়া। এবং এখানে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। কৌষীতকী উপনিষদের এই সকল প্রশ্ন "এইরূপে পুরুষ কোথায় নিদ্রিত ছিলেন? তিনি ছিলেন কোথায়? পুনরায় তিনি কিভাবেই বা প্রত্যাগত হইলেন? (কৌ: ৪.১৯)— জীবাত্মা হইতে অন্য কিছুকেই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এবং ইহাদের উত্তরগুলিও (ঐ ৪.২০) ইহাই নির্দেশ করিয়াছে জীবাত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও যেখানে এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে, সেইখানেও 'বিজ্ঞানময়' শব্দদ্বারা জীবকে জ্ঞাতা হিসাবে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং জীবাত্মাকে স্পষ্টভাবেই পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে (বৃহ: ২.১.১৬-১৭)।

অধিকরণ ৬ : শ্রবণ মননাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য আত্মা ব্রহ্মই।

পূর্ববর্তী প্রকরণে আলোচিত শ্রুতিকে ব্রহ্মদ্যোতক বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ইহার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ঐ পাদটি ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই আরম্ভ করা হইয়াছে: "আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিব।" এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বিরুদ্ধবাদিগণ বৃহদারণ্যকের ২.৪.৫ শ্রুতিকে উদ্ধৃত করিয়া এই আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, যেহেতু এই পাদের প্রসঙ্গটি জীবকে লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, সেইহেতু "আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে" বলিতে এখানে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে নহে।

বাক্যান্বয়াৎ ।। ১ । ৪ । ১৯ ।।

বাক্য-অন্বয়াৎ (পূর্বাপর বাক্য সকলের সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা)।

১৯. (আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ইত্যাদি ব্রহ্মই) যেহেতু শ্রুতির বাক্যগুলির সমন্বয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

[১৯. পূর্বাপর বাক্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা উক্তবাক্যে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।]

"হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হইলে তদ্দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়" (বৃহ: ২.৪.৫)। এই শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে জীবাত্মাকে নহে। কিভাবে বুঝিবে ? এই সমগ্র ব্রাহ্মণাংশেই (পাদে) ব্রহ্ম সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, "আমি কি এই ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ?" এবং ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সম্পদ এবং যজ্ঞাদির দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। অতঃপর মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা "কিসে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে ?" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মজ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান করিলেন। এই আলোচনার পরিসমাপ্তি হইল— "অমৃতত্ব এই পর্যন্তই গমন করে"— এই বলিয়া। তাহা হইলে জানা গেল যে, জীবাত্মার জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না— শুধুমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই হইলেন আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং শ্রবণাদির সাহায্যে ব্রহ্মকেই লাভ করিতে হইবে। অধিকন্তু এখানে যে শ্রুতির উদ্ধৃতি আছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই আত্মা বিদিত হইলে সব কিছুই বিদিত হইয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে আত্মা বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। তাহা না হইলে সসীম জীবাত্মার জ্ঞানের দ্বারা কিভাবে আমরা সব কিছুর জ্ঞানকে লাভ করিতে পারিব ?

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ।। ১ । ৪ । ২০ ।।

প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধেঃ (প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতে) লিঙ্গম্ (জ্ঞানের বিষয় উৎপাদক চিহ্ন) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্য মুনি বলেন)।

২০. (জীবাত্মাকেই যে এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে) তাহার দ্যোতক চিহ্ন প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হিসাবে এখানে বর্তমান আছে— ইহা আশ্মরথ্য মুনি মনে করেন।

[২০. (ভেদাভেদবাদী) আশ্মরথ্য মুনি বলেন "একের বিজ্ঞানে সকলের জ্ঞান হয়" এই প্রতিজ্ঞা হইতে জীব শব্দ যে এখানে পরমাত্মাবাচক বুঝাইয়াছেন তাহা প্রতিপন্ন হয়।]

পূর্বসূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিবচনটিকে (বৃহ:২.৪.৫) এই সূত্রে ভেদাভেদবাদী আশ্মরথ্য মুনির দৃষ্টকোণ হইতে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই মতবাদের বিচারে জীব এবং ব্রহ্ম কার্যকারণ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন আবার অভিন্ন, যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে ভিন্ন এবং অভিন্নও বটে। যদি জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে একান্তভাবে ভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে একের (ব্রহ্মের) জ্ঞানের দ্বারা অন্য সব কিছুকে জানা যাইত না। সেইহেতু এই মতাবলম্বী মুনিগণ এই শ্রুতিটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন : একমাত্র জীবাত্মাই দ্রষ্টব্য। কিন্তু যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহেন, সেইজন্য জীবাত্মার জ্ঞান ব্রহ্মেরই জ্ঞানকে প্রদান করে— এবং ফলত সব কিছুরই জ্ঞান দিয়া থাকে। ব্রহ্ম এবং জীবের এই অভেদত্ব হইতেই এই প্রতিজ্ঞাটি পাওয়া যায় "একের জ্ঞানের দ্বারা সবকিছুই জানা যায়"। এবং এই ব্যাখ্যানুসারেই এই শ্রুতিতে আত্মা (বৃ: ২.৪.৫) জীবাত্মাকে গ্রহণ করা হয়।

ইহাকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: যদি জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞানও জীবের জ্ঞান দিতে পারে না। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই বটে। এখানে বক্তব্য হইল এই যে, আলোচ্য শ্রুতিটি জীবাত্মা অবলম্বন করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে।

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ।।১।৪।২১।

উৎক্রমিষ্যতঃ (শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয় এইরূপ কিছুর) এবং-ভাবাৎ (এইরূপ স্বভাববশত) ইতি (এইরূপ) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি মুনি) বলেন।

২১. (প্রারম্ভের বর্ণনায় জীবকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে।) কারণ এই লক্ষণ হইতেই (ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভিন্নত্ব হইতেই) একের (অর্থাৎ জীবের) শরীর হইতে উৎক্রান্তি হয় (মুক্তির সময়ে) এইরূপ (মনে করেন) ঔড়ুলোমি ঋষি।

[২১. ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, শরীর হইতে উৎক্রান্ত জীবের ব্রহ্মভাব হয়। অতএব উক্ত জীব শব্দে ব্রহ্মই বুঝা যায়।]

এই আচার্য (ঔড়ুলোমি) যখন 'আত্মা দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি স্থলে জীবকেই গ্রহণ করিয়াছেন তখন তিনি এই শ্রুতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রান্ত

হয়, অর্থাৎ যখন মুক্ত এবং দেহাভিমান শূন্য হয়, তখন সে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করে। এই জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রদর্শনের জন্যই শ্রুতি মুক্তাবস্থায় জীব এবং ব্রহ্মের একত্বের কথা বলিয়াছেন— যদিও বদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞ জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের ভিন্নত্ব একটি বাস্তব সত্য। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে জীবের অভিন্নত্বের কথা বলা হয় জীবের মুক্ত অবস্থাতে, কারণ তখন জীব এবং ব্রহ্ম একই হইয়া যান। উদ্ধৃত শ্রুতিটি জীবের ভাবী অভিন্নত্বের অবস্থাকে বাস্তবের ভিন্নাবস্থার উপর আরোপ করিয়াছেন। বেদান্তের এই সম্প্রদায়কে বলা হয় "সত্য-ভেদ-বাদী" (অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন যে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সত্যই একটা ভেদ বা পার্থক্য আছে)।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥১।৪।২২॥

অবস্থিতেঃ (অবস্থান হেতু) ইতি (এইরূপ মনে করেন) কাশকৃৎস্নঃ (কাশকৃৎস্ন ঋষি)।

২২. (প্রথম উক্তিটি করা হইয়াছে) কারণ, অবস্থান হেতু (জীব হিসাবে ব্রহ্মের) এইরূপ বলেন মুনি কাশকৃৎস্ন।

[২২. কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই দেহ মধ্যে জীবাত্মারূপে অবস্থিত। সুতরাং জীব শব্দে এইস্থলে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে।]

যেহেতু জীব স্বভাবতই ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেইজন্য মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব লাভ করা অসম্ভব। এই কারণেই এই মুনি মনে করেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং-ই জীবাত্মারূপে অবস্থান করিয়া আছেন। উভয়ে একান্তিত অভিন্ন। উপাধি এবং সসীম বিশেষণ-গুলিই হইল আপাত ভিন্নত্বের কারণ। উপাধি মায়ার সৃষ্টি সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অপর সব কিছুকেই জানা যায়।

পূর্ববর্তী তিনটি সূত্রে বেদান্তদর্শনের তিনটি শাখার মতবাদ বর্ণনার মধ্যে কাশকৃৎস্ন শাখার মতই বেদান্ত শ্রুতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্মরথ্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মার সৃষ্টি। সুতরাং কারণের জ্ঞান হইতে সব কিছুর জ্ঞানই লাভ করা যায়, জীবাত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানও এই জ্ঞানেরই অন্তর্গত। কিন্তু কার্য বা কার্যাংশ কি কারণ হইতে ভিন্ন? এবং সম্পূর্ণ কারণটি-ই কি ইহার প্রতিটি কার্যের মধ্যে বর্তমান? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে স্পষ্টভাবেই বলা যায়, 'না'। আর কার্য বা কার্যাংশ যদি এই কারণ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল ইহা কোথা হইতে আসিল? আর, কার্য কি কারণ হইতে বিচ্ছেদ্য? ইহা যদি বিচ্ছেদ্য হয়, তাহা হইলে ইহা তাহার ধর্ম হইতে পারে না; কারণ কোন বস্তুর ধর্মকে বস্তু হইতে

পৃথক্ করা যায় না। ইহা যদি বিচ্ছেদ্য না হয়, তাহা হইলে কারণকে জানা সম্ভব হইবে না। এবং সেক্ষেত্রে "আত্মাকে জানিলে সব কিছুই জানা হইয়া যায়"— এই প্রতিজ্ঞাটি নস্যাৎ হইয়া যায়। সুতরাং আশ্মরথ্যের মতবাদ দাঁড়াইতে পারে না।

ঔড়ুলোমির মতানুসারে জীব পরমাত্মারই অবস্থা-বিশেষমাত্র। যদি জীবত্বটি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা কখনও ধ্বংস হইতে পারে না এবং সেই ক্ষেত্রে মুক্তিলাভও হইবে অসম্ভব। অপরপক্ষে ইহা যদি পরব্রহ্মের সহিত একই হয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে জীবত্বের কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং ঔড়ুলোমির মতবাদও টিকিতে পারে না। জীবত্ব হইল একটি অসৎ বস্তু— ইহা অবিদ্যার সৃষ্টি— কারণ জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্নই। অগ্নি হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টিকেও যথার্থ সৃষ্টি বলা যায় না— ইহা শুধুই ঔপাধিক। বাস্তবিকপক্ষে জীব সৃষ্টও হয় না, ধ্বংসও হয় না। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমরা জীবকে উপাধিদ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

অধিকরণ ৭ : ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণও বটেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ।। ১ । ৪ । ২৩ ।।

প্রকৃতিঃ (উপাদান-কারণ) চ (এবং) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্ত-অনুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরোধী নহে)।

২৩. (ব্রহ্ম হইলেন) উপাদান-কারণও (এই মতবাদ অনুসারে মাত্র) ইহা প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরোধী নহে (শ্রুতিতে যেরূপে উল্লিখিত হইয়াছে)।

[২৩. ব্রহ্ম জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও, এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয়।]

ব্রহ্ম জগতের কারণ ইহা স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল : কিন্তু কি জাতীয় কারণ? ইহা কি নিমিত্ত-কারণ, না উপাদান-কারণ, অথবা উভয় কারণ? প্রাথমিক বিচারে ব্রহ্ম একমাত্র নিমিত্ত-কারণ বলিয়াই মনে হয়, যেমন প্রশ্ন উপনিষদে (৬.৩-৪)-এ আছে "তিনি চিন্তা করিলেন...... তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন"।

আলোচ্যমান এই সূত্রের দ্বারা এই মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণও বটেন। এখানে 'চ' শব্দটি (ও শব্দ) প্রমাণ করে যে ইহা নিমিত্ত-কারণও বটে। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান-কারণ হন, একমাত্র তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা

সব কিছুকে জানা সম্ভব; যেমন (ছা: ৬.১.৩) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে— "যাহার দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়"— ইত্যাদি; যেহেতু কারণ কার্য হইতে ভিন্ন কিছু নহে। এখানে যে দৃষ্টান্তের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল: "হে সৌম্য যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণাম-ভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে" ইত্যাদি (ছা: ৬.১.৪)। এই সকল শ্রুতিবচন হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ; তাহা না হইলে এই শ্রুতিবচনগুলি অর্থহীন হইত। পুনশ্চ "সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, এক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ছিলেন"— ইত্যাদি শ্রুতিও প্রমাণ করে যে, ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণও বটেন— যেহেতু, যখন আর কিছুই ছিল না তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে এইরূপ কারণ হইতে পারেন?

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ।। ১ । ৪ । ২৪ ।।

অভিধ্যোপদেশাৎ (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার উল্লেখ থাকায়) চ (এবং)।

২৪. এবং যেহেতু (সৃষ্টির) ইচ্ছার কথা বর্ণিত আছে (পরমাত্মা সৃষ্টি করিবেন। ইহাই উপাদান- কারণ)।

[২৪. ব্রহ্ম নিজেই বহুরূপে সৃষ্ট হইবেন, এই বাক্য হইতেও তিনি যে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ তাহা বুঝা যায়।]

"ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব' (ছা: ৬.২.৩) ইত্যাদি।" এই শ্রুতিতে ইচ্ছার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ, এবং পরবর্তী শ্রুতিবচন "আমি বহু হইব"— হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম নিজেই বহু হইয়াছেন। সুতরাং তিনি উপাদান-কারণও বটেন।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ।। ১ । ৪ । ২৫ ।।

সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে— সোজাসুজি) চ (এবং) উভয়াম্নানাৎ (যেহেতু শ্রুতি উভয়টিকেই উপদেশ করিয়াছেন)।

২৫. এবং যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই (জগতের সৃষ্টি এবং বিলয়ে) ব্রহ্ম হইলেন প্রত্যক্ষ (কারণ)।

[২৫. শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন।]

যাহা হইতে কোন জিনিস উৎপন্ন হইয়া যাহাতে পুনরায় বিলীন হয় তাহাই হইল উপাদান-কারণ। "এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয়।" (ছা: ১.৯.১) "যাঁহা হইতে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশ কালে যাঁহাতে গমন করে ও যাঁহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও; তিনিই ব্রহ্ম" (তৈ: ৩.১)। এই শ্রুতিবচনগুলি প্রমাণ করে যে, ব্রহ্ম উপাদান-কারণও বটেন। একটি বস্তুকে ইহার নিমিত্ত-কারণ হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রলয়কালে ইহা তাহাতে ফিরিয়া যাইতে পারে না, যদি না ইহা উপাদান-কারণও হয়।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥

আত্মকৃতেঃ (যেহেতু তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন) পরিণামাৎ (পরিবর্তিত হইয়া)।

২৬. (ব্রহ্ম হইলেন জগতের উপাদান-কারণ) কেন না (শ্রুতি তাহাই বলেন) ব্রহ্ম (রূপান্তরিত) হইয়া নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

[২৬. "ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগৎরূপে সৃষ্টি করিলেন"— এই বাক্য হইতে ব্রহ্ম যে কর্তা ও কর্ম— নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ তাহা বুঝা যায়।]

"তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন" (তৈ: ২.৭) এই শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বয়ং ব্রহ্ম নিজের অভ্যন্তর হইতেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন— এবং এই সৃষ্টি একটি পরিণামের মাধ্যমেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রুতির 'স্বয়ম্‌' এই শব্দটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে অন্য কোন কারণ ক্রিয়াশীল ছিল না। এই পরিণাম আচার্য শঙ্করের মতে আপাতপ্রতীয়মান কিন্তু রামানুজের মতে উহা যথার্থ।

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥

যোনিঃ (মূল উৎপত্তিস্থল) চ (এবং) হি (যেহেতু) গীয়তে (বলা হইয়াছে)।

২৭. এবং যেহেতু (ব্রহ্মকেই) (সৃষ্টির) মূল বলা হইয়াছে।

[২৭. শ্রুতি ব্রহ্মকেই জগতের 'যোনি' অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়াছেন, এজন্যও উহার উপাদান-কারণত্বও সিদ্ধ হয়।]

"সেই কারণ-ব্রহ্মকে বিবেকীরা সর্বতোভাবে দর্শন করেন।" (মু: ১.১.৬) এই শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান-কারণ। সুতরাং ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

অধিকরণ ৮ : যে-সকল যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতকে খণ্ডন করা হইল তদ্দ্বারাই অন্যমতকেও খণ্ডন করা হইল।

এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১।৪।২৮॥

এতেন (ইহার দ্বারা) সর্বে (সকল) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যা করা হইল)।

২৮. ইহার দ্বারা (বেদান্ত বিরোধী সৃষ্টি-সম্পর্কিত মতবাদগুলির) ব্যাখ্যা করা হইল।

[২৮. সমস্ত বিরুদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মই— তাহা প্রথম অধ্যায়ের এই চারিটি পাদে ব্যাখ্যা করা হইল।]

জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণত্বের অভিন্নত্ব প্রমাণ করার ফলে যে-সকল মতবাদ মনে করে যে, উহারা ভিন্ন, তাহাদেরও সকলকেই খণ্ডন করা হইল। অর্থাৎ— এখানে শুধু সাংখ্যমতবাদকেই খণ্ডন করা হইল না, পরমাণুকারণবাদী এবং অন্যমতবাদেরও খণ্ডন করা হইল, কেন না ইহাদের কোন মতবাদই শ্রুতি প্রামাণ্য নহে এবং বহু শ্রুতির সঙ্গে ইহাদের বিরোধও আছে। এই সূত্রে 'ব্যাখ্যাত' এই ক্রিয়া পদটির দ্বিরুক্তির তাৎপর্য হইল এই যে, এই অধ্যায়টি এখানে সমাপ্ত হইল।

যাঁহারা পরমাণুকারণবাদী অথবা যাঁহারা বলেন যে, আদি কারণ অসৎ অথবা ইহাকে শূন্য বলেন— যেমন নাস্তিবাদীরা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমর্থনে যথাক্রমে নিম্নলিখিত শ্রুতিগুলির উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন:— "এই বীজগুলি যাহা প্রায় দৃষ্টির অতীত" (ছা: ৬.১২.১); "সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ-শব্দ-বাচ্য ছিল" (ছা: ৩.১৯.১); "কোন কোন বিদ্বান বস্তু-স্বভাবকেই জগৎ-কারণ বলেন; সেইরূপ অপর অবিবেকীরা কালকে কারণ বলেন" (শ্বে: ৬.১)। সাংখ্যবাদীদের এই মতের খণ্ডনে বলা যায় যে, অচেতনকে প্রথম কারণ হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রুতি-বিরুদ্ধ। "একক জানিতে পারিলে সব কিছুই বিজ্ঞাত হয়"— এই প্রতিজ্ঞাটি এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না ইত্যাদি যুক্তি এখানেও খাটে। সুতরাং এই সকল যুক্তিকে প্রামাণ্য এবং শাস্ত্রভিত্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উদ্ধৃত শ্রুতিগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: অণু অথবা অতি সূক্ষ্ম এই শব্দটি

আত্মাকেই বুঝাইয়াছে— ইহাকে এইরূপ বলার কারণ এই যে ইহাও অতি সূক্ষ্ম! এখানে 'অসৎ' বলিতে একটি অপ্রকট কারণাবস্থাকে বুঝাইয়াছে— যাহা নাম-রূপের আকারে তখনও পর্যন্ত বিমূর্ত হইয়া উঠে নাই। এই 'অসৎ' সম্পূর্ণ অনস্তিত্বরূপ অবস্থা নহে। প্রকৃতিকে প্রথম কারণ হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে শ্রুতি পূর্বপক্ষরূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং শ্রুতিই পরবর্তী শ্রুতির দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র আদি কারণ; অপর কিছুই নহে।

ব্রহ্ম-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় । প্রথম পাদ

প্রথম অধ্যায়ে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সব কয়টি বেদান্ত শ্রুতিই ব্রহ্মকে আদি কারণ হিসাবে গ্রহণপূর্বক তর্কনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি এই মতবাদের বিরুদ্ধ কিছু যুক্তির খণ্ডনের আবশ্যকতা রহিয়া গিয়াছে। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়াই এই অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে দেখানো হইয়াছে যে সাংখ্যবাদীদের প্রধানের এবং বৈশেষিক মতবাদীদের অণুর প্রথম কারণ হিসাবে শ্রুতিপ্রামাণ্য নাই। এই পাদে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া প্রধান এবং অণুকে প্রথম কারণ হিসাবে গ্রহণ করার যুক্তিগুলিকেও খণ্ডন করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১ : শ্রুতিবহির্ভূত স্মৃতিবাক্যের খণ্ডন।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥২।১।১॥

স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ (সেখানে অন্য স্মৃতির উল্লেখ উত্থাপন করার সম্ভাবনা-না-থাকা-জনিত দোষ দেখা দিবে) ইতি চেৎ, (যদি এইরূপ বলা হয়?)— ন, (না, তাহা হইতে পারে না) অন্য স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ (কারণ, সেখানে অন্যতর স্মৃতির উল্লেখের অবকাশ না-থাকা-জনিত দোষ দেখা দিবে)।

১. যদি এইরূপ বলা হয় যে (ব্রহ্মকেই সৃষ্টির আদি কারণরূপে গ্রহণ করার মতবাদ হইতে) কোন স্মৃতির উল্লেখের সুযোগ না-দেওয়া-জনিত দোষ দেখা দিবে, (ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে) না; (তাহা নহে) কারণ (এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করার জন্য) সেখানে অন্যতর স্মৃতির উল্লেখের সম্ভাবনা না-থাকা-জনিত দোষের উৎপত্তি হইবে।

[১. যদি সাংখ্যসম্মত নহে বলিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বকে অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বেদের অনুকূল মন্বাদি স্মৃতির উল্লেখের সম্ভাবনাও থাকে না; সেই ক্ষেত্রে স্মৃতিগুলির পরস্পরের মধ্যেই একটা বিরোধ দৃষ্ট হয়।]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, সাংখ্য মতের শ্রুতিপ্রামাণ্য নাই। এখন সাংখ্য মতের যে স্মৃতিপ্রামাণ্যও নাই তাহা প্রমাণ করিয়া ইহার খণ্ডন করা হইতেছে।

যদি প্রধানের কারণত্বের মতবাদকে অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মহামুনি কপিল প্রচারিত এবং অপর বহু বিদগ্ধ ঋষি স্বীকৃত সাংখ্য দর্শনটিই অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। সুতরাং ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, বেদান্ত শ্রুতিগুলিকে এমনভাবেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যাহাতে স্মৃতির প্রামাণ্যও রক্ষিত হয় এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে না হয়। ইহা হইল বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য। এই সূত্রটি বিরুদ্ধপক্ষের এই অভিমতের উত্তররূপেই বলিতেছে: যদি বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য শ্রুতিকে মান্য করার জন্য ব্রহ্মকে সৃষ্টির আদি-কারণরূপে গ্রহণ করার মতবাদকে পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে, এই মতবাদকে পরিহারের দ্বারা আমরা মন্বাদি অন্য বহু স্মৃতিকেই গ্রহণ করিতে পারিব না, অথচ এই সকল স্মৃতি শ্রুতিভিত্তিক এবং সেইজন্য অধিকতর প্রামাণ্য এবং ইহাদের সকলেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মকেই জগতের আদি-কারণ হিসাবে গ্রহণ করার মতবাদকে অনুসরণ করেন। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে বেদবিরোধী স্মৃতিগুলিকে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২।১।২॥

ইতরেষাং (অন্যগুলির) চ (এবং) অনুপলব্ধেঃ (সেখানে কোন উল্লেখ) না থাকায়।

২. এবং (শাস্ত্রে) যেহেতু কোন উল্লেখ নাই (প্রধান ব্যতীত অন্য কোন সত্তার) (সেইজন্য সাংখ্যমত প্রামাণ্য হইতে পারে না)।

[২. মনুস্মৃতি এবং মহাভারতাদি গ্রন্থও শ্রুতিশাস্ত্রসম্মত নয় বলিয়া ইহারা বেদবিরুদ্ধ, সাংখ্যবাদীদের এই মতবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না।]

তর্কের খাতিরে, এমনকি সাংখ্যের প্রধানকেও যদি জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়— কারণ বেদান্তবাদীরাও তো মায়াকে জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সাংখ্যবাদীদের মতে প্রধান হইলেন স্বাধীন সত্তা, অপর পক্ষে মায়া হইলেন ব্রহ্মের শক্তিরূপে ব্রহ্মের অধীন সত্তা। তথাপি বেদের কোথাও সাংখ্যের প্রধান ব্যতীত অন্য কোন সত্তার উল্লেখ না থাকায় সাংখ্যদর্শন প্রামাণ্য হইতে পারে না।

অধিকরণ ২ : যোগ দর্শনের খণ্ডন।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥২।১।৩॥

এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (যোগ দর্শনও) প্রত্যুক্তঃ (খণ্ডিত হইল)।

৩. ইহার দ্বারা যোগদর্শনকেও খণ্ডন করা হইল।

[৩. একই যুক্তিতে সাংখ্য মতানুসারী যোগ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্যকেও খণ্ডন করা হইল।]

সাংখ্যবাদীদের মতকে খণ্ডন করার পর এই সূত্র যোগ স্মৃতির স্বীকৃত প্রধানকে প্রথম কারণ হিসাবে গ্রহণ করার মতবাদকেও খণ্ডন করিতেছে। সাংখ্যবাদীরা প্রধানকে একটি স্বাধীন সত্তারূপেই জগতের আদি কারণ হিসাবে গ্রহণ করেন। যোগস্মৃতিও প্রধানকে আদিকারণ হিসাবেই গ্রহণ করেন— তবে যোগস্মৃতির মতে প্রধান পৃথক্ একটি সত্তা হইলেও ইহা অচেতন এবং সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্বেতাশ্বতরের ন্যায় কোন কোন উপনিষদে যোগ দর্শনের উল্লেখ আছে। ইহা নিদিধ্যাসনের সহায়ক— সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের ধারণার জন্য নিদিধ্যাসনের বিশেষ প্রয়োজন এবং এইজন্যই জ্ঞানলাভের অন্যতম একটি উপায়। সুতরাং এই যোগস্মৃতি শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই প্রামাণ্য। কিন্তু যোগশাস্ত্রও প্রধানকে স্বীকার করেন বলিয়া ইহা প্রথম কারণ, বিরুদ্ধবাদীরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সূত্র প্রমাণ করে যে, পূর্ববর্তী সূত্রে যে-যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহা দ্বারাই যোগস্মৃতির খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। কারণ, ইহাও একটি প্রধানের এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুগুলির কথা বলে— যাহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না। যদিও স্মৃতি অংশত প্রামাণ্য তথাপি যে-অংশে ইহা শ্রুতি বিরুদ্ধ, সেই অংশে প্রামাণ্য হইতে পারে না। স্মৃতির সেই অংশ মাত্র গ্রাহ্য যাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ নহে।

অধিকরণ ৩ : ব্রহ্ম জগৎ হইতে বিলক্ষণ হইলেও জগতের কারণ হইতে পারেন।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥২।১।৪॥

ন (নহে) বিলক্ষণাৎ (ইহার বিপরীত লক্ষণ হেতু) অস্য (ইহার) তথাত্বং (এইরূপ হওয়া) চ (এবং) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে)।

৪. (ব্রহ্ম) নহেন (জগতের কারণ) যেহেতু ইহা (জগৎ) বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ লক্ষণযুক্ত); এবং ইহার এইরূপ হওয়ার জন্যই (ব্রহ্ম হইতে পৃথক্) (জানা যায়) শাস্ত্র হইতে।

[৪. অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; অতএব চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।] (সূত্রটি পূর্বপক্ষ।)

ব্রহ্ম হইলেন বিজ্ঞানময়, বিশুদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত; অন্য পক্ষে জগৎ হইল স্থূল, অবিশুদ্ধ ইত্যাদি এবং সেইজন্যই ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণযুক্ত। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। কার্য কারণের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং কার্য এবং কারণ সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞানময় সত্তা জড় বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না— এবং ইহার বিপরীত ক্রমও এইরূপ, অর্থাৎ কোন জড় সত্তা চৈতন্যময় কিছু উৎপাদন করিতে পারে না। ব্রহ্ম এবং জগৎ যে তাহাদের লক্ষণগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা এই জাতীয় শ্রুতি হইতে জানা যায়: "ব্রহ্ম চেতন এবং জড় উভয়েই হইলেন (তৈ: ২.৬)।" এখানে অচেতন বলিতে জগৎকে বুঝাইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জড়জগতের আদি কারণ হইতে পারেন না। যদিও এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥২।১।৫॥

অভিমানিব্যপদেশঃ (সেই সকল বস্তুর অভিমানী দেবতার বিষয়ে উল্লেখ আছে) তু (কিন্তু) বিশেষ-অনুগতিভ্যাম্ (যেহেতু বিশেষ লক্ষণযুক্ততার কথা এবং তাহাদের অধিষ্ঠানের কথাও বর্ণিত আছে)।

৫. কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা উল্লিখিত আছে (ইন্দ্রিয়সকলের) যেহেতু (দেবতা হিসাবে) তাহাদের বিশেষ লক্ষণের উল্লেখও আছে এবং যেহেতু এইরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখও আছে (প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কার্যের উপর দেবতার কর্তৃত্ব শ্রুতির অন্যত্রও সমর্থিত হইয়াছে)।

[৫. শ্রুতিতে যেসব স্থানে ইন্দ্রিয়াদির কথা উল্লেখ আছে সেসব স্থানে তদভিমানী দেবতারও উল্লেখ আছে বুঝিতে হইবে। (ইন্দ্রিয়াদি অচেতন হইলেও তদভিমানী দেবতাগণ চেতনাসম্পন্ন)।]

যে-সকল বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, জগৎ এবং ব্রহ্ম যেহেতু লক্ষণগতভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ, ব্রহ্ম চৈতন্যময় এবং জগৎ জড়, সেইজন্য ব্রহ্ম ও জগৎ কার্য কারণ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে পারেন না, সেইসকল বিরুদ্ধবাদিগণ এখানে একটি সম্ভাব্য আপত্তির আশঙ্কা করিয়া এই সূত্রে তাহার উত্তর দিতেছেন। (বৃহঃ উপনিষদে ৬.১.৭) এই শ্রুতিটি আছে— "এই ইন্দ্রিয়সকল একদা আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য কলহ পরায়ণ

হইয়া"— ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইন্দ্রিয়সকলও জড় নহে— চেতনাসম্পন্ন। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে এই শ্রুতি হইতে আমরা যেন জগতের চৈতন্য সত্তার অস্তিত্বকে অনুমান করিয়া না ফেলি, কারণ এখানে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কথাই বলা হইয়াছে। কারণ এই জাতীয় প্রসঙ্গের উল্লেখ কৌষীতকী উপনিষদে আরও স্পষ্টতরভাবেই করা আছে। "এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ (বাক্ ইত্যাদি) তাঁহাদের স্বীয় প্রাধান্য বিষয়ে কলহ-পরায়ণ হইয়া"......ইত্যাদি (কৌ: ২.১৪)। এবং আরও বহু শ্রুতিতে অভিমানী দেবতাদের অস্তিত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবিষ্ট হইলেন" (ঐ: আরণ্যক ২.৪.২৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬ষ্ঠ অধ্যায়) শ্রুতি বিষয়েও একই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে— যেখানে অগ্নি প্রভৃতির চিন্তাশক্তির কথা এবং পর্যায়ক্রমে পরবর্তী পদার্থ সৃষ্টির কথা উল্লিখিত আছে। এখানে চিন্তাশক্তি সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তাহা হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মের শক্তি— যে শক্তি ব্রহ্মের প্রতিটি কার্যের সঙ্গে অধীক্ষক (নিয়ন্ত্রী) শক্তি হিসাবে সংযুক্ত। এই জাতীয় শ্রুতি হইতে আমরা জগতের চৈতন্যসত্তার অস্তিত্বের অনুমান করিতে পারি না, কারণ জগৎ হইল জড় এবং সেইজন্য লক্ষণগতভাবে ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম জড় জগতের কারণ হইতে পারেন না।

দৃশ্যতে তু ॥২।১।৬॥

দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) তু (কিন্তু)।

৬. কিন্তু ইহা (এই জাতীয় উৎপত্তি) দৃষ্ট হয়।

[৬. চেতন হইতে অচেতন এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে।]

'তু' (কিন্তু) এই শব্দটি পূর্ববর্তী সূত্রে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তিটির খণ্ডন করিতেছে। পূর্বপক্ষ বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না কারণ জগতের প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, বৃশ্চিকাদি চেতনাসম্পন্ন জীব গোময়াদি অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ চেতনাসম্পন্ন মাকড়সা হইতে অচেতন তন্তু ইহার জালের জন্য সৃষ্ট হয়। সেইরূপভাবেই অচেতন নখ কেশাদি চেতনাসম্পন্ন জীব মানুষ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব যে, এই জড়জগৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, মানুষের দেহই হইল কেশ নখাদির কারণ—মানুষ নয়; এইরূপে গোময়ই হইল কীটের দেহের কারণ। তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিয়াই

লইতে হয় যে, কার্য এবং কারণের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, যেহেতু উপরের দুইটি দৃষ্টান্তেই দেখা গেল যে, উহাদের একটি হইল সচেতন কিছুর আশ্রয়স্থল এবং অপরটি এইরূপ নহে। তাহারা সর্বতোভাবে একরূপ নহে। কার্য এবং কারণ যদি সম্পূর্ণরূপে একই হইত তাহা হইলে কার্য এবং কারণ বলিয়া কোন বৈশিষ্ট্যই থাকিত না এবং তাহাদের সংজ্ঞাও পৃথক্ হইত না। সুতরাং আমাদের মানিয়াই লইতে হয় যে, কার্য এবং কারণ সর্বতোভাবে একরূপ হইতে পারে না। অথবা কারণের কিছুটা গুণ কার্যে অবশ্যই দৃষ্ট হইবে— যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডের অস্তিত্ব ঘটে দৃষ্ট হয় যদিও মৃৎপিণ্ডের এবং ঘটের আকার ইত্যাদি ভিন্ন। এইরূপভাবেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ব্রহ্ম এবং জগতের ক্ষেত্রেও কারণরূপ ব্রহ্মের কিছুটা গুণ যথা 'সৎ' এবং 'চিৎ' সত্তা কার্যরূপ জগতের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। জগতের সব কিছুই অস্তিত্ববান (সৎ)— এবং জগতের এই 'সৎ' গুণটি ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত, কারণ ব্রহ্ম স্বয়ংই 'সৎ'-স্বরূপ। পুনশ্চ ব্রহ্মের চিৎ শক্তি সমগ্র জগতকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের এই দুইটি গুণ জগতের মধ্যেও বর্তমান রহিয়াছে। ইহা হইতেই আমাদের এই উভয়কে কার্য কারণ সম্বন্ধে যুক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়াকে সমর্থন করা যায়— যদিও অন্য বহু বিষয়ে উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

অসদিতি চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥২।১।৭॥

অসৎ (অসৎ) ইতি চেৎ (যদি বলা হয়), ন (না, তাহা হইতে পারে না) প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (কারণ ইহা একটা প্রতিষেধ মাত্র)।

৭. যদি এইরূপ বলা হয় (তাহা হইলে কার্যরূপ জগৎ হইয়া যাইবে) অসৎ (সৃষ্টির পূর্বে); (ইহার উত্তরে বলা যায়) না, তাহা হইতে পারে না, কারণ ইহা একটা প্রতিষেধ মাত্র (ইহার কোন ভিত্তি নাই)।

[৭. কোন একটি বস্তু হইতে উহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত কোন বস্তুর উৎপত্তিকে স্বীকার করিলে উৎপন্ন বস্তুটি 'অসৎ' হইয়া পড়ে, যদি এইরূপ বলা হয়? উত্তরে বলা যায়, 'না তাহা নহে; কারণ পূর্ব সূত্রে একটা' সাধারণ প্রতিষেধ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। (কার্য এবং কারণ বস্তুত যে এক বস্তু নহে তাহা বলা হয় নাই)]

যদি বিজ্ঞানময়, শুদ্ধ ও নির্গুণ ব্রহ্ম ইহার বিপরীতধর্মী জগতের কারণ হন, তবে ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল, কারণ তখন ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু ছিলেন। ইহার অর্থ হইল কোন অসৎ বস্তু হইতে সৎ-বস্তুর উৎপত্তি

হইয়াছে।— কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্র এইরূপ সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে না। বিরুদ্ধপক্ষের এই আপত্তিকে এই সূত্রটি এই বলিয়া খণ্ডন করে যে, এই নিষেধটি একটি সাধারণ উক্তি মাত্র, ইহার বিশেষ-উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক গুরুত্ব নাই। কার্য ইহার উৎপত্তির পূর্বে এবং পরেও কারণে অবস্থান করে। ইহা স্বাধীনভাবে কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া উৎপত্তির পূর্বে বা পরেও থাকিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব হইতেই জগৎ ব্রহ্মে বর্তমান ছিল এবং ইহা একান্তত অসৎ নহে।

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥২।১।৮॥

অপীতৌ (প্রলয়কালে) তদ্বৎ (সেইরূপভাবে) প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু প্রসঙ্গের কারণ আছে) অসমঞ্জসম্ (অসম্ভব)।

৮. যেহেতু প্রলয়কালে (কারণটি হইয়া যায়) সেইরূপ (অর্থাৎ কার্যেরই অনুরূপ) (ব্রহ্মকে যেখানে জগৎ-কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে সেই মতবাদটি) তখন অসম্ভব হইয়া যায়।

[৮. ব্রহ্মকে যদি জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে প্রলয়কালে জগৎ যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন ব্রহ্মের জগতের ন্যায় বিকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে; অতএব ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ এই মতবাদটি অসঙ্গত হইয়া যায়।]

বিরুদ্ধবাদিগণ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন: যদি ব্রহ্ম জগতের কারণ হন, তাহা হইলে জগৎ যখন প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন হইবে তখন জগতের বিকারাদি ব্রহ্মকেও বিকৃত করিতে পারে— যেমন জলে লীন হইয়া লবণ জলকে বিকৃত করে। সুতরাং ব্রহ্ম সেই ক্ষেত্রে অশুদ্ধ হইয়া যাইবেন এবং তিনি উপনিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী জগতের সর্বদর্শী কারণ হইতে পারিবেন না। পুনশ্চ, প্রলয়কালে সকল বস্তুই ব্রহ্মে লীন হইয়া একত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নূতন সৃষ্টির জন্য সেখানে বিশেষ কোন কারণের অস্তিত্বেরও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ অবস্থার পরও যদি আমরা মনে করি যে, নূতন একটি সৃষ্টি সম্ভব, তাহা হইলে যে জীবাত্মাগুলি মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরও এই সংসারে পুনরায় আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। আবার একথাও বলা চলে না যে, প্রলয় অবস্থায় জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থান করে; কেন না তাহা হইলে সেই অবস্থাকে মোটেই প্রলয়াবস্থা বলা চলে না। সুতরাং বেদান্তবাদীদের ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মতবাদটি আপত্তিজনক— কারণ ইহা হইতে নানা অসঙ্গতির উদ্ভব হইবে।

ন তু, দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥২।১।৯॥

ন (নহে) তু (কিন্তু) দৃষ্টান্তভাবাৎ (বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বলিয়া)।

৯. কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ (এতাদৃশ) বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

[৯. অচেতনের চেতনের সহিত মিলনে যে চেতনের কোন বিকার হয় না তদনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।]

এখানে আপত্তির উত্তর দেওয়া হইতেছে: কার্য যখন কারণে লীন হয় তখন কার্যের বিকারাদি যে কারণকে বিকৃত করিতে পারে না তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় একটি মৃন্ময় ঘট যখন ভগ্ন হইয়া উহার মূলাবস্থা মৃত্তিকায় লীন হইয়া যায় তখন ঘট তাহার বিশেষগুণগুলি মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারে না। একেবারে লীন হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটিই হইল এই যে, কার্যের সকল গুণগুলিই আর থাকিতে পারে না— তাহা না হইলে ইহা একেবারে লীন হওয়াই হইল না। উপরন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কার্যের মধ্যে কারণের গুণগুলি থাকিবেই কিন্তু বিপরীত ক্রমে ইহা সত্য নহে (অর্থাৎ কারণের মধ্যে কার্যের গুণ থাকা)। সুতরাং কার্যের গুণগুলি কারণকে স্পর্শ করিতে পারে না। অপরপক্ষে এইরূপ একটি আপত্তিও উত্থাপন করা যাইতে পারে— যেহেতু কার্যটি হইল কারণটিরই নূতন অবস্থান্তর মাত্র, সেইহেতু কার্যের ভাল এবং মন্দ সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই নিশ্চিতই কারণে বর্তমান ছিল। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, জগৎ আসলে একটি ভ্রান্তিমাত্র। ব্রহ্ম মাত্র আপাতদৃষ্টিতেই পরিবর্তিতরূপে জগৎ হইয়াছেন এবং সেইজন্যই তিনি জগতের দ্বারা কখনও বিকৃত হন নাই যেমন যাদুকর তৎ-কৃত যাদুদ্বারা বিকৃত হয় না।

অপর যে অসঙ্গতিটি প্রদর্শন করা হইয়াছে যেমন প্রলয়কালে জগৎ লীন হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়, সেইজন্য পুনরায় সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকে না, আর যদি পুনঃ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেরা পুনরায় বদ্ধ হইয়া যাইতেন— তাহাও এখানে প্রযোজ্য হইতে পারে না; কারণ, এই দৃষ্টান্তের সমান্তরাল বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। সুষুপ্তিকালে আমাদের কোন ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে না, সে অবস্থায় নানাত্বের অভিজ্ঞতা থাকে না— কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা জগতের দ্বৈত ভাব প্রত্যক্ষ করি। প্রলয়কালে এই জাতীয় ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। পূর্বদৃষ্টান্তে অবিদ্যার অস্তিত্বই হইল জগতের পুনরাবির্ভাবের কারণ যেহেতু অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। এইরূপভাবেই প্রলয়কালে অবিদ্যার আকারে সেই বিশ্লিষ্টকারিণী শক্তিটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু মুক্ত জীবাত্মার ক্ষেত্রে

যেহেতু কোন অবিদ্যাই অবশিষ্ট থাকে না, সেইজন্যই ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত অবস্থায় স্থিত মুক্ত আত্মার পুনরাবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২।১।১০॥

স্বপক্ষদোষাৎ (যেহেতু নিজের যুক্তিরই বিরুদ্ধ) চ (এবং)।

১০. এবং যেহেতু (প্রদর্শিত) আপত্তিগুলি (প্রযুক্ত হইতে পারে) তাহার নিজের (সাংখ্যের) মতবাদের ক্ষেত্রে (ও)।

[১০. ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ে সাংখ্যবাদীরা যে-সকল দোষের উল্লেখ করেন, সাংখ্যবাদীদের মত বিষয়েও সেই-সকল দোষ দৃষ্ট হয়।]

সাংখ্যবাদিগণ বেদান্তবাদীদের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই-সকল আপত্তি তাঁহাদের বর্ণিত আদি কারণ 'প্রধান' সম্পর্কেও সমভাবেই প্রযোজ্য। আকার রস ইত্যাদি প্রধানে দৃষ্ট হয় না, তথাপি আমরা প্রধান হইতে উৎপন্ন জগতের ভিতর এই-সকল বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই। প্রলয়কালে সকল বস্তুর ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবার আপত্তিটি সাংখ্যের প্রধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এইভাবে, এই বিষয়ে বেদান্তের বিরুদ্ধে যে-কোন আপত্তিই উত্থাপন করা হউক না কেন, সাংখ্যের ক্ষেত্রেও সেই সব আপত্তি যথার্থভাবেই প্রযোজ্য। সুতরাং এই আপত্তিগুলি এখানেই পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দুই মতবাদের মধ্যে, যেহেতু বেদান্ত শ্রুতি-ভিত্তিক, সেইজন্য ইহা অধিকতর প্রামাণ্য। উপরন্তু, বেদান্ত বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে এই আপত্তিগুলির সব কয়টিরই খণ্ডন করা হইয়াছে, অপর পক্ষে সাংখ্যবাদীদের দৃষ্টিকোণ হইতে এই-সকল আপত্তির খণ্ডন করা সম্ভব নহে।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি, অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ, এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥২।১।১১॥

তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ (যেহেতু তর্কের নিশ্চিত কোন ভিত্তি নাই) অপি (এবং) অন্যথা (অন্যভাবেও) অনুমেয়ম্ (অনুমান করা সঙ্গত) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) এবং (এইরূপভাবে) অপি (তাহা হইলে এমনকি) অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (অবিমুক্ত [বদ্ধ] অবস্থায় থাকিয়া যাইবারই আশঙ্কা)।

১১. আরও এই কারণে যে, তর্কের স্থির কোন ভিত্তি নাই (ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্তকে অন্যথা করিতে পারে না)। যদি বলা হয় যে, এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিদ্বারা অন্যথাও প্রমাণ করা যায় (যাহাতে এই ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকা যায়) (আমরা বলিব) তাহা হইলেও বদ্ধ থাকার আশঙ্কা থাকিয়াই যায় (এই ত্রুটি হইতে— এই আলোচ্য বিষয়ের সমস্যা বিষয়ে)।

[১১. তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; অতএব শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের কারণত্ববাদ কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা চলে না।]

যে-কোন ব্যক্তির যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য ব্যক্তির যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা যায়। কপিলের ন্যায় মুনির যুক্তিকেও কণাদের ন্যায় অন্যমুনি খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তর্কের যেহেতু কোন সুনিশ্চিত ভিত্তি নাই, সেইজন্য তর্কের দ্বারা বেদান্তের সিদ্ধান্তকে অন্যথা করা সম্ভবপর নহে, কারণ বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, যুক্তির বিষয় এই সিদ্ধান্তটিও যুক্তির দ্বারাই পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা সত্য নহে যে, যুক্তির একেবারেই কোন স্থির ভিত্তি নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি অকাট্য সুদৃঢ় হয়। শুধু আমাদের যথাযথভাবে যুক্তিকে প্রয়োগ করিতে হইবে। সূত্রটির পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি অভ্রান্ত হইতে পারে তথাপি আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এই দোষকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কারণ, জগৎকারণ (ব্রহ্ম) হইলেন অতীন্দ্রিয় বস্তু এবং তাঁহার কোন পরিচায়ক লক্ষণ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষভিত্তিক অনুমান বস্তু হইতে পারেন না— অথবা পক্ষান্তরে আমরা সূত্রে উল্লিখিত 'মোক্ষ' শব্দটিকে যদি মুক্তি অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহা এইরূপ দাঁড়ায়: কোন যথার্থ বস্তুর অভ্রান্ত জ্ঞান ঐ বস্তুটির উপরই নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য ইহা সর্বদাই একরূপ হয়। সুতরাং ইহার সম্পর্কে মতবাদের পার্থক্যের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু যুক্তির সিদ্ধান্ত কখনও একরূপ হইতে পারে না। যেমন সাংখ্যবাদিগণ যুক্তির মাধ্যমে প্রধানকেই জগতের আদি কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অপরপক্ষে নৈয়ায়িকগণ পরমাণুগুলিকেই আদিকারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। এখন আমরা কোন্ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিব? সুতরাং যুক্তির মাধ্যমে, শাস্ত্রপ্রমাণকে বাদ দিয়া আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি না; এবং যেহেতু এই উপায়ে সত্যোপলব্ধি হয় না— সেইজন্যই আমাদের মুক্তিলাভও হইবে না। সেইজন্যই যে-সকল যুক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহারা জ্ঞানের পক্ষে প্রামাণ্য হইতে পারে না— এবং শ্রুতিবচনের বাধা হইতে পারে না।

অধিকরণ ৪ : সাংখ্যবাদিগণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত যুক্তি খণ্ডনের পদ্ধতি অনুসারেই অণুবাদী ও অন্য মতাবলম্বীদের মতকেও খণ্ডন করা যায়।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।।২।১।১২।।

এতেন (ইহার দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (শিষ্টগণ যাহাকে গ্রহণ করেন নাই) অপি (ও) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল)।

১২. ইহার দ্বারা (সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত যুক্তির দ্বারা) (অন্য মতগুলিকেও) যাহাকে শিষ্টগণ গ্রহণ করেন নাই (মনু এবং অন্যান্যগণ)— তাহাও ব্যাখ্যাত হইল।

[১২. এইরূপ সাংখ্য মতের খণ্ডনের দ্বারা অন্যান্য বেদবিরুদ্ধ মত সকলেরও খণ্ডন করা হইল বুঝিতে হইবে।]

সাংখ্যদর্শনের অংশ বিশেষকে মুনিগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও এই মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর, অপ্রামাণ্য মতবাদগুলি, যথা কণাদের মত এবং প্রথম কারণ হিসাবে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ সম্পর্কেও কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না; এই সকল মতবাদকেও জ্ঞানিগণ সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। এই মতবাদগুলিও সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারাই খণ্ডিত হইল— কারণ যে যুক্তিগুলির বলে ইহা খণ্ডন করা হইল— সেগুলি অন্যত্রও অভিন্ন।

অধিকরণ ৫ : ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য অদ্বিতীয়ত্ব সত্যের বিরোধী নহে।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ, স্যাল্লোকবৎ ।।২।১।১৩।।

ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ভোক্তৃত্ব বিষয়ে আপত্তি তুলিলে) অবিভাগঃ (কোন বিভেদ নাই) চেৎ (যদি বলা হয়) স্যাৎ (থাকিতে পারে) লোকবৎ (লোকব্যবহারে যাহার অভিজ্ঞতালাভ হয়)।

১৩. যদি এইরূপ বলা হয় যে (ব্রহ্মই যদি কারণ হন তাহা হইলে) যেহেতু (ভোগ্য বস্তু) ভোক্তারূপে পরিণত হয়, পার্থক্য রাহিত্য (ভোক্তা এবং ভোগ্যের মধ্যে দেখা দিবে), এর উত্তরে বলা যায় যে— এইরূপ বিভেদ থাকিতে পারে (তাহাতে কোন প্রভেদ নাই), যেমন আমরা সাধারণ ব্যবহারিক জগতেও দেখিয়া থাকি।

[১৩. ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ববাদের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ সম্বন্ধ অসঙ্গত— এইরূপ বলা যায় না; কারণ অভিন্ন বিষয়ে ভেদ সম্বন্ধের দৃষ্টান্তও লোক জগতে বহু আছে।]

ব্রহ্ম কারণত্বের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। আমরা জগতে নানা পার্থক্য দেখিয়া থাকি। এখন জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল শ্রুতি অপেক্ষাও বলবত্তর। সেইজন্যই শ্রুতি এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত যাহা বলেন তাহা গ্রাহ্য নহে। ধারণাটি এইরূপ: আমাদের অভিজ্ঞতায় ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্ম হইলেন উপাদান-কারণ, সেই ক্ষেত্রে কার্যরূপ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই হইবে, এই পরিস্থিতিতে বেদান্তমতে জীব এবং ব্রহ্ম হইবেন অভিন্ন— এখানে কর্তা এবং কর্মের মধ্যে ভেদ দূর হইয়া যাইবে, যেহেতু পূর্ববর্তী কারণটি কার্যে পরিণত হইয়া যাইবে। সেইজন্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিরুদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান-কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

সূত্রটির পরবর্তী অংশটি প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির খণ্ডন করিতেছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অভিন্ন জিনিসের মধ্যেও যে ভিন্ন প্রতীতি একেবারে থাকে না তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়— সমুদ্রজলের সঙ্গে তরঙ্গ, ফেন ইত্যাদি অভিন্নই, তথাপি তরঙ্গরূপে এবং ফেনরূপে তাহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন। ইহাদের কারণরূপে সমুদ্রজলের সঙ্গে ইহারা কিন্তু তরঙ্গ, ফেন ইত্যাদিরূপে ভিন্ন— ফলত এখানে কোন বিরোধই নাই। সুতরাং নাম এবং রূপের কারণে একই সঙ্গে বস্তুর মধ্যে ভেদ এবং অভেদ দুইই থাকিতে পারে। সেইজন্যই ব্রহ্মের দৃষ্টিকোণ হইতে ভোক্তা এবং ভোগ্য ভিন্ন নহে, কিন্তু ভোক্তা এবং ভোগ্য হিসাবে তাহারা ভিন্ন। ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

এই সূত্রটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। ব্রহ্ম যদি কারণ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীব হিসাবে ভোক্তাও হইবেন, কারণ এখানে কার্য ও কারণের মধ্যে কোন ভেদই নাই। ইহারই ফলশ্রুতিরূপে জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা এবং ব্রহ্মের মুক্তাবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না। এই সূত্রটিতে বলা হইয়াছে যে— যেমন একটি পরিচ্ছন্ন বস্তুর এবং অপরিচ্ছন্ন দর্পণের উপর উহার বিকৃত প্রতিবিম্বের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেইরূপ অন্তঃকরণের মলিনতাবশত নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে বদ্ধজীবের প্রতিবিম্বের একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

অধিকরণ ৬: কার্যের কারণ হইতে অভিন্নত্ব।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥

তদনন্যত্বম্ (ইহার অনন্য ভাব) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণ ইত্যাদি শব্দ হইতে)।

১৪. ইহার (কার্যের) অভিন্নত্ব (কারণ হইতে উৎপন্ন ফল) (আরম্ভণ ইত্যাদি শব্দ হইতে)।

[১৪. 'বাচারম্ভণ' ইত্যাদি শব্দ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই কার্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।]

পূর্ববর্তী সূত্রে পরিণামবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে (অর্থাৎ যে মতে ব্রহ্ম কার্যত জগৎরূপে পরিণত হন) ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্বের আপত্তিকে খণ্ডন করা হইয়াছে— কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত ইহার বিরোধ আছে। এখানে, এখন সেই আপত্তিকেই বিবর্তবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে (অর্থাৎ যে মতে জগৎরূপে প্রতিভাত হন ব্রহ্ম) করা হইতেছে। অদ্বৈত বেদান্তের ইহাই ভিত্তি। আপত্তিটি হইল এইরূপ: "এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই" (কঠ: ২.১.১১) ইত্যাদি শ্রুতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিরুদ্ধ। যুক্তিদ্বারাও জানা যায় যে, যে-সকল বস্তু পরস্পর রূপান্তরিত হয়, তাহাদের মধ্যে একই কালে ভেদ এবং অভেদ ভাব থাকিতে পারে না। এইজন্যই আমাদের সন্দেহ হয়। একই চন্দ্রে আমরা দুইটি চন্দ্রকে দেখিতে পারি না। পূর্ববর্তী সূত্রে যাহা বলা হইয়াছিল— অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য শুধু নাম এবং রূপের মাত্র, তাহাও সত্য নহে, কারণ যে-বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়, যাহা অদ্বৈতস্বরূপ সেখানে নাম-রূপগত পার্থক্যও অসম্ভব। এখানে সমুদ্রের দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য নহে; কারণ, এখানে সমুদ্র এবং ইহার পরিণাম তরঙ্গ এবং ফেন— উভয়ই হইল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ব্রহ্মকে একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান এবং সমাধির মাধ্যমেই উপলব্ধি করিতে হয়। তাহা হইলে সত্য বস্তুটি কি? ইহা হইল একত্ব— অদ্বৈতভাব। যেহেতু কার্য কারণ হইতে অভিন্ন সেইজন্য কারণই একমাত্র সত্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে মৃত্তিকা এবং ঘটের দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে (কারণ) সমস্ত বিকারই বাচাবলম্বনে অবস্থিত নাম মাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য;...... হে সৌম্য, এইরূপেই উক্ত উপদেশ হইয়া থাকে।" (ছা: ৬.১.৪-৬)। এখানে শ্রুতি 'বিকার' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মূল উপাদান মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটাদির পৃথক্ কোন সত্তা নাই। ইহারা পৃথক্ কোন বস্তু নহে, ইহা বিভিন্ন অবস্থা মাত্র যেমন একই দেবদত্তের বাল্য, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা মাত্র ইহাদের কোনটাই সত্য নয়। সুতরাং মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানলাভ করিয়াই ঘটাদির আসল স্বরূপকে জানিতে হয়। বিভিন্ন রূপকে জানিতে না পারিলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ ইহারা অসৎ বলিয়া জ্ঞাতব্যই নহে। যদিও ঘটাদি বস্তুসকল আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় তথাপি বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কোন সত্যই ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা বাক্য হইতে

উদ্ভূত কতকগুলি নামমাত্র— ইহার অধিক আর কিছুই নহে। যেহেতু ইহারা অবিদ্যার মাধ্যমেই জ্ঞাত হয়— সেইজন্য ইহারা অসৎ। অপরপক্ষে মৃৎপিণ্ডকে নাম এবং রূপ হইতে পৃথক্‌ভাবেও জানা যায়, সুতরাং ইহা সত্য। সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং এই জগৎ অসৎ। জগৎ ইহার কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া সত্য হইল এই যে, ইহা এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' যে-সকল লোকের অভিজ্ঞতার অভাববশত বস্তুর সত্তা বিষয়ে এই অন্তর্দৃষ্টি নাই, তাহাদের নিকট সর্বদাই ভেদ এবং অভেদ দুইই থাকিবেই, যেমন সমুদ্র এবং ইহার তরঙ্গের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে একটা ভেদাভেদ বুদ্ধি আছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই ভেদজ্ঞান আপেক্ষিক— যথার্থ নহে।

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২।১।১৫॥

ভাবে (বিদ্যমান থাকিলে) চ (এবং) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধ হয়— জ্ঞাত হয়)।

১৫. এবং (যেহেতু) থাকে বলিয়া (কারণের অস্তিত্ব) (কার্য) উপলব্ধ হয়।

[১৫. কারণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই কার্যের উপলব্ধি হয়।]

কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্যের জ্ঞান হইতে পারে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কার্য কারণ হইতে পৃথক্ নহে। ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই জগৎ ব্যাপার প্রতিভাত হয়— ব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত ইহা সম্ভব হইত না। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥২।১।১৬॥

সত্ত্বাৎ (ইহার অবস্থান হেতু) চ (এবং) অবরস্য (পরবর্তীর, কার্যের)।

১৬. এবং পরবর্তীর (কার্য যাহা কারণের অনুগামী হয়) (তাহা সৃষ্টির পূর্বে কারণরূপে থাকে)।

[১৬. (পরবর্তী) কার্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে কারণে অবস্থান করে বলিয়াও কার্য-কারণ ভিন্ন নহে।]

শ্রুতি বলেন যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ইহার কারণরূপ ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল: "সুনিশ্চিতভাবেই সৃষ্টির প্রারম্ভে এই একমাত্র আত্মাই ছিলেন" (ঐ: আরণ্যক ২.৪.১.১)। "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক সৎ-রূপে বিদ্যমান ছিল" (ছা: ৬.২.১)। তাহা হইলে, যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে জগৎ কারণ হইতে অভিন্ন ছিল, সেইহেতু সৃষ্টির পরেও ইহা অভিন্নরূপেই বর্তমান আছে।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥২।১।১৭॥

অসৎ-ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহাকে ‘অসৎ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে) ন (না) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) ধর্মান্তরেণ (অন্য লক্ষণ দ্বারাও) বাক্যশেষাৎ (শ্রুতির পরবর্তী অংশ হইতে)।

১৭. যদি এইরূপ বলা হয় যে, যেহেতু (কার্যকে) (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পূর্ববর্তী সূত্রের সিদ্ধান্ত হইল) না (সত্য); (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) না, এইরূপ নহে (যেহেতু ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে) অন্য লক্ষণের দ্বারা (যেরূপ দৃষ্ট হয়) শ্রুতির পরবর্তী অংশের উল্লেখ হইতে।

[১৭. শ্রুতি বলেন “এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎ-ই ছিল”— ইহার অর্থ এই নয় যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না। ইহা ব্রহ্মে সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া ছিল তাহা পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়।]

“সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ শব্দ-বাচ্য ছিল” (ছা: ৩.১৯.১)। ‘অসৎ’ এই শব্দটি সম্পূর্ণ অনস্তিত্বকে বুঝায় না, কিন্তু জগৎ পৃথক্ কোন সত্তারূপে ছিল না— ইহাই বুঝায়। ইহা অভিন্ন অবস্থাতেই ছিল— তখন পর্যন্ত কোন নাম-রূপের উদ্ভব হয় নাই— এই অর্থে জগৎকে ‘অসৎ’ বলা হয় সাধারণ লোকব্যবহারেও। তখন ইহা সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির পর ইহা স্থূল আকার ধারণ করিল এবং নাম-রূপেরও উদ্ভব হইল। এই শ্রুতির অব্যবহিত পরের অংশে এই অর্থেই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। “ইহা সৎ-শব্দবাচ্য হইল, উহা সম্ভূত (অর্থাৎ উদ্গতপ্রায়) হইল—”। সুতরাং পূর্ববর্তী সূত্রের সিদ্ধান্তটি সর্বতোভাবে অভ্রান্ত।

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥২।১।১৮॥

যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দান্তরাৎ (অন্য শ্রুতি বচন হইতে) চ (এবং)।

১৮. যুক্তি এবং অন্য একটি শ্রুতি বচন হইতে (কার্য কারণ সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[১৮. যুক্তি এবং অন্য একটি শ্রুতি বচন হইতে ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত।]

যুক্তি হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, কার্য কারণ হইতে অভিন্ন এবং ইহা (কার্য) উৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান থাকে। তাহা না হইলে সকল বস্তুই যে-কোন বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইতে পারিত। বিশেষ কোন কারণই বিশেষ কোন কার্যকে উৎপাদন করে— ইহা হইতেই কার্য কারণের সম্পর্কটিকে বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টির পূর্বে কার্যটি কারণের মধ্যে অপ্রকট অবস্থায় থাকে। তাহা না হইলে, নূতন কোন সৃষ্টির সময় সব কিছু হইতেই যে-কোন কিছুকে সৃষ্টি করা যাইত। মূল ঘটনাটি হইল এই যে, সৃষ্টির সময় ইহা প্রকট হয় মাত্র— অন্য কিছু নহে। যাহা শশশৃঙ্গের ন্যায় একেবারেই অনস্তিত্বশীল (অলীক) তাহা কখনও বাস্তবায়িত হইতে পারে না। সুতরাং কারণটি সম্পূর্ণ নূতন এমন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না— যাহা পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। অধিকন্তু, কার্য যে কারণে পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তাহা আমরা এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতেও জানিতে পারি— "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-রূপে (বিদ্যমান) ছিল" (ছা: ৬.২.১)।

পটবচ্চ ॥২।১।১৯॥

পটবৎ (বস্ত্রের ন্যায়) চ (এবং)।

১৯. এবং একখণ্ড বস্ত্রের ন্যায়।

[১৯. ভাঁজ করা এবং প্রসারিত বস্ত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারাও কার্য কারণের অভিন্নত্বকে অবগত হওয়া যায়।]

একখণ্ড বস্ত্রের কুঞ্চিত (ভাঁজ করা) এবং প্রসারিত অবস্থার অনুরূপই জগতের সৃষ্টির পূর্বের এবং পরের অবস্থা। ভাঁজ করা অবস্থায় কেউ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিবে না ইহা বস্ত্রখণ্ড না আর কিছু— কিন্তু প্রসারিত অবস্থায় ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যাইবে। প্রলয়কালে— অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে— জগৎ সূক্ষ্ম কারণ অবস্থায় ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং সৃষ্টির পর ইহা স্থূল আকার ধারণ করে।

যথা চ প্রাণাদি ॥২।১।২০॥

যথা (যেরূপ) চ (এবং) প্রাণাদি (প্রাণাদি বিষয়ে যেইরূপ হয়)।

২০. বিভিন্ন প্রাণের ক্ষেত্রে যেইরূপ হয় (এখানেও জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে সেইরূপ)।

[২০. মুখ্য প্রাণে যেমন প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুসকল লীন থাকে (সেইরূপ জগৎও ব্রহ্মে লীন থাকে)।]

যখন বিভিন্ন প্রকারের পাঁচটি প্রাণ (প্রাণশক্তি) প্রাণায়াম সহায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাহারা প্রধান প্রাণে লীন হইয়া অবস্থান করে (এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনা করিয়া) জীবন ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে মাত্র ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কার্যরূপ বিভিন্ন প্রাণগুলি কারণরূপ প্রধান হইতে ভিন্ন নহে। কার্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ, কার্য তাহার কারণ হইতে পৃথক্ কিছু নয়। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, কার্যরূপ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই সব কিছু জানা হইয়া যায়।

অধিকরণ ৭ : ব্রহ্ম যদি জগৎ-কারণ হন তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম যেহেতু বাস্তবে এক, সেই ক্ষেত্রে জীবের কৃত সকল পাপাদি কার্যের জন্য ব্রহ্মই দায়ী হইবেন— এই আপত্তির খণ্ডন।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥২।১।২১॥

ইতর-ব্যপদেশাৎ [যেহেতু অন্যটির (জীবের)] বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে (জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া) হিত-অকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ (হিত বিষয়ের অকরণ এবং আরও অন্যান্য দোষ উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে।)

২১. অন্যটির (জীবাত্মা) উল্লেখ হেতু (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে) উঠিতে পারে (ব্রহ্ম বিষয়ে) কতকগুলি দোষ— যথা হিতকার্যাদির অকরণ এবং এই জাতীয় অন্যান্য দোষ।

[২১. জীব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই জীব— এইরূপ অভেদ উক্তি করিলে জীবের 'হিত-কার্য-অকরণাদি দোষ'গুলি ব্রহ্মেও আরোপিত হইবার আশঙ্কা আছে।]

পূর্ববর্তী প্রকরণে জগতের কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূত্রে একথাও বলা হইয়াছে যে, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। এখন যদি একই কালে ব্রহ্ম জগতের কারণও হন তাহা হইলে ব্রহ্মের উপর হিত-অকরণাদি দোষ বর্তায়। সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের পক্ষে জীবের কোন অহিত করা অথবা জীবের প্রতি হিত কার্য হইতে বিরত থাকা সম্ভব নয়— কারণ কোন ব্যক্তিকেই নিজের অনিষ্ট করিতে দেখা যায় না। বরং ব্রহ্ম এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করিবেন যেখানে জীবের

পক্ষে সব কিছুই হইবে সুখকর এবং দুঃখের লেশ মাত্রও থাকিবে না। যেহেতু বাস্তবে ব্যাপারটি এইরূপ নয়, সেইজন্যই বেদান্তবাদীরা যে বলেন ব্রহ্মই জগতের কারণ— তাহা ঠিক নয়।

অধিকং তু, ভেদনির্দেশাৎ ॥২।১।২২॥

অধিকং (আরও অধিক কিছু) তু (কিন্তু) ভেদ নির্দেশাৎ (ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া)।

২২. কিন্তু (শ্রুতিতে) ভেদনির্দেশ আছে বলিয়া (ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে) (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম) হইলেন (জীব হইতে) অধিকতর কিছু।

[২২. শ্রুতি যেমন জীব-ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ ভেদের কথাও বলিয়াছেন। তাই ব্রহ্ম জীব হইতে অধিকতর কিছুই।]

'তু' শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রের আপত্তি খণ্ডন হইল। জগৎস্রষ্টা হইলেন সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। সেইজন্যই তিনি জীবের এবং জগতের অসত্যের কথা এবং সাক্ষীমাত্র রূপে জীব এবং জগতের প্রতি তাঁহার অনাসক্তির কথাও জানেন। তাঁহার নিকট ভাল বা মন্দ কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে শুভাশুভ বিমিশ্র জগতের সৃষ্টিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। জীবাত্মার পক্ষে কিন্তু অবিদ্যার অধীন থাকাকালীন অবস্থায় ভাল মন্দ দুই-ই থাকিবে। শ্রুতি স্পষ্টভাবেই নিম্ন-উদ্ধৃত বচনগুলিতে জীবাত্মার ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন— "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি (বৃ: ২.৪.৫)। অবশ্য এই সকল পার্থক্যবোধ আমাদের অবিদ্যা-জনিত কাল্পনিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করে। তখন সকল নানাত্ববোধই দূর হইয়া যায়— এবং তখন সেখানে জীবাত্মা বা স্রষ্টা কেহই ব্যষ্টিভাবে বর্তমান থাকেন না। এইভাবেই জীবাত্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা নহে— উত্থাপিত এই আপত্তি খণ্ডিত হইল।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২।১।২৩॥

অশ্মাদিবৎ (পাথর ইত্যাদির ন্যায়) চ (এবং) তদনুপপত্তিঃ (ইহার অসমর্থনীয়ত্ব)।

২৩. এবং যেহেতু এখানে প্রস্তরাদি দৃষ্টান্তের সদৃশ পরিস্থিতি (মৃত্তিকা হইতে একইভাবে উৎপন্ন)—সেইজন্য এই আপত্তি অসমর্থনীয়।

[২৩. প্রস্তরাদির দৃষ্টান্তেও যে দোষের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে।]

এখানে এইরূপ একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে— যে-ব্রহ্ম হইলেন বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এবং অক্ষর, তিনি নানাত্বময়, এবং শুভাশুভযুক্ত জগতের কারণ হইতে পারেন না। এই সূত্রটি এই আপত্তিরই খণ্ডন করিতেছে। এই আপত্তিটি অসমর্থনীয়— কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, একই মৃত্তিকার উপাদান হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি, রত্নরাজি এবং নিষ্প্রয়োজন শিলা খণ্ডাদিরও উৎপত্তি হইতেছে। সেইভাবেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেও শুভাশুভ বিমিশ্র জগতের উৎপত্তি হইতে পারে।

অধিকরণ ৮ : ব্রহ্ম উপাদান এবং উপকরণরহিত হইয়াও জগৎ-কারণ হইতে পারেন।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২।১।২৪॥

উপসংহার-দর্শনাৎ (যেহেতু আনুষঙ্গিক উপকরণের সমাহার দৃষ্ট হয়) ন (না) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা হইতে পারে না) ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (যেহেতু)।

২৪. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ব্রহ্ম বাহিরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে) পারেন না (জগতের কারণ হইতে) কারণ (একজন কর্তাকে) আনুষঙ্গিক উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করিতে দেখা যায়) (যে-কোন সৃষ্টির জন্য); ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি— না, তাহা নহে; কারণ (ইহা হইল) দুগ্ধের দধিতে পরিণত হইয়া যাওয়ার ন্যায়।

[২৪. উপকরণের সাহায্য ভিন্ন কোন কিছুই নির্মাণ করা যায় না, অতএব বাহ্য উপকরণ ব্যতীত ব্রহ্ম কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করিলেন?— যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহার উত্তরে আমরা বলিব— দুগ্ধ যেমন স্বতই দধিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ নিজেই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।]

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের বিরুদ্ধে আর একটি নূতন আপত্তি উত্থিত হইল। ব্রহ্মকে সৃষ্টি কর্মে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মের বাহিরে কোন উপকরণ নাই— কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোন কিছুই নাই। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্;' সুতরাং সকল বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ ভেদরহিত। সাধারণ জাগতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন কেহ কোন কিছুর সৃষ্টি করে, তখন সে বাহ্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে— যেমন কুম্ভকারের ক্ষেত্রে

কুম্ভকার কুলাল চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার এই সকল আনুষঙ্গিক উপকরণ নাই— সুতরাং তিনি সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। এই সূত্রটি এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছে এই বলিয়া যে— এইরূপ সৃষ্টি সম্ভব; যেমন দুগ্ধ অপর কোন বাহ্য উপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজেই দধিতে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রেও যদি আপত্তিকে এই বলিয়া আরও জোর দেওয়া হয় যে, দুগ্ধের দধিতে পরিণত হইবার প্রক্রিয়াটিকে উত্তাপ বা এই জাতীয় বাহ্য বস্তু সহায়তা করে— ইহার উত্তরে আমরা বলিব তাপ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার গতি সঞ্চার করিতে পারে মাত্র কিন্তু দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় দুগ্ধের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের দ্বারা। কেহ তাপের সাহায্যে জলকে তো দধিতে পরিণত করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম যেহেতু অসীম (ক্ষমতাসম্পন্ন), সেইজন্য এই জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার এইরূপ কোন সহায়তার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্ম যে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন তাহা এইজাতীয় শ্রুতি হইতেই জানা যায়: "সেই পরমেশ্বরের শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ দৃষ্ট হন না। ইঁহার পরাশক্তি (মায়া) বিচিত্র-কার্য-কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ বলদ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া করেন"— (শ্বে: ৬.৮)।

দেবাদিবদপি লোকে ॥২।১।২৫॥

দেবাদিবৎ (দেবতা এবং অন্যদের ন্যায়) অপি (ও) লোকে (এই জগতে)।

২৫. (ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারটি হইল) দেবতা এবং এই জগতের অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি-ক্রিয়ার মতো।

[২৫. দেবতা এবং পৃথিবীর বহু সিদ্ধপুরুষও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রহ্মও সেইরূপ পারেন।]

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, দুগ্ধের দধিতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্তটি যথাযথ নয় কারণ, যেহেতু দুগ্ধ একটি অচেতন বস্তু। কেহ কুম্ভকারের ন্যায় কোন সচেতন প্রাণীকে বাহ্য উপকরণের সাহায্য ব্যতীত কোন সৃষ্টি করিতে কখনও দেখে নাই।

এই সূত্রটি এই আপত্তিকে খণ্ডন করিতেছে অপর একটি সৃষ্টিকর্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা যেখানে একজন সচেতন কর্তা বাহ্য কোন উপকরণ ব্যতীতই সৃষ্টিকার্য করিতেছেন। বহু ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থেই এইরূপ উল্লেখ আছে যে, বহু দেবদেবী বাহ্য উপকরণের সাহায্য ব্যতীত নিজের অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তির বলেই বহু সৃষ্টিকার্য করিয়াছেন। সেইভাবেই পরমেশ্বর তাঁহার অসীম মায়াশক্তি বলে এই বৈচিত্র্যময় জগৎকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঘটাদি নির্মাণে যে-সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় সেই সীমাবদ্ধ শর্তগুলি প্রতিটি সৃষ্টি-ক্রিয়াতেই থাকিবে তাহা নহে। সেই শর্তগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য নহে।

অধিকরণ ৯ : ব্রহ্ম অংশরহিত হইয়াও জগতের উপাদান কারণরূপে বর্তমান।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২।১।২৬॥

কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই পরিণত হইবার সম্ভাবনা) নিরবয়বত্ব শব্দকোপঃ (ব্রহ্ম যে অংশরহিত এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হইবে) বা (অথবা)।

২৬. (ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিলে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয়) হয় সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগতে পরিণত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, অথবা শাস্ত্রে যে আছে ব্রহ্ম অংশ-রহিত তাহার অপলাপ করিতে হয়।

[২৬. জগৎ-কারণ ব্রহ্ম হয় সম্পূর্ণভাবেই জগতে পরিণত হইয়াছেন— তাহা মানিতে হয়, অথবা শাস্ত্রের বিরোধিতা করিতে হয়— যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন ব্রহ্ম অংশরহিত।]

ব্রহ্ম অংশরহিত হইয়াও যদি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, সমগ্র ব্রহ্মই এই বিচিত্রজগতে পরিণত হইয়া আছেন। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ব্রহ্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, শুধুমাত্র কার্যরূপ জগৎ-ই থাকিবে। উপরন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয় এই শাস্ত্র-বচনের বিরোধিতা করিতে হয়। অপরপক্ষে আমরা যদি বলি যে, ব্রহ্ম সর্বাংশে পরিবর্তিত হন না, অংশত মাত্র পরিবর্তিত হন, তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত— কিন্তু শাস্ত্রে ব্রহ্মের অংশত্বকে অস্বীকারই করা হইয়াছে। এই উভয় পক্ষের যে-কোন একটিকে গ্রহণ করিলে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হইব— সেই কারণেই ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারেন না।

শ্রুতেস্তু, শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥

শ্রুতেঃ (শ্রুতি শাস্ত্রে উল্লিখিত বলিয়া) তু (কিন্তু) শব্দমূলত্বাৎ (শাস্ত্রের বচনের দ্বারা ইহার সমর্থন আছে বলিয়া)।

২৭. কিন্তু (ইহা ঐরূপ হইতে পারে না) শ্রুতি বচন আছে বলিয়া (আপাত-বিরুদ্ধ দুইটি মতেরই সমর্থনে) এবং যেহেতু (ব্রহ্ম) শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া।

[২৭. ব্রহ্ম যে সর্বশক্তিসম্পন্ন তাহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত। অতএব তিনি জগতের অতীত হইয়াও জগৎরূপে পরিণত হইতে পারেন।]

এখানে 'তু' শব্দটি পূর্বসূত্রে বর্ণিত মতকে খণ্ডন করিতেছে। ব্রহ্ম সর্বাংশে পরিবর্তিত হন না— যদিও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে জগৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ শ্রুতিতে দেখা যায়— "প্রপঞ্চরূপ সর্বভূত তাঁহার এক পাদমাত্র, এবং ত্রিপাদ স্বর্গে অমৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত"— (ছা: ৩.১২.৬)। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যেহেতু একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ। যুক্তি-সিদ্ধ না হইলেও আমাদের এই পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় মতকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আসল ব্যাপারটি হইল ব্রহ্মের পরিবর্তন প্রতীয়মান সত্যমাত্র, উহা আত্যন্তিক সত্য নহে। সুতরাং শ্রুতিবর্ণিত দুইটি মতই সত্য। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবচনগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়— অন্যথা নহে।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥

আত্মনি (জীবাত্মাতে) চ (এবং) এবং (এইরূপে) বিচিত্রাঃ (নানারূপ) চ (এবং) হি (যেহেতু)।

২৮. এবং যেহেতু জীবাত্মাতেও (যাদুকর প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেইরূপ ঘটে) বিচিত্র (সৃষ্টি বর্তমান) সেইরূপ (ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও)।

[২৮. জীবের এবং দেবতাগণেরও যখন বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করিবার প্রসিদ্ধি আছে, তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে কি তাহা অসম্ভব হইতে পারে?]

এই সূত্রটি একটি দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্বসূত্রে উল্লিখিত মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

স্বপ্নাবস্থায় এক এবং অবিভাজ্য জীবাত্মাতে জাগ্রৎ অবস্থার অনুরূপই নানা ঘটনার উদয় হয় (বৃ: ৪.৩.১০ দ্রষ্টব্য)। তথাপি ইহার দ্বারা আত্মার অবিভাজ্যত্ব স্বরূপের কোন বিপর্যয় হয় না। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ যাদুকরের বিচিত্র সৃষ্টিকে গ্রহণ করিতে পারি যেখানে যাদুকর নিজের কোন পরিবর্তন না করিয়াও অসংখ্য সৃষ্টিকার্য করিয়া থাকে। সেইরূপভাবেই ব্রহ্মের অনির্বচনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র প্রকার সৃষ্টি হয়— যদিও ব্রহ্ম স্বয়ং অপরিবর্তিতই থাকিয়া যান।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২।১।২৯॥

স্বপক্ষ-দোষাৎ (যেহেতু প্রতিপক্ষের মতও এইরূপ আপত্তির বিষয় হইতে পারে) চ (এবং)।

২৯. এবং যেহেতু প্রতিপক্ষের নিজ মতবাদও এই আপত্তির দ্বারা অন্যথা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

[২৯. আপত্তিকারীর পক্ষেও এই সকল দোষ আছে বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। (তাই শ্রুতি প্রমাণকেই মানিয়া লইতে হইবে)।]

যদি বেদান্তবিরোধী সাংখ্যবাদীদের প্রধানকে প্রথম কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রেও এই একই দোষ দেখা দিবে। কারণ সাংখ্যবাদিগণও বেদান্তবাদীদের আদিকারণ ব্রহ্মের ন্যায় প্রধানকে অংশরহিত বলিয়াই বর্ণনা করেন। বেদান্তবাদিগণ অবশ্য এই সকল আপত্তিই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যবাদী এবং বৈশেষিকগণ এই আপত্তির সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যেহেতু তাঁহাদের মতে এই পরিবর্তন যথার্থই সত্য।

অধিকরণ ১০ : ব্রহ্মের মায়াশক্তির প্রতিষ্ঠা।

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥২।১।৩০॥

সর্বোপেতা (সব কিছুর দ্বারা ভূষিত) চ (এবং) তৎ-দর্শনাৎ (কারণ ইহা দৃষ্ট হয়)।

৩০. এবং (ব্রহ্ম হইলেন) সর্ব (শক্তি) দ্বারা পরিমণ্ডিত, কারণ ইহা (শাস্ত্রে) দৃষ্ট হয়।

[৩০. ব্রহ্ম যে সর্বশক্তিমান তাহা শাস্ত্রের বহুস্থলেই ঘোষিত হইয়াছে।]

সাধারণত আমরা দেখি যে, শরীরধারী ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ শক্তি আছে। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মের কোন শরীর নাই, সেই হেতু ব্রহ্মের এইরূপ কোন শক্তি থাকার সম্ভাবনাও নাই— ইহা হইল বিরুদ্ধপক্ষের আপত্তি।

এই সূত্রটি ব্রহ্মের মায়াশক্তির দ্বারা শক্তিমান হওয়ার প্রমাণ প্রদান করে। বহু শ্রুতিবচনই ঘোষণা করে যে, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান। "প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।" (শ্বে: ৪.১০), (ছা: ৩.১৪.৪ এবং ৮.৭.১৩ দ্রষ্টব্য।)

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২।১।৩১॥

বিকরণত্বাৎ (যেহেতু কোন ইন্দ্রিয় নাই) ন (না) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) তৎ (তাহা) উক্তম্ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

৩১. যদি এইরূপ বলা হয় যে, যেহেতু (ব্রহ্ম) হইলেন ইন্দ্রিয়রহিত (তিনি) নহেন (শক্তিমান হইলেও সৃষ্টিক্ষম নহেন), (ইহার উত্তরে বলা যায়) যে ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

[৩১. ব্রহ্মের কোন ইন্দ্রিয় নাই, তাই তাঁহার সৃষ্টিরও কোন ক্ষমতা নাই— এই আপত্তির উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।]

ব্রহ্মের যেহেতু ইন্দ্রিয় নাই, সেইজন্য ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে পারেন না। উপরন্তু ব্রহ্মকে 'নেতি', 'নেতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে— সুতরাং তাঁহার কোন গুণ নাই— এইরূপ ব্রহ্মের শক্তি থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সূত্রে এই আপত্তিরই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, এই আপত্তিটির উত্তর ইতঃপূর্বেই ২.১.৪ এবং ২.১.২৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়া গিয়াছে— ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ— যুক্তি নহে। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মের যদিও ইন্দ্রিয় নাই, তথাপি তিনি সর্বশক্তিমান। "তাঁহার হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন"— ইত্যাদি (শ্বে: ৩.১৯)। যদিও ব্রহ্ম সর্বগুণরহিত, তথাপি মায়ার কারণে তাঁহার সর্বপ্রকার শক্তিই আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অধিকরণ ১১: ব্রহ্মের সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নাই— ইহা তাঁহার লীলামাত্র।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২।১।৩২॥

ন (নহেন) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (উদ্দেশ্য আছে বলিয়া)।

৩২. (ব্রহ্ম) নহেন (জগতের সৃষ্টিকর্তা) কারণ (প্রতিটি কার্যেরই) একটা উদ্দেশ্য থাকে।

[৩২. আপ্তকাম, তাঁহার কোন কামনা নাই, কামনাই সৃষ্টির প্রেরণা সুতরাং কামনা-রহিত ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন না।]

ধরিয়া লওয়া গেল যে, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যের সকল শক্তিই আছে, তথাপি ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে আর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কোন কামনা পূরণের জন্যই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন আপ্তকাম, সুতরাং সৃষ্টি করিয়া পাইবার মতো তাঁহার কিছুই থাকিতে পারে না। সেইজন্যই ব্রহ্ম নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন এইরূপ প্রত্যাশা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না।

লোকবত্তু, লীলাকৈবল্যম্ ॥২।১।৩৩॥

লোকবৎ (সাধারণ লোকজগতে যেইরূপ দৃষ্ট হয়) তু (কিন্তু) লীলাকৈবল্যম্ (শুধু লীলাখেলা মাত্র)।

৩৩. কিন্তু (ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যাদি) তাঁহার লীলা মাত্র— যেমন সাধারণ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়।

[৩৩. সাধারণ জগতে দৃষ্ট মানুষের ক্রীড়াদির ন্যায় সৃষ্টিকার্যও ব্রহ্মের লীলা মাত্র।]

যেমন নৃপতিগণকে কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র ব্যসন ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে দেখা যায়, অথবা মানুষ যেমন উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই শ্বাসকার্য চালনা করে— কারণ ইহা তাহাদের স্বভাবগত— অথবা যেমন শিশুরা শুধুমাত্র কৌতুকের বশবর্তী হইয়াই ক্রীড়া করে— সেইরূপ ব্রহ্মও উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই এই বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ইহার দ্বারা পূর্বসূত্রে উত্থাপিত আপত্তি যে, ব্রহ্ম জগৎ-কর্তা হইতে পারেন না— তাঁহার উত্তর দেওয়া হইল॥

অধিকরণ ১২ : ব্রহ্মে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা আরোপ করা যায় না।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥২।১।৩৪॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে (পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা) ন (না) সাপেক্ষত্বাৎ (অন্য যুক্তির বিচারে ইহাকে বিবেচনা করিলে) তথা (সেইরূপ) হি (যেহেতু) দর্শয়তি (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে)।

৩৪. পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতা (ব্রহ্মের উপর আরোপিত হইতে পারে) না, কারণ (অন্য যুক্তি এই বিষয়ে গ্রহণ করিলে) যেহেতু (শাস্ত্র) এইরূপ ঘোষণা করিয়াছে।

[৩৪. জগতে সুখ দুঃখাদি দেখিয়া ব্রহ্মকে পক্ষপাতযুক্ত বা নিষ্ঠুর বলা যায় না— কারণ শাস্ত্রে এই বৈষম্যের হেতু এবং ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।]

জগতে কেহ বা দরিদ্র আবার কেহ বা ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে— সুতরাং ঈশ্বর কাহারও প্রতি পক্ষপাতী। নিষ্ঠুর এইজন্য যে, তিনি কোন কোন লোককে কষ্ট ভোগ করান। এইজাতীয় আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতার জন্য অভিযুক্ত করা চলে না; কারণ তিনি জীবের স্বকীয়

পাপপুণ্য অনুযায়ীই ভালমন্দের বিধান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও এই মর্মে উক্তি আছে— "মানুষ ভাল কর্মের দ্বারা ভাল হয়, মন্দ কর্মের দ্বারা মন্দ হয়"— (বৃহ: ৩.২.১৩)। কিন্তু ইহার দ্বারা ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধিতা করা হয় না, যেমন ভৃত্যগণকে স্ব স্ব কর্মানুযায়ী পারিতোষিক দেওয়ার উপর কোন রাজার পদমর্যাদা নির্ভর করে না। যেমন বৃষ্টির জল প্রত্যেকটি বীজকে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে অঙ্কুরিত হইতে সাহায্য করে, সেইরূপভাবেই ঈশ্বরও প্রত্যেকটি জীবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রবণতাগুলিকে বিকশিত করার জন্য নিমিত্ত-কারণরূপে বর্তমান আছেন। সুতরাং তিনি পক্ষপাতযুক্ত বা নিষ্ঠুর কোনটাই নহেন।

ন কর্মাবিভাগাদিতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ॥২।১।৩৫॥

ন (না) কর্মাবিভাগাৎ (কর্মবিভাগ ছিল না বলিয়া) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে;) অনাদিত্বাৎ (কারণ জগৎ হইল অনাদি)।

৩৫. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ইহা সম্ভব নহে) কারণ (সৃষ্টির পূর্বে) কোন কর্মবিভাগ ছিল না, (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) যে, না, তাহা নহে কারণ (জগৎ) হইল অনাদি।

[৩৫. সৃষ্টির পূর্বে জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ ছিল না। সৃষ্টির সময়েই ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করিয়া ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে, না জীবজগৎও অনাদি।]

যেহেতু প্রথম সৃষ্টির পূর্বে জীবাত্মার পক্ষে তৎপূর্ব কোন অবস্থান সম্ভব নহে, তাহা হইলে প্রথম সৃষ্টির সময়েই জীবের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য আসিবে কোথা হইতে— যদি না ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করিয়া এই ভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন? এই সূত্রটিতে এই আপত্তিটিরই উত্তরে বলা হইতেছে যে, সৃষ্টি হইল অনাদি— সৃষ্টিতে প্রথম সৃষ্টির কোন প্রশ্ন নাই। ইহা বীজাঙ্কুরের অনুরূপ। সুতরাং জীবাত্মাগণের পূর্বেই এক একটি জন্ম ছিল এবং সেই সেই জন্মে তাহারা ভালমন্দ কাজ করিয়াছিল এবং সেই সেই কর্মানুযায়ী ঈশ্বর পরবর্তী সৃষ্টিতে তাহাদের অদৃষ্টের বিধান করিয়াছেন।

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥২।১।৩৬॥

উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত) চ (এবং) অপি (অধিকন্তু) উপলভ্যতে (উপলব্ধি করা যায়) চ (এবং)।

৩৬. এবং (এই জগৎ যে অনাদি) তাহা যুক্তিসম্মত এবং ইহা (শাস্ত্রাদিতেও দৃষ্ট হয়)।

[৩৬. জীব ও জগতের অনাদিত্বকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায়— এবং শাস্ত্রেও ইহার সপক্ষে উল্লেখ আছে।]

যুক্তির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সৃষ্টি নিশ্চিতভাবেই অনাদি। কারণ জগৎ যদি অব্যক্ত অবস্থায় সংস্কাররূপে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে প্রথম সৃষ্টির সময়ে ইহা একটি সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন বস্তুরূপে প্রকাশ পাইত। সেইক্ষেত্রে মুক্ত জীবাত্মারও পুনর্জন্ম হইতে পারিত। উপরন্তু জীবগণ ভালমন্দ কোন কর্ম না করিয়াও সুখ-দুঃখের ভাগী হইত। ইহা একটি কারণবিহীন কার্যাবস্থা যাহা ঘটা অসম্ভব। ইহাকে আদি অবিদ্যা হিসাবেও গ্রহণ করা যায় না— কারণ তাহা এক বলিয়াই। ব্যক্তিগত বিভিন্ন ফল উৎপাদনের জন্য — প্রত্যেকেরই পূর্ববর্তী বিভিন্ন অতীত কর্মের প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রেও জগৎ যে সৃষ্টির পূর্ব-কল্পেও বর্তমান ছিল তাহা এইজাতীয় শ্রুতিতে আছে "ঈশ্বর পূর্ববৎ-ই সূর্য এবং চন্দ্রকে সংস্থাপিত করিলেন"। (ঋগ্বেদ, ১০.১৯০.৩)

সুতরাং ঈশ্বরের উপর পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠুরতার দোষ আরোপ করা যায় না।

অধিকরণ ১৩ঃ ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্মের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন।

সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ।।২।১।৩৭।।

সর্ব-ধর্ম-উপপত্তেঃ (সমগ্র গুণরাশি থাকার সম্ভাবনা হইতে) চ (এবং)।

৩৭. এবং যেহেতু (জগৎ-সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত) সবগুলি গুণই সম্ভব (একমাত্র ব্রহ্মেই— সেইজন্যই ব্রহ্ম জগৎ-কারণ)।

[৩৭. জগৎ- কারণ হইবার জন্য যে-সকল গুণ বা ধর্ম থাকা আবশ্যক তাহার সবগুলি ব্রহ্মেই বর্তমান। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ-কারণ।]

আপত্তি :— ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না— এই আপত্তিটি এই সূত্রে খণ্ডিত হইতেছে। উপাদান-কারণ হইল সেই বস্তুটি যাহা পরিবর্তিত হইয়া কার্যে পরিণত হয়। এইরূপ কারণের সাধারণত কতকগুলি গুণ আছে বলিয়াই জাগতিক অভিজ্ঞতায় মনে হয়। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বলিয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।

আপত্তির উত্তর :— যদিও উপাদান-কারণ কার্য উৎপন্ন করার জন্য পরিবর্তিত

হইয়া থাকে, তথাপি এই পরিবর্তন দুই প্রকারে হইতে পারে। একটি হইতে পারে যথার্থ পরিণতি বা রূপান্তর যেমন দধি দুগ্ধে পরিবর্তিত হয়, অথবা এই রূপান্তর হইতে পারে অবিদ্যা হেতু আপাত প্রতীয়মান—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। সুতরাং যদিও নির্গুণ ব্রহ্মের যথার্থ রূপান্তর অসম্ভব তথাপি মায়াশক্তি প্রভাবে ব্রহ্মের আপাত রূপান্তর সম্ভব। এই মায়াশক্তি বলেই সৃষ্টির জন্য উপাদানে যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক তাহাদের সবগুলির অবস্থান একমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভব। সেইজন্যই ব্রহ্ম হইলেন জগতের উপাদান-কারণ, কিন্তু যথার্থত পরিবর্তিত না হইয়াও তিনি আপাত পরিবর্তিত রূপেই জগতের উপাদান-কারণ; এবং ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণও বটেন। সুতরাং ব্রহ্ম যে জগতের কারণ— এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্রহ্ম-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় । দ্বিতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে ব্রহ্মের আদিকারণত্বের বিরুদ্ধে সবগুলি আপত্তিরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই পাদে অন্যান্য বিরুদ্ধ দার্শনিক মতবাদকে শাস্ত্র-উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যেই খণ্ডন করার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী সূত্রটিতে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে সবগুণই বর্তমান— যদিও মায়াশক্তি বলেই ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ হইবার যোগ্যতা পাইয়াছেন। এখন বিচার্য হইল সাংখ্যের প্রধানের এই সকল যোগ্যতা আছে কি না।

অধিকরণ ১ : প্রধানকে আদিকারণ বলিয়া সাংখ্যবাদীদের যে মতবাদ—তাহার খণ্ডন।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।।২।২।১।।

রচনানুপপত্তেঃ (সৃষ্টি পরিকল্পনার অসম্ভবতাহেতু) চ (এবং) ন (নহে) অনুমানম্ (যাঁহাকে অনুমান করা হয়)।

১. এবং যাঁহাকে অনুমান করা হয় (অর্থাৎ সাংখ্যবাদীদের প্রধান) (প্রথম কারণ হইতে পারেন না); কারণ, (সেইক্ষেত্রে) এই বিশ্বে যে সৃষ্টি রচনার পরিকল্পনা আছে (তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না)।

[১. জগৎ-সৃষ্টির পরিকল্পনায় জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োজন। প্রধান অচেতন। সুতরাং অচেতন প্রধানের পক্ষে জগৎ রচনার কল্পনা অনুমান করা চলে না।]

গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশের আলোচনায় শাস্ত্রপ্রমাণের সাহায্যে সাংখ্যমতকে বহুক্ষেত্রে খণ্ডন করা হইয়াছে। এখানে ১-১০ সূত্রগুলি বেদান্তশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যুক্তির দ্বারাই এই মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে।

এই বিচিত্র এবং সুপরিকল্পিত বিশ্বরচনায় যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় জড় প্রধানের তাহা নাই; সুতরাং প্রধান জগতের আদি কারণ হইতে পারেন না।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২।২।২॥

প্রবৃত্তেঃ (প্রবৃত্ত হইবার) চ (এবং)।

২. এবং (এইরূপ) (সৃষ্টির) প্রবণতা (অসম্ভাব্যতা হেতু)।

[২. অচেতন প্রধানের পক্ষে কোন কার্যে রত হইবার প্রবৃত্তি (ইচ্ছা) থাকা সম্ভব নহে।]

যদিও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, প্রধানের পক্ষে এইরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অন্য আপত্তিও আছে।

অচেতন প্রধানকে সৃষ্টির ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তিযুক্ত বলিয়াও ধরিয়া লওয়া চলে না। কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মৃৎপিণ্ডকে ঘট উৎপাদন করিতে দেখা যায় না। সুতরাং জড় প্রধান সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না, কেন না সৃষ্টির জন্য যে-সকল কর্ম-প্রেরণা থাকা আবশ্যক তাহা প্রধানের নাই। ইহার জন্য কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন বুদ্ধি-মত্তার প্রয়োজন।

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥২।২।৩॥

পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ এবং জলের ন্যায়) চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) তত্র (সেখানে) অপি (ও)।

৩. যদি এইরূপ বলা হয় (যে প্রধান স্বতই পরিবর্তিত হন) দুগ্ধের (ধারার ন্যায়) এবং জলের ন্যায়, (উত্তরে বলা যায়) সেক্ষেত্রেও (বুদ্ধিমত্তাই কারণ)।

[৩. যদি এইরূপ বলা হয় যে, দুগ্ধ যেমন আপনা হইতে বৎসমুখে এবং মেঘজল যেমন স্বতই পৃথিবীবক্ষে পতিত হয় সেইরূপ প্রধান স্বতই পরিবর্তিত হইয়া সৃষ্টি করেন— না তাহা হইতে পারে না— সেইক্ষেত্রেও অন্যের কর্তৃত্ব বর্তমান।]

সাংখ্যবাদীরা দুগ্ধ এবং জলের এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করিয়া প্রধানের জগৎকারণত্বকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন— তাঁহারা বলেন, জল যেমন নদীতে এবং দুগ্ধ যেমন গো-মাতার স্তন হইতে বৎসমুখে স্বতই প্রবাহিত হয় সেইরূপভাবেই অচেতন প্রধান স্বতই রূপান্তরিত হইয়া অন্যের কর্তৃত্ব ব্যতীতই বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতিতে পরিণত হইতে পারেন। সূত্রটির শেষের অংশের দ্বারা এই যুক্তির খণ্ডন করা হইয়াছে— বলা হইয়াছে যে, এই জল এবং দুগ্ধের প্রবহমানতা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে: "হে গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে কোন কোন নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে" ইত্যাদি (বৃহ: ৩.৮.৯): "যিনি জলে, অর্থাৎ জলদেবতার

অন্তর্বর্তীরূপে বিদ্যমান আছেন, জলদেবতা যাঁহাকে জানেন না, যিনি অন্তর্বর্তীরূপে থাকিয়া জলদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন"— (বৃহ: ৩.৭.৪)। বস্তুজগৎ নিয়ন্ত্রণের সর্বক্ষেত্রেই অন্তরালে ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ।।২।২।৪।।

ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ (ইহা ব্যতীত বাহিরের আর কোন কর্তৃত্ব নাই) চ (এবং) অনপেক্ষত্বাৎ (কারণ ইহা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহে)।

৪. এবং যেহেতু (প্রধান) নির্ভরশীল নহেন (অন্য কিছুর উপর) ইহার বাহিরে ইহা ব্যতীত অন্য কোন কর্তা নাই বলিয়া (ইহার কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ব কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না)।

[৪. সাংখ্যমতে প্রধানের নিজ বহির্ভূত কোন কর্তা নাই এবং বহির্ভূত কোন কিছুর উপর ইহা নির্ভরশীলও নহেন। সেইক্ষেত্রে অচেতন প্রধানের কর্তৃত্ব বা অকর্তৃত্ব কিছুই নাই। অতএব প্রধান আদিকারণ নহেন।]

সাংখ্যের প্রধান জড় বলিয়া, ইনি নিজে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না— অথবা একবার কর্মপ্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে স্বয়ং নিবৃত্তও হইতে পারেন না। সুতরাং বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নিয়ন্তার অবর্তমানে সাংখ্যবাদীদের মতে স্বীকৃত কল্পের সৃষ্টির এবং কল্পান্তে প্রলয়ের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রধান ব্যতীত আর যে একটি মাত্র সত্তাকে সাংখ্যবাদিগণ স্বীকার করেন তিনি হইলেন পুরুষ বা জীবাত্মা। কিন্তু তাঁহাদের মতে পুরুষ কর্তৃত্বরহিত, কেন না তিনি সাক্ষী মাত্র। আর যে-সকল তত্ত্বের উপর সাংখ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন— এমনকি কর্মবাদও— তাহাও প্রধান হইতেই উৎপন্ন মাত্র— এবং সেইজন্য প্রধানের উপর ইহাদেরও লক্ষণীয় কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। সেইজন্যই সাংখ্যবাদীদের যুক্তি পরস্পর-বিরোধী হইয়া যায়।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ।।২।২।৫।।

অন্যত্র (অন্যস্থলে) অভাবাৎ (ইহা না থাকার জন্য) চ (এবং) ন (নহে) তৃণাদিবৎ (যেমন ঘাস প্রভৃতি হয়, তেমনি)।

৫. এবং (ইহা বলা যায় না যে, প্রধান স্বতঃ পরিবর্তিত হন) যেমন ঘাস ইত্যাদি (দুগ্ধে পরিণত হয়); কারণ ইহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না (একমাত্র স্তন্যপায়ী স্ত্রী জাতি ব্যতীত)।

[৫. তৃণ যেমন গাভীর উদরে স্বতই দুগ্ধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও স্বয়ংই জগতে পরিণত হন— যদি এইরূপ বলা হয়? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, এখানে অন্য কারণ আছে, তাহা না হইলে ষাঁড় যে তৃণ ভক্ষণ করে তাহা তো দুগ্ধে পরিণত হয় না।]

প্রধান যে স্বতই পরিবর্তিত হইতে পারেন তাহা সম্ভবপর নহে। যদি গাভীভুক্ত তৃণকে দৃষ্টান্তরূপে দেখানো হয় তাহা হইলে আমরা বলিব— তৃণ স্বতই দুগ্ধে পরিণত হয় না, যখন ইহা কোন স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণী ভক্ষণ করে তখনই ইহা দুগ্ধে পরিণত হয়। তাহা না হইলে তৃণ স্বতই স্বাধীনভাবে দুগ্ধে রূপান্তরিত হইতে পারিত। যেহেতু এই দৃষ্টান্তটি যথার্থত গ্রাহ্য নহে, সেইজন্য আমরা প্রধানের স্বতই পরিবর্তিত হওয়া গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি না।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।।২।২।৬।।

অভ্যুপগমে (তাহা মানিয়া লইলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (যেহেতু এখানে উদ্দেশ্যের অভাব আছে)।

৬. যদিও ইহা স্বীকার করা হয় (যে সাংখ্যবাদীদের মতানুসারে প্রধান স্বতই রূপান্তরিত হন, তথাপি ইঁহা প্রথম কারণ হইতে পারেন না) কারণ এখানে প্রধানের কোন উদ্দেশ্য নাই।

[৬. সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টির মূলে একটা উদ্দেশ্য আছে; তাহা হইল— ভোগ এবং মোক্ষসাধন। কিন্তু অচেতন প্রধানের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সেইজন্য প্রধান আদিকারণও হইতে পারেন না।]

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রধান স্বতই রূপান্তরিত হন, তাহা হইলেও সাংখ্যবাদীদের দার্শনিক মতবাদে একটা স্ব-বিরোধী ভাব দেখা দেয়। যদি প্রধান স্বতই কর্মপ্রণোদিত বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলে তাঁহার এই কর্মপ্রচেষ্টার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না— তাহা হইলে সাংখ্যমতের বিরোধিতা করা হইবে— কারণ, তাহা হইলে প্রধানের রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটির উদ্দেশ্য হইবে জীবের ভোগ এবং মোক্ষলাভ। উপরন্তু, যেহেতু আত্মার পূর্ণতার জন্য আত্মা স্বভাবতই মুক্ত— সেইজন্য তাহা হইতে কিছু বিচ্যুতও হয় না— বা কোন কিছু আসিয়া তাহার সঙ্গে সংযুক্তও হয় না। সুতরাং প্রধান আদিকারণ হইতে পারেন না।

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ।।২।২।৭।।

পুরুষ-অশ্ম-বৎ (যেমন কোন ব্যক্তি বা চুম্বক প্রস্তর) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) তথাপি (তাহা হইলেও)।

৭. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (পুরুষ প্রধানকে পরিচালিত করিতে পারেন) যেমন একজন (খঞ্জ) ব্যক্তি (একজন অন্ধকে পরিচালিত করিতে পারে), অথবা যেমন একখণ্ড চুম্বক (লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে)— সেইরূপ হইলেও (প্রধানের আদিকারণত্বের বাধা অতিক্রম করা যায় না)।

[৭. পঙ্গু ও অন্ধ পুরুষের অথবা লৌহ ও চুম্বকের দৃষ্টান্তের অনুযায়ী যদি প্রধানের কর্মপ্রবৃত্তি থাকা সম্ভব ধরিয়াও লওয়া হয়— তাহা হইলেও প্রধানের পক্ষে জগৎ-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।]

সাংখ্যদর্শন মতানুসারে পুরুষ যদিও স্বয়ং ক্রিয়াশক্তিরহিত তথাপি ইহা প্রধানকে পরিচালিত করিতে পারেন। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন করিতেছে। সাংখ্য মতে প্রধান হইলেন স্বতন্ত্র; সুতরাং ইহা বলা সমীচীন নয় যে, লৌহখণ্ডের চুম্বক-সান্নিধ্যের ন্যায় প্রধানেরও কর্মপ্রেরণার জন্য পুরুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন। উপরন্তু পুরুষ সর্বদাই প্রধানের সান্নিধ্যে আছেন বলিয়া সৃষ্টির চিরস্থায়িত্বেরই সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অতঃপর, এখানে পঙ্গু এবং অন্ধের দৃষ্টান্তটি ঠিকভাবে প্রযোজ্য নহে, কারণ একটি পঙ্গু লোকের পক্ষে একটি অন্ধ লোককে পরিচালনা করা সম্ভব; কিন্তু সাংখ্যবাদীদের মতে পুরুষ যেহেতু সম্পূর্ণ উদাসীন, সেইজন্য তিনি প্রধানকে পরিচালনা করিতে পারেন না। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম যদিও উদাসীন, তথাপি মায়াশক্তিবলে ব্রহ্ম গুণোপহিত এবং ক্রিয়াশীল— সুতরাং তিনি সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন। পুনশ্চ পুরুষ এবং প্রধান হইলেন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র, ইঁহাদের একজন হইলেন বুদ্ধিমান ও উদাসীন আর অপরজন হইলেন অচেতন এবং স্বাধীন। এখন, যদি এই দুইটিকে সংযুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে একটি তৃতীয় সত্তার উপস্থিতির প্রয়োজন— এবং যেহেতু সাংখ্যদর্শনে এইরূপ তৃতীয় কোন সত্তার স্বীকৃতি নাই— সেইজন্য ইহাদের সংযোগও অসম্ভব।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৮॥

অঙ্গিত্ব-অনুপপত্তেঃ (যেহেতু মুখ্য এবং গৌণাদি সম্পর্কের কল্পনা এখানে সম্ভব নহে) চ (এবং)।

৮. এবং যেহেতু মুখ্য (গৌণাদি সম্পর্ক) সম্ভব নহে (গুণগুলির মধ্যে, সেইজন্য প্রধান ক্রিয়াশীল নহেন)।

[৮. সাংখ্যমতে গুণ সকলের 'অঙ্গ-অঙ্গী' ভাব ধরিয়া লইয়া প্রধানের জগৎরূপে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ প্রলয়ে সকল গুণই সাম্যভাবে অবস্থান করে।]

সাংখ্যমতে প্রধান সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ— এই তিন গুণসম্পন্ন। এই তিনটি গুণই পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির পূর্বে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। সৃষ্টিকার্য তখনই আরম্ভ হয়, যখন এই সাম্যাবস্থার মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে; যখন একটি গুণ অপর দুইটি গুণকে অতিক্রম করিয়া ক্রিয়াশীল হয়। বাহিরের কোন শক্তি ব্যতীত এই সাম্যাবস্থার বিপর্যয় হইতে পারে না— অথবা যে গুণসমূহ প্রধানে অবস্থান-কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে সেই সকল গুণই তাহাদের স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়াই স্বয়ং অন্য গুণের অধীন হইয়া যায়, এ-রকমটি হইতে পারে না। সুতরাং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২।২।৯॥

অন্যথা (অন্যরূপ) অনুমিতৌ (যদি অনুমান করা হয়) চ (তাহা হইলেও) জ্ঞশক্তি-বিয়োগাৎ (জ্ঞান শক্তির অভাব হেতু)।

৯. যদি অন্যরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে তথাপি জ্ঞানশক্তির অভাব হেতু (প্রধানের প্রথম কারণত্বের অন্য আপত্তিগুলি থাকিয়াই যায়)।

[৯. (অঙ্গাঙ্গিভাব আপত্তিকে যদিও বা খণ্ডন করা যায় অন্য ব্যাখ্যার দ্বারা)— তথাপি প্রধানের জ্ঞান শক্তির অভাবহেতু জগৎ-কর্তৃত্ব কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না।]

কার্য হইতে যদি এইরূপ অনুমান করা যায় যে, কারণরূপ প্রধান এমন কতকগুলি গুণ সমবায়ে গঠিত যে, গুণগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত অস্থৈর্যাদি গুণ বর্তমান, যাহার ফলে তাহারা সাম্যাবস্থায় থাকিয়া নিজেরাও একটা অসাম্য ভাবের সৃষ্টি করে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও প্রধানের প্রথম কারণ হইবার পক্ষে আপত্তিগুলি থাকিয়াই যায়; (সূত্র ১ এবং ৪ দ্রষ্টব্য) কারণ, প্রধানের বুদ্ধিমত্তার অভাবহেতু জগতের পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা এবং সৃষ্টির প্রবহমানতার আপত্তিগুলি কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২।২।১০॥

বিপ্রতিষেধাৎ (বিরোধ হেতু) চ (এবং) অসমঞ্জসম্ (স্ববিরোধী)।

১০. এবং নানা বৈপরীত্যহেতু (সাংখ্যমত) স্ববিরোধী।

[১০. শ্রুতি-স্মৃতির সহিত সাংখ্যের বহু বিরোধ আছে এবং সাংখ্যদর্শনের নিজের চিন্তার মধ্যেও স্ববিরুদ্ধভাব আছে। সুতরাং সাংখ্যের প্রধান গ্রহণযোগ্য নহেন।]

সাংখ্যদর্শনে বহুবিধ বিরুদ্ধভাব আছে; দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যেমন কখনও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা বলা হইয়াছে একাদশ, কোথাও বলা হইয়াছে সাত; আবার একস্থানে বলা হইয়াছে যে, মহৎ হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে— অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ইহারা অহঙ্কার হইতে জাত— এইরূপ বহু অসঙ্গতি আছে। শ্রুতি এবং স্মৃতির সহিত ইহার বিরোধ সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং সাংখ্যবাদিগণের প্রধানের জগৎকারণত্ব মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

অধিকরণ ২ : ব্রহ্মের প্রথম কারণত্বের বিরুদ্ধে বৈশেষিক মতবাদের আপত্তির খণ্ডন।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২।২।১১॥

মহৎ-দীর্ঘ-বৎ (মহৎ এবং দীর্ঘরূপে কল্পনার ন্যায়) বা (অথবা) হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্ব এবং অণু হইতে)।

১১. (জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে) যদিও ইহা মহৎ অথবা দীর্ঘ (ত্র্যণুক ইত্যাদিও হয়), ইহা হ্রস্ব হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে (ক্ষুদ্র দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হইতে পারে) অথবা (এইরূপ দ্ব্যণুক) অপরিমেয় ক্ষুদ্র অণু হইতে জাত হইতে পারে।

[১১. দ্ব্যণুক হইতে এবং পরমাণু হইতে যেমন মহাদীর্ঘ ত্র্যণুকাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতেও অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভব।]

সাংখ্য মতবাদকে খণ্ডন করার পর এখন ১১-১৭ সংখ্যক সূত্রগুলিতে বৈশেষিক মতবাদের আলোচনা করিয়া উহাকেও খণ্ডন করা হইতেছে। প্রথমত ব্রহ্মের প্রথম কারণত্বের বিরুদ্ধে বৈশেষিক দৃষ্টিকোণ হইতে সম্ভাব্য আপত্তিটিকে ১১ নং সূত্রের সাহায্যে খণ্ডন করা হইতেছে। তাঁহাদের মতে কারণের গুণগুলি কার্যের মধ্যেও সমজাতীয় গুণের উৎপাদন করে— যেমন শুভ্র সূত্রের দ্বারা বয়ন করা বস্ত্রে সূত্রের শুভ্রতাই প্রকাশ পায়। সেইরূপ জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি জগতের মধ্যেও বর্তমান থাকিবে— কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। এই যুক্তিকে এইভাবে খণ্ডন করা যায় যে, বৈশেষিক মতবাদের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধেও এই একই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং এই আপত্তিটি শুধু বেদান্তের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আপত্তি নয়। বৈশেষিক

মতে জগতের চরম অবস্থা হইল অণুময়ত্ব— এই জগতের সব বস্তুই বিভিন্ন প্রকার অণুর সমবায় মাত্র। অণু হইল সনাতন এবং জগতের মৌলিক কারণ। প্রলয় অবস্থার সময় জগৎ অণুরূপেই বর্তমান থাকে। সৃষ্টির সময় অদৃষ্টের অপরিদৃশ্যমান তত্ত্বের দ্বারা বায়ুর অণুগুলি চলমান হয়— এবং দুইটি অণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করে। পুনরায় তিনটি দ্ব্যণুক একত্র মিলিত হইয়া একটি ত্র্যণুকের (ত্রসরেণুর) সৃষ্টি করে, এবং চারিটি দ্ব্যণুক একটি চতুরণুর সৃষ্টি করিয়া এইরূপভাবেই স্থূল অবয়ববিশিষ্ট বায়ুর সৃষ্টি হয়। ঠিক অনুরূপভাবেই অন্য পদার্থেরও স্ব-স্ব অণু-দ্ব্যণু হইতে স্থূল আকারের সৃষ্টি হয়। এই দার্শনিক মতবাদানুসারে একটি পরমাণু হইল অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম সত্তা, একটি দ্ব্যণুক হইল খুব সূক্ষ্ম এবং হ্রস্ব এবং ত্র্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সংমিশ্রিত বস্তুগুলি হইল মহৎ এবং দীর্ঘ। এখন, তাহা হইলে— যদি অণু দুইটি গোলাকারবৎ হয় এবং তাহারা যদি একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করে সেই দ্বাণুকটি হইবে সূক্ষ্ম এবং হ্রস্ব, তাহাতে আর সেই অণুর গোলত্ব উৎপাদিত হইবে না। অথবা যদি চারিটি সূক্ষ্ম ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক একটি চতুরণু পদার্থ সৃষ্টি করে যাহা মহৎ এবং দীর্ঘ— সেইক্ষেত্রে, নূতন সৃষ্ট এই বস্তুতে দ্ব্যণুকের সূক্ষ্মত্ব এবং হ্রস্বত্ব সঞ্চারিত হইবে না। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কারণের সবগুলি গুণই কার্যে সঞ্জাত হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের পক্ষে অচেতন ও জগতের কারণত্বের কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানময় এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অবশ্যই অচেতন এবং দুঃখময় জগৎকে সৃষ্টি করিতে পারেন।

অধিকরণ ৩: বৈশেষিকগণের অণু-বাদের খণ্ডন।

বেদান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলির উত্তরদানের পর এখন সূত্রকার বৈশেষিক দর্শনকে খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ ॥২।২।১২॥

উভয়থাপি (উভয় ক্ষেত্রেই) ন (নহে) কর্ম (কার্যাদি) অতঃ (সেইজন্য) তৎ-অভাবঃ (তাহার অস্বীকৃতি)।

১২. এই উভয় ক্ষেত্রেই ('অদৃষ্ট' তত্ত্বটি অণুর মধ্যে অথবা জীবের মধ্যে যেখানেই বর্তমান মনে করা হউক) কার্যগুলি (অণুর) (সম্ভব) নহে। সুতরাং ইহা অস্বীকার করিতে হয় যে, (অণু সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে)।

[১২. 'অদৃষ্ট' অণুর মধ্যে অথবা জীবের মধ্যে যেখানেই অবস্থান করেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হউক না কেন— এই উভয় ক্ষেত্রেই অণুর পক্ষে কোন কার্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং অণু জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না।]

যদি অণু-সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলা হয় তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে, কে এই অণুর সংমিশ্রণ ঘটাইল? যদি ইহাকে কোন দৃষ্ট কারণ বলা হয়— তাহা হইতে পারে না; কারণ, কোন স্থূল সৃষ্টির পূর্বে ইহার থাকা অসম্ভব। একটি দৃষ্ট কারণ একটি প্রচেষ্টা হইতে পারে— অথবা ইহা একটি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে— অথবা এই জাতীয় অন্য কিছুও হইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রচেষ্টাই হইতে পারে না— ইহাই বৈশেষিকদের মত। এবং যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে কোন স্থূল দেহ বা মন্ উভয়ই অবর্তমান, সুতরাং সেখানে কোন কর্মপ্রচেষ্টা থাকিতে পারে না। ঠিক অনুরূপভাবেই কোন প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে না। যদি 'অদৃষ্ট'-ই কারণ হন, তাহা হইলে সেই 'অদৃষ্ট' কোথায় অবস্থান করেন— আত্মাতে অথবা অণুতে? এই উভয় ক্ষেত্রেই, 'অদৃষ্ট' অণুর প্রথম কর্ম প্রেরণার কারণ হইতে পারেন না; কারণ, এই অদৃষ্ট হইলেন অচেতন, এবং সেইজন্যই তিনি স্বয়ং কোন কার্য করিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে, এই আত্মায় অবস্থান করেন— তাহা হইলে আত্মা নিজে তখন অচেতন বলিয়া তাহার মধ্যে অদৃষ্টকে পরিচালনা করার মতো কোন বুদ্ধি (চেতনা) নাই। যদি অদৃষ্ট অণুর মধ্যেই অবস্থান করেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইহা সর্বদা বর্তমান বলিয়া ইহার প্রলয়াবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না— কারণ অণু সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিয়া যাইবে। পুনশ্চ আত্মা হইলেন অণুর ন্যায় অংশ-রহিত। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আত্মা জীব এবং অণুর মধ্যে কোন সংযোগস্থাপনও সম্ভব নহে। ফলত 'অদৃষ্ট' যদি আত্মায় অবস্থান করেন তাহা হইলে তিনি অণুর প্রথম ক্রিয়াশীলতাকে কোনভাবেই প্রভাবিত করিতে পারেন না— কারণ অণুর সঙ্গে আত্মার কোন সংযোগই নাই। সুতরাং সব ক্ষেত্রেই অণুর পক্ষে মৌলিক ক্রিয়াশীলতা সম্ভবপর নহে এবং এই ক্রিয়াশীলতার অভাব-হেতু বৈশেষিকদের মতানুসারে অণুর পরস্পর সংযোগ সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অণু সংযোগে জগৎ সৃষ্টির মতবাদটি সিদ্ধ হইতে পারে না।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২।২।১৩॥

সমবায়-অভ্যুপগমাৎ (সমবায়কে স্বীকার করার জন্য) চ (এবং) সাম্যাৎ (যুক্তির সমতা হেতু) অনবস্থিতেঃ (যুক্তির 'অনবস্থা' দোষ উৎপন্ন হয়)।

১৩. (বৈশেষিক মতবাদ যুক্তিসহ নহে) যেহেতু ইহাতে যুক্তির 'অনবস্থা' দোষ আছে— কেন না ইহা সমবায়কে স্বীকার করিয়াছে।

[১৩. সমবায় সম্বন্ধকে স্বীকার করার জন্য কার্য-কারণের মধ্যে একটা 'অনবস্থা' দোষ দেখা যায় বলিয়া বৈশেষিক মতবাদ গ্রহণীয় নহে।]

বৈশেষিক মতবাদিগণ সাতটি পদার্থ স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে একটি হইল সমবায় বা নিত্যসম্বন্ধ। তাহাদের মতে এই সমবায়ই দ্ব্যণুককে ইহার অঙ্গীভূত দুইটি অণুর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেয়। কারণ দ্ব্যণুক এবং অণু হইল পৃথক্ গুণসম্পন্ন দুইটি বস্তু। সেই ক্ষেত্রে এই সমবায়ও স্বয়ং সংযুক্ত এই দ্ব্যণুক এবং অণু হইতে ভিন্ন হওয়ার জন্য ইহাদের সঙ্গে সমবায়কে যুক্ত করার জন্য অপর একটি সমবায়ের প্রয়োজন হয়, আবার এই সমবায়কে প্রথম সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অপর আর একটি সমবায়ের প্রয়োজন— এবং এইভাবে অনন্ত সমবায়ের প্রয়োজন হইবে। এই যুক্তি এই অনবস্থা দোষের জন্যই দুষ্ট এবং এইজন্যই পরিণামে পরমাণু মতবাদ যাহা অণু সংযোগের জন্য সমবায়কে স্বীকার করে, অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২।২।১৪॥

নিত্যম্ এব (নিত্যভাবে) চ (এবং) ভাবাৎ (অবস্থান হেতু)।

১৪. এবং স্থায়ী অবস্থানের জন্য (অণুগুলির নিত্যকাল কর্ম প্রেরণার ভাব বিদ্যমান থাকার জন্য) (বৈশেষিক) অণু-বাদ গ্রহণীয় নহে।

[১৪. পরমাণুগুলি যদি নিত্য প্রবৃত্তি-প্রবণ হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি অনন্তকালই চলিতে থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। আর ইহাদের মধ্যে নিত্য নিবৃত্তিগুণ কল্পনা করিলে কখনও সৃষ্টি সম্ভব হইবে না।]

এই (বৈশেষিক) অণু-বাদের ক্ষেত্রে আর একটি আপত্তি আছে। যদি অণুগুলি স্বভাবতই ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি হইবে চিরস্থায়ী, কারণ সেইক্ষেত্রে প্রলয়ের অর্থ হইবে অণুগুলির স্বভাবের পরিবর্তন মানিয়া নেওয়া, যাহা অসম্ভব। পক্ষান্তরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারা স্বভাবত নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে প্রলয়াবস্থাকেই চিরন্তন বলিয়া মানিয়া লইতে হয় এবং সেইজন্যই আর সৃষ্টিও হইবে না। অণুগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয়ই হইতে পারে না। যদি তাহারা এই উভয়ের একটা গুণসম্পন্নও না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারটি অদৃষ্টের ন্যায় অন্য কোন নিমিত্ত কারণের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে

— যেহেতু অদৃষ্ট সর্বদাই অণুগুলির সহিত সংযুক্ত সেইজন্য সর্বদাই তাহারা ক্রিয়াশীল থাকিবে এবং সৃষ্টিও চিরস্থায়ী হইয়া পড়িবে। অন্যপক্ষে, যদি আবার সেখানে কোন নিমিত্ত-কারণ না থাকে, তাহা হইলে অণুগুলির কোন ক্রিয়াশীলতাও থাকে না এবং ক্রিয়াশীলতার অভাবে সৃষ্টিও থাকিবে না। ফলত এই অণু-বাদ পুনরায় অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইল।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়ো, দর্শনাৎ ॥২।২।১৫॥

রূপাদিমত্ত্বাৎ (রূপ ইত্যাদি থাকা হেতু) চ (এবং) বিপর্যয়ঃ (বিপরীত) দর্শনাৎ (দেখা যায় বলিয়া)।

১৫. এবং যেহেতু (অণুগুলির) রূপ ইত্যাদি আছে, তাহা হইলে বিপরীত (বৈশেষিকগণ যাহা সত্য বলেন তাহার বিপরীত) হইয়া যায় (কারণ এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে)।

[১৫. বৈশেষিক মতে পরমাণুর রূপাদি গুণ আছে। সুতরাং ইহা সূক্ষ্ম এবং নিত্য হইতে পারে না। স্ববিরোধী বলিয়া অণু জগতের কারণ নহে।]

অণুগুলির রূপ ইত্যাদি আছে বলিয়া বলা হয়, কারণ, তাহা না হইলে কার্যগুলিতে অণুর সেই সকল গুণ পাওয়া যাইত না— যেহেতু কারণের গুণগুলিই কার্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে অণুগুলি অণুগুণসম্পন্ন (ক্ষুদ্র) এবং স্থায়ী হইত না। কারণ যাহা রূপ-বিশিষ্ট তাহাই স্থূল — সূক্ষ্ম নহে এবং ইহা ইহার কারণের তুলনায় অস্থায়ী। সেইহেতু রূপাদিবিশিষ্ট অণুও স্থূল এবং অস্থায়ী হইয়া পড়ে। কাজেই বৈশেষিক দর্শন মতে অণুর ক্ষুদ্রত্ব এবং স্থায়িত্ব ইহার দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া ইহা স্ববিরোধী। সুতরাং অণু জগতের মূল কারণ হইতে পারে না।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২।২।১৬॥

উভয়থা (উভয়ক্ষেত্রেই) চ (এবং) দোষাৎ (দোষহেতু)।

১৬. এবং যেহেতু উভয়ক্ষেত্রেই দোষ দৃষ্ট হয় (সেইজন্য পরমাণু কারণবাদ অপ্রযোজ্য)।

[১৬. অণুর রূপাদি গুণের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি উভয়ই দোষযুক্ত। সেইজন্য পরমাণু কারণবাদ অগ্রাহ্য।]

ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং বায়ু এই চারিটি স্থূল ভূত অণু হইতে উৎপন্ন হয়। গুণগত বিচারে এই চারিটি পদার্থ ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— ক্ষিতির মধ্যে স্পর্শ, রস, গন্ধ এবং রূপ এই চারিটি গুণ বর্তমান, অপরপক্ষে জলের আছে মাত্র তিনটি গুণ, অগ্নিতে মাত্র দুইটি এবং বায়ুতে একটি। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, পদার্থগুলির নিজ নিজ অণুর মধ্যেও পদার্থের গুণগুলি বর্তমান, তাহা হইলে, বায়ুর অণুতে থাকিবে একটি গুণ এবং ক্ষিতির অণুতে থাকিবে চারিটি গুণ। চারিটি গুণের সমবায়ে ক্ষিতির অণুটি আকারে অন্য পদার্থের অণু হইতে বৃহত্তর হইবে— কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুণের বৃদ্ধি হইলে আয়তনের বৃদ্ধি না হইয়াই পারে না, এবং এই আয়তন বৃদ্ধির ফলে অণু আর অণু থাকিতে পারে না। অপরপক্ষে যদি আমরা ধরিয়া লই যে, প্রত্যেক পদার্থের অণুরই সমসংখ্যক গুণ আছে, তাহা হইলে অণুগুলির সৃষ্ট পদার্থের গুণগুলির মধ্যেও কোন পার্থক্য থাকিবে না— কারণ তত্ত্বটি হইল এই যে, কারণের গুণগুলিই কার্যের মধ্যে সঞ্জাত হইয়া বর্তায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই বৈশেষিক মতবাদ ভ্রান্ত এবং সেইজন্য ইহা অগ্রাহ্য।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।।২।২।১৭।।

অপরিগ্রহাৎ (যেহেতু ইহা গ্রহণীয় নহে) চ (এবং) অত্যন্তম্ (সম্পূর্ণরূপে) অনপেক্ষা (বর্জনীয়)।

১৭. এবং যেহেতু (অণু-বাদকে) গ্রহণ করা হয় নাই (মনু প্রমুখ প্রামাণ্য ঋষির দ্বারা), ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

[১৭. মনু প্রমুখ স্মৃতিকার মুনিগণ অণু-বাদকে স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বেদমতাবলম্বীদের পক্ষে এই মতবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না।]

অধিকরণ ৪: প্রপঞ্চবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।।২।২।১৮।।

সমুদায়ে (একত্র সমবেতভাবে) উভয় হেতুকে (দুইটিকেই কারণ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য) অপি (তাহা হইলেও) তৎ-অপ্রাপ্তি (তাহা সংঘটিত হইবে না)।

১৮. যদিও (দুই প্রকার) সমবায় দুইটি কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও (দুইটি সমবায়ের) দ্বারাও কোন সৃষ্টি সম্ভব হইবে না।

[১৮. বৌদ্ধমতে অণুহেতু বাহ্য প্রপঞ্চ এবং চিত্তহেতু আন্তর প্রপঞ্চ— এই উভয়ের মিলনে 'সমুদায়' ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়। এই মতও অগ্রাহ্য— কারণ, তাহাদের মতে ঐ সকলের মিলন হইতেই পারে না।]

এই সূত্রটি হইতে বৌদ্ধ মতবাদের খণ্ডন আরম্ভ হইল। বৌদ্ধ দর্শনে তিনটি প্রধান মতবাদ আছে— যথা (১) বস্তুবাদী বা প্রপঞ্চবাদী যাঁহারা বাহ্য এবং আন্তর উভয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন— বাহ্য বস্তু সমবায়ে বাহ্য-জগৎ ও চিত্তবৃত্তি লইয়া অন্তর্জগৎ— (২) চিত্ত-চৈত্তিক (Idealist) বাদী যাঁহারা মনে করেন যে, বিজ্ঞপ্তি চিত্তই (Thought) একমাত্র সত্য এবং (৩) শূন্যবাদী— যাঁহারা মনে করেন যে, সব কিছুই শূন্য এবং অসৎ। কিন্তু এই মতবাদগুলির সব কয়টিই বিশ্বাস করে যে, জগতের সব কিছুই ক্ষণিক— কিছুই এক মুহূর্তের অধিক স্থায়ী নহে।

বস্তুবাদী বৌদ্ধগণ দুইটি 'সমুদায়'কে স্বীকার করেন— বাহ্য বস্তুজগৎ (ভূত-ভৌতিক) এবং আন্তর মনোজগৎ (চিত্ত-চৈত্তিক)— এই উভয়ের সমন্বয়ে বিশ্বজগৎ। বাহ্য জগৎ (ভূত-ভৌতিক) পরমাণু সমুদায় লইয়া গঠিত। এই পরমাণু চারি প্রকার— পার্থিব পরমাণু যাহা কঠিন, জলীয় পরমাণু যাহা তরল, তেজঃ পরমাণু যাহা উষ্ণ এবং বায়বীয় পরমাণু যাহা সদা গতিময়।

পঞ্চ স্কন্ধ হইল অন্তর্জগতের উপাদান। এই পঞ্চ স্কন্ধ হইল— (১) রূপ স্কন্ধ যাহা ইন্দ্রিয় এবং ইহার বিষয় লইয়া গঠিত; (২) বিজ্ঞান স্কন্ধ যাহা অহংবোধের জন্ম দেয় এমন কতকগুলি ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা গঠিত; (৩) বেদনা স্কন্ধ— যাহা সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি দ্বারা গঠিত; (৪) সংজ্ঞা স্কন্ধ— সে একজন মানুষ ইত্যাদি নাম রূপের জ্ঞানসমবায়ে গঠিত এবং (৫) সংস্কার স্কন্ধ যাহা আকর্ষণ- বিকর্ষণ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বোধের দ্বারা গঠিত। এই স্কন্ধগুলির সমবায়ে আন্তর সমুদায় বা মনো জগতের সৃষ্টি। এই সূত্রটিতে এই দুই বাহ্য এবং আন্তর সমুদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮-২৭ সংখ্যক সূত্রগুলি প্রপঞ্চবাদকে (বস্তুবাদকে) খণ্ডন করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে এই দুইটি সমুদায়ের উৎপত্তি হইল? এই সমুদায়ীকরণের পশ্চাতে কি কোন চৈতন্যময় কারণরূপী পরিচালক সত্তা আছেন, অথবা ইহা স্বতই উৎপন্ন হইয়াছে? যদি ইহা স্থিতিশীল হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধিতা করা হয়। আর যদি ইহাকে ক্ষণিক মনে করা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে, ইহা প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পরে পরমাণুগুলিকে একত্র সংহত করিল। কেননা তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কারণ এক মুহূর্তের অধিককালই

স্থায়ী। আর যদি এই সমুদায়ের পশ্চাতে কোন চৈতন্যময় সত্তা নিয়ন্তারূপে না থাকেন, তাহা হইলে কিরূপে এই অচেতন এবং স্কন্ধগুলি এমন সুশৃঙ্খলভাবে সংহত হইয়া সমুদায় সৃষ্টি করিতে পারে? অধিকন্তু, এই ক্রিয়াশীলতা হইত চিরন্তন এবং সেক্ষেত্রে কোন ধ্বংস বা প্রলয় থাকিত না। এই সকল কারণেই এই সমুদায় সৃষ্টির কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না এবং তাহা করিতে না পারার জন্যই জাগতিক অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও বর্তমান থাকিতে পারে না। ফলত বৌদ্ধদের এই মতবাদটি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ইতরেতর–প্রত্যয়ত্বাদিতি চেৎ, ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।।২।২।১৯।।

ইতরেতর-প্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পর কার্যকারণতা হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন (তাহা নহে) উৎপত্তি-মাত্র-নিমিত্তত্বাৎ (কারণ তাহারা যেহেতু উৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ মাত্র)।

১৯. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (সমুদায়ের উৎপত্তি সম্ভব হয়) পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধের জন্য (অবিদ্যা ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদের পরম্পরায়), ইহার উত্তরে বলা যায় যে— না, তাহা নহে; কারণ তাহারা হইল উৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ মাত্র (কার্যকারণ শৃঙ্খলের অব্যবহিত পরবর্তীর নিমিত্ত-কারণ মাত্র— সমুদায়ের কারণ নহে)।

[১৯. যদি বলা হয় যে, অবিদ্যা-সংস্কার প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ বলিয়া তাহাদের সঙ্গতি আছে— তদুত্তরে বলা যায় যে, তাহা হইতে পারে না কারণ তাহার উৎপত্তির পরক্ষণেই ধ্বংস হয় বলিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না এবং কারণ হইলেও তাহারা নিমিত্ত-কারণ মাত্র।]

বৌদ্ধদের প্রতীত্য সমুৎপাদের শৃঙ্খল পরম্পরাটি হইল এইরূপ:— অবিদ্যা, সংস্কার (আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদি), বিজ্ঞান (আত্ম-সচেতনতা), নাম (ক্ষিতি, জল প্রভৃতি), রূপ (স্থূল শরীরের সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ), ষড়ায়তন (দেহ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়), স্পর্শ, বেদনা (সুখ-দুঃখাদি অনুভব), ভব (বাসনা), গতি, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি। এই শৃঙ্খলা পরম্পরায় অব্যবহিত পূর্ববর্তীটি হইল পরবর্তীটির কারণ। সুতরাং আমরা পূর্ববর্তী সূত্রের আপত্তি, জাগতিক অস্তিত্ব যে সমুদায়-সম্পাদক কোন সত্তা ব্যতীতই সম্ভবপর তাহার একটা ব্যাখ্যা এখানে পাই। এইগুলি সৃষ্টি করে একটি অপ্রতিহত কার্য-কারণ শৃঙ্খল,

যাহা অবিরতভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এবং একটি 'সমুদায়' না থাকিলে ইহা সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং 'সমুদায়' হইল একটি বাস্তব সত্তা।

এই সূত্রটি এই যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছে। এখানে এই যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, যদিও এই শৃঙ্খলে পূর্ব-পূর্ববর্তীটি পর-পরবর্তীটির কারণ, তথাপি সমগ্র সমুদায়ের কারণ বলিয়া কিছু বর্তমান নাই। বৈশেষিক মত খণ্ডন প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, পরমাণুগুলিকে অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন ধরিয়া নিলেও তাহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই যাহার বলে তাহারা একত্র সমবেত হইতে পারে। বৌদ্ধরা যেখানে অণুগুলিকে ক্ষণিক বলিয়া থাকেন সেখানে তো তাহাদের পক্ষে স্বতই সংহত হওয়া আরও অসম্ভব। পুনশ্চ যে জীবাত্মার ভোগ ইত্যাদির জন্য দেহ-সমুদায় ইত্যাদির প্রয়োজন— সেই জীবাত্মাও ক্ষণিক এবং ক্ষণিকত্বের জন্য জীবও ভোক্তা হইতে পারে না। জীবাত্মা যদি ক্ষণিকই হইল, তাহা হইলে এই মুক্তির প্রয়োজনই বা কাহার জন্য? সুতরাং এই প্রতীত্য সমুৎপাদ শৃঙ্খল যদিও পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ— তথাপি ইহা সমুদায়ের কারণ হইতে পারে না, এবং যেহেতু স্থায়ী কোন ভোক্তা নাই, সেইজন্য এই সমুদায় প্রপঞ্চেরও প্রয়োজন নাই। সুতরাং বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ অসিদ্ধ।

এই সূত্রটিকে এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: বৌদ্ধগণ বলেন, যদি অণুগুলিকে একটি কারণ সম্পর্কে বর্তমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইলে সেগুলিকে সমুদায়ে সংহত করার জন্য অন্য কোন সংযোগকারী সত্তার প্রয়োজন থাকিবে না, সেক্ষেত্রে পরমাণুগুলি স্বতই সংহত হইবে। সূত্রটির পরবর্তী অংশ এই বলিয়া ইহার খণ্ডন করে যে— কারণত্বটি শুধুমাত্র ঘটের পরমাণুর পূর্ববর্তী মুহূর্তের দ্বারা সৃষ্ট পরবর্তী মুহূর্তের ঘটের পরমাণুর উৎপত্তিরই ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু পরমাণুগুলির সমুদায় গঠনের কারণত্বের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সমুদায় তখনই সম্ভব যদি তাহার পশ্চাতে কোন চেতন কর্তা থাকেন— তাহা না হইলে অচেতন এবং ক্ষণিকধর্মী অণু সমুদায়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥২।২।২০॥

উত্তরোৎপাদে (পরবর্তী বস্তুটির উৎপাদনের সময়ে) চ (এবং) পূর্বনিরোধাৎ (কারণ পূর্ববর্তী বস্তুটি অনস্তিত্বে বিলীন হইয়া গিয়াছে)।

২০. এবং যেহেতু পরবর্তী জিনিসটি সৃষ্টির সময় (এমনকি প্রতীত্য সমুৎপাদের শৃঙ্খলের মধ্যেও) পূর্ববর্তী বস্তুটি অবিদ্যমান হইয়া গিয়াছে (সেইজন্য ইহা পরবর্তী বস্তুটির কারণ হইতে পারে না)।

[২০. সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি পরপর বস্তুসমূহ যখন উৎপন্ন হয় তখন ইহার অব্যবহিত পূর্বপূর্ব অবিদ্যাদি পদার্থসমূহ অনস্তিত্বশীল হইয়া যায়। সুতরাং পূর্বপূর্ব অবিদ্যাদি দ্রব্যসমূহ পরপর সংস্কারাদির উৎপাদক কারণ হইতে পারে না।]

এখন এই সূত্রটি অবিদ্যা, সংস্কার ইত্যাদি প্রতীত্য-সমুৎপাদ-শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ, কারণ পরম্পরার কারণত্বকেও খণ্ডন করিতেছে। যেহেতু সব কিছুই ক্ষণিক, সেইজন্য পূর্ববর্তী জিনিসটি জন্মমুহূর্তের পরই আর থাকিবে না— তাই ইহা পরবর্তী কোন বস্তুর কারণ হইতে পারিবে না। ঘটের উৎপত্তির সমকালে যে মৃৎপিণ্ডটি ছিল তাহাই হইল ঘটের কারণ— ঘটের সৃষ্টির পূর্বকালে যে মৃৎপিণ্ড ছিল তাহা কারণ নহে, কারণ তাহা ততক্ষণে অসৎ হইয়া গিয়াছে। যদি তখনও ইহাকে কারণ বলা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হয় যে, নাস্তি হইতে অস্তি উৎপন্ন হয়, যাহা অসম্ভব। আবার ক্ষণিকত্ববাদকে গ্রহণ করিলে, কার্যটি কারণেরই নবতর রূপ— এই তত্ত্বটির বিরোধিতা করা হয়। এই তত্ত্বটি হইতে জানা যায় যে, কারণটি কার্যে বর্তমান থাকে— ইহার অর্থ হইল এই যে, ইহা ক্ষণিক নহে। পুনরায় বস্তুসমূহের ক্ষণিকত্বের জন্য বস্তুর 'উৎপত্তি' এবং 'বিনাশ'— উভয়ই সমার্থক হইয়া দাঁড়ায়— কারণ যদি আমরা বলি যে, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, একটি বস্তু অন্ততপক্ষে এক মুহূর্তের অধিককাল স্থিতিশীল হয়— সেইক্ষেত্রে আমাদিগকে ক্ষণিকত্ববাদকে বর্জন করিতেই হয়।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২।২।২১॥

অসতি (যদি [কারণের] অনস্তিত্বকে মানিয়া লওয়া হয়) প্রতিজ্ঞা-উপরোধ (তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা হইবে) অন্যথা (তাহা না হইলে) যৌগপদ্যম্ (সমকালীন হইয়া যাইবে)।

২১. যদি (কারণের) অনস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় (কারণ ব্যতীতই কার্য হইতে পারে— ইহা) (তাহা হইলে ফল হইবে এই যে), বৌদ্ধদের প্রতিজ্ঞাটি স্ববিরোধী হইয়া যাইবে। অন্যথায় (কারণ এবং কার্য) একই সময়ে (উৎপন্ন হইবে)।

[২১. কার্য উৎপত্তিকালে কারণস্বরূপ পূর্বক্ষণ থাকে না ইহা স্বীকার করিলে বৌদ্ধদিগের— "চিত্ত-চৈত্য পদার্থসমূহ চারি প্রকারে উৎপন্ন হয়"— এই প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ হয়। আর কারণের বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে কার্যকারণের একই সময়ে অবস্থিতি মানিতে হয়। তাহা হইলে পদার্থমাত্রই ক্ষণিক এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয় না।]

যদি পূর্বসূত্রে প্রদর্শিত আপত্তিকে পরিহার করিতে গিয়া বৌদ্ধগণ বলেন যে, কারণ ব্যতীতই কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের প্রতিজ্ঞাকেই ভঙ্গ করিবেন যে, প্রত্যেকটি কার্যেরই একটি কারণ আছে। অন্যপক্ষে, যদি একটি কারণকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য এবং কারণ একই সময়ে বর্তমান থাকে— পরবর্তী মুহূর্তটিতে— অর্থাৎ কারণ একাধিক মুহূর্তকাল স্থায়ী হয়। তাহা হইলে, পূর্বসূত্রে যেরূপ দেখানো হইয়াছে— ক্ষণিকত্ববাদ মতটি নস্যাৎ হইয়া যায়।

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ, অবিচ্ছেদাৎ ॥২।২।২২॥

প্রতিসংখ্যা (নিরোধ)- অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ- অপ্রাপ্তিঃ (সহেতুক [সজ্ঞান] বিনাশ এবং অহেতুক বিনাশ অসম্ভব হইত) অবিচ্ছেদাৎ (বিচ্ছেদহীন বলিয়া)।

২২. যেহেতু কোন বিচ্ছেদ নাই, সেইজন্য সহেতুক বিনাশ বা অহেতুক বিনাশ কিছুই হইবে না।

[২২. পরম্পর সম্বদ্ধ কার্যকারণ পরম্পরায় বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া বুদ্ধিপূর্বক বিনাশ ও অবুদ্ধিপূর্বক বিনাশ উভয়ই অসম্ভব হয়।]

বৌদ্ধগণের মতে চিরকাল যাবৎ একটি সামগ্রিক ধ্বংস (বিনাশ) চলিয়া আসিতেছে; এবং এই ধ্বংস হইল বুদ্ধিপূর্বক এবং অবুদ্ধিপূর্বক— দুই প্রকার। বুদ্ধিপূর্বক বিনাশ হইল যেমন চিন্তাভাবনা করিয়া একটি লোক যষ্টি দ্বারা একটি ঘটকে ভাঙিল; আর অবুদ্ধিপূর্বক বিনাশ হইল বস্তুসমূহের স্বাভাবিক বিনষ্টি। এই সূত্রটি বলে যে, এই উভয় প্রকারের বিনাশই অসম্ভব, কারণ এই ধ্বংসের জন্য হয় এই ক্ষণিক সত্তার একটা ধারাবাহিক অবস্থানের প্রয়োজন অথবা এই সমুদায়ের অন্তত একটিরও প্রয়োজন। এই সমুদায় পরম্পরা সদা প্রবহমান, ইহাকে কখনও স্তব্ধ করা যাইবে না। কেন?— কারণ এই ধ্বংসের পূর্ববর্তী শেষতম মুহূর্তের অবস্থানকে কল্পনা করিতে হইবে এইভাবে যে, হয় ইহা কার্য উৎপাদন করে, অথবা কোন কার্য উৎপাদন করে না। যদি ইহা কার্য উৎপাদন করে— তাহা হইলে এই কার্যকারণ পরম্পরার শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াই চলিতে থাকিবে এবং ইহার বিনাশ হইবে না। আর ইহা যদি কোন কার্য উৎপাদন না করে, তাহা হইলে— শেষতম মুহূর্তের অবস্থানটি মোটেই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা হইবে না— কারণ বৌদ্ধদের মতে সত্তার অর্থ হইল কারণের কার্যকারিতা। পুনশ্চ,

শেষতম মুহূর্তের অস্তিত্বের অনস্তিত্ব আমাদিগকে পশ্চাতের দিকে পূর্ব পূর্ববর্তী ক্ষণিক অস্তিত্বের অনস্তিত্বের দিকে লইয়া যাইবে—। এইরূপে এই কার্যকারণ শৃঙ্খলের সব অবস্থানের অনস্তিত্বের দিকেই যাত্রা হইবে।

পুনশ্চ, এই দুই প্রকারের বিনাশ এই সমুদায়ের বিশেষ কোন পদার্থের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। কারণ এই সমুদায়ের প্রত্যেকটি পদার্থই ক্ষণিক হওয়ার জন্য ইহার বুদ্ধিপূর্বক বিনাশ কখনও সম্ভব নয়। অথবা ইহার অবুদ্ধিপূর্বক বিনাশও সম্ভব নয়, কারণ ইহার অন্তর্গত কোন পদার্থ বিশেষেরই সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব নয়। যেমন যখন একটি ঘট ধ্বংস হয় তখন ইহার খণ্ডগুলির মধ্যে আমরা মৃৎপিণ্ডের অস্তিত্বকে দেখিতে পাই। এমনকি অন্যক্ষেত্রেও যেখানে আমরা বস্তুটি অদৃশ্য হইয়া গেল বলিয়া মনে করি, সেখানেও; যেমন যদি উত্তাপের ফলে জলবিন্দুকে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখি তাহা হইলেও আমরা ধারণা করিতে পারি যে, উহা অন্যরূপে—বাষ্পরূপে অবস্থান করিতেছে।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২।২।২৩॥

উভয়থা (উভয় ক্ষেত্রেই) চ (এবং) দোষাৎ (আপত্তি হেতু)।

২৩. এবং উভয়ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ— চরম মোক্ষ অবস্থার মায়া এবং ইহার সৃষ্ট বিপত্তিগুলির বুদ্ধিপূর্বক অথবা অ-বুদ্ধিপূর্বক যেভাবেই বিনাশ হউক না কেন), ইহার আপত্তি হেতু (যেসব আপত্তি উদ্ভূত হইতে পারে— সেই সকলের জন্য— বৌদ্ধমত সিদ্ধ হইতে পারে না)।

[২৩. বুদ্ধিপূর্বক অথবা অ-বুদ্ধিপূর্বক, যেভাবেই অবিদ্যার বিনাশ হউক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই নানা দোষ থাকায় বৌদ্ধমত অসঙ্গত।]

বৌদ্ধমতে অবিদ্যা (মায়া) হইল ক্ষণিক বস্তুতে চিরন্তনত্বের আরোপজনিত ভ্রান্তি বা মিথ্যা দৃষ্টি। বৌদ্ধরা বলেন যে, এই অবিদ্যার বিনাশেই মোক্ষ বা নির্বাণলাভ হয়। এখন এই অবিদ্যার বিনাশ পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত দুই প্রকার বিনাশের মধ্যে একটির দ্বারা অবশ্যই হইবে। যদি এই বিনাশ বুদ্ধিপূর্বক কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব চেষ্টা, তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারা হয়, তাহা হইলে ইহা বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী হইবে। কারণ, ক্ষণিকত্ববাদের মতে অবিদ্যাও ক্ষণিক, এবং অবিদ্যাও উৎপত্তির এক মুহূর্ত পরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি আমরা বলি যে, অবিদ্যার বিনাশ স্বতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গ মার্গাদির উপদেশ ব্যর্থ হয়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই বৌদ্ধদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে।

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২।২।২৪॥

আকাশে (আকাশ [অবকাশ] বিষয়ে) চ (ও) অবিশেষাৎ (কোন পার্থক্য নাই বলিয়া)।

২৪. আকাশ (অবকাশ) বিষয়েও কোন পার্থক্য নাই (দুই প্রকার বিনাশ ব্যাপার হইতে— ইহাও অভাব-পদার্থ নহে।)

[২৪. বৌদ্ধমতে আকাশ কোনরূপ ভাববস্তু নহে। কিন্তু এই মত ঠিক নহে। কারণ পৃথিব্যাদির ন্যায় ইহারও উপলব্ধি হয়।]

বৌদ্ধ মতানুসারে দুই প্রকার বিনাশ ব্যতীতও আকাশ হইল তৃতীয় অভাব-বস্তু। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, আকাশের কোন সাধারণ আবরণ অথবা স্থানাধিকারী কোন শরীর নাই। ২২-২৩ সংখ্যক সূত্রদ্বয়ে দেখানো হইয়াছে যে, দুই প্রকারের বিনাশ সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বগুণরহিত নহে, সুতরাং ইহা অভাব-পদার্থ হইতে পারে না। আকাশের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। যেমন ক্ষিতি, বায়ু প্রভৃতিকে তাহাদের প্রকৃতিগত মৌলিক গুণরাশি গন্ধত্বাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করা যায়— ঠিক সেইরূপভাবেই আকাশকেও শব্দগুণের আশ্রয়স্থল বলিয়া একটি সত্তাত্মক পদার্থ হিসাবে উপলব্ধি করা সঙ্গত হইবে। ক্ষিতি প্রভৃতির প্রতীতি হয় তাহাদের গুণ হইতে এবং আকাশের অস্তিত্বও অনুভূত হয় ইহার শব্দগুণ হইতে। সুতরাং কার্যকারণে ইহাও অবশ্যই একটি ভাব-পদার্থ।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২।২।২৫॥

অনুস্মৃতেঃ (স্মৃতি হেতু) চ (এবং)।

২৫. এবং স্মৃতি থাকে বলিয়া (অভিজ্ঞতার স্থায়িত্বকে স্বীকার করিতেই হইবে)।

[২৫. দ্রষ্টার পূর্বদৃষ্ট পদার্থ স্মরণে থাকে। অতএব ক্ষণিকত্ববাদ যুক্তিযুক্ত নহে।]

বস্তুনিচয়ের ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে অপর একটি আপত্তি এখানে দেওয়া হইতেছে। যদি সবকিছুই ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে সকল অভিজ্ঞতাকারী অথবা কোন কিছুর ভোক্তাও অবশ্যই ক্ষণিক হইবে। কিন্তু ভোক্তা যে ক্ষণিক নহে এবং দীর্ঘতর কাল স্থায়ী, তাহা এই বিষয় হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি পরবর্তী কালেও থাকে। স্মৃতি একমাত্র সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সম্ভব যাহার

এই বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে— কারণ যাহা এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয় তাহা অন্য ব্যক্তির স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং ভোক্তা এবং স্মর্তা একই ব্যক্তি হওয়ার জন্য সে অন্ততপক্ষে দুইটি মুহূর্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে— যাহা ক্ষণিকত্ববাদকে খণ্ডন করে।

নাসতঃ, অদৃষ্টত্বাৎ ॥২।২।২৬॥

ন (হয় না) অসতঃ (অসৎ হইতে) অদৃষ্টত্বাৎ (দৃষ্ট হয় না বলিয়া)।

২৬. (কোন কিছুর উৎপত্তি) হয় না অসৎ বস্তু হইতে, কারণ এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই।

[২৬. অনস্তিত্বশীল বস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি হয় না। কারণ, এইরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও নাই।]

বৌদ্ধগণ বলেন যে, যাহা চিরন্তন এবং অপরিবর্তনশীল, তাহা হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণ যাহার পরিবর্তন নাই তাহা কার্য উৎপাদন করিতে পারে না। এইজনাই তাঁহারা (বৌদ্ধগণ) বলেন যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বক্ষণেই কারণটি ধ্বংস হইয়া যায়। বীজটি ধ্বংস হইলে পরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে— বৌদ্ধমতে, অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই সূত্রটি এই বলিয়া ইহার খণ্ডন করে যে, যদি এইরূপ হইত, তাহা হইলে বিশেষ কারণের অনুমান নিরর্থক হইত। সেক্ষেত্রে যাহা কিছু হইতে যে-কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারিত, কারণ সর্বক্ষেত্রেই অনস্তিত্ব অবস্থাটি একইরূপ। একটি আমের আঁটি এবং একটি আপেলের বীজের অনস্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কার্যত আমরা একটি আমের আঁটি হইতে একটি আপেল গাছের উৎপত্তিকে প্রত্যাশা করিতে পারি। যদি অনস্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে তাহা হইলে ইহার ফল হইবে এই যে, একটি আম্র বীজের অনস্তিত্ব একটি আপেলের বীজের অনস্তিত্ব হইতে ভিন্ন হইবে। সেক্ষেত্রে তাহারা একটা সুনিশ্চিত নির্দিষ্ট ফলই উৎপন্ন করিবে, তাহা হইলে তাহারা আর অসৎ-বস্তু হইবে না— অবশ্যই একটা সদ্‌বস্তু হইবে।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২।২।২৭॥

উদাসীনানাম্ (চেষ্টাহীনের) অপি (ও) চ (এবং) এবং (এইরূপ) সিদ্ধিঃ (উদ্দেশ্য লাভ হইবে)।

২৭. এবং এইরূপভাবে (যদি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে ফল হইবে এই যে) নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরাও অভীষ্ট ফল লাভ করিবে।

[২৭. যদি অভাববস্তু হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি হইত তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিও কার্যসিদ্ধি করিতে পারিত।]

কেবল কর্মহীনতা হইতেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত— যেহেতু কারণরূপ কর্মপ্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনই হইত না। এমনকি চরম মুক্তি পর্যন্ত চেষ্টা ব্যতীতই সম্ভব হইত।

অধিকরণ ৫ : বৌদ্ধ আদর্শবাদের অর্থাৎ চিত্ত-চৈত্তিক বা বিজ্ঞানমাত্র বাদের খণ্ডন

নাভাবঃ উপলব্ধেঃ ।।২।২।২৮।।

ন (না, ইহা নহে) অভাবঃ (অভাব, অনস্তিত্ব) উপলব্ধেঃ (যেহেতু ইহার উপলব্ধি হয়)।

২৮. অভাব (বাহ্য বস্তুর) (সত্য) নহে, কারণ তাহারা তো উপলব্ধ হইয়া থাকে।

[২৮. এই সূত্র হইতে বৌদ্ধ আদর্শবাদীদের অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতবাদের খণ্ডন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের মতে বিজ্ঞান মাত্রই সত্য, অন্য কিছু নহে।]

এই মতবাদ অনুসারে বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। ইহার দ্বারা কি আমরা বুঝিব যে, বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চ শশশৃঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক, অথবা ইহা কি স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় মিথ্যা? এই সূত্রটি পূর্ববর্তী (শশশৃঙ্গের ন্যায়) মতের খণ্ডন করিতেছে। সেইরূপ হইলে আমরা এই জগৎপ্রপঞ্চকে উপলব্ধিই করিতে পারিতাম না। বাহ্য জগৎকে আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে উপলব্ধি করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাকে আমরা শশশৃঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন বলিতে পারি না। ইহার উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা কোন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নহেন একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না; তবে তাঁহারা চিত্ত-চেতনায় অন্তরে বিজ্ঞানরূপে যাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই তাঁহাদের নিকট বাহ্য জগতে বিমূর্তরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহা হইলে বিজ্ঞানের নিজস্ব লক্ষণটিই প্রমাণ করিবে যে, বাহ্য জগতের বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণাটি আন্তর জগতের বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। কারণ, মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুনিচয়ের সম্পর্কেই সচেতন, কেহই তাহার শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সম্পর্কে সচেতন

নহে। বৌদ্ধরা যে বলেন চিত্ত-চৈত্তিক অভিজ্ঞাই "বাহ্য কোন কিছুর রূপবিশিষ্ট হইয়া" প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাহ্য জগৎটি বাস্তব। যদি বাহ্য জগৎ বাস্তব না হইত, তাহা হইলে "বাহ্য কিছুর ন্যায়"— এই তুলনা অর্থহীন হইত। কেহই বলে না যে, দেবদত্ত এক বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায়।

বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।।২।২।২৯।।

বৈধর্ম্যাৎ (যেহেতু প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে) চ (এবং) ন (নহে) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্ন ইত্যাদির ন্যায়)।

২৯. যেহেতু স্বরূপের পার্থক্য আছে (জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থার চেতনা বিষয়ে, সেইজন্য জাগ্রৎ অবস্থার অভিজ্ঞা) স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞার অনুরূপ নহে।

[২৯. জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থার চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া, জাগ্রৎ অবস্থার অভিজ্ঞা স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞার অনুরূপ নহে।]

এই সূত্রটি পূর্ববর্তী সূত্রে প্রদত্ত বিকল্প মতকে খণ্ডন করিতেছে। বৌদ্ধগণ বলিতে পারেন যে, বাহ্য জগতের অভিজ্ঞা স্বপ্নজগতে দৃষ্ট অভিজ্ঞার ন্যায়ই মনে করিতে হইবে। স্বপ্নে বাহ্যবস্তু থাকে না; তথাপি ধারণাগুলি দুইটি রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়— একটি জ্ঞাতা এবং অপরটি জ্ঞেয়। বাহ্যজগতের রূপটি একইভাবে বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ। এই সূত্রটি ঐ মতকে খণ্ডন করিতেছে। জাগ্রৎ-অবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা জাগ্রৎ অবস্থার অভিজ্ঞতার দ্বারা বাধিত হয়— দেখা যায় ইহা মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থা হইল একপ্রকার স্মৃতি, আর জাগ্রৎ অবস্থা হইল বাস্তব অনুভব। সুতরাং ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। অধিকন্তু, অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বের আর প্রমাণ কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যাহার সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা হইল তাহাকে অস্তিত্বশীল বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কোথায়? বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তবাদীরাও বাহ্য জগতের অনস্তিত্বকে স্বীকার করেন— কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর বাহ্য জগতের জ্ঞান বাধিত হয় এবং শ্রুতির উপরই এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি বৌদ্ধরা বেদের প্রমাণকে স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বেদান্তবাদীদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন!— তাঁহাদের আর পৃথক্ কোন অস্তিত্ব থাকিল না— কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধরা বেদ মানেন না।

ন ভাবঃ অনুপলব্ধেঃ ॥২।২।৩০॥

ন (হয় না) ভাবঃ (অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু বাহ্য বস্তুসমূহ) উপলব্ধ হয় না।

৩০. (সংস্কারের) অস্তিত্ব (সম্ভব নয়— বৌদ্ধ মতানুসারে) কারণ, (বাহ্য বস্তুনিচয়) অভিজ্ঞতালব্ধ হয় না।

[৩০. বস্তুর অভাবে তদ্বিষয়ক উপলব্ধি সম্ভব নহে এবং উপলব্ধির অভাবে বাসনার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।]

বৌদ্ধগণ বলেন যে যদিও বাহ্য বস্তুর নিজের কোন অস্তিত্ব নাই, তথাপি ঘট-পটাদির বাস্তব বিচিত্র ধারণাগুলির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে আমাদের পূর্ব সংস্কার অথবা পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ মানসিক ধারণার (বাসনার) প্রভাবের দ্বারা— যেমন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার ধারণাগুলিই স্বপ্নাবস্থায় বিচিত্ররূপে উপলব্ধ হয়। এই সূত্র অনুসারে এই মতবাদটি সঙ্গত নহে— কারণ বাহ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা ব্যতীত মানসিক ধারণা (সংস্কার) সম্ভব নহে। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহা অস্বীকার করেন। অনাদি কার্যকারণ শৃঙ্খলের (প্রতীত্য-সমুৎপাদ) ধারণার অনুমানকে স্বীকার করিলে আমাদের 'অনবস্থাদোষে'ই উপনীত হইতে হইবে— ইহাতে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২।২।৩১॥

ক্ষণিকত্বাৎ (ক্ষণিকত্ব হেতু) চ (এবং, ও)।

৩১. ক্ষণিকত্বহেতুও (অহংজ্ঞানও ক্ষণিক বলিয়া ইহা সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারে না)।

[৩১. বৌদ্ধমতে বাসনা ও সংস্কারের আশ্রয় অহংও ক্ষণিক। তাই ইহা সংস্কার বা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না।]

বাসনা বা মনের সংস্কারের অবশ্যই একটা আশ্রয় থাকা প্রয়োজন। আশ্রয় ব্যতীত তাহারা বর্তমান থাকিতে পারে না। কিন্তু ক্ষণিকত্ববাদ সবকিছুরই স্থায়িত্বকে অস্বীকার করে। এমনকি আলয়-বিজ্ঞান বা অহংজ্ঞানও ক্ষণিক, সেইজন্য ইহাও সংস্কারের আশ্রয় হইতে পারে না। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ রক্ষাকারী যদি কোন সত্তা বর্তমান না থাকে তাহা হইলে, বিশেষ কোন সময়ে এবং স্থানে উদ্ভূত কোন অভিজ্ঞতার স্মৃতি বা সংস্কার থাকা সম্ভবপর নহে। যদি আলয়-বিজ্ঞানকে স্থায়ী কিছু বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা হইবে ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধ।

সর্বথানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩২॥

সর্বথা (সর্বতোভাবে) অনুপপত্তেঃ (অযৌক্তিক বলিয়া) চ (এবং)।

৩২. এবং (যেহেতু বৌদ্ধমত) সর্বপ্রকারেই যুক্তিহীন (সেইজন্য ইহা গ্রহণীয় নহে)।

[৩২. বৌদ্ধমত যেমন যুক্তি-বিরুদ্ধ তেমনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধও বটে। তাই তাহা অগ্রাহ্য।]

এই সূত্রটিকে শূন্যবাদের খণ্ডনকারী হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। তাহা হইলে ইহার অনুবাদ হইবে এইরূপ:—এবং (যেরূপ শূন্যবাদ) অযৌক্তিক ইত্যাদি। বৌদ্ধদের শূন্যবাদ সব কিছুরই বিরোধী। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, অনুমান অথবা অন্য সর্বপ্রকার যথার্থ জ্ঞানেরই বিরোধী। এবং সেইজন্যই যাঁহারা আত্মকল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ইহা সর্বতোভাবে অশ্রদ্ধেয়।

অধিকরণ ৬: জৈনমত খণ্ডন।

নৈকস্মিন্, অসম্ভবাৎ ॥২।২।৩৩॥

ন (না, হয় না) একস্মিন্ (এই বিষয়ে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভাবিত্ব হেতু)।

৩৩. (বিরুদ্ধ গুণগুলির) একই সময়ে একই বস্তুতে অবস্থিতির অসম্ভাবিত্ব হেতু (জৈন মত) (যথার্থ) নহে।

[৩৩. একই সময়ে একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ সম্ভব নহে। (ইহা ভ্রান্ত জৈন-মতের বিরুদ্ধে আপত্তি।)]

বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিবার পর এখন জৈনমতকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে। জৈনগণ সাতটি পদার্থকে স্বীকার করেন, যেগুলিকে আত্মা এবং অনাত্মা হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পুনরায় জৈনগণ সাতটি পদার্থের সত্যতা সম্পর্কে পৃথক্ সাতটি মত পোষণ করেন। জৈনমতে প্রত্যেকটি বস্তুই সৎ, অসৎ, সদসৎ উভয়, সদসৎ উভয় হইতে অন্যথা, অবর্ণনীয় (অসংজ্ঞেয়)—এবং এইরূপ অনেক কিছু হইতে পারে। কিন্তু পদার্থ সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না, কারণ ইহা চিন্তা করা অবাস্তব যে, একই বস্তু সত্য-মিথ্যাদি বিপরীত গুণযুক্ত হইতে পারে। জৈন মতানুসারে আমরা কোন সুনির্দিষ্ট জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি না— এবং সেইজন্যই এই জগৎ, স্বর্গ এবং এমনকি মুক্তি পর্যন্ত সন্দেহের বস্তু হইয়া যাইবে। অবশ্য, বেদান্ত মতে কিন্তু জগৎ অনির্বচনীয় এবং সেইহেতু ইহাকে পরস্পর আপেক্ষিক বিরুদ্ধরূপেও সর্বতোভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ॥২।২।৩৪॥

এবং (এই একইভাবে) চ (এবং) আত্ম-অকার্ৎস্ন্যম্ (আত্মার অসর্বজনীনতা, সর্বজনীনতার অভাব)।

৩৪. এবং এই একইভাবে আত্মার সর্বজনীনতার (বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিতে পারে)।

[৩৪. জৈনগণ আত্মাকে যে দেহ পরিমাণ বলেন তাহাতে আত্মা (ক্ষুদ্র) অসর্বজনীন হইয়া যাইবেন।]

জৈন মতাবলম্বিগণ বলেন যে, আত্মা (পুদ্‌গল্) শরীরেরই সমান আয়তন-বিশিষ্ট। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, ইহা হইবে সসীম এবং সাংশ (অংশ-সম্বলিত)— এইজন্যই ইহা চিরন্তন (অবিনাশী) হইতে পারিবে না। ইহার অন্য একটি অসুবিধা হইবে এই যে, যদি কোন পিপীলিকার আত্মা অতীত কর্মফলহেতু গজত্ব-লাভ করে, তাহা হইলে এই পিপীলিকাদেহ দ্বারা গজদেহের পরিমাণকে পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না; এবং বিপরীতক্রমে একটি গজ যদি পিপীলিকাত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে গজ দেহটিকে পিপীলিকার দেহে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে না। কোন ব্যক্তিবিশেষের একই দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কেও একই সমস্যা দেখা দিবে।

ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ ॥২।২।৩৫॥

ন চ (তাহাও নহে) পর্যায়াৎ (পর্যায়ক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (অ-বিরোধ, সঙ্গতি) বিকারাদিভ্যঃ (বিকার প্রভৃতি আছে বলিয়া)।

৩৫. তাহাতেও কোন সঙ্গতি (পাওয়া যাইবে না,) যদিও আত্মা পর্যায়ক্রমে অংশ গ্রহণ এবং বর্জন করে বলিয়া মনে করা হয় (যাহাতে নানা শরীরে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে), বিকারাদি আছে বলিয়া (এই ক্ষেত্রে আত্মার)।

[৩৫. অবস্থা বিশেষে পর্যায়ক্রমে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি আছে ধরিয়া নিলেও আত্মার অনিত্যাদি দোষ থাকিয়াই যায়।]

পূর্বসূত্রে উত্থাপিত আপত্তিটি অতিক্রম করিতে গেলে, অর্থাৎ আত্মা গৃহীত শরীরের পরিমাণ ধারণ করে তাহা মানিয়া লইলে— ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, আত্মার অংশ বিভাগ আছে এবং পর্যায়ক্রমে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সেইক্ষেত্রে আর একটি

বাধা দেখা দেয়— তাহা হইল এই যে, আত্মার বিকার আছে এবং সেইজন্যই আত্মা অচিরস্থায়ী। যদি আত্মা অশাশ্বত এবং সদা পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে আত্মার বিষয়ে বন্ধন বা মুক্তি কিছুই অনুমান করা যায় না।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।।২।২।৩৬।।

অন্ত্য-অবস্থিতেঃ (অন্ত অবস্থায় [আকারের] নিত্যত্ব থাকে বলিয়া) চ (এবং) উভয়-নিত্যত্বাৎ (দুইয়েরই নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয় বলিয়া) অবিশেষঃ (তাহাতে কোন পার্থক্য নাই)।

৩৬. এবং যেহেতু (আত্মার আকারের) নিত্যত্ব পরিণামে দৃষ্ট হয় (মোক্ষের সময়) সেখানে দুইটারই (আদি এবং মধ্য অবস্থারও) নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই (আত্মার সর্বাবস্থায় আকারের সমতা বিষয়ে)।

[৩৬. মোক্ষ অবস্থায় প্রাপ্ত দেহের পরিমাণ যখন অপরিবর্তনীয় বলিয়া জানা যায়, তখন আদি বা মধ্য কোন অবস্থাতেই আত্মার আকারের পরিবর্তন হয় না— তাহা স্বীকার করিতেই হয়।]

মুক্তির সময় আত্মার আকার অপরিবর্তনীয় থাকে বলিয়া জৈনরা মনে করেন। তাহা হইলে, যদি এই আকার নিত্যই হয়, তাহা হইলে ইহা কোন সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারে না— কারণ যাহা কিছু সৃষ্ট, তাহাই অনন্তকাল স্থায়ী হয় না। আর ইহা যদি সৃষ্ট পদার্থ না হয় তাহা হইলে ইহা সৃষ্টির আদিতে এবং মধ্যেও অবশ্যই বর্তমান ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, আত্মার আকারটি সর্বদাই একরূপ ছিল— ইহা ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎ-ই হউক। সুতরাং শরীরের আকার অনুযায়ী ইহার আকারের পরিবর্তন হয়— জৈনদের এই মতবাদটি যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অধিকরণ ৭: ঈশ্বর জগতের শুধু নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নহেন— এই মতবাদের খণ্ডন।

পত্যুঃ, অসামঞ্জস্যাৎ ।।২।২।৩৭।।

পত্যুঃ (জগৎপতির, ঈশ্বরের) অসামঞ্জস্যাৎ (স্ববিরোধ হেতু)।

৩৭. ঈশ্বরের শুধুমাত্র জগতের নিমিত্ত-কারণত্ব প্রযোজ্য নহে, কারণ তাহা হইলে (এই মতবাদের) স্ববিরোধ দোষ হয়।

[৩৭. (পাশুপত দর্শন মতে) ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র, উপাদান-কারণ নহেন—শ্রুতিবিরুদ্ধ এই মতবাদ গ্রহণীয় নহে।]

বেদান্তমতে ঈশ্বর হইলেন জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, যোগ এবং মাহেশ্বর মতানুসারে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ-মাত্র। এবং জগতের উপাদান-কারণ হইলেন— নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক মতে পরমাণু—যোগ এবং অন্য মতানুসারে প্রধান। ঈশ্বর হইলেন প্রধান এবং জীবাত্মাগুলির নিয়ন্তা, যাঁহারা তাঁহা হইতে ভিন্ন। এই মত গ্রহণ করিলে অসঙ্গতির সম্মুখীন হইতে হয়। কিভাবে? এই মত গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের উপর পক্ষপাতিত্বদোষ আরোপ করা হয়; কারণ তিনি তাহা হইলে এই জগতে কাহারও প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে সুখী করিয়াছেন এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া তাহাদিগকে অসুখী করিয়াছেন, ধরিয়া লইতে হয়। প্রতিপক্ষ এখানে বলিতে পারেন—বেদান্তবাদিগণ কিভাবে এই আপত্তির উত্তর দিয়া থাকেন? উত্তর হইল—ঈশ্বর নিরপেক্ষ, সমদর্শী— কিন্তু তিনি জীবগণকে তাহাদের পূর্বকৃত কর্মের শুভাশুভ ফলানুসারে নিয়ন্ত্রণ করেন (সূত্র ২.১.৩৪-৩৫)। কারণ ইহা শাস্ত্র-সম্মত, এবং যদি আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রের প্রামাণ্যকে মানিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের "আমি বহু হইব"— (তৈ: ২.৬) এই শ্রুতিবচনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই শ্রুতি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।।২।২।৩৮।।

সম্বন্ধ-অনুপপত্তেঃ (কারণ সম্বন্ধ সম্ভব নয়) চ (এবং)।

৩৮. এবং যেহেতু সম্বন্ধ (ঈশ্বর এবং প্রধান বা জীবাত্মাগুলির মধ্যে) সম্ভব নহে।

[৩৮. ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে কোন সম্বন্ধ সম্ভবপর না হওয়ায় (পাশুপতদের) এই মত গ্রহণীয় নহে।]

ঈশ্বর যেহেতু অংশরহিত, এবং প্রধান ও জীবাত্মাগুলিও সেইরূপ, সেইজন্য ঈশ্বর এবং ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধস্থাপন সম্ভব নয়। কার্যত সেইজন্যই ইহারা ঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারেন না। অথবা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পরম্পরাগত অবিচ্ছেদ্য অংশ-অংশী ভাব, দ্রব্য এবং তাহার অবিচ্ছেদ্য গুণগত ভাব ইত্যাদি সম্পর্কও স্থাপন করা সম্ভব হয় না। বেদান্ত মত গ্রহণ করিলে কিন্তু এইজাতীয় আপত্তি উঠিতে পারে

না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, ইহাদের সম্পর্ক হইল অনির্বচনীয়-তাদাত্ম্য, এবং দ্বিতীয়ত প্রামাণ্য-বিষয়ে ইহারা শ্রুতি-নির্ভর এবং সেইজন্যই তাহাদের ভিত্তি শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ যুক্তিনির্ভর নহে— বিরুদ্ধপক্ষকে যাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩৯॥

অধিষ্ঠান-অনুপপত্তেঃ (নিয়ন্ত্রিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া) চ (এবং)।

৩৯. এবং যেহেতু (ঈশ্বরের) কর্তৃত্ব অসম্ভব।

[৩৯. (পাশুপত মতে) ঈশ্বর অধিষ্ঠান (উপাদান-কারণ) না হওয়ার জন্য (তাহার পক্ষে) নিয়ন্ত্রিত্ব অসম্ভব।]

এই মতাবলম্বিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুমান করেন— এবং কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রধানকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রধান ইত্যাদি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহেন। সুতরাং ঈশ্বর তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। কারণ অনুমানটিকে অবশ্যই দৃষ্টান্তের যথার্থ অনুগামী হইতে হইবে।

করণবচ্চেৎ, ন, ভোগাদিভ্যঃ ॥২।২।৪০॥

করণবৎ (ইন্দ্রিয়ের ন্যায়) চেৎ (যদি বলা হয়) ন (না, তাহা হইতে পারে না) ভোগাদিভ্যঃ (ভোগ ইত্যাদি আছে বলিয়া)।

৪০. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ঈশ্বর প্রধান ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন) যেইরূপ (জীব নিয়ন্ত্রণ করে) তাহার ইন্দ্রিয়গণকে (যাহাও প্রত্যক্ষ নয়); (ইহার উত্তরে বলা যায় যে) না, তাহা হইতে পারে না— কারণ ভোগাদি ব্যাপার আছে।

[৪০. জীব অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতারূপে যেমন ভোগ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন— যদি এইরূপ বলা হয়— তাহা ঠিক নহে, কারণ জীব ভোক্তা নহে।]

জীব যেমন অদৃশ্য ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করে— ঈশ্বরও সেইরূপ প্রধান প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি—যদি প্রতিপক্ষ এইরূপ বলেন? ইহার উত্তরে বলা যায়— উপমাটি যথার্থ হইল না, কারণ জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জীব সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে,

জীব ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি এই উপমাটি যথার্থরূপে প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে ঈশ্বরও প্রধানের কৃত সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া যান।

অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা ॥২।২।৪১॥

অন্তবত্ত্বম্ (ধ্বংসের, বিনাশের অধীন) অসর্বজ্ঞতা (সর্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা)।

৪১. (পাশুপত ইত্যাদি মতবাদ হইতে ঈশ্বরের) বিনাশিত্ব, অসর্বজ্ঞতাদি (দোষ দেখা দেয়)।

[৪১. তাহা হইলে ঈশ্বরও জীবের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন এবং অসর্বজ্ঞ হইয়া পড়েন। অতএব পাশুপতমত অগ্রাহ্য।]

এই সকল (পাশুপতাদি) মতানুসারে ঈশ্বর হইলেন সর্বজ্ঞ এবং অপরিবর্তনশীল— অর্থাৎ অবিনাশী। পাশুপত মতানুসারে ঈশ্বর, প্রধান এবং জীব হইলেন অনন্ত এবং পরস্পর ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হইল সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কি প্রধান, জীব এবং তাঁহার নিজস্ব পরিমাণ জানেন, অথবা জানেন না? এই উভয়পক্ষেই ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির শুধুমাত্র নিমিত্ত-কারণত্বের মতবাদটি অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি ঈশ্বর প্রধান ইত্যাদির পরিমাণ জানেন, সেক্ষেত্রে তাহারা সকলেই সসীম— সেইজন্যই এমন একটি সময় আসিবে যখন তাহাদের কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। অপরপক্ষে যদি ঈশ্বর প্রধানাদির পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ হন— তাহা হইলে তিনি আর সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না।

অধিকরণ ৮: ভাগবত অথবা পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডন ।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২।২।৪২॥

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ (উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া)।

৪২. উৎপত্তি (ঈশ্বর হইতে জীবাত্মার) অসম্ভব বলিয়া (পাঞ্চরাত্র মতবাদ অসিদ্ধ)।

[৪২. (পুরুষ সংযোগ বিনা শুধু শক্তির দ্বারা) উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া (পাঞ্চরাত্র মতবাদ অগ্রাহ্য।]

এখন পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতবাদের সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই মতবাদ ঈশ্বরের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণত্বকেই স্বীকার করে— কিন্তু এই সঙ্গে

অপর কতকগুলি উপস্থাপিত মত পোষণ করে, যাহা আপত্তিজনক। এই মতানুসারে বাসুদেবই পরমেশ্বর। এবং জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। বাসুদেবের পূজা করিয়া, তাঁহার ধ্যান করিয়া এবং তাঁহাকে জানিয়াই জীবের মুক্তি হয়। বাসুদেব হইতেই সঙ্কর্ষণ জীব, জীব হইতে প্রদ্যুম্ন মন, এবং মন হইতেই অনিরুদ্ধ অহঙ্কারের জন্ম হইয়াছে। ইহাই হইল পরমেশ্বর বাসুদেবের চতুর্ব্যূহচারি বিগ্রহ। এই চারিটি বিগ্রহের মধ্যে বাসুদেবই যে পরমেশ্বর এবং তাঁহাকেই অর্চনাদি করিতে হইবে— ইত্যাদি মতবাদকে বেদান্তবাদিগণ স্বীকার করেন, কারণ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু বেদান্তবাদীরা জীবের সৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারকে প্রত্যাখ্যান করেন— কারণ এইরূপ সৃষ্টি বেদান্তমতে অসম্ভব। কেন অসম্ভব? কারণ জীব যদি সৃষ্ট হয় তবে ইহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জীবের পক্ষে মুক্তি সম্ভাব্য বলিয়া মনে করা যায় না। জীব যে সৃষ্ট (পদার্থ) নহে তাহা ২.৩.১৭ সংখ্যক সূত্রে প্রদর্শিত হইবে।

ন চ কর্তুঃ করণম্ ।।২।২।৪৩।।

ন চ (তাহাও নয়) কর্তুঃ (কর্তা হইতে) করণম্ (করণ)।

৪৩. এইরূপও (দৃষ্ট হয় না যে) কর্তা হইতে করণের (উৎপত্তি হইয়াছে)।

[৪৩. পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি করণবিহীন। এইরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না যে, কর্তা হইতে করণের সৃষ্টি হইয়াছে।]

যেমন কর্তা কাষ্ঠচ্ছেদক হইতে কুঠারাদি অস্ত্রের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না, সেইরূপে ভাগবতের মতবাদ যে জীব হইতে অন্তরেন্দ্রিয় বা মনের উৎপত্তি হয় এবং মন হইতে অহং-এর উৎপত্তি হয়— ইত্যাদিও গ্রহণ করা চলে না। এই বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রমাণও নাই। সব কিছুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, শ্রুতি এই কথাই স্পষ্টভাবে বলেন।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ।।২।২।৪৪।।

বিজ্ঞানাদিভাবে (যদি বিজ্ঞান ইত্যাদি থাকে) বা (অথবা) তৎ-অপ্রতিষেধঃ(তাহার প্রতিবিধান হয় না)।

৪৪. অথবা যদি (স্বীকার করা হয় যে চতুর্ব্যূহের) বিজ্ঞানাদি ভাব আছে, তাহা হইলেও সেই আপত্তি দূরীভূত হয় না (৪২ সংখ্যক সূত্রের আপত্তিটি)।

[৪৪. যদি স্বীকার করা হয় যে, পুরুষ বিজ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন, তাহা হইলেও পূর্বের আপত্তির প্রতিবিধান হয় না।]

ভাগবতগণ বলিতে পারেন যে, বিশ্বের সব কিছুই বাসুদেব ভগবানের মূর্তি এবং সব কিছুই সমানভাবেই ঈশ্বরের জ্ঞান, কর্তৃত্ব, শক্তি, সাহস ইত্যাদি সম্পন্ন এবং দোষ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্ত। এইরূপ মনে করিলে একাধিক ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়; যাহা বাহুল্য-সমন্বিত এবং স্বসিদ্ধান্ত-বিরোধী। ইহার সব কিছুই মানিয়া লইলেও একটি হইতে অপরটির উৎপত্তি ব্যাপারটি অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সর্বতোভাবে সমান বলিয়া ইহাদের কোনটা-ই অপর কিছুর কারণ হইতে পারিবে না; যেহেতু কার্যের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ পাওয়া দরকার যাহা কারণে অনুপস্থিত। পুনশ্চ বাসুদেবের মূর্তি শুধুমাত্র চারিটি আকারেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না যেহেতু 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত' সমগ্র জগৎ-ই পরমেশ্বরের বিরাট মূর্তি।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২।২।৪৫॥

বিপ্রতিষেধাৎ (বিরোধহেতু) চ (এবং)।

৪৫. এবং যেহেতু নানা বিরোধ আছে সেইজন্য (ভাগবত মতবাদ অসিদ্ধ)।

[৪৫. ভাগবত (শক্তি কারণাদি বাদ) বেদাদি শাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া গ্রহণীয় নয়।]

উপরন্তু এই মতবাদে বহু বিরোধ দৃষ্ট হয়। কখন কখনও এই মতবাদ চতুর্ব্যূহকে আত্মার গুণ, আবার কখন কখনও এইগুলিকে আত্ম-স্বরূপই বলিয়াছে।

ব্রহ্ম-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় । তৃতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে অবৈদান্তিক মতবাদগুলির নানা অসঙ্গতির কথা পর্যালোচনা করিয়া পরিশেষে তাহাদের অসিদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এখন আর একটি সন্দেহ দেখা দিতে পরে যে, ব্রহ্মের আদিকারণত্ব বিষয়ে শ্রুতিবচনগুলির মধ্যেও যে নানা বিরুদ্ধ উক্তি আছে, সেগুলিকে কি অবৈদান্তিক মতবাদের মতোই একই শ্রেণীভুক্ত এবং তাহাদিগকে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? পরবর্তী দুইটি পাদের সূচনা করা হইতেছে এই শ্রুতিবচনগুলির মধ্যে যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া এই সন্দেহকে দূর করিবার জন্য। শ্রুতিবচনগুলির মধ্যে একটা স্ব-বিরোধী ভাব আছে বলিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করিয়া, পরে ইহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১: আকাশ নিত্য নহে, কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ।

ন বিয়ৎ, অশ্রুতেঃ ॥২।৩।১॥

ন (নহে) বিয়ৎ (আকাশ), (সৃষ্ট পদার্থ) অশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতিতে ইহাকে এইরূপ বলা হয় নাই)।

১. আকাশ সৃষ্ট পদার্থ নহে। যেহেতু শ্রুতি ইহাকে এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই।

[১. শ্রুতি আকাশকে উৎপন্ন পদার্থ বলেন নাই। অতএব আকাশ নিত্য পদার্থ। (সূত্রটি পূর্বপক্ষ)।]

সর্বপ্রথমে সৃষ্টি-সংক্রান্ত শ্রুতিবচনগুলির আলোচনা করা হইতেছে। এবং প্রথমেই আকাশের উৎপত্তির বিষয়কে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেখানে সৃষ্টির ক্রমের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে শ্রুতিতে বলা আছে— "আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন"— (৬.২.৩)। এখানে সৎ বা ব্রহ্ম কর্তৃক আকাশকে সৃষ্টি করার উল্লেখ নাই। সুতরাং আকাশ সৃষ্ট পদার্থ নহে, নিত্য পদার্থ।

অস্তি তু ॥২।৩।২॥

অস্তি (আছে) তু (কিন্তু)।

২. কিন্তু (একটি শ্রুতিবচন) আছে, (যেখানে আকাশকে সৃষ্ট পদার্থ বলা হইয়াছে)।

[২. কিন্তু অন্য শ্রুতিতে আছে যে, আকাশ সৃষ্ট পদার্থ।]

১ সংখ্যক সূত্রে বিরুদ্ধবাদিগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য আপত্তি এই সূত্রে অনুমান করেন এবং ৩ সংখ্যক সূত্রে ইহার খণ্ডনকে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। এখানে উল্লিখিত শ্রুতিটি হইল— "সেই পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল"— ইত্যাদি (তৈ: ২.১)।

গৌণী, অসম্ভবাৎ ॥২।৩।৩॥

গৌণী (গৌণ অর্থে ব্যবহৃত) অসম্ভবাৎ (অসম্ভবাবিত্ব হেতু)।

৩. (আকাশের সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতিবাক্যটিকে) গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; যেহেতু (আকাশের সৃষ্ট হইবার) ব্যাপারটি অসম্ভব।

[৩. আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব আকাশের উৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে গৌণ অর্থে গ্রহণ করা উচিত।]

বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে, পূর্বসূত্রে উল্লিখিত তৈত্তিরীয় শ্রুতিটি গৌণ অর্থে গ্রহণ করা উচিত— যেহেতু আকাশ সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারে না। ইহার অংশাদি বিভাগ নাই, তাই সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারে না। উপরন্তু আকাশ হইল সর্বব্যাপী— তাই ইহা অনুমান করা যায় যে, ইহা চিরন্তন এবং অনাদি।

শব্দাচ্চ ॥২।৩।৪॥

শব্দাৎ (শ্রুতিবচন হইতে) চ (এবং)।

৪. শ্রুতিবচন হইতেও (আমরা জানিতে পারি যে, আকাশ হইল চিরন্তন)।

[৪. শ্রুতিবচন হইতেও জানা যায় যে, আকাশ অমৃত।]

পূর্ববর্তী সূত্রে আকাশকে নিত্য বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বিরোধীপক্ষ এখানে একটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিতেছেন যাহার দ্বারা দেখানো যায় যে, ইহা নিত্য।

উল্লিখিত শ্রুতিটি হইল— "অতঃপর বায়ু ও অন্তরীক্ষ (এই ভূতদ্বয়) অমূর্ত; ইহা অমৃত" (বৃহঃ ২.৩.৩)। অমৃত এবং অনন্ত বলিয়া ইহার কোন আরম্ভ থাকিতে পারে না।

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ।।২।৩।৫।।

স্যাৎ (হইতে পারে) চ (এবং) একস্য (একই শব্দের, 'উদ্ভূত' এই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ (ব্রহ্ম-শব্দের ন্যায়)।

৫. ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে, একই শব্দ (উদ্ভূত) (মুখ্য) এবং (গৌণ) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে, 'ব্রহ্ম' শব্দটির ন্যায়।

[৫. একই শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়— যেমন 'ব্রহ্ম' শব্দ। অতএব 'সম্ভূত' শব্দ গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।]

এই সূত্রে বিরুদ্ধপক্ষ নিজেরই একটি দুর্বল যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন। যুক্তিটি হইল— "এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি"— ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই 'সম্ভূত' শব্দটি কিভাবে আকাশের ক্ষেত্রে গৌণ এবং বায়ু ও অগ্নি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে? ব্রহ্ম শব্দটি অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তিনি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন। "তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর কারণ তপঃই ব্রহ্ম"— এখানে একই শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দটি মুখ্য এবং গৌণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং 'অন্নং ব্রহ্ম' (তৈঃ ৩.২) এবং 'আনন্দং ব্রহ্ম' (তৈঃ ৩.৬)— এই পরিপূরক শ্রুতিতে প্রথমে ব্রহ্ম শব্দটি গৌণ এবং পরে মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ।।২।৩।৬।।

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ (প্রতিজ্ঞাকে পরিহার করা হইবে না) অ-ব্যতিরেকাৎ (পার্থক্য না করিলে) শব্দেভ্যঃ (শ্রুতিবচন হইতে)।

৬. প্রতিজ্ঞাকে পরিহার করা হইবে না (যেমন এককে জানিলে সবকিছুই জানা হইয়া যায়— তখনই সম্ভব) যদি পার্থক্য না করা হয় (ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগতের)। শ্রুতিবচন হইতে (যাহা কার্য এবং কারণের মধ্যে অভিন্নতা উপদেশ করিয়াছেন— এই প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণিত হয়)।

[৬. এইরূপ বলিলে— "একের বিজ্ঞানে সর্ববিষয়ে বিজ্ঞান হয়" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ভঙ্গ হয়। (অতএব তৈঃ উপনিষদের 'সম্ভূত' শব্দের গৌণার্থে প্রয়োগ বলা সঙ্গত হয় না।]

এই সূত্রটি এই পর্যন্ত উত্থাপিত প্রতিপক্ষের সব কয়টি যুক্তিকেই খণ্ডন করিয়া— সিদ্ধান্তটি প্রদান করিতেছে। একের (ব্রহ্ম) জ্ঞান হইতে সব কিছুর জ্ঞানই লাভ করা যায়—এই প্রতিজ্ঞাটি তখন সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, যখন জগতের সব কিছুকেই ব্রহ্মের কার্য বলিয়া জানা যায়। কেন না শ্রুতি বলেন কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ফলত কারণকে জানিলে কার্যকেও জানা হইয়া যাইবে। যদি আকাশ ব্রহ্ম হইতে 'সম্ভূত' না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রতিজ্ঞাটি নস্যাৎ হইয়া যায়। কারণ, সেই ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে জানা হইয়া গেলেও আকাশকে জানা বাকি থাকিয়াই যায়; যেহেতু আকাশ ব্রহ্মের কার্য নহে। কিন্তু যদি আকাশ সৃষ্ট পদার্থ হয় তাহা হইলে এই আপত্তি উঠে না। সুতরাং আকাশ সৃষ্ট পদার্থই (সম্ভূত)— তাহা না হইলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যেখানে আকাশের উল্লেখ নাই— সেই স্থলের ব্যাখ্যা তৈত্তিরীয় শ্রুতির আলোকেই করিতে হইবে। অর্থাৎ আকাশ এবং বায়ুকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এবং সেই ক্ষেত্রে শ্রুতির অর্থ হইবে— "বায়ু এবং আকাশকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন।"

যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ ।।২।৩।৭।।

যাবৎ-বিকারং (যে কোন কার্যতেই পরিব্যাপ্ত) তু (কিন্তু) বিভাগঃ (পার্থক্য আছে) লোকবৎ (লোক জগতে যেরূপ দৃষ্ট হয়)।

৭. কিন্তু যে-কোন প্রকার কার্যেই একটি পার্থক্য (বর্তমান), যেমন (দৃষ্ট হয়) লোক ব্যবহারিক জগতে।

[৭. শ্রুতি প্রমাণে আকাশাদি সব বিকারই ব্রহ্মেরই অভিন্ন রূপ। ইহা ব্রহ্মেরই বিকার বা কার্যবস্তু। অতএব বিকারও উৎপত্তিশীল হওয়ায় আকাশ সর্বব্যাপী নহে।]

এখানে 'তু' শব্দটি "আকাশ সৃষ্ট পদার্থ নহে"— এই ধারণাকে খণ্ডন করিয়াছে। এই জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই পরস্পর ভিন্ন। ঘটটি পট হইতে ভিন্ন— এইরূপ সব কিছুই পরস্পর ভিন্ন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যাহার মধ্যে অপর হইতে বিভেদ আছে— তাহাই সৃষ্ট পদার্থ। আমরা একটি বস্তুকে অপর হইতে ভিন্ন অথচ শাশ্বত বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। এখন আকাশ হইল পৃথিবী ইত্যাদি হইতে ভিন্ন— সুতরাং ইহা শাশ্বত হইতে পারে না— এবং ইহা অবশ্যই

সৃষ্ট পদার্থ হইবে। এখন এইভাবেও একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, আত্মাও আকাশ হইতে বিভক্ত ইত্যাদি এবং সেইজন্য ইহাও একটি কার্য। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে, কারণ সব বস্তুই আত্মা হইতে সৃষ্ট— আত্মাই তাহাদের স্বরূপ— সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন নহে—সেইজন্যই আত্মা কার্য নহেন। আকাশের সর্বব্যাপিত্ব এবং নিত্যত্ব— আপেক্ষিকভাবে সত্য মাত্র। আসলে ইহা সৃষ্ট পদার্থ এবং ব্রহ্মের কার্যস্বরূপ।

অধিকরণ ২ : বায়ু আকাশ হইতে সৃষ্ট।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২।৩।৮॥

এতেন (ইহার দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

৮. ইহার দ্বারা (অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুক্তি ও ব্যাখ্যা দ্বারা আকাশ সম্পর্কে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে) (সেইভাবে) বায়ুকেও (একটি কার্য হিসাবে) ব্যাখ্যা করা যায়।

[৮. যে যুক্তি বলে আকাশের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল, বায়ু সম্পর্কেও সেই যুক্তি প্রযোজ্য। বায়ুও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।]

অধিকরণ ৩ : ব্রহ্ম সৃষ্ট পদার্থ নহেন।

অসম্ভবস্তু সতঃ, অনুপপত্তেঃ ॥২।৩।৯॥

অসম্ভবঃ (কোন উৎপত্তি থাকিতে পারে না) তু (কিন্তু) সতঃ (সৎ বস্তুর) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে)।

৯. কিন্তু সৎ বস্তুর (যিনি সদাবর্তমান, সেই ব্রহ্মের) কোন উৎপত্তি থাকিতে পারে না, যেহেতু ইহা অযৌক্তিক।

[৯. সৎবস্তু ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভব নহে। কারণ সতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে— তাহার উৎপত্তি— তৎ পূর্ববর্তীর উৎপত্তি— ইত্যাদিরূপে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে।]

এখন প্রশ্ন হইতেছে ব্রহ্মও কি আকাশ ইত্যাদির ন্যায় একটি কার্য? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই শ্রুতিটি আছে—"তুমিই জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর" (শ্বে : ৪.৩); ইহা স্পষ্টই বলিতেছে যে, ব্রহ্ম জাত হন। এই সূত্রে এই মতটির খণ্ডন করিতে

গিয়া বলা হইতেছে যে, স্বয়ং সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম কখনও কার্য হইতে পারেন না— কারণ ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে না— "ইহার কোন উৎপাদয়িতা বা অধ্যক্ষ নাই" (শ্বে: তদেব, ৬.৯)। অন্য পক্ষে অসৎও এইরূপ কারণ হইতে পারেন না— কারণ শ্রুতি বলেন— "অসৎ হইতে কিভাবে সৎ উৎপন্ন হইতে পারেন?" (ছা: ৬.২.২)। ইহাও বলা সমীচীন হইবে না যে, সৎ নিজেই নিজের কারণ; যেহেতু কার্যের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিদ্যমান থাকিতে হইবে, যাহা কারণে নাই। ব্রহ্ম কোন বৈশিষ্ট্যরহিত সদ্বস্তু মাত্র। সাধারণ হইতেই বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে— ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা, যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে নানা প্রকারের ঘট উৎপন্ন হয়—কিন্তু বিপরীতক্রমে ঘট হইতে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সাধারণ সদ্বস্তু ব্রহ্ম কোন বিশেষ বস্তুর কার্য হইতে পারেন না। প্রত্যেকটি কারণ নিজেই যে পূর্ববর্তী কোন বস্তুর কার্য ইহাও এই শ্রুতি অস্বীকার করিয়াছেন: "এই মহান অজ আত্মাই অমৃত" (বৃহঃ ৪.৪.২৫)। তাহা না হইলে এখানে অনবস্থা দোষ হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম কার্য নহেন, চিরন্তন।

অধিকরণ ৪: বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি।

তেজোঽতঃ তথা হ্যাহ ॥২।৩।১০॥

তেজঃ (অগ্নি) অতঃ (ইহা হইতে) তথা (এইরূপ) হি (নিশ্চিতভাবে) আহ (বলেন)।

১০. অগ্নি এই (বায়ু) হইতে (উৎপন্ন) হইয়াছে ইহা (শ্রুতি) বলেন।

[১০. বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি, ইহা শ্রুতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে।]

"বায়ু হইতে তেজ সম্ভূত" (তৈঃ ২.১)— এই শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তেজ বায়ু হইতে উৎপন্ন। পুনরায় আমরা পাই— "তিনি (ব্রহ্ম) তেজ সৃষ্টি করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩)। এই দুইটি শ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় তৈত্তিরীয় শ্রুতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যে, ইহার সৃষ্টির ক্রম হইল: ব্রহ্ম প্রথমে বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া পরে তেজকে সৃষ্টি করিলেন। এই সূত্রটি কষ্টকল্পিত এই ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, তেজ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ছান্দোগ্য শ্রুতির বিরোধী নহে; কারণ— ইহার অর্থ হইল এই যে, যেহেতু বায়ু ব্রহ্ম উপাদানে সৃষ্ট পদার্থ, সেইজন্য ইহা ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট। ব্রহ্মই বায়ুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং এই বায়ু হইতেই তেজ উৎপন্ন হইয়াছে। "সবকিছুই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট"— এই সাধারণ

প্রতিজ্ঞাটিকে প্রমাণ করিতে হইলে সব কিছুরই মূল কারণ হিসাবে ব্রহ্মকেই সন্ধান করিতে হইবে— উৎপন্ন বস্তুগুলি যে ইহার অব্যবহিত কার্য হইবে তাহাও নহে। সুতরাং ইহাতে কোন স্ববিরোধিতা নাই।

অধিকরণ ৫ : তেজ হইতে জল সৃষ্ট হইল।

আপঃ ॥২।৩।১১॥

১১. জল (অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)।

[১১. অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। (ইহা শ্রুতিতে আছে)।]

"অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে" (তৈঃ ২.১); "তিনি (ব্রহ্ম) জল সৃষ্টি করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৩)। —এই দুইটি শ্রুতি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, জল অগ্নি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এখানেও আমাদের বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিরূপে পরিণত ব্রহ্ম হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে।

অধিকরণ ৬ : পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন।

পৃথিবী, অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥২।৩।১২॥

পৃথিবী (পৃথিবী), অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (কারণ বিষয়বস্তু বর্ণ এবং অন্য শ্রুতিবচনও আছে)।

১২. পৃথিবী (অন্ন শব্দের দ্বারাও ইহা লক্ষিত) কারণ, যেহেতু বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ, বর্ণ এবং অন্য শ্রুতিবচনও আছে।

[১২. জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। প্রকরণ বা রূপ হইতে এবং অন্য শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, অন্ন শব্দও পৃথিবী-বোধক।]

"জল হইতে পৃথিবী" (তৈঃ ২.১); "ইহা (জল) অন্ন সৃষ্টি করিল" (ছাঃ ৬.২.৪)। এই দুইটি শ্রুতি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ; কারণ একটিতে বলা হইয়াছে যে, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, অন্যটিতে বলা হইয়াছে অন্ন।

এই সূত্রটিকে বলা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 'অন্ন' শব্দটি 'খাদ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই— ইহা 'পৃথিবী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কিভাবে বুঝিব? প্রথমত প্রকরণ— এই পদে আলোচ্য বিষয়-বস্তু হইতে বুঝা যায়। "ইহা (ব্রহ্ম)

অগ্নি সৃষ্টি করিলেন"— এই শ্রুতি এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও পাঁচটি উপাদানের সৃষ্টির কথাই আছে এবং সেইজন্য 'অন্ন'ও কোন পদার্থবাচকই হইবে— খাদ্য নহে। পুনশ্চ, পরবর্তী একটি পরিপূরক শ্রুতিতেও আমরা পাই— "অগ্নির মধ্যবর্তী কৃষ্ণবর্ণটি হইল অন্নেরই বর্ণ" (ছা: ৬.৪.১)। বর্ণের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে 'অন্ন' শব্দ দ্বারা পৃথিবীকেই বুঝায়। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে অন্ন হইল পৃথিবীবাচক, এইজন্যই ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। অন্যান্য শ্রুতিও— যেমন "জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল, এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল" (বৃহঃ ১.২..২)— স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, জল হইতেই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে।

অধিকরণ ৭: ব্রহ্ম পূর্ব পূর্ব পদার্থগুলিতে সৃষ্টিকর্তারূপে অবস্থান করায়, সৃষ্টির ক্রমের মধ্যে পরবর্তী পরবর্তী পদার্থগুলির কারণরূপে অবস্থান করেন।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২।৩।১৩॥

তদভিধ্যানাৎ (তাঁহার ধ্যানের কারণে) এব (কেবলমাত্র) তু (কিন্তু) তল্লিঙ্গাৎ (তাঁহার উপলব্ধির লক্ষণগুলি হইতে) সঃ (তিনি)।

১৩. কিন্তু শুধুমাত্র তাঁহার অভিধ্যানের ধ্যানরত অবস্থায় মনে যে-চিন্তারাজির উদয় হয় তাহার জন্যই (সৃষ্টির ক্রমের মধ্যে পূর্ব-পূর্ববর্তী পদার্থসমূহ হইতে পর-পরবর্তী পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে); সুতরাং তিনিই (পরমেশ্বর ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতির স্রষ্টা), (আমরা ইহা) তাঁহার (পরমেশ্বরের) স্বরূপ নির্ণায়ক লক্ষণগুলি হইতেই (জানিতে পারি।)

[১৩. পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারাই সৃষ্টি-ক্রমের ধারা চলিতেছে। ব্রহ্মই আকাশাদির অন্তরাত্মারূপে বর্তমান থাকিয়া পর পর সৃষ্টি রচনা করেন। ব্রহ্মেরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার লক্ষণ আছে, আকাশাদির নাই। আকাশাদির স্রষ্টৃত্ব মূলত ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব।]

শ্রুতিশাস্ত্রে ব্রহ্মকেই সব কিছুর স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুনরায়, আমরা শ্রুতিতে "আকাশ হইতে বায়ু সৃষ্ট হইল"— (তৈঃ ২.১) ইত্যাদি উদ্ধৃতি হইতেও জানিতে পারি যে, কোন কোন পদার্থ স্বাধীনভাবেই কোন কোন পদার্থকে সৃষ্টি করে। এইজন্যই প্রতিপক্ষগণ মনে করেন যে, শ্রুতিবচনের মধ্যে বিরোধ আছে। এই সূত্রটি এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছে যে, ঈশ্বরই এই সকল পদার্থে অন্তর্নিহিত থাকিয়া

ধীশক্তির দ্বারা কিছু কার্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমরা কিভাবে ইহা বুঝিব?— কারণ ঈশ্বরের কতকগুলি নিদর্শক লক্ষণ আছে, তাহা হইতেই বুঝিব। "যিনি পৃথিবী দেবতার অন্তর্বর্তীরূপে বিদ্যমান থাকেন, ...যিনি অন্তর্বর্তীরূপে থাকিয়া পৃথিবী দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন"— ইত্যাদি (বৃহঃ ৩.৭.৩)। শ্রুতি প্রমাণ করেন যে, পরমেশ্বরই একমাত্র নিয়ন্তা এবং এই শ্রুতি অন্য পদার্থের সর্বপ্রকার স্বতন্ত্রতাকে অস্বীকার করেন। পুনরায় "সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন... ... সেই জল ঈক্ষণ করিলেন"... (ছাঃ ৬.২.৩-৪) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দেখা যায় যে, ধ্যান করার পর (মনন করার পর) এই সকল পদার্থ অন্য কার্য সকল উৎপাদন করিলেন। এই 'ঈক্ষণ' (ধ্যান-মনন) অচেতন পদার্থের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরই এই পদার্থসমূহের অন্তর্বর্তী অধিদেবতারূপে থাকিয়া 'ঈক্ষণ' করিয়া কার্য উৎপাদন করেন। সুতরাং এই পদার্থসমূহ তাহাদের অন্তর্বর্তী পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের মাধ্যমেই কারণরূপে বর্তমান থাকিতে পারে। অতএব আলোচনার প্রারম্ভে উদ্ধৃত দুইটি শ্রুতিবচনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

অধিকরণ ৮: প্রলয়কালে সৃষ্টির বিপরীতক্রমে ভূতবর্গ লয়প্রাপ্ত হয়।

বিপর্যয়েণ তু ক্রমোঽতঃ উপপদ্যতে চ ॥২।৩।১৪॥

বিপর্যয়েণ (বিপরীতক্রমে) তু (অবশ্যই) ক্রমঃ (পূর্বাপর ভাব) অতঃ (উহা হইতে [সৃষ্টির ক্রম হইতে]) চ (এবং) উপপদ্যতে (ইহা যুক্তিসম্মতভাবেই বোধগম্য)।

১৪. (প্রলয়কালে পদার্থসমূহ) নিশ্চিতভাবেই (ব্রহ্মে লীন হয়) বিপরীতক্রমে (সৃষ্টির ক্রমের বিপরীতভাবে); এবং ইহা যুক্তিসম্মতভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

[১৪. যে ক্রমানুসারে ভূতবর্গ সৃষ্ট হয় তাহার বিপরীতক্রমে উহারা লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মতও বটে।]

এখন প্রশ্ন হইতেছে— বিশ্বের প্রলয়ের সময় পদার্থসমূহ যে ব্রহ্মে লীন হয় তাহা কি সৃষ্টিকালীন ক্রমানুসারে, না বিপরীতক্রমে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, প্রলয় বিপরীত-ক্রমেই হয়— কারণ কার্যটি আবার কারণাবস্থায় ফিরিয়া যায়— দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তুষাররূপ কার্যটি জলরূপ কারণে লয় হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি পদার্থই তাহার অব্যবহিত পূর্ব পূর্ব কারণে লয়প্রাপ্ত হয় এবং এই বিপরীতক্রমে লয় হইতে হইতে পরিশেষে আকাশে উপনীত হয়। এই আকাশ আবার পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মে লীন হয়।

অধিকরণ ৯ : মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির উল্লেখ দ্বারা সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ক্রমের বা ব্যুৎক্রমের কোন বাধার সৃষ্টি হয় না, কারণ ইহারা পদার্থ হইতেই সৃষ্ট।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ ।।২।৩।১৫।।

অন্তরা (মধ্যস্থলে) বিজ্ঞানমনসী (বিজ্ঞান এবং মন) ক্রমেণ (ক্রমানুসারে পর পর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার লক্ষণ হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) অবিশেষাৎ (যেহেতু কোন পার্থক্য নাই)।

১৫. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ব্রহ্ম এবং পদার্থসমূহের) মধ্যবর্তীস্থলে মন এবং বুদ্ধির (উল্লেখ আছে এবং সেইজন্য তাহাদের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের সময় ক্রম এবং বিপরীতক্রমের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল), (শ্রুতিতে) সেই বিষয়ে লক্ষণের উল্লেখ থাকায় ফল বিষয়ে (যাহা পদার্থের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ক্রমকে বিপর্যস্ত করে), (তাহার উত্তরে বলা যায়) না, তাহা নহে, যেহেতু ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (মন এবং বুদ্ধির তন্মাত্রসমূহ হইতে কোন পার্থক্য নাই)।

[১৫. আত্মা হইতে ভূতসমূহের অনুলোম ক্রমে উৎপত্তি এবং বিলোমক্রমে ভূতসমূহের লয় প্রাপ্তি; মন এবং বুদ্ধির উল্লেখ থাকায়— ইহার বিপর্যয় হইবে যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা যায় যে— না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিতে মন এবং বুদ্ধিকে পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।]

মুণ্ডকোপনিষদে এই শ্রুতিটি আছে: "এই পুরুষ হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।" (মুঃ ২.১.৩) এখানে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, এই শ্রুতিতে পদার্থের সৃষ্টির যে ক্রম প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা ছান্দোগ্য ৬.২.৩ শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে বর্ণিত পদার্থের সৃষ্টির ক্রমের বিরোধী। এখানে এই আপত্তিকে এই বলিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে যে, মুণ্ডকোপনিষদ্ শুধু উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই এই পদার্থসমূহ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে— অন্য শ্রুতির ন্যায় মুণ্ডক এখানে সৃষ্টির ক্রমের উল্লেখ করেন নাই। পুনরায়, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি, পদার্থসমূহেরই কার্য মাত্র; সুতরাং পদার্থসমূহ উৎপত্তি হইবার পরই তাহাদের উৎপত্তি হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়সমূহের পদার্থসমূহ হইতে এই অভিন্নতাবশত তাহাদের উৎপত্তি এবং প্রলয়ও পদার্থের উৎপত্তি ও প্রলয়েরই অনুরূপ। ইন্দ্রিয়সমূহ যে পদার্থ-সমূহেরই রূপান্তর তাহা এই জাতীয় শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয়— "হে সৌম্য মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়" (ছা: ৬.৬.৫)। সুতরাং মুণ্ডক শ্রুতি অন্য শ্রুতি-বর্ণিত সৃষ্টির ক্রমকে বিপর্যস্ত করে না।"

অধিকরণ ১০ : জন্ম এবং মৃত্যু ব্যাপারটি মুখ্যার্থে জীব সম্পর্কে এবং রূপকার্থে আত্মা সম্পর্কে বলা হয়।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তঃ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥২।৩।১৬॥

চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ (স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুর [দেহের উপর] নির্ভর করিয়া) তু (কিন্তু) স্যাৎ (হইতে পারে) তদ্ব্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (গৌণ) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (ঐ সকল শব্দের) উহার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীলতার জন্য।

১৬. কিন্তু উহার উল্লেখ (জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু) যথার্থ প্রযোজ্য শুধুমাত্র (দেহের প্রসঙ্গে) স্থাবর এবং জঙ্গমের। (কিন্তু আত্মার প্রসঙ্গে) ইহা গৌণ, যেহেতু (ঐ শব্দগুলি) (শরীরের) অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল।

[১৬. জীবের উৎপত্তি এবং বিনাশের যে উল্লেখ আছে তাহা মুখ্যার্থে নহে, গৌণার্থে, কারণ দেহের প্রকাশ এবং অপ্রকাশকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে।]

এখানে একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, জীবাত্মারও জন্ম এবং মৃত্যু আছে, কারণ সাধারণভাবে মানুষ এইজাতীয় উক্তি করিয়া থাকে— "দেবদত্ত জাত হইল"— "দেবদত্ত মৃত হইল" ইত্যাদি। এবং শাস্ত্রেও জন্ম এবং মৃত্যুকালে কোন কোন ক্রিয়াকাণ্ডাদির ব্যবস্থা বিহিত আছে। এই সূত্রটি এইজাতীয় সন্দেহের নিরসন করিবার জন্য বলিতেছে যে, জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এই জন্মমৃত্যু আত্মার সঙ্গে যুক্ত নহে, দেহের সঙ্গে যুক্ত— যে দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ আছে। দেহের সঙ্গে এই সংযোগ এবং বিয়োগকেই সাধারণত লোকে আত্মার জন্ম এবং মৃত্যু বলিয়া থাকে। অধিকন্তু শ্রুতিতে বলা আছে— "হে সৌম্য,......জীববিযুক্ত হইয়া এই শরীর মরে, জীব মরে না" (ছা: ৬.১১.৩)। সুতরাং জন্ম এবং মৃত্যু চরাচর জীবের শরীর সম্পর্কেই বলা হইয়া থাকে—আত্মা সম্পর্কে ইহা মুখ্যত আংশিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জন্ম এবং মৃত্যুর অর্থ হইল দেহের সঙ্গে আত্মার যথাক্রমে সংযোগ ও বিয়োগ।

এই শ্রুতি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়— "এই পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন অথবা শরীর ধারণ করেন"— ইত্যাদি (বৃহঃ ৪.৩.৮)।

অধিকরণ ১১ : জীবাত্মা অবিনাশী, অমৃত ইত্যাদি।

নাত্মা, অশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৭॥

ন (উৎপন্ন নহে) আত্মা (জীবাত্মা) অশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ না থাকায়) নিত্যত্বাৎ (নিত্যতাবশত) চ (এবং উপরন্তু) তাভ্যঃ (সেই শ্রুতিসমূহ হইতে)।

১৭. জীবাত্মা (সৃষ্ট) নহেন, কারণ এইরূপ শ্রুতিতে উল্লেখ নাই; অধিকন্তু (ইহা) নিত্য বলিয়া (কারণ এইরূপই জানা যায়) তাহা (শ্রুতি গ্রন্থ) হইতে।

[১৭. জীবাত্মা উৎপন্ন হন এই কথা শ্রুতি বলেন নাই। বরং আত্মার নিত্যত্ব ও অজত্ব বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন।]

সৃষ্টির আদিতে শুধু— "একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন" (ঐতরেয়ঃ ১.১), এবং সেইজন্যই জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করেন না এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না। পুনশ্চ শ্রুতি বলেন, "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হয়, তেমনি এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা এবং প্রাণীসমূহ"......(বৃহঃ ২.১.২০, মাধ্যন্দিন শাখা)। এইজন্যই বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, সৃষ্টিচক্রের প্রারম্ভেই জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছিল, যেইরূপ আকাশ এবং অন্যান্য পদার্থেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সূত্রটি এই বলিয়া এই যুক্তির খণ্ডন করে যে, জীবাত্মা সৃষ্ট হয় নাই; কারণ সেই শ্রুতির যে-অংশে সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা আছে, সেখানে কোথাও জীবের সৃষ্টি সম্পর্কে কোন উল্লেখই নাই। বিপরীতপক্ষে, বহু শ্রুতি স্পষ্টভাবেই জীবাত্মার উৎপত্তিকে অস্বীকারই করিয়াছেন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" অজ ও শাশ্বত (কঠঃ ১.২.১৮); "এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা" (বৃহঃ ৪.৪.২৫)। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। "এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া তিনি ইহাতে প্রবিষ্ট হইলেন" (তৈঃ ২.৬)। সুতরাং যেহেতু জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে কোন ভেদই নাই, সেইজন্য "জীব জাত হয় না"— এই ব্যাপারটি এই শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় না— "আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় আত্মাই বর্তমান ছিলেন"— (ঐঃ ১.১)। অন্য শ্রুতিতে জীবাত্মার উৎপত্তির কথা যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা শুধু গৌণ অর্থে মাত্র। সুতরাং ইহা, "তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং ইহাতে প্রবিষ্ট হইলেন"— এই শ্রুতির বিরোধী নহে।

অধিকরণ ১২ : বিজ্ঞানই জীবাত্মার স্বরূপ।

জ্ঞোঽত এব ॥২।৩।১৮॥

জ্ঞঃ (বিজ্ঞানময়) অতঃ এব (এই কারণেই)।

১৮. এই কারণেই (অর্থাৎ ইহা যে সৃষ্ট হয় নাই) (জীবাত্মা) বিজ্ঞানস্বরূপ (স্বয়ং বিজ্ঞানময়)।

[১৮. (সৃষ্ট হন নাই বলিয়াই) আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ।]

বৈশেষিকগণ বলেন যে, জীব স্বভাবত বিজ্ঞানময় নহে, কারণ, মূর্চ্ছা অথবা সুষুপ্তি অবস্থায় জীবকে বিজ্ঞানময় মনে হয় না। জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থায় মনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই ইহা বিজ্ঞানময় হইয়া উঠে। এই সূত্রটি জীব সম্পর্কে এইরূপ সম্ভাবনাকে খণ্ডন করিতেছে। বিজ্ঞানময় ব্রহ্মই স্বয়ং উপাধিযুক্ত হইয়া, সসীম দেহ ইত্যাদি যুক্ত হইয়া— জীবরূপ ধারণ করেন। সেইজন্যই বিজ্ঞানময়তা জীবের স্বভাবধর্ম এবং মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তি অবস্থায় এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না। যেমন "সুযুপ্তিতে তিনি যে দেখেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুত) দেখিয়াও দেখেন না ; কারণ (দ্রষ্টা) অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টির বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি দেখিবেন" (বৃঃ ৪.৩.২৩)। সুতরাং ইহা সত্য নহে যে, জীবের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়— কারণ ইহা অসম্ভব। বস্তুত ইহা তাহার দৃষ্টি ক্ষমতাকে হারায় না ; ইহা দেখে না— শুধু এই কারণে যে, সেখানে দেখার মতো কোন বিষয় (বস্তু) থাকে না। সেই অবস্থায় যদি বস্তুতই জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, "সেখানে জ্ঞান ছিল না"— এই কথা বলিবার জন্য কে থাকিবে? সেই অজ্ঞান অবস্থাকে কিভাবে জানা যাইবে? অধিকন্তু যে বলে যে, সে সুযুপ্তি অবস্থায় কিছুই জানিত না— সে নিশ্চয়ই তখন সেই অবস্থায় বর্তমান ছিল। তাহা না হইলে কিভাবে তাহার সেই অবস্থার স্মৃতি মনে থাকিবে? সুতরাং কোন অবস্থাতেই জীবাত্মার সম্বিৎ লোপ পায় না।

অধিকরণ ১৩ : জীবাত্মার পরিমাণ নির্ণয়।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥

উৎক্রান্তি-গতি-আগতীনাম্ (উৎক্রান্তি [বহির্গমন], যাওয়া ও আসা)।

১৯. (যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে যে, জীবের) বহির্গমন, (অন্তরীক্ষে) গমন এবং (সেখান হইতে) প্রত্যাবর্তন আছে (সেইজন্য জীবের আকার সর্বব্যাপী অসীম নহে)।

[১৯. জীবাত্মার উৎক্রান্তি-গতি, এবং পুনরাগমনের কথা শ্রুতিতে থাকায়— ইহা ব্রহ্মের ন্যায় বিভু বা সর্বব্যাপী হইতে পারে না।]

এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৩২ সংখ্যক সূত্র পর্যন্ত আত্মার আকার পরিমাণ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে— আত্মা কি অণুপরিমাণ, না মধ্যমাকার, না অসীম, বিভু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা পাই— "তিনি এক দেব— সর্বব্যাপী" (৬.১১); আবার পাই 'আত্মা অণুপরিমাণ' (মুঃ ৩.১.৯)। এই দুইটি শ্রুতির মধ্যে একটা বিরোধ দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হইবে। ২০-২৮ সংখ্যক সূত্রগুলি প্রথম প্রতিভাত সত্যকেই গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিয়াছে।

বিরুদ্ধপক্ষ বলেন যে, আমরা শ্রুতিতে আত্মার শরীর হইতে নিক্রমণ স্বর্গাদি স্থানে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা তখনই সম্ভব যদি আত্মা অণুপরিমাণ হন— সর্বব্যাপী বা বিভুর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; কারণ একটি অসীম আত্মার পক্ষে গমনাগমন থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা অণুপরিমাণ-ই।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২।৩।২০॥

স্বাত্মনা (সংযুক্ত হইবার জন্য) (প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কর্তার সহিত) চ (এবং) উত্তরয়োঃ (পরবর্তী দুইটি)।

২০. এবং পরবর্তী দুইটি (গমন এবং আগমন) (সংযুক্ত থাকার কারণে) প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কর্তার (আত্মার সঙ্গে) (ইহা অণুপরিমাণ)।

[২০. গতি এবং অগতি কর্তার সহিত-ই সম্বন্ধবিশিষ্ট। আত্মার সম্পর্কে-ই জীবের গতি-অগতি বিচার করা যায়। তাই জীব অণুপরিমাণ।]

যদি আত্মা অনন্তও হন, তথাপি তাঁহার সম্পর্কে দেহ হইতে উৎক্রান্তির ব্যাপারটি সম্ভবপর বলা যাইতে পারে— যদি ইহার অর্থ হয় দেহের কর্তৃত্বহীনতা। কিন্তু পরের দুইটি ক্রিয়া— অর্থাৎ গমন এবং আগমন, সর্বব্যাপী কোন সত্তার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং আত্মা অণুপরিমাণ।

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ,ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২১॥

ন অণু (অণু পরিমাণ নহে) অতৎ-শ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতিতে তাহা অন্যরূপ বলা হইয়াছে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়) ন (না এইরূপ নহে) ইতরাধিকারাৎ (জীবাত্মা ব্যতীত অন্য কোন মূলতত্ত্বের আলোচনা সেখানকার বিষয়বস্তু বলিয়া)।

২১. যদি এইরূপ বলা হয় (যে আত্মা) অণুপরিমাণ নহেন, যেহেতু শ্রুতিগুলি ইহাকে অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিভু) (তাহার উত্তরে বলা যায়) না, তাহা নহে; কারণ জীব হইতে ভিন্ন একটি বিষয় সম্পর্কে (পরব্রহ্ম বিষয়ে) ঐ সকল শ্রুতিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

[২১. যদি বলা যায় যে, শ্রুতিতে জীবের মহত্ত্বের উল্লেখ থাকায় জীব অণু নহে; তাহার উত্তরে বলা যায় যে — (বৃহদারণ্যকে) যে মহত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে, জীব সম্বন্ধে নহে।]

"তিনি একদেব... ... সর্ব্বব্যাপী" (শ্বেঃ ৬.১১)— এই জাতীয় শ্রুতি জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই— পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন এবং সকল বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—কারণ ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু এবং সকল বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্ম সম্পর্কেই আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ ।।২।৩।২২।।

স্বশব্দ-উন্মানাভ্যাং ([শাস্ত্রের] স্পষ্ট উল্লেখ এবং অণুত্ব পরিমাণ হইতে) চ (এবং)।

২২. এবং (শ্রুতিশাস্ত্রের অণুত্বপরিমাণ বিষয়ে) স্পষ্ট উক্তি হইতে এবং অণুপরিমাণ আকার হইতে (বুঝিতে পারা যায় যে, জীব অণুপরিমাণ-ই)।

[২২. অণুবোধক এবং অণুপরিমাণবাচক স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য থাকাতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব অণুই।]

"এই আত্মা অণু" (মুঃ ৩.১.৯); আবার আমরা পাই— "একটি কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতি ভাগকে পুনরায় শতধা বিভক্ত করিলে যে এক একটি ভাগ হয়, জীব তাহারই ন্যায় অণুপরিমাণবিশিষ্ট" (শ্বেঃ ৫.৯)। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, জীব ক্ষুদ্রতম হইতেও ক্ষুদ্র। সুতরাং জীব আকারে অণুপরিমাণ-ই।

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ।।২।৩।২৩।।

অবিরোধঃ (কোন বিরোধ নাই) চন্দনবৎ (চন্দন প্রলেপের ন্যায়)।

২৩. চন্দন প্রলেপের ন্যায় এখানেও কোন বিরোধ নাই।

[২৩. দেহের একাংশে চন্দন-প্রলেপে যেমন সর্বদেহের সন্তাপ দূর হয়, সেইরূপ সর্বদেহেই (জীবাত্মার) অণুত্বহেতু কার্যকারিতা ব্যাহত হয় না।]

যেমন দেহের এক অংশে চন্দনের প্রলেপ দিলে, সর্ব অঙ্গেই আনন্দকর অনুভূতি হয়, সেইরূপ জীব যদিও অণুপরিমাণ এবং সেইজন্য দেহের একাংশমাত্রে তার অবস্থিতি, তাহা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ দেহের উপর বিস্তীর্ণ সুখ-দুঃখাদিকে উপভোগ করিতে পারে।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥২।৩।২৪॥

অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ (বিশেষ কোন স্থানে অবস্থানহেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) অভ্যুপগমাৎ (স্বীকৃতি আছে বলিয়া) হৃদি (হৃদয়ে) হি (অবশ্যই)।

২৪. যদি এইরূপ বলা হয় যে, একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত বলিয়া (শরীরে চন্দন-প্রলেপের দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য নহে)— (ইহার উত্তরে বলা যায়) না, তাহা নহে, কারণ শাস্ত্রে (আত্মার একটি বিশেষ আসনের) স্বীকৃতি আছে এবং সেটি কেবল হৃদয় মধ্যেই।

[২৪. চন্দন দেহের একাংশে প্রলিপ্ত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু জীবাত্মার অবস্থান সেইরূপ নহে বলিয়া দৃষ্টান্তটি গ্রাহ্য নয়। ইহা পূর্বপক্ষ। উত্তর-- না, এইরূপ একাংশে অবস্থানের কথা শ্রুতিতে আছে।]

বিরুদ্ধবাদী তাঁহার নিজ মতের বিরুদ্ধেই একটি সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপন করেন। চন্দন-প্রলেপের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, চন্দন দেহের একাংশে প্রলিপ্ত হইলেও সর্বাঙ্গকেই প্রফুল্ল করে। কিন্তু আত্মার দৃষ্টান্তে আমরা জানি না যে, ইহা দেহের এক বিশেষ অংশে অবস্থান করে, এবং ইহা না জানার জন্য আমরা অনুমান করিতে পারি না যে, চন্দন-প্রলেপের ন্যায় ইহা অবশ্যই দেহের একাংশকে অধিকার করিয়া বর্তমান আছে এবং সেইজন্যই ইহা অণুপরিমাণ। কারণ এমনও তো হইতে পারে যে, সর্বব্যাপী এক আত্মা দেহের আবরক চর্মের ন্যায় দেহের সর্বত্রই বর্তমান থাকিয়া স্পর্শাদি সুখ উৎপাদন করিতেছেন। সুতরাং কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে আত্মার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। এই আপত্তিকে বিরুদ্ধবাদী এই বলিয়া খণ্ডন করিতেছেন যে, "এই হৃদয় অভ্যন্তরস্থ (স্বয়ং) জ্যোতি পুরুষ" (বৃহঃ ৪.৩.৭)— ইত্যাদি শ্রুতি

স্পষ্টই বলিতেছেন যে, শরীরে আত্মার একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে— তাহা হইল হৃদয়। সুতরাং আত্মা অণুই।

গুণাদ্বা লোকবৎ ॥২।৩।২৫॥

গুণাৎ (ইহার গুণহেতু) বা (অথবা) লোকবৎ (জগতে যেমন দৃষ্ট হয়)।

২৫. অথবা ইহার গুণ (বিজ্ঞানময়তা) থাকার জন্য— যেমন আমরা জাগতিক ব্যাপারেও (এইরূপ গুণের কার্য দেখিতে পাই)।

[২৫. যেমন নিজ গুণের দ্বারা ক্ষুদ্র একটি দীপ বৃহৎ একটি ঘরকে আলোকিত করে, সেইরূপ বিজ্ঞানাদি গুণের দ্বারা ক্ষুদ্র আত্মা একস্থানে অবস্থান করিয়াও সমগ্র দেহে কার্য করিতে পারেন।]

এই সূত্রটি আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে কিভাবে অণুপরিমাণ আত্মা সর্বদেহব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। জাগতিক দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, গৃহকোণে অবস্থিত একটি প্রদীপ সমগ্র গৃহকেই আলোকিত করিয়া থাকে। সেইভাবে আত্মাও, যদিও অণুপরিমাণ এবং সেইজন্যই দেহের একটি মাত্র অংশে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি, তাঁহার বিজ্ঞানময়তা প্রভৃতি গুণ যাহা সর্বদেহেই সঞ্চারিত, তাহার দ্বারা সর্বদেহব্যাপী সুখ-দুঃখাদিকে অনুভব করিতে পারেন।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥২।৩।২৬॥

ব্যতিরেকঃ (সীমার বাহিরে বিস্তৃতি বস্তুর অর্থাৎ আত্মার বাহিরেও) গন্ধবৎ (গন্ধের ন্যায়)।

২৬. বিস্তার (বিজ্ঞানময়তাদি গুণের) অতিক্রম করিয়া (যে আত্মাতে ইহা অবস্থিত তাহাকে অতিক্রম করিয়া) ইহা গন্ধবৎ (যেমন গন্ধ গন্ধযুক্ত পদার্থকে অতিক্রম করে) সেইরূপ (ক্রিয়াশীল)।

[২৬. পুষ্পের গন্ধ যেমন পুষ্পেতে অবস্থিত হইয়াও ইহাকে অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী স্থানকেও আমোদিত করে, জীবাত্মাও সেইরূপ একাংশে থাকিয়াও সর্বদেহে কার্যকর হইতে পারেন।]

আমরা দেখিতে পাই যে, পুষ্পের সুগন্ধ পুষ্পকে অতিক্রম করিয়া তাহার চারিপার্শ্বের স্থানে সঞ্চারিত হয়, সেইভাবেই, অণুপরিমাণ জীবাত্মার বিজ্ঞানময়তা আত্মাকে অতিক্রম করিয়া সর্বদেহেই পরিব্যাপ্ত হয়।

তথা চ দর্শয়তি ।।২।৩।২৭।।

তথা (এইরূপ) চ (এবং) দর্শয়তি (শ্রুতিতে প্রদর্শিত হয়)।

২৭. শ্রুতিও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

[২৭. শ্রুতিশাস্ত্রেও (এই যুক্তির সমর্থনে) উল্লেখ আছে।]

শ্রুতিতে এইরূপ বলা আছে যে, বিজ্ঞানময়তা গুণের দ্বারা অণুপরিমাণ আত্মা সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শ্রুতিটি বলেন, "ঠিক এইরূপভাবেই বিজ্ঞানময় আত্মা এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কেশ-নখাগ্র পর্যন্ত সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন" (কৌঃ ৪.২০)।

পৃথগুপদেশাৎ ।।২।৩।২৮।।

পৃথক্ (ভিন্নভাবে) উপদেশাৎ (উপদেশহেতু)।

২৮. (শ্রুতির) পৃথক্ উপদেশ থাকার জন্য (আত্মা যে বিজ্ঞানময় গুণের জন্য সর্বদেহব্যাপী— সেই বিষয়ে)।

[২৮. শ্রুতিতে জ্ঞান হইতে জীবের পৃথকত্ব উপদেশ করা হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞানময়তায় জীব মহৎ হইলেও জীব আসলে অণুই।]

পূর্বসূত্রের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর একটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। "প্রজ্ঞার সহায়ে দেহকে অধিকার করিয়া"— ইত্যাদি (কৌঃ ৩.৬) শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রজ্ঞা (বিজ্ঞান) দেহ হইতে পৃথক্— ইহাদের মধ্যে করণ-কর্তা সম্পর্ক বর্তমান এবং এই বিশেষ গুণ সহায়েই আত্মা সর্বদেহব্যাপী হইয়া বর্তমান।

তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ।।২।৩।২৯।।

তদ্গুণসারত্বাৎ (তাহার, সেই বুদ্ধির) গুণগুলিই যে ইহার সারবত্তা সেইজন্য— তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (সেই অণুপরিমাণত্ব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; প্রাজ্ঞবৎ (যেমন বিজ্ঞানময় পুরুষকে অণুরূপে উপদেশ করা হইয়াছে)।

২৯. কিন্তু শ্রুতির সেই উপদেশ (আত্মার অণুত্ব সম্পর্কে) হইল এইজন্য যে, (বুদ্ধির) গুণগুলিই হইল (আত্মার) সারবত্তা, যেমন বিজ্ঞানময় প্রভু (ব্রহ্ম, যিনি সর্বব্যাপী হইয়াও অণুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন)।

[২৯. প্রাজ্ঞ পরমাত্মার বৃহৎগুণ থাকার জন্য যেমন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, সেইরূপ জীবাত্মার গুণেও বিভুত্ব থাকায় কোন কোন শ্রুতি জীবকেও বিভু বলিয়াছেন। কিন্তু জীবাত্মা অণুই।]

এই সূত্রের 'তু' এই শব্দটি ১৯-২৮ সূত্রগুলিতে যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই খণ্ডন করিতেছে; এবং সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, জীবাত্মা বিভুই, কারণ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বয়ংই এই বিশ্বে জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বলা হইয়াছে— আর জীবাত্মাকেও পুনরায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে জীবকে কিভাবে অণু বলা যায়? জীবের মধ্যেও বুদ্ধিগুণের আধিক্যহেতু, যতদিন ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্পর্ক আছে বলিয়া কল্পিত হয় এবং বদ্ধ অবস্থায় জীবকেও অণু বলা যায়। উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ইত্যাদি হইল বুদ্ধির গুণ, কিন্তু এইগুলিকে জীবাত্মার উপরই আরোপ করা হয়। এই একই কারণে অর্থাৎ বুদ্ধির সসীমতাহেতু আত্মাকে অণু বলিয়া মনে করা হয়। যেমন উপাসনা বা আন্তরিক সৌকর্যের জন্য সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে সসীম বলিয়া জ্ঞান করা হয়— ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষঃ, তদ্দর্শনাৎ ॥২।৩।৩০॥

যাবৎ-আত্মভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা [ইহার আপেক্ষিক অবস্থায়] বর্তমান থাকে) চ (এবং) ন দোষঃ (কোন দোষ হয় না) তদ্দর্শনাৎ (কারণ, ইহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)।

৩০. এবং সেখানে কোন হানি হয় না (যাহা পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে সেই বিষয়ে) (যেহেতু বুদ্ধির সঙ্গে আত্মায় সম্বন্ধ বর্তমান আছে), যে পর্যন্ত আত্মা (ইহার আপেক্ষিক অবস্থায়) বর্তমান থাকে; কারণ এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় (শ্রুতিতে)।

[৩০. গুণে জীবাত্মাকে বিভু বলা দোষযুক্ত নহে। কারণ আত্মা যতদিন থাকিবে তাহার গুণও ততদিন থাকিবে। আত্মা নিত্যহেতু, তাহার গুণও নিত্য।]

পূর্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে— আত্মা এবং বুদ্ধি পৃথক্ দুইটি সত্তা এবং তাহাদের মধ্যে যে সংযোগ রহিয়াছে— তাহা কোন না কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইবেই। যখন জীবাত্মা বুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, তখন ইনি হয় একেবারে অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবেন অথবা অন্ততপক্ষে

সংসারী (ব্যষ্টি সত্তা) হওয়া হইতে বিরত থাকিবেন। এই সূত্রে এই আপত্তির জবাব দেওয়া হইয়াছে: পূর্বসূত্রের যুক্তিতে এইরূপ কোন দোষ থাকিতে পারে না— কারণ, বুদ্ধির সঙ্গে জীবের এই সংযোগ ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না জীবের পরম-জ্ঞানের উপলব্ধি দ্বারা সংসারীভাব বিনষ্ট হয়। আমরা কিভাবে ইহা জানিতে পারি? আমরা শাস্ত্রের ঘোষণা হইতেই জানিতে পারি যে, এমনকি মৃত্যুতেও এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। "এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ (স্বয়ং) জ্যোতিপুরুষ ... তিনি (বুদ্ধির) সমানাকার হইয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যথাক্রমে বিচরণ করেন, এবং যেন ধ্যান করেন, ও যেন সচল হন" (বৃহঃ ৪.৩.৭)। "যেন ধ্যান করেন", "যেন বিচরণ করেন"— এই শব্দগুলির অর্থ হইল, জীবাত্মা নিজের চেষ্টায় এবং ইচ্ছায় ধ্যান করেন না বা সচল হন না— শুধুমাত্র বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াই ইহা করিতে পারেন।

পুংস্ত্বাদিবৎ ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২।৩।৩১॥

পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষত্বাদির ন্যায়) তু (অবশ্যই) অস্য (ইহার অর্থাৎ জীবের সহিত বুদ্ধির সংযোগের) সতঃ (অস্তিত্বশীলের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (বিকশিত হইবার সম্ভাবনাহেতু)।

৩১. অভিব্যক্তিহেতু (জাগ্রৎ অবস্থায় বুদ্ধির সহিত জীবের সংযোগের) ইহার অস্তিত্বের উপর মাত্র সম্ভব বলিয়া (যাহা সুষুপ্তি অবস্থায় অপ্রকাশিত) পুরুষত্বাদির ন্যায়।

[৩১. পুরুষের ধর্ম যেমন বাল্যে প্রকাশিত হয় না, তেমনি জীবের জ্ঞানও সুষুপ্তি অথবা প্রলয়ে অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু জাগ্রৎ কালে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।]

এখানে এই বলিয়া একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির সঙ্গে কোন সংযোগই থাকিতে পারে না। কারণ শ্রুতিতে আছে— "তখন (সুষুপ্তি অবস্থায়) তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন" (ছাঃ ৬.৮.১)। তাহা হইলে কিভাবে ইহা বলা হয় যে, এই সংযোগ ততক্ষণ পর্যন্তই স্থায়ী হয় যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যষ্টি সত্তার অবস্থাটি বর্তমান থাকে?

এই সূত্রটি এই বলিয়া ইহাকে খণ্ডন করিতেছে যে— এমনকি সুষুপ্তিকালেও এই সংযোগ খুব সূক্ষ্ম এবং সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় বর্তমান থাকে। তাহা না হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় ইহা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিত না। পুরুষত্ব শক্তিটি যৌবনে বিকশিত

হয়, যদিও মাত্র ইহা সম্ভাবনাময় অবস্থায় শৈশবে বর্তমান থাকে। সুতরাং এই সংযোগটি বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকে যে-পর্যন্ত ব্যষ্টি সত্তার অবস্থাটি বর্তমান থাকে।

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা ॥২।৩।৩২॥

নিত্যোপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ (নিত্যই উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধিরূপ ফল হইতে পারিত) অন্যতরনিয়মঃ (এই দুইটির মধ্যে একটির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা হইবে) বা (তাহা না হইলে) অন্যথা (অন্যরূপ হইবে)।

৩২. তাহা না হইলে (অর্থাৎ যদি বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে স্বীকার না করা হয়) তাহা হইলে ফল হইবে এই যে— হয় ইহা চিরন্তন জ্ঞানের অথবা চিরন্তন অজ্ঞানের বিষয় হইবে, অথবা, তাহা না হইলে— ইহাদের উভয়ের (আত্মা অথবা অন্তঃকরণের) ক্ষমতার সসীমতা হইবে।

[৩২. জীবাত্মা সর্বগত এবং স্বরূপত বিভুস্বভাব মানিয়া নিলে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই নিত্য হইয়া যায়। অতএব বন্ধ ও মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় নিত্য বলিয়া উৎপন্ন হয়। আর তাহা না হইলে, তাহা নিত্যই বদ্ধ কিংবা নিত্যই মুক্ত—ইহাদের অন্যতর অবস্থাকে মানিয়া লইতে হয়। এমতাবস্থায় জীব বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হয়, এই সিদ্ধান্তটি অসঙ্গত হইয়া পড়ে।]

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বুদ্ধি যাহার অবস্থান্তরমাত্র সেই অন্তঃকরণকে স্বীকার করার প্রয়োজন কোথায়? এই সূত্রে বলা হইতেছে যদি অন্তঃকরণকে আমরা স্বীকার না করিতাম তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই তাহাদের বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে সর্বদাই সব কিছুরই উপলব্ধি হইত; কারণ জ্ঞানের (উপলব্ধির) জন্য যে-সকল উপাদানের প্রয়োজন— যথা—আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং বিষয়গুলি তাহারা সকলেই বর্তমান আছে। আর ইহাকে অস্বীকার করিলে ইহার অর্থ হইবে এই যে, জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইবে না— এবং জগতের কোন কিছুকেই বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং সেইক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদিগণকে আত্মার অথবা ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতার সসীমতাকে মানিয়াই লইতে হইবে। আত্মার পক্ষে এইরূপ হওয়া অসম্ভব; কারণ, আত্মা অপরিবর্তনীয়। ইহাও বলা যায় না যে, যে ইন্দ্রিয়শক্তি যাহা পূর্ব বা পর মুহূর্তে বাধিত নহে, তাহা মধ্যে বাধিত (সসীম) হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমাদের একটি (অন্তরেন্দ্রিয়কে) অন্তঃকরণকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, যাহার সংযোগ এবং বিয়োগের মাধ্যমেই আমাদের উপলব্ধি

বা অনুপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়টি শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে— "আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, আমি ইহা শুনি নাই" (বৃহঃ ১.৫.৩)। সুতরাং অন্তঃকরণ নামক বস্তুটি অবশ্যই থাকিবে— বুদ্ধি হইল এই অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষ মাত্র। এবং বুদ্ধির সঙ্গে অন্তঃকরণের সংযোগই আত্মাকে জীবরূপে (ব্যষ্টির) আকারে দেখাইয়া থাকে। ২৯ সংখ্যক সূত্রে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১৪ : জীবকে কর্তারূপে স্বীকৃতি।

কর্তা, শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ।।২।৩।৩৩।।

কর্তা (কর্তা) শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের অর্থ মানিতে হইলে)।

৩৩. (জীব হইলেন) কর্তা, যেহেতু শাস্ত্রীয় (উপদেশ) ঐ বিষয়ে সার্থকরূপেই করা হইয়াছে।

[৩৩. শাস্ত্র স্বর্গাদিলাভের জন্য যে যজ্ঞাদির কথা উপদেশ করিয়াছেন তাহা সার্থক হয় তখনই যখন জীবকে এই সকলের কর্তা বলিয়া মান্য করা হয়।]

আত্মার আয়তনের প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন আত্মার আর একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হইতেছে। জীব কর্তা-ই বটেন। কারণ জীবের কর্তৃত্বকে ভিত্তি করিয়াই শাস্ত্র— "তাহাকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে"— ইত্যাদি উপদেশ করিয়াছেন— জীবের এই কর্তৃত্বকে স্বীকার করিলেই শ্রুতিবচনের সার্থকতা হয়। এই-জাতীয় শ্রুতিতে কিছু যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কথা জীবের দ্বারা করণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যদি জীবাত্মা কর্তাই না হন, তাহা হইলে শ্রুতির এই- জাতীয় উপদেশগুলি নিরর্থক প্রতিপন্ন হইবে।

বিহারোপদেশাৎ ।।২।৩।৩৪।।

বিহার-উপদেশাৎ (শ্রুতি বিচরণাদির উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া)।

৩৪. এবং শ্রুতি জীবের বিচরণাদির উপদেশ করার জন্য (জীব কর্তাই)।

[৩৪.বিহার বা বিচরণাদির উপদেশ হইতেও বুঝা যায় যে, জীব কর্তা।]

"এই আত্মাও (স্বপ্নকালে) ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া নিজের শরীরে এইরূপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করেন।" (বৃহঃ ২.১.১৮) এই শ্রুতিবচনটি হইতে জানা যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা বিচরণ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জীব কর্তা।

উপাদানাৎ ।।২।৩।৩৫।।

৩৫. ইহার (ইন্দ্রিয়াদি) উপাদান গ্রহণ করা হেতু (জীব কর্তা)।

[৩৫. শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াদিকে গ্রহণরূপ কার্যের উল্লেখ থাকায় (জীব কর্তা-ই)।]

পূর্ব সূত্রে উল্লিখিত শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া বিচরণ করেন। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, জীব কর্তা।

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং, ন চেন্নির্দেশবিপর্যয়ঃ ।।২।৩।৩৬।।

ব্যপদেশাৎ (উল্লেখ হেতু) চ (ও) ক্রিয়ায়াম্ (কার্যবিষয়ে) ন চেৎ (যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে) নির্দেশ-বিপর্যয়ঃ (তাহার উল্লেখ অন্যরূপ [হইয়া যাইত])।

৩৬. এবং যেহেতু (শাস্ত্র) উল্লেখ করিয়াছেন (যে জীবই কর্তা) কার্য ব্যাপারে। যদি তাহা এইরূপ না হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ অন্যরূপ হইত।

[৩৬. শ্রুতিতে 'বিজ্ঞান' যজ্ঞ করেন বলা আছে। শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াতে জীবই কর্তা। তাহা না হইলে ইহার উল্লেখ অন্যরূপ হইয়া যাইত। এখানে বিজ্ঞান ও জীব একার্থক। তাই জীবই কর্তা।]

"বিজ্ঞানই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন— এবং কর্মসকলেরও বিস্তার (অনুষ্ঠান) করেন—" (তৈঃ ২.৫)। এখানে 'বিজ্ঞান' এই শব্দ দ্বারা আত্মাকে বুঝাইয়াছে, বুদ্ধিকে নহে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, আত্মা কর্তা। যদি শ্রুতি বুদ্ধিকে বুঝাইতে চাহিতেন তাহা হইলে (বিজ্ঞান) শব্দটিকে কর্তৃকারকে ব্যবহার করিতেন না, করণ কারকেই ইহার উল্লেখ করিতেন এবং ইহার অর্থ হইত "বিজ্ঞানের দ্বারা"— বিজ্ঞানের করণত্বের সাহায্যে— এবং অনুরূপ প্রসঙ্গে অন্যত্রও করণ কারকেই বর্ণনা করিয়াছেন— দৃষ্টান্ত, কৌঃ ৩.৬।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ।।২।৩।৩৭।।

উপলব্ধিবৎ (উপলব্ধি বিষয়ে যেইরূপ) অনিয়মঃ (কোন নিয়ম নাই)।

৩৭. যেমন উপলব্ধি ব্যাপারে তেমনি (এই শুভাশুভ আচরণ ব্যাপারেও) কোন নিয়ম নাই।

[৩৭. জীব কর্তা হইলেও শুভাশুভ কার্য সম্পাদনে তাহার কোন নিয়মিত কর্তৃত্ব নাই।]

এখানে এইরূপ একটি আপত্তি উঠে যে, জীব যদি কর্তাই হয়, তাহা হইলে সে—যাহা তাহার পক্ষে কল্যাণকর শুধু সেই সকল কর্মেরই অনুষ্ঠান করিত—শুভাশুভ উভয় কর্ম করিত না। এই আপত্তিকে এখানে খণ্ডন করা হইতেছে। জীব যেমন স্বাধীন হইলেও প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয়কেই অনুভব করে, ঠিক সেইরূপই শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকার কার্যই করিয়া থাকে। এমন কোন নিয়ম নাই যে, জীব শুধু ভাল কাজই করিবে এবং মন্দকে পরিহার করিবে।

শক্তিবিপর্যয়াৎ ॥ ২ । ৩ । ৩৮ ॥

৩৮. শক্তির বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনাহেতু (বুদ্ধির শক্তির প্রাধান্য হয়—যাহা গ্রহণীয় নয়)।

[৩৮. বুদ্ধিকে কর্তা বলিলে বুদ্ধির করণত্বের লোপ হয়— তাহা কর্তা হইয়া যায়। আসলে জীবেরই কর্তৃত্ব।]

বুদ্ধি আসলে করণ, যদি বুদ্ধিকে কর্তা বলা হয় তাহা হইলে ইহা করণ হিসাবে কার্য সহায়ক হইতে পারে না— আমাদের অন্য কিছুকে করণরূপে কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং এখানে শুধু আপত্তি হইল পদের পরিচিতি বিষয়ে, কেন না উভয় ক্ষেত্রেই কর্তা যে করণ হইতে ভিন্ন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ২ । ৩ । ৩৯ ॥

সমাধি-অভাবাৎ (সমাধি অসম্ভব হইবে বলিয়া) চ (এবং)।

৩৯. তাহা হইলে সমাধিও সম্ভব হইবে না (এইজন্যই জীবকে কর্তা স্বীকার করিতে হয়)।

[৩৯. আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যে সমাধির উপদেশ আছে, তাহা বৃথা হইয়া পড়ে।]

যদি আত্মা কর্তা না হন, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে আছে সমাধির দ্বারা "আত্মাকে জানিতে হইবে" (বৃঃ ২.৪.৫), তাহা অসম্ভব হইয়া যায়। সুতরাং আত্মার পক্ষে "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন" ইত্যাদি সহায়ে সাধনা করিয়া জ্ঞান উৎপাদন এবং সমাধিলাভ করাও সম্ভব হইবে না। সেইহেতু জীবাত্মার পক্ষে মোক্ষলাভ করাও হইবে না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মাই একমাত্র কর্তা— বুদ্ধি কর্তা নহে।

অধিকরণ ১৫: উপাধিযুক্ত জীবই কর্তা।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥

যথা (যেইরূপ) চ (এবং) তক্ষা (কাঠশিল্পী) উভয়থা (উভয়ভাবেই)।

৪০. যেমন একজন সূত্রধর উভয় (কর্তা-অকর্তা) (হইতে পারে)।

[৪০. সূত্রধর ইচ্ছানুসারে কর্তা এবং অকর্তা উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু অচেতন বুদ্ধি তাহা পারে না। সুতরাং জীবই কর্তা।

পূর্ব সূত্রে জীবের কর্তৃত্ব বিষয়টির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে— জীবের এই কর্তৃত্ব কি তাহার স্বভাব ধর্ম অথবা ইহা আরোপিত ধর্মমাত্র। নৈয়ায়িকদের মতে কর্তৃত্ব জীবের নিজস্ব স্বভাব ধর্ম। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, ইহা জীবের উপর আরোপিত ধর্মমাত্র, যথার্থ ধর্ম নহে, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন— "এই আত্মা অসঙ্গ"— (বৃঃ ৪.৩.১৫)। যেমন একজন সূত্রধর তাহার যন্ত্রাদি লইয়া কর্ম করিবার কালে ক্লেশ অনুভব করে এবং যখন সে কর্ম পরিত্যাগ করে তখন আনন্দ অনুভব করে— ঠিক সেইরূপ আত্মাও যখন বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হইয়া জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় কর্মানুষ্ঠান করেন তখন ক্লেশ অনুভব করেন— এবং যখন সকল কর্তৃত্ব রহিত হইয়া অবস্থান করেন তখন আনন্দ। শাস্ত্রের সকল উপদেশই হইল আত্মার বিশেষ গুণযুক্ত অবস্থা বিষয়ে। আত্মা স্বভাবত নিষ্ক্রিয়— যখনই মন বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধির সঙ্গে যুক্ত হন তখনই আত্মা সক্রিয় হন। যদি জীবাত্মা স্বভাবতই কর্তা না হন, তাহা হইলে শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়— এই যে আপত্তি তাহা যুক্তিসহ নহে— কারণ এই শ্রুতিবচনগুলি ইহার (কর্তৃত্ব) প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্দিষ্ট নহে— কিন্তু অবিদ্যাবশত জীবের যে কর্তৃত্বাভিমান আছে তাহার উল্লেখ করা মাত্র।

অধিকরণ ১৬: জীবের ক্রিয়া পরমেশ্বরের অধীন।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২।৩।৪১॥

পরাৎ (পরমেশ্বর হইতে) তু (কিন্তু) তৎ (তাহা, সেই কর্তৃত্ব) শ্রুতেঃ (এইরূপ শ্রুতিবচন থাকার জন্য)।

৪১. কিন্তু (এমনকি) ইহা (জীবের কর্তৃত্ব) পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত; শ্রুতিতে এইরূপ ঘোষণা আছে।

[৪১. শ্রুতি বাক্যানুসারে জীবের কর্তৃত্ব পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন।]

জীবাত্মার কর্তৃত্বও পরমেশ্বরের জন্যই। জীব পরমেশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই শুভ বা অশুভ কার্য করিয়া থাকেন। "যাঁহাদিগকে তিনি উন্নত করিবেন, তাঁহাদিগকে উত্তম কার্যে প্রণোদিত করিবেন।" (কৌঃ ৩.৮) তাঁহারই কৃপায় (মহিমায়) জীবগণ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হন।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ।।২।৩।৪২।।

কৃতপ্রযত্ন-অপেক্ষঃ (কৃতকর্মের উপর নির্ভরশীল) তু (কিন্তু) বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বৈধ কর্তব্য এবং নিষিদ্ধ-অকর্তব্য বিবেচনায়) ইত্যাদি।

৪২. কিন্তু (পরমেশ্বরের জীব কৃত্যাদি ব্যাপার) (জীবের) কৃত কর্মফলের উপর নির্ভরশীল; (এই বিবেচনাতেই) কৃত্য-অকৃত্য বিধিনিষেধ ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

[৪২. জীবের ধর্মাধর্ম কার্যানুসারেই ঈশ্বর তাহাকে শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা আছে।]

এই সূত্রটি একটি সম্ভাব্য আপত্তিকে খণ্ডন করিতেছে। যেহেতু ঈশ্বর কোন কোন ব্যক্তিকে সৎকার্যে এবং কাহাকেও আবার মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করেন সেইজন্য তাঁহাকে নিষ্ঠুর এবং অবিবেকী মনে হইতে পারে। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারেই শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এবং সংসার যেহেতু অনাদি, নিশ্চয়ই পুনঃপুনঃ পূর্ব জন্মগুলির কর্মফল তাহাতে থাকিবেই— এবং ঈশ্বরই এই সকল কর্মফলানুসারে জীবের নিয়ন্তা। সুতরাং ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বা স্বৈরাচারী বলিয়া দোষারোপ করা যায় না। এইভাবে বুঝিলেই শাস্ত্রের কর্তব্যাকর্তব্যের বিধিনিষেধের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। তাহা না হইলে জীব এই সকল শাস্ত্র উপদেশ পালন করিয়া কোন লাভবান হইত না। ইহাতে কিন্তু ঈশ্বরের স্বাধীনতার কোন হানি হয় না। যদিও বলা যাইতে পারে যে, তিনি তো জীবের শুভাশুভ ক্রিয়ার উপরই ফলদান ব্যাপারে নির্ভরশীল— তিনি যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন না। ইহার উত্তর হইল এই যে, যেমন একজন রাজা তাঁহার প্রজাকে তাহার কর্মানুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দিয়া থাকেন— কিন্তু ইহার দ্বারা রাজার সার্বভৌমত্বের কোন হানি হয় না।

অধিকরণ ১৭ : ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্পর্ক।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২।৩।৪৩॥

অংশঃ (অংশ) নানাব্যপদেশাৎ (নানারূপে বর্ণনাহেতু) অন্যথা (অন্যভাবে) চ (এবং) অপি (ও) দাশকিতবাদিত্বম্ (মৎস্যজীবী খল ইত্যাদি) অধীয়তে (পাঠ করা হয়) একে (কোন কোন বেদের কোন কোন শাখা)।

৪৩. (জীব হইল) (পরমেশ্বরের) অংশ (পার্থক্যহেতু) (জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে) এইভাবেই শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুনরায় অন্যভাবেও (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবেও বর্ণনা করা হইয়াছে); আবার (কোন বেদের শাখাবিশেষে) ব্রহ্মকে ধীবর, খল ইত্যাদিও বলা হইয়াছে।

[৪৩. জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ শ্রুতিও জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; আবার অভেদও উপদেশ করিয়াছেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়।]

পূর্ববর্তী প্রকরণে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পরমাত্মা জীবকে পরিচালিত করেন। এবার আমরা জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় অথবা অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের সম্পর্কের ন্যায়? এই সূত্রটি বলিতেছে ইহাদের সম্বন্ধ হইল, অগ্নির সহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সম্পর্কের ন্যায়—অর্থাৎ অংশ-অংশী সম্বন্ধ।

কিন্তু তাহা হইলে, জীব প্রকৃতপক্ষে একটি অংশ হইতে পারে না— কিন্তু যেন অংশেরই ন্যায় একটি কল্পিত অংশবিশেষ— কারণ ব্রহ্মের কোন অংশ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে কেন আমরা জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া মনে করিব— ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মনে করিব না? ইহার কারণ, শ্রুতিতে ইহাদের মধ্যে ভেদের উপদেশ বর্ণিত আছে। যেমন এই জাতীয় শ্রুতিতে— "একমাত্র ব্রহ্মকে জানিয়াই মুনি (ঋষি) হইতে পারা যায়"— (বৃহঃ ৪.৪.২২); 'আত্মা দ্রষ্টব্য' (বৃহঃ ২.৪.৫)। এই ভেদ জাগতিক দিক হইতেই বলা হইয়াছে। পারমার্থিক বিচারে তাহারা অভিন্ন। "ব্রহ্ম ধীবর, ব্রহ্ম দাস, ব্রহ্ম ধূর্ত খল"— ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, এইরূপ নগণ্য লোকেরাও বস্তুত ব্রহ্মই।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥২।৩।৪৪॥

মন্ত্রবর্ণাৎ (মন্ত্রের শব্দ হইতে) চ (ও)।

৪৪. মন্ত্রের শব্দরাশি হইতেও (ইহা জানিতে পারা যায় যে, জীব পরমেশ্বরেরই অংশ)।

[৪৪. শ্রুতিমন্ত্র হইতেও জীব যে পরমেশ্বরের অংশ তাহা প্রমাণিত হয়।]

জীব যে পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই অংশ ইহার সমর্থনে আর একটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। "সর্বভূত তাঁহার একপাদ মাত্র" (ছাঃ ৩.১২.৬)— এখানে ভূত বলিতে জীবগণকেও বুঝাইয়াছে। এবং এই ভূতসহিত জীবগণকে পরমেশ্বরের একপাদ বা একটি অংশ বলা হইয়াছে।

অপি চ স্মর্যতে ॥২।৩।৪৫॥

অপি (ও) চ (এবং) স্মর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রেও) এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৪৫. এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ বলা আছে।

[৪৫. স্মৃতিশাস্ত্রও ইহাই বলেন।]

"আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীব নামে প্রসিদ্ধ" (গীতা ১৫.৭)।

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥২।৩।৪৬॥

প্রকাশাদিবৎ (আলোক ইত্যাদির ন্যায়), ন (নহে) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমেশ্বর)।

৪৬. পরমেশ্বর (সুখ বা দুঃখে বিচলিত) হন না ইহার মতো (জীবাত্মা), যেমন সূর্যকিরণাদি (যে-সকল বস্তুকে স্পর্শ করে তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না)।

[৪৬. জীব ব্রহ্মের অভিন্ন অংশ হইলেও অংশ-রূপ জীবের সুখ-দুঃখাদি ব্রহ্মকে বিচলিত (দূষিত) করিতে পারে না— যেমন সূর্যের কিরণ অপবিত্র বস্তুতে স্পৃষ্ট হইলেও দূষিত হয় না।]

যদি জীব পরমেশ্বরের অংশই হন, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমেশ্বরও জীবেরই ন্যায় সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন—যেমন যদি কোন বস্ত্রের সূত্রগুলি

মলিন হয়, তবে বস্ত্রটিও মলিন হইবে। এই সূত্রটি এই আপত্তিকে খণ্ডন করিতে গিয়া বলিতেছে যে, পরমেশ্বর জীবের ন্যায় সুখদুঃখ অনুভব করেন না। কারণ অবিদ্যাহেতু জীব নিজেকে দেহ এবং মনের সঙ্গে একীভূত করিয়া নেয় বলিয়াই সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যেমন সূর্যের সর্বব্যাপী জ্যোতি বিশেষ কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াই সরল বা বক্র আকার ধারণ করে, অথবা যেমন ঘট-পরিচ্ছিন্ন আকাশ ঘটের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চালিত হয় বলিয়া মনে হয়, অথবা যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে জলের তরঙ্গের কম্পনের সঙ্গে কম্পিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়— কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের কাহারও কোন বিকার হয় না। ঠিক সেইরূপ পরমেশ্বরও ইহার কল্পিত অংশ জীবের সুখ-দুঃখ অনুভবের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন না। জীব অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট এবং বুদ্ধির-দ্বারা সীমিত বলিয়াই সুখ-দুঃখ অনুভব করে।

স্মরন্তি চ ॥২।৩।৪৭॥

স্মরন্তি (স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে) চ (এবং)।

৪৭. স্মৃতিশাস্ত্রেও (ইহার) উল্লেখ আছে।

[৪৭. স্মৃতিশাস্ত্র এবং ঋষিগণও বলিয়াছেন যে, জীবের সুখ-দুঃখাদির দ্বারা পরমাত্মার কোন বিকার হয় না।]

"এই দুইয়ের (জীব ও পরমাত্মা) মধ্যে পরমাত্মা হইলেন শাশ্বত এবং নির্গুণ। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ইনি কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না...."। এইরূপ স্মৃতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, পরমাত্মা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি আছে।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥২।৩।৪৮॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ (বিধি এবং নিষেধ) দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধবশত) জ্যোতিরাদিবৎ (জ্যোতি ইত্যাদির মতো)।

৪৮. বিধি এবং নিষেধ (সম্ভব) (আত্মার সহিত) দেহের সম্বন্ধ আছে বলিয়া; যেমন জ্যোতি ইত্যাদির দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

[৪৮. দেহের সহিত সম্পর্ক থাকায় জীবের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য যেমন জ্যোতি ইত্যাদির দৃষ্টান্তে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে (শ্মশানাগ্নি বর্জনীয়, যজ্ঞের গ্রহণীয়)।]

যদিও আত্মা এক এবং অনির্বচনীয়, এবং ইহার সম্পর্কে কোন বিধি বা নিষেধ থাকিতে পারে না, তথাপি দেহসংস্পর্শে আসায় তাঁহার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ সম্ভব। অগ্নি একই, কিন্তু শ্মশানের অগ্নিকে পরিহার করা হয় এবং যজ্ঞের অগ্নিকে গ্রহণ করা হয়। আত্মার ক্ষেত্রেও একইরূপ।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২।৩।৪৯॥

অসন্ততেঃ (বিস্তারিত নহে বলিয়া) (ইহার দেহের বাহিরে) চ (এবং) অব্যতিকরঃ (কোন সংশয় নাই) (কর্মফল বিষয়ে)।

৪৯. এবং যেহেতু (নিজ দেহের বাহিরে) জীবাত্মা বিস্তৃত নহে, সেইজন্য (কর্মফল বিষয়ে) কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

[৪৯. জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ইহা পৃথক্ পৃথক্। তাই এক জীবের কর্মফল অন্য জীবে সংক্রামিত হইতে পারে না।]

এখানে এইরূপ একটি আপত্তি উঠিতে পারে: পরমাত্মার সঙ্গে জীবের অভিন্নতাহেতু কর্মফল বিষয়েও একটা সংশয় দেখা দিতে পারে; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের কৃত কর্মফল অপর অপর জীবও ভোগ করিতে পারে। এই সূত্রটি এই জাতীয় সম্ভাবনার খণ্ডন করিতেছে। কেন না জীবাত্মা বলিতে বুঝায় কোন একটি বিশেষ দেহ, মন ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্মা এবং যেহেতু এই দেহগুলি পরস্পর হইতে ভিন্ন, একের মধ্যে অন্যটি অন্তর্ভুক্ত নহে, জীবাত্মাগুলিও পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং একে অন্যের কর্মফল ভোগ করিবে এইরূপ সংশয় থাকা সম্ভব নয়।

আভাস এব চ ॥২।৩।৫০॥

আভাসঃ (একটি আভাস, ছায়া) এব (মাত্র) চ (এবং)।

৫০. এবং (জীব) (পরমেশ্বরের) একটি আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র।

[৫০. এবং জীব পরমাত্মার একটি আভাস বা প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই জীবের সুখ-দুঃখ পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না।]

বেদান্ত মতে জীব পরমেশ্বরের একটি প্রতিবিম্ব বা মূর্তি মাত্র— অন্তঃকরণের উপাধির উপর প্রতিফলিত একটি রূপ। সুতরাং পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব বিভিন্ন অন্তঃকরণে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত— যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব

ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন সূর্যের একটি প্রতিবিম্বের কম্পনাদি অন্য প্রতিবিম্বকেও কম্পিত করে না, ঠিক সেইভাবেই বিশেষ কোন জীবের সুখ-দুঃখের অনুভূতি অন্য জীবের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। সুতরাং কর্মফল ভোগ বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২।৩।৫১॥

অদৃষ্ট-অনিয়মাৎ (অদৃষ্ট কোন পদার্থের নির্দিষ্ট কোন স্থিরতা নাই) বলিয়া।

৫১. অদৃষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নিশ্চয়তা না থাকার জন্য (যাঁহারা বহু আত্মায় এবং প্রত্যেক আত্মার সর্বব্যাপিত্বে বিশ্বাসী তাঁহাদের সংশয় থাকিতে পারে)।

[৫১. অদৃষ্ট পদার্থের স্থির কোন স্থিতি নাই। যাঁহারা জীবাত্মার বহুত্বের সঙ্গে সকল জীবাত্মারই সর্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস করেন— তাঁহাদের নানা সংশয় থাকিতে পারে।]

সাংখ্যবাদী, বৈশেষিকগণ এবং নৈয়ায়িকগণ আত্মার বহুত্বকে স্বীকার করেন— আবার সকল আত্মাকেই সর্বব্যাপী বলিয়া মনে করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে কর্মফল ভোগ সম্পর্কে সংশয় না হইয়াই পারে না; কারণ প্রত্যেকটি আত্মাই সর্বত্র বর্তমান— প্রত্যেকটি আত্মাই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া কোথায় সুখ-দুঃখাদি কি কর্মফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা দেখিতেছে। অদৃষ্টকে স্বীকার করিয়াও এই সংশয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, কারণ ইহা হইল জীবের অর্জিত ধর্মাদি ক্রিয়ার পাপ বা পুণ্যফল। সাংখ্যমতে এই কর্মফল আত্মাতে বর্তায় না— ইহা প্রধানের উপর বর্তায়, যে প্রধান সকল আত্মার মধ্যেই বর্তমান, সুতরাং এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যাহার দ্বারা বলা যাইবে যে, বিশেষ কোন অদৃষ্ট বিশেষ কোন জীবাত্মার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। অন্য দুইটি মতবাদ অনুসারে অদৃষ্ট পদার্থ সৃষ্ট হয় আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগের ফলে—এবং যেহেতু সব জীবাত্মাই সর্বব্যাপী এবং সমানভাবেই সকল মনের সঙ্গে যুক্ত— এখানেও কোন নিশ্চয়তা থাকিতে পারে না যে, নির্দিষ্ট কোন অদৃষ্ট নির্দিষ্ট কোন জীবের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং কর্মফল ভোগ ব্যাপারে সংশয়টি অপরিহার্য।

অভিসংধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২।৩।৫২॥

অভিসংধ্যাদিষু (সংকল্প বিকল্পাদি বিষয়ে) অপি (এমনকি) চ (ও) এবম্ (এইরূপ)।

৫২. এবং এমনকি সংকল্প বিকল্পাদি বিষয়েও এইরূপ (সংশয়) (হইতে পারে)।

[৫২. কর্মবিষয়ে যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাহাতেও আত্মার সর্বগতবাদে কোন নিয়ম থাকে না।]

যদি এইরূপ বলা হয় যে, কোন কিছু লাভ করার জন্য বা কোন কিছুকে পরিহার করার জন্য যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তাহা যদি অদৃষ্টের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও এই সংশয় থাকিয়াই যাইবে। কারণ সংকল্প ইত্যাদিও আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং এখানেও ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য।

৫১ হইতে ৫৩ সংখ্যক সূত্রগুলি সাংখ্য এবং অন্যান্য দার্শনিকদের আত্মার বহুত্ববাদকে এবং সর্বব্যাপিত্বকে খণ্ডন করিয়াছে। এই মতবাদ বহু অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট।

প্রদেশাদিতি চেৎ, ন, অন্তর্ভাবাৎ ॥২।৩।৫৩॥

প্রদেশাৎ (স্থানের পার্থক্যহেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) অন্তর্ভাবাৎ (আত্মার সর্বদেহের অন্তবর্তিতাহেতু)।

৫৩. যদি এইরূপ বলা হয় (যে সুখ-দুঃখের তারতম্য অনুভূত হয়) স্থানের (পার্থক্যহেতু), তাহার উত্তরে বলা যায় যে— "না তাহা হইতে পারে না— কারণ আত্মা তো সর্বদেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

[৫৩. যদি বলা হয় যে, স্থানের পার্থক্যহেতু সুখ-দুঃখ বোধের পার্থক্য হয়— তাহা ঠিক হয় না; কারণ আত্মা তো সর্বদেহব্যাপী, সুতরাং কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষ দেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। অতএব জীবাত্মার সর্বগতত্ববাদ অসিদ্ধ।]

নৈয়ায়িক এবং অন্যান্য দার্শনিকগণ পূর্বসূত্রে প্রদর্শিত আপত্তিটিকে এইভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন: যদিও প্রতিটি জীবাত্মাই সর্বগত, তথাপি আমরা যদি বলি যে, ইহা দেহপরিচ্ছিন্নাংশেই মনের সহিত সংযুক্ত— এইরূপ চিন্তা করিলে কোন সংশয় নাও থাকিতে পারে। এই যুক্তিও বিচার-সহ নহে। যেহেতু প্রতিটি জীবাত্মাই সর্বগত এবং সেইজন্যই ইহা দেহের সর্বাংশেই পরিব্যাপ্ত এবং এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে, যাহার দ্বারা আমরা বলিতে পারি যে, বিশেষ কোন জীবাত্মা বিশেষ কোন দেহকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পুনশ্চ, একাধিক সর্বগত সত্তা থাকিতেই পারে না— যদি এইরূপ আছে বলা হয়, তাহা হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সর্বগতত্বকে সীমিত করিয়া দিবে এবং ফলত কেহই সর্বগত অথবা অসীম থাকিবে না। সুতরাং সর্বগত আত্মা একটিই— বহু নহে। বেদান্তে যে জীবাত্মার বহুত্বের কথা আছে— তাহা অবিদ্যার সৃষ্টি মাত্র, ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই।

ব্রহ্ম-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় । চতুর্থ পাদ

তৃতীয় পাদে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আকাশ এবং অন্যান্য ভূতবর্গ ব্রহ্ম হইতে জাত এবং এই ভূতবর্গের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতিতে যে আপাত-বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহারও সামঞ্জস্য-বিধায়ক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই পাদের সূত্রগুলি সেই সকল শ্রুতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন— যে-সকল শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিষয়ে উল্লেখ আছে।

অধিকরণ ১ : ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।

তথা প্রাণাঃ ।।২।৪।১।।

তথা (সেইরূপভাবে) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ)।

১. ঠিক এইরূপভাবেই (ব্রহ্ম হইতে) ইন্দ্রিয়সমূহ (সৃষ্ট হইয়াছে)।

[১. পরব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিও উৎপন্ন হইয়াছে।]

শাস্ত্রের যে-সকল প্রকরণে পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে সেখানে আমরা ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিষয়ক কোন আলোচনার উল্লেখ দেখিতে পাই না। অপরপক্ষে সেখানে এইজাতীয় শ্রুতি আছে— "আদিতে সবই অসৎ ছিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন "আদিতে কি অসৎ ছিল?"— 'ঐ ঋষিগণ।' "ঐ ঋষিগণ কাঁহারা?" "এই প্রাণগণই (ইন্দ্রিয়গণই) হইলেন বস্তুত ঋষি" (শতপথ ব্রাঃ ৬.১.১.১)। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইন্দ্রিয়গণ অনাদি, সৃষ্ট পদার্থ নহে।

এই সূত্রটি ঐ মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, আকাশ ইত্যাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহও ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট। 'তথা' এই শব্দটি পূর্ববর্তী প্রকরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়কে বুঝাইতেছে না, উহা ছিল আত্মার বহুত্ববিষয়ক আলোচনা। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রকরণে আকাশ ইত্যাদির উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনাকেই 'তথা' শব্দটি লক্ষ্য করিয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্র স্পষ্টতই ইহাদের উৎপত্তির বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন— "সেই আত্মা হইতে প্রাণ, মন এবং সকল ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে" (মুঃ ২.১.৩)। সুতরাং প্রাণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) সৃষ্ট পদার্থই।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥২।৪।২॥

গৌণী (লক্ষণা অর্থে, গৌণ অর্থে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভবতা হেতু)।

২. যেহেতু লাক্ষণিক অর্থে (সৃষ্টির ব্যাখ্যা) সম্ভব নহে।

[২. ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি গৌণ অর্থে বলা হয় নাই। (কারণ এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট শ্রুতি বাক্য আছে।)]

যেহেতু শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব-উল্লিখিত শ্রুতির ন্যায় আরও বহু শ্রুতি আছে, যাহাতে সৃষ্টির পূর্ব হইতেই ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্বের কথা বর্ণিত আছে, সেইহেতু আমরা এই সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি বিষয়ক শ্রুতিকে লাক্ষণিক অর্থে ব্যাখ্যা করিলে দোষ কি? এই সূত্রটি এই আপত্তিরই খণ্ডন করিতেছে। কেন না যদি আমরা লাক্ষণিক অর্থে ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে— "এককে (ব্রহ্মকে) জানিলে সবই জানা হইয়া যায়"— ইত্যাদি শ্রুতিবচনের সাধারণ স্বীকৃত সত্যগুলিকেও পরিহার করিতে হয়। সুতরাং ইহারা (ইন্দ্রিয়সমূহ) ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টির পূর্বে যে-প্রাণের (ইন্দ্রিয়গণের) অস্তিত্বের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে তাহা হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে— যে হিরণ্যগর্ভ খণ্ড প্রলয়ে লীন হইয়া যান না— যদিও অন্য সকল কার্য বস্তুই লীন হইয়া যায়। মহাপ্রলয়ে এমনকি হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত বিলীন হইয়া যান।

তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ॥২।৪।৩॥

তৎ (তাহা) প্রাক্‌ (প্রথম, পূর্বে) শ্রুতেঃ (উল্লেখহেতু) চ (এবং)।

৩. এবং যেহেতু ইহা (সৃষ্টি-সংক্রান্ত ক্রিয়াপদটি) প্রথমে উল্লিখিত আছে (প্রাণাদির সম্পর্কেই)।

[৩. "ব্রহ্ম হইতে জাত প্রাণ"— ইত্যাদি জন্মবাচক শব্দ পূর্বে থাকায়, ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি গৌণার্থে নহে, মুখ্য অর্থেই গ্রহণীয়।]

যে শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে তাহা হইল: "সেই আত্মা হইতে প্রাণ, মন ও সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি এবং পৃথিবী সম্ভূত হইল"— (মুঃ ২.১.৩)। এখানে 'জাত' শব্দটির যে-সকল দ্রব্য জাত হইল তাহাদের উল্লেখের আদিতেই উল্লেখ থাকায় ইহাকে আকাশাদি প্রসঙ্গে মুখ্য অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে— এবং পূর্বে উল্লিখিত প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয়েও আরও বিশেষভাবেই মুখ্যার্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে এই সূত্রে আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম হইতেই জাত।

তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২।৪।৪॥

বাচঃ (বাক্ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) তৎপূর্বকত্বাৎ (তাহাদের, পদার্থসমূহের বাগাদি উল্লেখহেতু)।

৪. (পদার্থসমূহ) বাক্ ইন্দ্রিয়াদির পূর্বে বর্তমান ছিল বলিয়া (ইহা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট)।

[৪. বাক্য ও মন ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট, এইরূপ উক্ত হওয়ায় বাক্য ও মনের ন্যায় প্রাণের জন্মও মুখ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।]

"অতএব হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী"— (ছাঃ ৬.৫.৪)। এই শ্রুতি স্পষ্টতই বুঝাইতেছে যে, যে-ভূতবর্গ স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে জাত সেই ভূতবর্গ হইতেই ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তাহারাও (ইন্দ্রিয়গণ) ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট। ভূতবর্গ হইতেই জাত হওয়ায় শ্রুতিতে যেখানে পদার্থসমূহের উৎপত্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে সেখানে পৃথক্‌ভাবে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই।

অধিকরণ ২ : ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা।

সপ্ত, গতেৰ্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২।৪।৫॥

সপ্ত (সাত) গতেঃ (এইরূপ জ্ঞাত বলিয়া— শ্রুতি হইতে) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষভাবে উল্লেখহেতু) চ (এবং)।

৫. (ইন্দ্রিয়াদি হইল সংখ্যায়) সাতটি, কারণ এইরূপ (শাস্ত্র হইতে) জানা যায় এবং যেহেতু উহাদিগের সংখ্যা নির্দিষ্ট ভাবেই (সাতটি বলা হইয়াছে)।

[৫. (প্রাণের) ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা সাতটি-ই —ইহা শ্রুতি হইতে বিশেষভাবেই অবগত হওয়া যায়।]

এই সূত্রে এবং ইহার পরবর্তী সূত্রেও ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ। ইহার মতে সাতটি ইন্দ্রিয় আছে। "সাতটি প্রাণ ইহা (ব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত" (মুঃ ২.১.৮)। অপর একটি শ্রুতিতেও ইহাদের বিশেষ উল্লেখ আছে— "মস্তকে সাতটি মাত্র ইন্দ্রিয় (প্রাণ) বর্তমান" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.১.৭.১)। অবশ্য অন্য কোন কোন শ্রুতিতে আট অথবা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। ইহাদিগকে অন্তরেন্দ্রিয়ের (অন্তঃকরণের) রূপান্তর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সুতরাং যদি

আমরা ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সাতটি বলিয়াই গ্রহণ করি তাহা হইলেও শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।

হস্তাদয়স্তু, স্থিতেঽতো নৈবম্ ।।২।৪।৬।।

হস্তাদয়ঃ (হাত ইত্যাদি) তু (কিন্তু) স্থিতেঃ (বাস্তব বলিয়া) অতঃ (সেইজন্য) ন (নহে) এবম্ (এইরূপ)।

৬. কিন্তু হস্ত ইত্যাদিকেও (শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে)। ইহা যেহেতু একটি স্বীকৃত বিষয়, সেইজন্য (ইহা—সংখ্যা) এইরূপ নহে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ সংখ্যায় সাতটি মাত্র নহে)।

[৬. অন্য শ্রুতিতে হস্তাদি প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের উল্লেখ থাকায় প্রাণ সপ্ত সংখ্যক মাত্র নহে। একাদশ বলিয়াই ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হয়।]

'তু' এই শব্দটি পূর্বসূত্রের মতকে খণ্ডন করিয়াছে। "হস্তদ্বয়ই গ্রহ (ইন্দ্রিয়) ইত্যাদি শ্রুতি (বৃঃ ৩.২.৮)। এইজাতীয় শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, হস্ত ইত্যাদি হইল অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়। সুতরাং পূর্ব-উল্লিখিত সাতটির সহিত অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্ এবং অন্তঃকরণের সহিত অন্য চারিটিও অর্থাৎ হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থকে যোগ করিতে হইবে। সুতরাং সর্বমোট ইন্দ্রিয় সংখ্যা হইল একাদশ। অন্তরেন্দ্রিয়ের (অন্তঃকরণের) বিভিন্ন রূপান্তরগুলি, যথা— মন, বুদ্ধি, অহং এবং চিত্ত (স্মরণেন্দ্রিয়)-গুলি পৃথক্ কোন ইন্দ্রিয় নহে, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশের অধিক হইতে পারে না— তাহা হইলে একাদশই হইল নির্দিষ্ট সংখ্যা। ইহারা হইল: পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ।

অধিকরণ ৩ : ইন্দ্রিয়গুলি আকারে সূক্ষ্ম।

অণবশ্চ ।।২।৪।৭।।

অণবঃ (সূক্ষ্ম—অণুপরিমাণ) চ (এবং)।

৭. এবং (এইগুলি) ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম।

[৭. প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) সূক্ষ্ম-ই।]

ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম—অণুপরিমাণ। সূক্ষ্ম বা অণু বলিতে পরমাণু পরিমাণ বুঝায় না। ইহা সূক্ষ্ম এবং আকারে সীমিত ইহাই বুঝায়। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম, সেইজন্য তাহারা

দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি তাহারা সর্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে বলা হয় যে, তাহারা মৃত্যুর সময় উৎক্রান্ত এবং বিগত হয় এবং জন্মের সময় পুনরায় আগত হয় তাহা বিরুদ্ধ হইত। উপরন্ত আমরা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না যে, বিশ্বের কোথায় কি সংঘটিত হইতেছে; যদি ইন্দ্রিয়গুলি সর্বব্যাপী হইত তাহা হইলে আমরা সেইরূপ অনুভব করিতে পারিতাম। সুতরাং তাহারা সূক্ষ্ম এবং আয়তনে সীমিত।

অধিকরণ ৪ : মুখ্যপ্রাণও ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২।৪।৮॥

শ্রেষ্ঠঃ (মুখ্য প্রাণ, প্রাণশক্তি) চ (এবং) (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন)।

৮. এবং মুখ্য প্রাণ (প্রাণশক্তিও) (সৃষ্ট পদার্থ)।

[৮. মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।]

"এই পুরুষ (পরমাত্মা) হইতে প্রাণ জাত হয়"— (মুঃ ২.১.৩)। পুনরায় আমরা পাই— "(প্রাণশক্তি) প্রাণবায়ু ব্যতীতই তিনি তাঁহার স্বকীয় নিয়মে, একমাত্র তিনিই পরিক্রমা করিতেছিলেন" (ঋগ্বেদ, ১০.১২৯.২)। এখানে 'চলমান ছিলেন' এই শব্দগুলি প্রাণশক্তির ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এবং সেইজন্য ইহা সৃষ্টির পূর্বেই নিশ্চিত বর্তমান ছিল এবং সেইজন্যই ইহারা সৃষ্ট পদার্থ নহে। সুতরাং ইহার উৎপত্তি সম্পর্কে একটি স্ববিরোধী ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এমনকি মুখ্য প্রাণও ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। 'সঞ্চালমান ছিল' শব্দগুলি 'বায়ুব্যতীত'— এই শব্দগুলির দ্বারা বিশেষিত এবং সেইজন্যই এইরূপ বুঝায় না যে, মুখ্য প্রাণশক্তি সৃষ্টির পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। ইহা শুধু এইমাত্র বুঝায় যে, ব্রহ্ম—সৃষ্টির আদি কারণ—সৃষ্টির পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিলেন। এই জাতীয় শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়: "সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-রূপে (বিদ্যমান) ছিল" (ছাঃ ৬.২.১)। এই প্রাণকে 'মুখ্য' বলা হয় এইজন্য যে, ইহা অন্য সকল প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্বেই ক্রিয়াশীল ছিল, অর্থাৎ যেই মুহূর্তে কোন শিশুর মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয়, সেই মুহূর্ত হইতেই ইহা ক্রিয়াশীল। ইহার উন্নততর গুণাবলীর জন্যও ইহাকে 'মুখ্য' বলা হয়— "ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না; আপনাকে ছাড়িয়া আমরা মোটেই বাঁচিতে পারিব না।"(বৃঃ ৬.১.১৩)

অধিকরণ ৫ : মুখ্যপ্রাণ বায়ু এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি হইতে ভিন্ন।

ন বায়ুক্রিয়ে, পৃথগুপদেশাৎ ।।২।৪।৯।।

ন বায়ুক্রিয়ে (বায়ু বা ক্রিয়াশক্তি নহে) পৃথক্ (পৃথক্‌ভাবে) উপদেশাৎ (উপদেশ [উল্লেখ] করার জন্য)।

৯. (মুখ্য প্রাণ) বায়ুও নহে, (ইন্দ্রিয়ের) কোন বৃত্তিও (ক্রিয়া) নহে—যেহেতু ইহাকে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে।

[৯. মুখ্যপ্রাণ, বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তিও নহে; কারণ শ্রুতি প্রাণকে বায়ু ও ক্রিয়া হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।]

এই সূত্রে মুখ্যপ্রাণের ধর্ম বর্ণিত হইতেছে। বিরুদ্ধবাদিগণ মনে করেন যে, প্রাণ নামে পৃথক্ কোন পদার্থ নাই; কিন্তু ইহা একমাত্র বায়ুই, অন্য কিছুই নহে— এবং এই বায়ু আমাদের মুখগহ্বরে এবং বাহিরেও বর্তমান। শ্রুতিতেও আছে— 'মুখ্যপ্রাণই বায়ু'। অথবা ইহা একাদশটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সমষ্টিভূত ফলও হইতে পারে। যেমন একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ পক্ষিসমূহ যখন চলাফেরা করে তখন খাঁচাটিও আন্দোলিত হয়— ঠিক সেইরূপ, যখন একাদশটি ইন্দ্রিয় সমবেতভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তখনই দেহে প্রাণশক্তিও সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই ক্রিয়াশীলতার সামগ্রিক ফলশ্রুতিই হইল প্রাণ। ইহা সাংখ্যবাদীদের মত। সুতরাং তাহাদের মতে প্রাণ বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই।

এই সূত্রটি সাংখ্যবাদীদের এই মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, প্রাণ একটি পৃথক্ পদার্থ-ই; কারণ (শাস্ত্রে) ইহাকে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "প্রাণ (প্রাণশক্তি)-ই ব্রহ্মের চারি পদের একটি পদ; উহা বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় এবং তাপদান করে" (ছাঃ ৩.১৮.৪)। এখানে ইহাকে বায়ু হইতে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনশ্চ "এই পুরুষ হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়..." (মুঃ ২.১.৩) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা কোন প্রাণশক্তি বা ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাহাকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইত না। 'প্রাণই বায়ু' এই শ্রুতিটিও যথার্থ, যেহেতু কার্য হইল কারণেরই রূপান্তর মাত্র এবং প্রাণশক্তি (মুখ্যপ্রাণ) বায়ুই শরীরের অভ্যন্তরে (অধ্যাত্ম) ক্রিয়াশীল। এই ক্ষেত্রে খাঁচার ভিতর পক্ষীর দৃষ্টান্তটি ঠিক প্রযোজ্য নহে। কারণ, পক্ষিগুলির সকলেরই কার্য একই রূপ— অর্থাৎ তাহারা সকলেই চঞ্চল এবং তাহাদের সঞ্চরণ খাঁচার আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির

কার্য একরূপ নহে— প্রত্যেকটির কার্য অপরটি হইতে ভিন্ন। এবং তাহাদের ধর্মও প্রাণশক্তির ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। সুতরাং তাহারা জীবনীশক্তির সৃষ্টি করিতে পারে না। সেইজন্যই প্রাণ একটি ভিন্ন সত্তা (পদার্থ)।

চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২।৪।১০॥

চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষু ইত্যাদির ন্যায়) তু (কিন্তু) তৎসহ-শিষ্ট্যাদিভ্যঃ (যেহেতু ইহাকে তাহাদের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যান্য কারণেও)।

১০. কিন্তু (প্রাণ আত্মার অধীন) চক্ষু ইত্যাদির ন্যায়, কারণ, ইহাকে অন্যান্যদের সঙ্গেই উপদেশ (উল্লেখ) করা হইয়াছে— এবং অন্যান্য কারণেও (ইহা আত্মার অধীন)।

[১০. চক্ষু প্রভৃতির সহিত প্রাণের একসঙ্গে উল্লেখ থাকায় প্রাণ জীবের ন্যায় কর্তা-ভোক্তা নহে। ভোগোপকরণ মাত্র।]

প্রাণ যদি ইহার অধীন ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে একটি পৃথক্ সত্তা হয়, তাহা হইলে, ইহা জীবাত্মার ন্যায় শরীরের মধ্যে স্বাধীন সত্তা হিসাবেই বিরাজ করিবে। এই সূত্রটি উক্ত মতবাদের খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, প্রাণ জীবাত্মার অধীন। কেন অধীন? কারণ, উপনিষদের প্রাণসংবাদ ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং এই জাতীয় শ্রেণী বিভাগে সমজাতীয় পদার্থকেই এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুতরাং প্রাণও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় জীবাত্মার অধীন। সূত্রে অন্যান্য কারণের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল, ইহার অংশিত্বময় সত্তা, ইহার অচেতন ভাব ইত্যাদি।

অকরণত্বাচ্চ ন দোষঃ, তথা হি দর্শয়তি ॥২।৪।১১॥

অকরণত্বাৎ (ইহা করণ না হওয়া হেতু) চ (এবং) ন (হয় না) দোষঃ (দোষ, আপত্তি) তথাহি (কারণ, এইরূপ) দর্শয়তি (শ্রুতিতে আছে)।

১১. এবং (ইহার) করণত্ব না থাকার জন্য কোন দোষ হয় না, কারণ এইরূপ (শ্রুতিতে)ও উপদেশ আছে।

[১১. মুখ্যপ্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় জ্ঞান-ক্রিয়ার করণ না হইলেও কোন দোষ হয় না, কারণ শ্রুতিতে ইহার নির্দিষ্ট কার্য কি তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।]

যদি মুখ্যপ্রাণও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় জীবাত্মার অধীন হয়, তাহা হইলে, ইহাও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় জীবাত্মার সঙ্গে করণসম্পর্কে সম্পৃক্ত হইবে। কিন্তু মাত্র একাদশটি ইন্দ্রিয়েরই

একাদশটি ক্রিয়া বর্তমান, দ্বাদশ সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের অবর্তমানে দ্বাদশটি বিষয় গ্রহণ-ক্রিয়ারও কোন স্থান নাই। এই সূত্রটি উক্ত আপত্তিটির খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, মুখ্যপ্রাণ চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কোন করণ বা ইন্দ্রিয় নহে; কারণ তাহা হইলে দ্বাদশতম করণের জন্য দ্বাদশতম একটি বিষয়েরও প্রয়োজন হইবে। তথাপি শরীরের মধ্যে মুখ্যপ্রাণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে যাহা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাধ্যাতীত— তাহা হইল শরীরকে রক্ষা করা। শ্রুতিতে আছে যে, মুখ্যপ্রাণ শরীরকে রক্ষা করে— "(অমর পূর্ণাত্মা) নিকৃষ্ট নীড়টিকে (দেহকে) প্রাণের দ্বারা রক্ষা করিয়া"... (বৃহঃ ৪.৩.১২)। পুনরায় অন্য শ্রুতিতেও আছে— "যে-কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করেন, সেই অঙ্গ সেই স্থলেই শুকাইয়া যায়" (বৃঃ ১.৩.১৯); "লোকে প্রাণের সহায়ে যে অন্ন আহার করে, তাহার দ্বারা ইঁহারা (ইন্দ্রিয়গণ) তৃপ্ত হন" (বৃঃ ১.৩.১৮)। এই সকল শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মুখ্যপ্রাণের কার্য হইল শরীরকে রক্ষা করা— ইন্দ্রিয়গণের এই ক্ষমতা নাই। মুখ্যপ্রাণের যে শুধু ইহাই একমাত্র কার্য তাহা নহে। ইহার অন্য বৃত্তিও আছে— পরবর্তী সূত্রে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥২।৪।১২॥

পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচটি বৃত্তি [কার্য] বিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের ন্যায়) ব্যপদিশ্যতে (এইরূপ উপদেশ আছে)।

১২. মনের ন্যায় ইহারও পাঁচটি বৃত্তি আছে বলিয়া শাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে।

[১২. মন যেমন পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট, প্রাণও তেমনি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া শ্রুতিতে উপদেশ করা হইয়াছে।]

"আমিই নিজেকে এইরূপ পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই কার্যকারণ সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া বিস্পষ্টরূপে ধারণ করি" (প্রঃ ২.৩)। পঞ্চপ্রকার— অর্থাৎ প্রাণ, অপান ব্যান, উদান এবং সমান। এই প্রত্যেকটি প্রাণেরই একটা নির্দিষ্ট কার্য আছে, যেমন— নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, সর্বদেহের উপর ক্রিয়া এবং শক্তির প্রকাশ, আত্মাকে দেহ হইতে নির্গত হইতে সহায়ক করা, এবং ভুক্ত খাদ্যকে পরিপাক করিয়া সর্বদেহে ইহাকে সঞ্চার করা। এই বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্তঃকরণের সহিত প্রাণের সাদৃশ্য আছে—অন্তঃকরণ একটি হইলেও ইহার চারিটি আকারে কার্যকারিতা হয়; যথা—মন, বুদ্ধি, অহং ও চিত্ত (স্মৃতি) রূপে।

অধিকরণ ৬: প্রাণের সূক্ষ্মতা।

অণুশ্চ ॥২।৪।১৩॥

অণু (সূক্ষ্ম) চ (এবং)।

১৩. এবং ইহা (মুখ্যপ্রাণ) অণু পরিমাণ।

[১৩. মুখ্যপ্রাণও অণুপরিমাণ। সূক্ষ্মভাবেই ইহা উৎক্রান্ত হয়।]

মুখ্যপ্রাণও ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় সূক্ষ্ম, অণু এবং সসীম। প্রাণ সর্বব্যাপী এইরূপ শ্রুতি থাকায় ইহার সূক্ষ্মতা সম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে। শ্রুতিটি হইল এই: "যেহেতু আবার এই প্রাণ পুত্তলিকার (উই-এর দেহের) সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই ত্রিলোকের সমান, এই নিখিল বিশ্বের সমান"— (বৃহঃ ১.৩.২২)। কিন্তু এখানে যে সর্বব্যাপিত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিশ্ব-মহাপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কে। সার্বিকভাবে বিবেচনা করিলে ইহা সর্বব্যাপী, কিন্তু এই জগতের প্রাণীসমূহের তুলনায়, ইহার ব্যষ্টিগত বিচার করিলে— যে ব্যষ্টিগত ব্যাপারই আমাদের বিশেষ বিবেচ্য— ইহা সসীমই বটে। এইজন্যই মুখ্য প্রাণও পরিচ্ছিন্ন।

অধিকরণ ৭ : ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥২।৪।১৪।

জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠানং (অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতাদের অধিষ্ঠান ব্যাপার) তু (কিন্তু) তৎ-আমননাৎ (তাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া)।

১৪. (ইন্দ্রিয়গণের উপর) অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণের অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যাপারটি কিন্তু শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে বলিয়াই (গ্রহণ করিতে হইবে)।

[১৪. বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের অধিষ্ঠান হেতুই স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়— ইহা শ্রুতিতে আছে।]

এখানে প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বিষয়টিকে আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে যে, এই ইন্দ্রিয়গণের অগ্নি প্রভৃতি অধিদেবতা আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যাইতে পারে— "অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন" (ঐঃ ২.৪)। ইন্দ্রিয়গণ যেহেতু অচেতন, সেইজন্য তাহারা স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণবতা, শব্দাৎ ॥২।৪।১৫॥

প্রাণবতা (প্রাণ বা ইন্দ্রিয়যুক্তদের সহিত) শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে)।

১৫. (দেবতাগণ ভোক্তা নহেন, জীবই ভোক্তা কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ জীবের সঙ্গেই সম্পৃক্ত), যে জীব আবার ইন্দ্রিয়-সমন্বিত শাস্ত্র হইতে (ইহা জানা যায়)।

[১৫. শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, সুতরাং জীবই ভোক্তা।]

এই সূত্রটি হইতে স্পষ্টই জানা যায় এই শরীরে কেন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভোক্তা নহেন— এবং জীবই ভোক্তা। জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হইল প্রভু-ভৃত্যের। শাস্ত্রে এইরূপই বলা আছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোক্তা হইল জীব— অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন।

"আর যিনি জানেন 'আমি গন্ধ উপলব্ধি করি' তিনি আত্মা; (তাঁহারই) গন্ধোপলব্ধির জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়" (ছাঃ ৮.১২.৪)। উপরন্তু দেহে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে বহু দেবতাই আছেন—কিন্তু ভোক্তা মাত্র একজনই। তাহা না হইলে (ভোগের) স্মৃতি সম্ভবপর হইত না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ জীবেরই ভোগের নিমিত্ত—দেবতাদের ভোগের নিমিত্ত নহে— যদিও দেবতারাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২।৪।১৬॥

তস্য (ইহার—জীবের) চ (এবং) নিত্যত্বাৎ (নিত্যতাহেতু)।

১৬. এবং (জীবের) (দেহে অবস্থানের) নিত্যতা হেতু জীবই ভোক্তা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ নহেন)।

[১৬. জীবই স্থায়িভাবে দেহে অবস্থান করে বলিয়া জীবই ভোক্তা— দেবতাগণ নহেন।]

জীবাত্মা ভোক্তা হিসাবে দেহে স্থায়িভাবে অবস্থান করে; সেইজন্য ইহা ভাল এবং মন্দের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে। ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, যে-দেহ জীবাত্মার পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা গঠিত তাহাতে অন্য কেহ— অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভোক্তা হইবেন। দেবতাগণের একটা মহিমময় প্রতিষ্ঠা আছে যাহার জন্য তাঁহারা মানবদেহের নিম্নস্তরের এই ভোগসকলের প্রতি ঘৃণাসম্পন্নই হইয়া থাকিবেন। জীবাত্মাই ভোক্তা। অধিকন্তু, ইন্দ্রিয় এবং জীবের মধ্যে সম্বন্ধটি চিরন্তন।

এই শ্রুতিটি দ্রষ্টব্য— "তিনি উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে; প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়"— (বৃহঃ ৪.৪.২)। জীবই হইল কর্তা সেইজন্যই জীব ভোক্তা— যদিও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

অধিকরণ ৮ঃ ইন্দ্রিয়সমূহ স্বাধীন পদার্থ, মুখ্য প্রাণের প্রকার ভেদ নহে।

ত ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২।৪।১৭॥

তে (সেইসকল) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) তদ্ব্যপদেশাৎ (এইরূপ কথিত হয় বলিয়া) শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র (প্রধান ব্যতীত)।

১৭. ঐসকল (অন্য প্রাণসমূহ) মুখ্য প্রাণ ব্যতীত হইল ইন্দ্রিয় (এবং সেইজন্যই মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন) যেহেতু (তাহাদিগকে) শাস্ত্রে এইরূপই (ইন্দ্রিয়রূপে) অভিহিত করা হইয়াছে।

[১৭. মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য সকল প্রাণকেই শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে।]

এখন প্রশ্ন হইল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কি শুধু মুখ্য প্রাণেরই বিকার বা প্রকারভেদ মাত্র, না ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ বিশেষ। বিরুদ্ধবাদিগণ মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণেরই বিকার, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ আছে— "তিনিই আমাদের (ইন্দ্রিয়গণের) মধ্যে সর্বোত্তম। ভাল কথা, আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি।" তাঁহারা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করিলেন। সেইজন্য তাঁহারা ইঁহারই নামে অর্থাৎ 'প্রাণবৃন্দ'এই নামে আখ্যাত হন (বৃহঃ ১.৫.২১)। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলে যে, এই একাদশ ইন্দ্রিয়সমূহ অন্য জাতীয় ভিন্ন একটি শ্রেণীভুক্ত। ইহারা মুখ্য প্রাণের প্রকারভেদ নহে, কারণ ইহাদিগকে অন্যান্য শ্রুতিতে পৃথক্‌রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে: "এই পুরুষ হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়"— (মুঃ ২.১.৩)। এখানে মুখ্য প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্‌ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের শ্রুতিকে গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভেদশ্রুতেঃ ॥২।৪।১৮॥

১৮. পার্থক্য-নির্দেশক শ্রুতি আছে বলিয়া।

[১৮. মুখ্য প্রাণ এবং অন্যান্য প্রাণ এক নহে। এই ভেদজ্ঞাপক শ্রুতি আছে।]

বৃহদারণ্যকে ১.৩ শ্রুতিতে প্রথমত একটি প্রকরণে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় আলোচনা করিবার পর অন্য একটি প্রকরণে মুখ্য প্রাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহারা একশ্রেণীভুক্ত নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহও স্বতন্ত্র পদার্থই— ইহারা মুখ্য প্রাণের বিকার বা রূপান্তর মাত্র নহে।

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ।।২।৪।১৯।।

বৈলক্ষণ্যাৎ (ধর্মগত পার্থক্য হেতু) চ (এবং)।

১৯. এবং লক্ষণসমূহের পার্থক্য হেতু।

[১৯. মুখ্য প্রাণের ধর্ম এবং ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম ভিন্ন বলিয়া ইহারা এক নহে।]

শ্রুতিতে ইহাদের স্বভাবগত নানা পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— ইন্দ্রিয়গণ সুষুপ্তি কালে কোন ক্রিয়া করে না—কিন্তু মুখ্য প্রাণ তখনও ক্রিয়াশীল থাকে। ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত হইয়া পড়ে, প্রাণ তাহা হয় না। বিশেষ কোন অঙ্গের হানি হইলে প্রাণের কিছু হয় না, কিন্তু প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে শরীরের মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি ঘটে। যে-সকল শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণ বলা হইয়াছে যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ প্রাণেরই আকার ধারণ করিয়াছিলেন—সেইসকল শ্রুতিকে গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; যেমন ভৃত্যগণ কখনও গৌণভাবে প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রাণ হইলেন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক। সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল স্বতন্ত্র পদার্থই।

অধিকরণ ৯: নাম এবং রূপের সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই কার্য, জীবের কার্য নহে।

সংজ্ঞামূর্তিক্লিপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্বতঃ,উপদেশাৎ ।।২।৪।২০।।

সংজ্ঞা-মূর্তি-ক্লিপ্তিঃ (নাম এবং রূপের সৃষ্টি কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুর্বতঃ [যিনি ত্রিবৃৎ (সৃষ্টিকার্য) করেন তাঁহার] উপদেশাৎ (এইরূপ শাস্ত্রে উপদেশ আছে বলিয়া)।

২০. কিন্তু নাম এবং রূপের সৃষ্টি তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে যিনি ত্রিবৃৎ (কারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি) কার্য করিয়াছেন, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে।

[২০. সৃষ্ট পদার্থের নাম ও রূপ কল্পনা ও ত্রিবিধ কর্তা পরমাত্মারই কার্য, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ বলা আছে।]

এখন একটি প্রশ্ন উঠে এই যে, এই বিশ্বে যে-সকল স্থূল নাম রূপ বিশিষ্ট ভূতবর্গ রহিয়াছে তাহাদিগকে ঈশ্বর কর্তৃক তিনটি ভূত সৃষ্টির পর, জীব অথবা পরমেশ্বরকে আকার-বিশিষ্ট করিয়াছেন। আমরা ছান্দোগ্য ৬.২-এ পাই যে, ঈশ্বরই পদার্থগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রুতির পরবর্তী অংশের আলোচনায় বলা হইয়াছে: "সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, অধুনা আমি এই প্রাণধারক আত্মারূপে এই তিন দেবতার (তেজ, ক্ষিতি ও অপ্) মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (প্রাণবান জীবরূপে) নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি" (ছাঃ ৬.৩.২)। এই শ্রুতিকে ভিত্তি করিয়াই বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,তিনটি মহাভূত (ক্ষিতি, তেজ ও অপ্) সৃষ্টির পর নামরূপ তথা সমগ্র স্থূল পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপারটি জীবাত্মারই কার্য— পরমেশ্বরের কার্য নহে। এই সূত্রটি এই মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে— শ্রুতিতে 'জীব' শব্দটি বাক্যবিন্যাসের নিয়মে 'অনুপ্রবিশ্য' এই শব্দটির সঙ্গে সম্পৃক্ত— "নামরূপ অভিব্যক্ত করি"-র সঙ্গে সম্পৃক্ত নহে। জীবাত্মার স্থূলজগৎ সৃষ্টির কোন ক্ষমতাই নাই। অধিকন্তু এই শ্রুতির পরবর্তী বাক্যটি— "(তারপর) 'তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই চিন্তা করিয়া উক্ত দেবতা—" ইত্যাদি (ছাঃ ৬.৩.৩) হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র পরমেশ্বরই নামরূপ প্রকট করিতে পারেন এবং স্থূল পদার্থসমূহ এবং জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে কোন কুম্ভকার কর্তৃক কুম্ভাদির সৃষ্টি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? সেখানেও পরমেশ্বরই আন্তর-নিয়ন্তা। পরমেশ্বরই সর্বভূতের অন্তর্যামী এবং সমগ্র সৃষ্টিরই নিয়ন্তা।

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২।৪।২১॥

মাংসাদি (মাংস প্রভৃতি) ভৌমং (ক্ষিতিরই বিকার) যথাশব্দম্ (শাস্ত্রানুসারে) ইতরয়োঃ (অপর দুইটির) চ (ও)।

২১. মাংস ইত্যাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন, শাস্ত্রে এইরূপ বলা আছে। অপর দুইটি (তেজ এবং অপ্) সম্পর্কেও একই কথা।

[২১. শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মাংসাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। অপর দুইটি—অপ্ এবং তেজ হইতেও এইরূপ অপর বস্তু উৎপন্ন হয়। তাহাও শ্রুতিতে আছে।]

ত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবী, মনুষ্য কর্তৃক ভুক্ত হইয়া মাংস ইত্যাদি উৎপন্ন করে। "পৃথিবী (অন্ন) ভক্ষিত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয় ... ইহার মধ্যমাংশ মাংসে এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়"— (ছাঃ ৬.৫.১)। এইরূপভাবেই আমাদিগকে শাস্ত্রানুসারে

বর্ণিত অপর দুইটি পদার্থের পরিণতিকেও বুঝিতে হইবে। জল রক্ত এবং প্রাণ ইত্যাদি উৎপাদন করে এবং তেজ উৎপাদন করে অস্থি, মজ্জা এবং বাগিন্দ্রিয়।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ।।২।৪।২২।।

বৈশেষ্যাৎ (আধিক্যহেতু) তু (কিন্তু) তদ্বাদঃ (সেই বিশেষ নাম হয়)।

২২. (স্থূল বস্তুটির মধ্যে কোন ভৌত পদার্থের) আধিক্যহেতু (সেই অধিক পদার্থের নামে) ইহার নাম হয়।

[২২. পৃথিবী, জল ও তেজের ভাগের আধিক্যহেতু তদ্রূপ নাম হয়।]

এখন একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি সব স্থূল বস্তুই তিনটি সূক্ষ্ম পদার্থের সমবায় হয়, তাহা হইলে, 'ইহা জল', 'ইহা পৃথিবী', 'ইহা তেজ' এইরূপ পার্থক্যজ্ঞাপক অভিধা কেন? এই সূত্রটি এই আপত্তির খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, যেহেতু সূক্ষ্ম ভূতগুলিকে একই বস্তুতে সমান পরিমাণ ভাগে দেখা যায় না, সেইজন্য স্থূল বস্তুটির গঠনে যে সূক্ষ্ম ভূতের ভাগের পরিমাণের আধিক্য থাকে, সেই ভৌত পদার্থের নামানুসারেই স্থূল বস্তুটির অভিধা হয়। 'তদ্বাদ' (সেই অভিধা) শব্দটির সূত্রে পুনরুক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই অধ্যায়টি এখানেই সমাপ্ত হইল।

ব্রহ্ম-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায় । প্রথম পাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদান্তিক মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রুতি ও যুক্তিভিত্তিক সকল আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অন্যান্য সকল মতবাদই ভ্রান্ত এবং বেদান্ত দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রুতির মধ্যে কোন আপাত বিরোধও থাকিতে পারে না। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জীব (প্রাণ ইত্যাদি) হইতে ভিন্ন সকল সত্তাই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন এবং ইহা জীবের ভোগের জন্যই সঞ্জাত। এই অধ্যায়ে সোপাধিক জীবের নানা লোকে ভ্রমণাদির কথা আলোচনা করা হইয়াছে যাহার দ্বারা জীবের একটা অনাসক্তির ভাবের উদ্ভব হইতে পারে।

অধিকরণ ১ : মৃত্যুকালে জীব (প্রাণ) যখন দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় তখন ইহা স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম অণুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ, প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১॥

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ (একটি নূতন দেহ প্রাপ্তির ইচ্ছার জন্য) রংহতি (যাত্রা করে) সম্পরিষ্বক্তঃ (আবৃত হইয়া) সূক্ষ্ম দেহ (দ্বারা) প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ (প্রশ্ন এবং উত্তর হইতে) (ইহা জানা যায়)।

১. (জীবাত্মা) যাত্রা করে (শরীর হইতে) আবৃত হইয়া (ভূতবর্গের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা) একটি নবতর দেহপ্রাপ্তির আশায়, (এইরূপ জানিতে পারা যায়) (শাস্ত্রের) প্রশ্ন এবং উত্তর হইতে।

[১. জীব সূক্ষ্মভূত-সমন্বিত হইয়া দেহত্যাগান্তে অন্যদেহ প্রাপ্তির জন্য গমন করে—ইহা শ্রুতি বর্ণিত প্রশ্নোত্তর হইতে অবগত হওয়া যায়।]

"দেহান্তর গ্রহণ করিবার সময় জীব স্থূল ভূতবর্গের সূক্ষ্মাংশগুলিকে ভাবি-দেহের বীজরূপে গ্রহণ করে কি না ইহাই এই সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদের মত হইল যে, জীব এই সকল সূক্ষ্মাংশ সঙ্গে লইয়া দেহান্তরে যায় না, কারণ ইহার কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু শরীর ধারণের উপাদানসমূহ সর্বত্রই সহজলভ্য।

উপরন্তু শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ কোন শ্রুতি নাই বলিয়া আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে যে, জীব ভূতবর্গের সূক্ষ্মাংশগুলি (সূক্ষ্মদেহ) সঙ্গে লইয়া দেহান্তরে গমন করে না। এই সূত্রটি উক্ত মতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া বলে যে, জীব নিশ্চিতই এই সকল সূক্ষ্ম উপাদান (সূক্ষ্মদেহ) সঙ্গে লইয়া জন্মান্তরে যায় এবং এই তত্ত্বটি জানা যায় শাস্ত্রে যেখানে প্রশ্ন এবং উত্তর সম্বলিত শ্রুতিটি আছে, সেখান হইতে। "পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে কিরূপে তরল আহুতিসমূহ (বা অপূর্ব) পুরুষ-পদ-বাচ্য হয় (তাহা) জান কি?" (ছাঃ ৫.৩.৩)। ইহাই হইল প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে সমগ্র শ্রুতির অংশে। এই শ্রুতি পঞ্চ-আহুতি, যথা— শ্রদ্ধা (তরল আহুতির সূক্ষ্মরূপ), সোম, বৃষ্টি, অন্ন এবং বীজ— এই কয়টিকে কিভাবে পঞ্চ অগ্নিতে (উপাসনার সৌকর্যের জন্য দ্রব্যগুলিকেই অগ্নিরূপে কল্পনা করা হয়), যথা— স্বর্গ, পর্জন্য (বৃষ্টি দেবতা), পৃথিবী, মনুষ্য এবং মানবীতে অর্পণ করা হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে বলিতেছে— "এই কারণেই পঞ্চম আহুতি জলকে মনুষ্য বলা হইয়াছে"। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, জীব জলের দ্বারা সমাবৃত হইয়াই গমন করে। (এখানে জল শ্রদ্ধারই অনুরূপ)। অধিকন্তু, যদিও উপাদানগুলি সর্বত্রই সুলভ, তথাপি ভাবি-শরীরের জন্য বীজ ততটা সহজলভ্য নহে। পুনশ্চ জীবের উপাধিগুলি— অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়াদি— যাহা জীবের সঙ্গে গমন করে (বৃঃ ৪.৪.২ দ্রষ্টব্য), তাহা জীবের সঙ্গে যাইতে পারে না— যদি তাহাদের একটা পদার্থগত অস্তিত্ব না থাকে।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩।১।২॥

ত্র্যাত্মকত্বাৎ [(জলের) তিনটি উপাদানত্বহেতু] তু (কিন্তু) ভূয়স্ত্বাৎ [(জলের) আধিক্যবশত]।

২. (জল) তিনটি উপাদান সমন্বিত বলিয়াই (জীব এই তিনটি উপাদানের সহিতই গমন করিয়া থাকে শুধুমাত্র জলের সহিতই নহে); কিন্তু (শাস্ত্রে শুধুমাত্র জলেরই উল্লেখ আছে)— (মানব শরীরে) জলের আধিক্যহেতু।

[২. জলে তিনটি উপাদানই আছে। এই সূক্ষ্ম শরীর সম্পর্কে কেবলমাত্র 'অপ্' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, মানব শরীরে জলের আধিক্যবশতই শুধু জলেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে জীব তিনটি উপাদানকেই সূক্ষ্ম শরীরে বহন করে।]

এখানে একটা আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে শুধুমাত্র জলেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্য যে সকল উপাদান জীবের সঙ্গে দেহান্তরে গমন করে

তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। এই সূত্রটি এখানে বলিতেছে যে, স্থূল বস্তুর ত্রিবৃৎ করণের নিয়মানুসারে জলে আরও দুইটি উপাদানের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই তিনটি উপাদানই জীবাত্মার সহগামী হয়। জলের উল্লেখ লক্ষণাত্মক মাত্র এবং ইহাতে তিনটি উপাদানই আছে বুঝিতে হইবে। কোন শরীরই শুধুমাত্র জলের উপাদানে গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু শরীরে জলীয় অংশই অধিক, সেইজন্য শাস্ত্রে শুধুমাত্র জলেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাণগতেশ্চ ।।৩।১।৩।

প্রাণগতেঃ (ইন্দ্রিয়গণ গমন করে বলিয়া) চ (এবং)।

৩. এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ গমন করে (জীবাত্মার সঙ্গে, সেইজন্য অন্যান্য উপাদানগুলিও জীবাত্মার সহগামী হয়)।

[৩. বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন যে, জীব উৎক্রান্ত হইলে জীবের সহিত ইন্দ্রিয়সকলও গমন করে।]

"তিনি উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে; প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়" (বৃহঃ ৪.৪.২)। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার সঙ্গে গমন করে, সেইজন্য নিশ্চয়ই তাহাদের স্থূল আকার আছে। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, জল এবং অন্যান্য উপাদানগুলিও জীবাত্মার অনুগমন করে— এবং এইভাবেই ভাবি-জন্মের ইন্দ্রিয়গ্রাম সৃষ্টির একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ ।।৩।১।৪।।

অগ্ন্যাদিগতি (অগ্নিতে প্রবেশ ইত্যাদি) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না এইরূপ নহে) ভাক্তত্বাৎ (যেহেতু ইহা গৌণার্থেই এইরূপভাবে বলা হইয়াছে)।

৪. যদি বলা হয় (যে ইন্দ্রিয়গণ জীবের অনুগমন করে না), কারণ শাস্ত্রে আছে তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করে ইত্যাদি, (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) না তাহা হইতে পারে না, কারণ ইহা গৌণার্থেই এইরূপভাবে বলা হইয়াছে বলিয়া।

[৪. যদি বলা হয় যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে দেহান্তর কালে ইন্দ্রিয়সকলের অগ্নিতে প্রবেশের কথাই বলা আছে, জীবের সহিত গমনের কথা নাই, তদুত্তরে আমরা বলিব, না তাহা নহে, কারণ ঐ উক্তি গৌণার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।]

"যখন এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে," ইত্যাদি (বৃহঃ ৩.২.১৩)। এই শ্রুতিটি হইতেই জানিতে পারা যায় যে, মৃত্যুর সময়ে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতার মধ্যে লীন হইয়া যায়। এবং সেইজন্যই ইহা বলা যায় না যে, ইন্দ্রিয়সমূহ জীবের অনুগমন করে। এই সূত্রটি ঐ মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, এইরূপ ব্যাখ্যায় বহু শ্রুতিরই বিরোধিতা করা হইবে— যে-সকল শ্রুতি বিশেষভাবেই বলে যে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়গণও গমন করিয়া থাকে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শ্রুতিটি উল্লেখ করা যায়: "তিনি উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে; প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়" (বৃঃ ৪.৪.২)। সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিটিকে অবশ্যই গৌণার্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যেমনভাবে "কেশ সমুদয় বনস্পতি সকলে—" (বৃঃ ৩.২.১৩)-কে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব হি, উপপত্তেঃ ॥৩।১।৫॥

প্রথমে (হবন ক্রিয়ার প্রথমে) অশ্রবণাৎ (উল্লেখ নাই বলিয়া) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) তাঃ এব (শুধুমাত্র তাহাই [জলই]) হি (কারণ) উপপত্তেঃ (যথাযথ হইবে বলিয়া)।

৫. যদি হবন ক্রিয়ার প্রথমে (জলের) উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হয়, (তাহার উত্তরে আমরা বলিব), না তাহা হইতে পারে না; কারণ তাহাই (অর্থাৎ জলই) একমাত্র (শ্রদ্ধা শব্দদ্বারা বুঝানো হইয়াছে) কারণ (এইরূপ ব্যাখ্যাই) সঙ্গত।

[৫. দেবতাদিগের হবনীয়দ্রব্যে জলের উল্লেখ নাই— শ্রদ্ধারই উল্লেখ আছে, অতএব জীবের সহিত জলের গমন বুঝা যায় না— এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, এখানে 'শ্রদ্ধা' শব্দদ্বারা জলকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।]

এখানে এই বলিয়া একটা আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে— "দেবগণ উক্ত অগ্নিকে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন" (ছাঃ ৫.৪.২)। এই শ্রুতিতে প্রথম আহুতিরূপে শুধুমাত্র শ্রদ্ধারই (বিশ্বাস) উল্লেখ আছে, জলের উল্লেখ নাই; জলের পরিবর্তে শ্রদ্ধার উল্লেখ

করা হইয়াছে— এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক। তাই, ইহা কিভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইবে "যে পঞ্চম আহুতিতে জলকে বলা হয় মানুষ"? এই সূত্রটি বলিতেছে যে 'শ্রদ্ধা' শব্দদ্বারা জলকেই বুঝিতে হইবে, একমাত্র তাহা হইলেই এই সমগ্র শ্রুতি অংশেরই একটা অর্থগত সামঞ্জস্য অবিঘ্নিত থাকে। তাহা না হইলে প্রশ্ন এবং উত্তরে কোন সংগতি থাকিবে না। উপরন্তু শ্রদ্ধা (বিশ্বাস)— যাহা হইল একটা মানসিক গুণ তাহাকে আহুতিস্বরূপ প্রদান করা যায় না। শ্রুতিতেও জলকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে: "শ্রদ্ধা-ই হইল জল" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১.৬.৮.১)।

অশ্রুতত্বাদিতি চেৎ, ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ।।৩।১।৬।।

অশ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিতে উল্লেখ নাই বলিয়া) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়), ন (না, তাহা নহে) ইষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞকারিগণকে) প্রতীতেঃ (বুঝিতে পারা যায় বলিয়া)।

৬. যদি এইরূপ বলা হয় যে, যেহেতু শ্রুতিতে (জীবের) কোন উল্লেখ নাই (সেইজন্য জীব জলাদি পরিবৃত হইয়া গমন করে না); ইহার উত্তরে আমরা বলিব— না, তাহা নহে; কারণ (শ্রুতি হইতে) ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যে-সকল জীব যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে (শুধুমাত্র তাহারাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে)।

[৬. জলের সহিত জীবের গতি শ্রুতিতে নাই, অতএব ঐরূপ বলিতে পার না, যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তাহা হইলে বলিব— ছান্দোগ্য উপনিষদে ইষ্টাপূর্তকারিগণের চন্দ্রলোকে গমনের কথা উল্লিখিত আছে।]

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৫.৩.৩) শুধুমাত্র জলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু জীবের কোন উল্লেখই নাই; এবং এই জল কিভাবে মনুষ্য হয় তাহাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, জীব জলাদি সমন্বিত হইয়া উৎক্রমণ করে এবং তারপর পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে? এই সূত্রটি এই আপত্তিকেই খণ্ডন করিতে গিয়া বলিতেছে যে, যদি আমরা সমগ্র শ্রুতিটিকে বিচার করিয়া— " আর যে-সকল গ্রামবাসী (গৃহস্থ) ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে (অধিদেবতাকে) প্রাপ্ত হন"... "চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন" (ছাঃ ৫.১০.৩-৪)— এই জাতীয় শ্রুতিগুলির পর্যালোচনা করি যাহাতে চন্দ্রলোকে গমন বিষয়ের বর্ণনা আছে তাহা হইলে আমরা

দেখিতে পাইব যে— যে-সকল জীব এই সকল সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে শুধুমাত্র তাহারাই স্বর্গে গমন করে এবং স্বর্গাদিগমনকালে তাহারা জলের দ্বারা আবৃত হইয়াই গমন করে— এবং এই জল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত দধি ইত্যাদি বস্তু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়— এই দধি ইত্যাদির আহুতিই অপূর্ব-নামীয় একটি সূক্ষ্ম অবয়ব গ্রহণ করে এবং তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে।

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥

ভাক্তং (গৌণ অর্থে) বা (কিন্তু) অনাত্মবিত্ত্বাৎ (যেহেতু জীবগণ আত্মজ্ঞানী নহে) তথা (এইরূপ) হি (কারণ) দর্শয়তি (শ্রুতি শাস্ত্রে আছে)।

৭. কিন্তু (জীবগণ স্বর্গে দেবতাদের অন্নস্বরূপ হওয়ার ব্যাপারটি যে উল্লেখ করা হইয়াছে), (তাহা) গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ তাহারা আত্মাকে জ্ঞাত নহে; এবং যেহেতু ইহা (শ্রুতি) শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে।

[৭. (ইষ্টাপূর্তকারী) জীবগণ দেবতাদের অন্ন হন— এই উক্তি মুখ্য নহে, গৌণ; কারণ তাহারা অনাত্মজ্ঞ, তাই শ্রুতি তাহাদিগকে পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন।]

শ্রুতিতে এইরূপ আছে যে, যাহারা স্বর্গে গমন করে তাহারা দেবতাগণের অন্ন হয়; তাহা হইলে তাহারা স্বর্গে কিভাবে সুকৃতির ফল ভোগ করিতে পারে? "ইনিই (চন্দ্রমাই) রাজা সোম। ইনি দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইঁহাকে ভক্ষণ করেন"— (ছাঃ ৫.১০.৪)। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এখানে 'অন্ন' শব্দটি মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু আলঙ্কারিক অর্থে উপমা হিসাবে 'ভোগের বস্তু'— এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা না হইলে স্বর্গগামী জীবের ভাগ্য যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে কে স্বর্গে যাইতে উৎসাহী হইবে?— সেইক্ষেত্রে "যাহারা স্বর্গে গমনে ইচ্ছুক, তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে"— এই জাতীয় শ্রুতি নিরর্থক হইয়া যায়। তাই, শাস্ত্রের অর্থকে এইভাবে বুঝিতে হইবে— মানুষের নিকট যেমন স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু, সেইরূপ দেবতাদের নিকট জীবগণও প্রিয় ভোগ্য বস্তু। এইভাবেই জীবগণ দেবতাগণকে আনন্দ দান করিয়া নিজেরাও দেবতাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিয়া সুখী হয়। তাহারা যে দেবতাগণের ভোগ্য তাহা এই জাতীয় শ্রুতি হইতে জানা যায়— "যিনি অন্যদেবতাকে যখন আরাধনা করেন,... দেবতাগণের নিকট তিনি যেন পশুরই সদৃশ। ঠিক যেমন বহু পশু ব্যক্তি বিশেষকে পালন করে, তেমনি প্রতি ব্যক্তি দেবগণকে পালন করে।" (বৃহঃ ১.৪.১০)

সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, জীব যখন তাহার সৎকর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে, তখন সে সকল উপাদানের সূক্ষ্ম ভাগ দ্বারা আবৃত হইয়াই গমন করে।

অধিকরণ ২ : জীব ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল লইয়াই স্বর্গ হইতে অবতরণ করে— এই কর্মফলই তাহার জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্, দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ যথেতমনেবং চ ॥৩।১।৮॥

কৃতাত্যয়ে (সুকৃতির ফল শেষ হইলে পর) অনুশয়বান্ (অবশিষ্ট কর্মফলসহ) দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ (ইহা এইরূপভাবেই শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়) যথা ইতম্ (যেমন [ইহা] গমন করিয়াছিল) অনেবং (অন্যভাবে) চ (ও বটে)।

৮. সৎকর্মের ফলভোগ শেষ হইলে পর (জীব) তাহার ভুক্তাবশিষ্ট কর্মসহ (এই পৃথিবীতে নামিয়া আসে)— ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় হইতেই জানা যায়। যে পথে সে গিয়াছিল সেই পথে এবং অন্য ভাবেও সে ধরাধামে নামিয়া আসে।

[৮. শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায় যে, জীব যে-পথে চন্দ্রলোকে গিয়াছিল, কর্মফল ভোগের পর পুনরায় সেই পথেই এবং অন্যভাবেও ভুক্তাবশিষ্ট কর্মসহ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে।]

এখানে একটি নূতন আলোচ্য বিষয়ের সূচনা করা হইয়াছে— বিষয়টি হইল স্বর্গ হইতে জীবের অবতরণ। প্রশ্ন হইল, জীব কোন ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল লইয়া মর্তে আসে কি না? বিরুদ্ধপক্ষ বলেন যে, ভুক্তাবশিষ্ট কোন কর্ম থাকে না, কারণ শ্রুতিতে আছে— "কর্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন সেইরূপেই...তাঁহারা পুনর্বার ফিরিয়া আসেন...ইত্যাদি" (ছা: ৫.১০.৫)। ইহার অর্থ হইল এই যে, তাহার সকল কর্মফলই নিঃশেষিত হইয়া যায়— কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অধিকন্তু এইরূপ চিন্তা করাই যুক্তিযুক্ত যে, এক জীবনে কৃত কর্মই (মানুষ হিসাবে)— পরজীবনে দেবতা হিসাবে উপভুক্ত হইয়া থাকে।

এই সূত্রটি উক্ত মতবাদকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলে যে, যে কর্মফলটি জীবকে স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম দিয়াছিল শুধু সেই কর্মফলটিই নিঃশেষিত হয়, কিন্তু এই কর্মফল

ভোগাবসানের পরও, অবশিষ্ট ভাল বা মন্দ কর্মফল তাহাকে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনে। তাহা না হইলে, একটি নবজাত শিশুর সুখ দুঃখের ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাও সম্ভবপর নহে যে, এক জীবনেই পূর্বজন্মকৃত সমগ্র কর্মফল নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। কেন না একটি লোক হয়তো যজ্ঞাদি শুভকর্ম করিয়াছিল যাহার ফলে সে দেবতা হইয়া পরলোকে জন্ম নিল, আবার হয়তো সে এমন মন্দ কর্মও করিয়াছিল যাহা ভোগ করিতে তাহার পশু-দেহের প্রয়োজন। এবং একই জীবনে একই সঙ্গে উভয় কর্মের ফলভোগকে নিঃশেষ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যদি স্বর্গাদি ভোগের দ্বারা যজ্ঞাদি শুভকর্মের ফল নিঃশেষ হইয়াও যায়, তাহা হইলেও সঞ্চিত এমন কিছু কর্মফল থাকিয়া যায় যাহার অনুসারে জীব পুনরায় ভাল বা মন্দ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রুতি বলেন— "যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত শুভ কর্মফল আছে তাঁহারা কোন শুভপরিবেশে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করেন"—(ছাঃ ৫.১০.৭)। স্মৃতিতেও আছে "তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফলের দ্বারা তাঁহারা অভিজাত স্থানে, বর্ণে এবং বংশে সুন্দর দেহকান্তি, দীর্ঘায়ু, জ্ঞান, বিত্ত, সুখ এবং মেধাসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।" সুতরাং জীব ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। জীব কোন্ পথে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়?— যে পথে সে স্বর্গে গমন করিয়াছিল সেই পথেই নামিয়া আসে, তবে কিছু পার্থক্যও থাকে। তাহারা যেই পথে ঊর্ধ্বলোকে গিয়াছিল সেই পথেই যে নামিয়া আসে তাহা পথের ধূম্রময়তা এবং আকাশের উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায় (ছাঃ ৫.১০.৫ দ্রষ্টব্য), এবং এই পথের অন্যথাও যে হইতে পারে তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রুতিতে রাত্রি ইত্যাদির উল্লেখ বর্জন করা হইয়াছে (ছাঃ ৫.১০.৩ দ্রষ্টব্য), কিন্তু আবার কুজ্ঝটিকা ইত্যাদির উল্লেখও আছে (ছাঃ ৫.১০.৬ দ্রষ্টব্য)।

চরণাদিতি চেৎ, ন, উপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ।।৩।১।৯।।

চরণাৎ (আচরণ হেতু) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে), উপলক্ষণার্থ (লক্ষণার্থ বুঝাইবার জন্য) ইতি (এইরূপ) কার্ষ্ণাজিনিঃ (কার্ষ্ণাজিনি মুনি) (মনে করেন)।

৯. যদি এইরূপ বলা হয় যে, আচরণ বা চর্যার জন্যই (পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফলের অনুমান করার কোন প্রয়োজন হয় না), (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) — না, এইরূপ নহে (কারণ 'চরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে) লক্ষণার্থে (ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফলকে বুঝাইতে)। ইহা ঋষি কার্ষ্ণাজিনির মত।

[৯. 'চরণ' অর্থ আচরণ-চর্যা, অতএব পূর্ব সিদ্ধান্ত ঠিক নহে— না, এইরূপ বলা যায় না; কারণ মুনি কার্ষ্ণাজিনির মতে এখানে 'কর্ম' অর্থেই চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।]

পূর্বে উল্লিখিত শ্রুতিতে (ছাঃ ৫.১০.৭) বলা আছে যে, 'শুভকর্মফলসম্পন্ন' জীবেরাই শুভজন্ম প্রাপ্ত হয়। এখন বক্তব্য হইল— 'চরণ' বা চর্যা হইল ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বস্তু, এমনকি শ্রুতিও ইহাদের ভিন্ন বলিয়াছেন (বৃহঃ ৪.৪.৫ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু শ্রুতি ভুক্তাবশিষ্ট কোন কর্মের উল্লেখ করেন নাই, সেইজন্য জীব কোন কর্মফলের সহিত জন্মগ্রহণ করে না, (শুভ) আচরণই হইল শুভজন্মের হেতু। ইহাই হইল প্রধান আপত্তি। এই সূত্রটি এই আপত্তিরই খণ্ডন করিয়াছে এই বলিয়া যে, এখানে চরণ শব্দকে শুভ কর্মফলরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা একটি অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্ত— এখানে চরণকে কর্মফল হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে— কারণ শুভ কর্মফল শুভ আচরণের উপরই নির্ভরশীল। ইহা ঋষি কার্ষ্ণাজিনির অভিমত।

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥

আনর্থক্যম্ (অর্থের বিপর্যয়— অসঙ্গতি) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না, তাহা হইতে পারে না), তদপেক্ষত্বাৎ (তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা হেতু)।

১০. যদি এইরূপ বলা হয় যে ('চরণ' এই শব্দটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে শুভ আচরণ হইয়া পড়িবে) (যাহা) উদ্দেশ্যবিহীন, (ইহার উত্তরে আমরা বলিব)— না, এইরূপ হইতে পারে না— যেহেতু (শুভ কর্মফল) (শুভ আচরণের) উপরই নির্ভরশীল।

[১০. যদি বলা হয় যে, পূর্বোক্ত অর্থে 'চরণ' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিলে সদাচার বিধান নিরর্থক হয়— তাহার উত্তরে আমরা বলিব— শ্রৌত এবং স্মার্ত সকল কর্মই তো সদাচারের অপেক্ষা করে।]

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়— যদি 'চরণ' শব্দটিকে লক্ষণার্থে 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়— এবং ইহার মুখ্য অর্থকে বর্জন করা হয়— তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনে সদাচার অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা থাকে না; এবং যেহেতু সদাচারের কোন নিজস্ব ফল নাই, ইহা নূতন জন্মগ্রহণের শুভের কারণও হইতে পারে না। এই সূত্রটি এই বলিয়া এই আপত্তিকে খণ্ডন করিতেছে যে— যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, শুধুমাত্র তাঁহারাই বেদবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অধিকারী। "আচারহীনং

ন পুনন্তি বেদাঃ— বেদও আচারহীনকে পবিত্র করিতে পারে না"। এইরূপভাবে সদাচার হইল শুভকর্মের সহায়ক এবং এইজন্যই ইহার সার্থকতা আছে। সুতরাং ইহাই হইল কার্ষ্ণাজিনির মত যে, কর্মফলই হইল নব জন্মের হেতু, আচরণ নহে।

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥

সুকৃতদুষ্কৃতে (শুভ এবং অশুভ কর্ম) এব (মাত্র) ইতি (এইরূপ) তু (কিন্তু) বাদরিঃ (বাদরি মুনি)।

১১. কিন্তু (আচরণ) হইল শুভ এবং অশুভ কার্য মাত্র; এইরূপ অভিমত (ঋষি) বাদরি (পোষণ করেন)।

[১১. 'চরণ' শব্দের অর্থ পুণ্য এবং পাপ উভয়ই—ইহা হইল বাদরি মুনির মত।]

এই সূত্রটি বলিতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে, সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় 'আচরণ' এবং 'কর্মের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন যজ্ঞাদি কার্য অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বলে "সেই ব্যক্তিটি সদাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে"— ইহার দ্বারা 'আচরণ' শব্দটিকে সাধারণ (শুভ) কর্মের অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ 'সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি' বলিতে বুঝায় যাঁহার কর্ম প্রশংসনীয়।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যাঁহারা যজ্ঞাদি শুভ কর্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে যান, তাঁহাদের এই জগতে পুনর্জন্মের কারণরূপে 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল' থাকে।

অধিকরণ ৩: যে-সকল জীবের কর্মফল চন্দ্রলোক গমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, মৃত্যুর পর তাহাদের কি গতি হয়?

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩।১।১২॥

অনিষ্টাদিকারিণাম্ (যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে না তাহাদের) অপি (এমনও কি) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে)।

১২. শ্রুতিশাস্ত্র ঘোষণা করেন যে, (চন্দ্রলোকাদিতে গমন ইত্যাদি) তাহাদেরও আছে যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ইত্যাদি না-ও করে।

[১২. অনিষ্টকারীরাও চন্দ্রলোকে গমন করে— কারণ এইজাতীয় উল্লেখ কৌষিতকী উপনিষদে আছে।]

এখন, যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের কি গতি হয়— সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত হইল যে, তাহারাও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, যদিও তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের ন্যায় সুখ সম্ভোগ নাও করিতে পারে— কারণ তাহাদেরও নূতন জন্মগ্রহণের জন্য পঞ্চম আহুতির প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ শ্রুতিবচনও আছে যে, তাহারা সকলেই স্বর্গে যায়। "ইহলোক হইতে যাহারা উৎক্রমণ করে তাহাদের সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে" (কৌঃ ১.২)।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ, তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥৩।১।১৩॥

সংযমনে (যমালয়ে) তু (কিন্তু) অনুভূয় (অনুভব করিয়া) ইতরেষাম্ (যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যতীত অপরের) আরোহাবরোহৌ (আরোহণ এবং অবরোহণ) তদ্‌গতি-দর্শনাৎ (এইজাতীয় উক্তি শ্রুতিশাস্ত্রে আছে বলিয়া)।

১৩. কিন্তু অন্যদের (অর্থাৎ যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে নাই) তাহাদের গতি হয় যমলোকে, এবং সেখানে তাহাদের (মন্দ কার্যের ফল ভোগ করার পর) (পুনরায় ইহলোকে) অবতরণ হয়। (অনিষ্ট আচরণকারীদের) সম্পর্কে এইরূপ একটি শ্রুতি শাস্ত্রে উল্লেখ থাকার জন্য (জানা যায়)।

[১৩. অনিষ্টকারী ব্যক্তি যমলোকে গমন করে; কারণ অনিষ্টকারীর সংযমী নামক যমপুরে যাওয়ার কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে।]

এই সূত্রটি পূর্ববর্তী সূত্রটির মতকে খণ্ডন করিতেছে এবং বলিতেছে যে, অনিষ্টকারীরা স্বর্গে গমন করে না, কিন্তু যমালয়ে গমন করে; সেখানে যমালয়ে তাহারা কর্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করে। "মোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না ... এইরূপে মানুষ পুনঃপুনঃ আমার (মৃত্যুর) অধীনতা প্রাপ্ত হয়"— (কঠ ১.২.৬)। চন্দ্রলোকে আরোহণ শুধুমাত্র শুভকর্মের ফল ভোগেরই জন্য— অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। সুতরাং অনিষ্টকারিগণ চন্দ্রলোকে যায় না।

স্মরন্তি চ ॥৩।১।১৪॥

স্মরন্তি (স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে) চ (ও)।

১৪. স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ ঘোষণা আছে।

[১৪. স্মৃতিশাস্ত্রেও (যথা মনু প্রভৃতি) পাপীদের নরক গমনের কথা দৃষ্ট হয়।]

মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র বলেন যে, পাপাচারী ব্যক্তিগণ নরকে গিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

অপি চ সপ্ত ॥৩।১।১৫॥

অপি চ (অধিকন্তু) সপ্ত (সাতটি)।

১৫. অধিকন্তু সাতটি (নরকের কথা উল্লেখ আছে)।

[১৫. অধিকন্তু পাপীদের ভোগের জন্য সাতটি নরক আছে।]

পুরাণে সাতটি নরকের কথা আছে। অনিষ্টকারিগণকে তাহাদের কষ্টভোগের মাধ্যমে পাপমুক্ত করার জন্য এই সকল নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥

অত্র (সেখানে) অপি (ও) চ (এবং) তৎ-ব্যাপারাৎ (তাহার কর্তৃত্ব হেতু) অবিরোধঃ (কোন বিরোধ নাই)।

১৬. এবং যেহেতু সেখানেও (সপ্ত নরকে) যমের শাসন আছে— সেইজন্য কোন বিরোধ নাই।

[১৬. এই সকল নরকেও যমের কর্তৃত্ব থাকার জন্য পূর্ব বাক্যের সহিত কোন বিরোধ নাই।]

এখানে এইরূপ একটি আপত্তি দেখা দেয় যে, যেখানে শ্রুতিতে আছে যে— সকল পাপীই যমের নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত হয়— সেখানে, রৌরব নামক নরকে, যেখানকার অধিদেবতা হইলেন চিত্রগুপ্ত— পাপীরা কিরূপে যমের শাস্তি পাইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এখানে কোন বিরোধ নাই, কারণ চিত্রগুপ্তও যমের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হন।

বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥

বিদ্যাকর্মণোঃ (জ্ঞানের এবং কর্মের) ইতি (এইরূপ) তু (কিন্তু) প্রকৃতত্বাৎ (তাহারা আলোচ্য বিষয় বলিয়া)।

১৭. কিন্তু (দুইটি যানের যে উল্লেখ আছে) বিদ্যা এবং কর্ম; এইরূপে (আমাদের বুঝিতে হইবে) যেহেতু তাহারাই হইল এখানকার আলোচ্য বিষয়বস্তু।

[১৭. পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন হয় না, কারণ, বিদ্যাদ্বারা দেবযান এবং কর্মের দ্বারা পিতৃযান প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।]

"(শাস্ত্রীয় কর্মাদি হইতে বিমুখ জীবগণ) এই উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না। সেই জীবগণ 'জন্মাও ও মর' এই ঈশ্বরাদেশক্রমে পুনঃপুনঃ (সংসার চক্রে) ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক (স্বর্গ) পরিপূর্ণ হয় না"— (ছাঃ ৫.১০.৮)। এই শ্রুতিতে যে দুইটি যানের (মার্গের) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বিদ্যা এবং কর্ম এই দুইটিকেই বুঝিতে হইবে— কারণ যেহেতু ইহারাই হইল এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তু। বিদ্যা এবং কর্মই হইল দেবযান এবং পিতৃযানের মাধ্যমে অতিক্রম করিবার উপায়। যাহারা বিদ্যার দ্বারা দেবযানের মাধ্যমে দেবলোকে যাইবার অথবা যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা পিতৃলোকে যাইবার অধিকারী নহে, শ্রুতি তাহাদের জন্য তৃতীয় একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন— এই স্থানটি ব্রহ্মলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। অনিষ্টকারিগণ যে একটি পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত এবং তাহারা যে স্বর্গে না গিয়া এই তৃতীয় স্থানে যায়— তাহা আরও অধিকতর স্পষ্টভাবেই এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে— "এই কারণেই ঐ লোক (স্বর্গ) কখনও পূর্ণ হয় না" (ছাঃ ৫.১০.৮)। সূত্রের 'তু' শব্দটি বেদের অন্য একটি শাখায় (কৌঃ ১.২ দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত অন্য একটি শ্রুতি বিষয়ে সম্ভাব্য আপত্তিকে খণ্ডন করিতেছে। সুতরাং কৌষিতকী শ্রুতিতে যেখানে বলা হইয়াছে যে, সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন— যে কোন প্রকারেই শুভকর্ম হউক না কেন— তাঁহারাই চন্দ্রলোকে গমন করেন— অনিষ্টকারিগণ ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ন তৃতীয়ে, তথোপলব্ধেঃ ।৩।১।১৮।।

ন (নহে) তৃতীয়ে (তৃতীয়টি-তে) তথা (এইরূপ) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয় বলিয়া— দৃষ্ট হয় বলিয়া)।

১৮. (পঞ্চ আহুতিবিষয়ে বিধানের উল্লেখ) (প্রযুক্ত) নহে তৃতীয় (স্থান) সম্পর্কে, কারণ এইরূপই (শাস্ত্র হইতে) দৃষ্ট হয়।

[১৮. তৃতীয় স্থানে দেহলাভের জন্য পঞ্চমাহুতির প্রয়োজন হয় না— এইরূপ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।]

এই প্রকরণের প্রথম সূত্রে যে ছাঃ ৫.৩.৩ শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বলা আছে যে, জীবগণ পঞ্চ আহুতি প্রদানের পর নবজন্ম লাভ করে। সেইজন্যই, অন্ততপক্ষে একটি নূতন দেহের জন্য, অনিষ্টকারিগণকে পঞ্চ আহুতি ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য— যে ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের নব কলেবর সৃষ্ট হইবে— একবার চন্দ্রলোকে যাইতেই হইবে। এই সূত্রটি বলে যে, পঞ্চ আহুতির বিধানটি অনিষ্টকারিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ, তাহারা পঞ্চ আহুতি প্রদান করিলে বা না করিলেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে— যেহেতু শ্রুতিতেই এইরূপ বলা আছে— 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব'— "জন্মাও এবং মর"। ইহাই হইল তৃতীয় লোক। ঐ বিধানটি শুধু যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স্মর্যতেঽপি চ লোকে ॥৩।১।১৯॥

স্মর্যতে (পুরাণাদি স্মৃতিতে উল্লেখ আছে) অপি (ও) চ (এবং) লোকে (সংসারে— লোকসমাজে)।

১৯. এবং উপরন্তু (পঞ্চ আহুতি ব্যতিরেকেও জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি) লোকসমাজেও পরিজ্ঞাত আছে।

[১৯. মহাভারতাদি শাস্ত্র-প্রমাণে এবং বাস্তব দৃষ্টান্তেও পঞ্চ আহুতির প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।]

অন্য একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলা হইতেছে যে, ভাবি জন্মের জন্য পঞ্চ আহুতির অনুষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। এবং সেই কারণেই, শুধুমাত্র পঞ্চ আহুতি ক্রিয়ার জন্য অনিষ্টকারিগণের স্বর্গে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যে দ্রোণাচার্যের মা ছিলেন না এবং যে ধৃষ্টদ্যুম্নের মা এবং বাবা উভয়েই ছিলেন না— তাঁহাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শেষের দুইটি আহুতি ছিল না। সুতরাং পঞ্চ আহুতির বিধান সকলের জন্য নহে— কিন্তু মাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদেরই জন্য।

দর্শনাচ্চ ॥৩।১।২০॥

দর্শনাৎ (এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া) চ (এবং)।

২০. এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়াও।

[২০. শ্রুতিতে এবং লোক-জগতেও এই ব্যাপার দৃষ্ট হয়।]

এই পঞ্চ আহুতির ব্যাপারটি যে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে তাহা আমরা চারি প্রকার প্রাণিগণের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই। অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রাণিগণের মধ্যে দেখা যায় যে, শেষের দুই প্রকার প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যতীতই জাত হইয়া থাকে— এবং ফলত তাহাদের ক্ষেত্রে পঞ্চ আহুতির কোন প্রসঙ্গই নাই।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥

তৃতীয়-শব্দ-অবরোধঃ (তৃতীয় শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি) সংশোকজস্য (স্বেদজ-দের)।

২১. তৃতীয় শব্দটি (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রাণ) স্বেদজ প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

[২১. উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারাই স্বেদজদের উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।]

পূর্ব সূত্রের বর্ণনা অনুসারে চারি প্রকার প্রাণী আছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬.৩.১) মাত্র তিন প্রকারের উল্লেখ আছে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই— কারণ, স্বেদজ প্রাণিগণ উদ্ভিজ্জেরই অন্তর্ভুক্ত।— কারণ, উহাদের উভয়েই অঙ্কুরিত হইয়া জাত হয়— একটি হয় পৃথিবী হইতে— অপরটি হয় জল ইত্যাদি হইতে।

সুতরাং ইহাই হইল স্থির সিদ্ধান্ত যে, অনিষ্টকারিগণ স্বর্গে গমন করে না— শুধুমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণই স্বর্গগমন করিয়া থাকেন।

অধিকরণ ৪ : চন্দ্রলোক হইতে অবতরণকালে জীব আকাশাদির সহিত অভিন্ন হইয়া যায় না— কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।

তৎসাভাব্যাপত্তিঃ, উপপত্তেঃ ॥৩।১।২২॥

তৎ-সাভাব্য-আপত্তিঃ (তাহাদের সহিত প্রকৃতির সাদৃশ্য লাভ) উপপত্তেঃ (যুক্তি-যুক্ত হয় বলিয়া)।

২২. (জীব যখন চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে) তখন তাহাদের সঙ্গে (আকাশ, বায়ু ইত্যাদির সঙ্গে) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, (একমাত্র ইহাই) যুক্তিযুক্ত (বলিয়া মনে হয়)।

[২২. চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণকালে জীব আকাশাদির সদৃশ হয়। আকাশস্বরূপ হয় না— কারণ সদৃশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।]

শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, সদাচারী জীবগণ যাঁহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করেন তাঁহারা যে-পথ দ্বারা ঊর্ধ্বলোকে গমন করিয়াছিলেন ঠিক সেই পথ দিয়াই অবতরণ করেন, কিন্তু ইহার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। "অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন সেইরূপেই তাঁহারা পুনর্বার ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন; বায়ু হইতে ধূম হন— ইত্যাদি" (ছাঃ ৫.১০.৫)। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই সকল ব্যক্তির আত্মা কি বাস্তবিকপক্ষে আকাশ, ধূম্র ইত্যাদির সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়, অথবা ইহারা একটি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়? এই সূত্রটি বলে যে, জীবগণ তাহাদের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, কারণ ইহা অসম্ভব। ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে কোন বাস্তব অভিন্নতা হয় না। সুতরাং শ্রুতিটির অর্থ হইল এই যে, ইহারা আকাশাদির প্রকৃতিগত একটি সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হয়— আকাশ, বায়ু ইত্যাদির ন্যায় হইয়া যায়। জীব আকাশের ন্যায় একটি সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া বায়ুর অধীনে আসে এবং ধূম্রাদির সহিত সংযুক্ত হয়। সেইজন্যই জীবের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের কথাই এখানে শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে, আকাশাদির সহিত অভিন্নত্বের কথা বলা হয় নাই।

অধিকরণ ৫: জীবের চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে ক্ষণমাত্র সময়ের প্রয়োজন হয়।

নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥৩।১।২৩॥

ন (নহে) অতিচিরেণ (খুব দীর্ঘ সময়ে), বিশেষাৎ (এই বিষয়ে বিশেষ শ্রুতি আছে বলিয়া)।

২৩. (জীবের চন্দ্রলোক হইতে যাত্রা করিয়া বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিতে) খুব দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু এই বিষয়ে একটি বিশেষ শ্রুতি আছে (যাহাতে বলা আছে স্তরগুলির কথা এবং সময়ের কথা)।

[২৩. শ্রুতি বলেন জীবের চন্দ্রলোক হইতে নানা অবস্থার (ব্রীহি, যব ইত্যাদি) মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিতে বেশি বিলম্ব হয় না। এই বিষয়ে একটি বিশেষ শ্রুতি আছে।]

এখন একটি প্রশ্ন উঠে যে, অবতরণকারী এই জীবাত্মা যখন আকাশ, বায়ু ইত্যাদির সহিত সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হয় তখন কি উহা বেশ দীর্ঘকালই ঐ অবস্থায় থাকে, না শীঘ্রই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, জীবাত্মা অতিশীঘ্রই এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া চলে। "অনন্তর উক্ত (ক্ষীণকর্মা)

জীবগণ এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ ইত্যাদিরূপে জাত হন। এই ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য"— (ছাঃ ৫.১০.৬)। এইরূপে পৃথিবীতে বৃষ্টির মাধ্যমে অবতরণের পর পরিবর্তনের স্তরগুলিকে শ্রুতি কঠিন বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারাই শ্রুতি ইঙ্গিতে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী স্তরগুলির অতিক্রমণ সহজ এবং ইহা দ্রুতই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধিকরণ ৬ : জীবগণ যখন নক্ষত্রলোকে প্রবেশ করে, তখন তাহারা শুধুমাত্র তাহাদের সংস্পর্শে আসে কিন্তু তাহাদের জীবনের কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় না।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববৎ, অভিলাপাৎ ॥৩।১।২৪॥

অন্য-অধিষ্ঠিতে (অন্যের দ্বারা শাসিত বস্তুতে) পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) অভিলাপাৎ (এইরূপ শ্রুতিবচন হেতু)।

২৪. (অবতরণকারী জীবাত্মা প্রবেশ করে) অন্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত (জীবে) যেমন পূর্ব পূর্ব ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদির সমানাকার হইবার সময়);কারণ, এইরূপই শ্রুতি বলেন।

[২৪. জীব ব্রীহি ইত্যাদি রূপ প্রাপ্ত হয় বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ হইল সেই সেই ব্রীহিতে অবস্থান হয় মাত্র, কারণ শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে আকাশাদি সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে, ব্রীহির সম্বন্ধেও সেইরূপই উল্লেখ আছে।]

এখন একটি তত্ত্বের অবতারণা করা হইতেছে। জীবের ব্রীহি ইত্যাদির মাধ্যমে অতিক্রমণ পূর্ববর্তী আকাশাদির মাধ্যমে অতিক্রমণের ন্যায় একটি বাহ্য সম্পর্কমাত্র নহে, কিন্তু জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রীহি ইত্যাদি আকারে জন্মগ্রহণ করে। কারণ, শ্রুতিতেই এইরূপ উল্লেখ আছে— "তারপর ইহা (জীবাত্মা) ব্রীহিরূপে জাত হয় ইত্যাদি", (ছাঃ ৫.১০.৬)। ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়, কারণ যাঁহারা স্বর্গে তাঁহাদের সুকৃতির ফল নিঃশেষে ভোগ করিয়া মর্তলোকে পতিত হন, তাঁহাদের পশুহত্যাদি অবশিষ্ট দুষ্কৃতির ফল ভোগ করার নিমিত্ত গুল্ম বৃক্ষাদিরূপেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

সুতরাং 'জাত' এই শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই সূত্রটি এই অভিমতকে খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছে যে, 'জাত' এই শব্দটিকে শস্য-গুল্মাদির সহিত সংস্পর্শ-মাত্র রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে— কারণ ঐগুলি পূর্ব হইতেই অন্য

জীবাত্মার দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া এইরূপভাবেই জাত হইয়া আছে। কারণ এই অবস্থাগুলির মধ্যে তাহাদের কৃত কোন কর্মের উল্লেখ নাই— যেমনটি আকাশাদি অবস্থায় ছিল। তাহারা এই সকল উদ্ভিজ্জে কোন কর্ম ব্যতিরেকেই প্রবেশ করে, এবং যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে ততক্ষণ— তাহারা কোন কর্মফলই ভোগ করে না। যেখানেই মুখ্যার্থে জন্মগ্রহণ ঘটে এবং কর্মফল ভোগের আরম্ভের উল্লেখ থাকে— সেখানে স্পষ্টতই কোন কর্মের উল্লেখ থাকিবে। যেমন, এই শ্রুতিটিতে— "যাঁহাদের শুভকর্মফল আছে, তাঁহারা শীঘ্রই শুভজন্মলাভ করিবে" (ছাঃ ৫.১০.৭)। সুতরাং অবতরণকারী জীবাত্মা অন্য জীবাত্মার দ্বারা (সঞ্জীবিত) প্রাণবন্ত বৃক্ষাদির মধ্যে যেন অবস্থান মাত্র করে— যে পর্যন্ত না তাহারা নূতন কোন জন্মের সুযোগ পায়।

অশুদ্ধমিতি চেৎ, ন, শব্দাৎ ॥৩।১।২৫॥

অশুদ্ধম্ (পাপ) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না, এইরূপ হইতে পারে না), শব্দাৎ (শাস্ত্র প্রমাণ হইতে বুঝা যায় বলিয়া)।

২৫. যদি এইরূপ বলা হয় যে (যজ্ঞাদিতে পশু ইত্যাদি বলি হয় বলিয়া) উহা পাপ, (আমরা বলিব) না, ইহা হইতে পারে না— কারণ শাস্ত্র প্রমাণ এইরূপ আছে।

[২৫. যজ্ঞাদি কর্মে পশুবধজনিত পাপ হয় বলিয়া ব্রীহি যবাদি জন্ম হয়— যদি বলা হয় তবে তদুত্তরে বলা যায় যে, না, তাহা নহে, কারণ শ্রুতিতে পশুবধের বিধান আছে— এবং এই কর্মের শুধুমাত্র পুণ্য ফলই হইবে এইরূপই বলা আছে।]

এই সূত্রটি পূর্বসূত্রে উপস্থাপিত বিরোধীদের আপত্তিটির খণ্ডন করিতেছে। আপত্তিটি ছিল যে, জীব যজ্ঞাদিতে পশু হননাদি দুষ্কর্মের পাপে লিপ্ত হইয়াই বৃক্ষগুল্মাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞে পশুহননাদি দ্বারা যজ্ঞকর্তার কোন পাপ বা অশুভ কর্মফলের সৃষ্টি হয় না— কারণ শাস্ত্রের দ্বারা ইহা অনুমোদিত।

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥৩।১।২৬॥

রেতঃ-সিক্-যোগঃ (জন্মদানক্রিয়া সক্ষম জীবের সহিত সংযোগ) অথ (তাহার পর)।

২৬. অতঃপর (জীব প্রাপ্ত হয়) জন্মদানক্রিয়া-সক্ষম জীবের সহিত সংযোগ।

[২৬. চন্দ্রলোক-প্রত্যাগত জীব ধান্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পর যাহারা শুক্রনিষেক করিয়া জন্মদান করিতে সমর্থ তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়।]

"(সন্তান উৎপাদনে সমর্থ) যে কেহ ঐ (ব্রীহি প্রভৃতি) অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে কেহ সন্তানোৎপাদন করে, জীব তাহারই আকার গ্রহণ করিয়া জাত হন"—ইত্যাদি (ছাঃ ৫.১০.৬)। এখানে জীবের পক্ষে যথার্থই ব্যক্তির সহিত অভিন্ন হওয়া অসম্ভব— জীব ইহার সংস্পর্শে আসে— ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, জীবের পক্ষে অব্যবহিত পূর্বজন্মে বৃক্ষাদি হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল ইহাদের সংস্পর্শে আসামাত্র— ইহাদের আকারে যথার্থই জন্মগ্রহণ করা নহে।

যোনেঃ শরীরম্ ।।৩।১।২৭।।

যোনেঃ (গর্ভ হইতে) শরীরম্ (শরীর ধারণ)।

২৭. গর্ভ হইতেই একটি (নূতন) দেহের (জন্ম হয়)।

[২৭. যোনিকে (গর্ভকে) আশ্রয় করিয়াই জীব স্বীয় ভোগায়তনদেহ লাভ করে।]

পরিশেষে জীবের প্রকৃত জন্ম কিভাবে হয় তাহা এই সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন পর্যন্ত জীব পরপর অবস্থার সঙ্গে একটা সংযোগমাত্র প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু পরিশেষে জীবাত্মা একজন সন্তান-উৎপাদনসক্ষম (রেতঃসিঞ্চনকারী) পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া নারীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং সেখানে একটি নূতন দেহ লাভ করে, যে দেহ পূর্ব-কৃত-কর্মের ভুক্তাবশিষ্ট ফল ভোগ করার জন্য সমর্থ।

ব্রহ্ম-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায় । দ্বিতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে জীবের বিভিন্ন লোকে উৎক্রমণ এবং ইহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কর্মাদিমূলক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা জীবাত্মার এইরূপ দশার কথা বিবেচনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। এই সকল 'ইহামূত্রফলভোগবিরক্ত' মানুষকে বেদের মহান উক্তি 'মহাবাক্যের' তাৎপর্য (উপলব্ধি করাইবার জন্য এই পাদের সূত্রগুলির বিশেষ প্রচেষ্টা হইবে। 'তত্ত্বমসি'— এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' এবং 'ত্বম্'-এর যথার্থ তাৎপর্য) এবং স্বরূপ কি তাহা এই পাদে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। পূর্ববর্তী পাদে জীবের (ত্বম্-এর) জাগ্রৎ অবস্থাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন, এই পাদে জীবের স্বপ্নাবস্থাটিকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হইতেছে; এবং ইহাই প্রমাণ করা হইবে যে, জীবাত্মা হইলেন স্বয়ং-প্রাজ্ঞ। এইভাবে জীবাত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি— এই তিন অবস্থাকেই ভ্রান্তি মাত্র বলিয়া উপস্থাপিত করা হইবে। এবং পরিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ ফলশ্রুতির হইবে প্রতিষ্ঠা।

অধিকরণ ১ : স্বপ্নাবস্থায় জীব।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥

সন্ধ্যে (মধ্য অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তির মধ্যাবস্থায়— অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়) সৃষ্টিঃ (প্রকৃত) (সৃষ্টি) আহ— (শ্রুতি বলেন) হি (যেহেতু)।

১. মধ্যবর্তী অবস্থায় (জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে) (যথার্থ) সৃষ্টি হইয়া থাকে, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে।

[১. শ্রুতিতে স্বপ্নাবস্থায় যে রথাদি সৃষ্টির উল্লেখ আছে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই তাহার কর্তা, কারণ শ্রুতিতে অনুরূপ বাক্য আছে।]

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে— আমরা স্বপ্নাবস্থায় যে সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করি, তাহা কি আমাদের এই বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ন্যায় সত্য, না বাস্তব জগতের জাগ্রৎ অবস্থার তুলনায় ইহা মায়া বা ভ্রান্তি মাত্র। এই সূত্রটিতে বিরুদ্ধপক্ষেরই মত

ব্যক্ত হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদিরা বলেন যে, ইহা প্রকৃত বাস্তবেরই অনুরূপ— কারণ শ্রুতিতে এইরূপ আছে— "সেখানে রথ থাকে না, অশ্ব থাকে না, পথ থাকে না; অথচ তিনি রথ, অশ্ব ও পথ সকল সৃষ্টি করেন... কারণ তিনি কর্তা" (বৃহঃ ৪.৩.১০)। অধিকন্তু আমরা জাগ্রৎ অবস্থার অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। স্বপ্নাবস্থার ভোজনে ও জাগ্রৎ অবস্থার ভোজনের তৃপ্তিবোধের প্রতিক্রিয়াটি বর্তমান থাকে। সেইহেতু স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টি সত্যই (বাস্তবই)— এবং ইহাও স্বয়ং পরমেশ্বরের আকাশাদি অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় একটি সৃষ্টি।

নির্মাতারং চৈকে, পুত্রাদয়শ্চ ।।৩।২।২।।

নির্মাতারং (নির্মাতারূপে) চ (এবং) একে (বেদের বিশেষ কোন শাখা-অবলম্বিগণ) পুত্রাদয়ঃ (পুত্র প্রভৃতি) চ (এবং)।

২. এবং বেদের কোন কোন (শাখাবলম্বিগণ) (ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে) সৃষ্টিকর্তা হিসাবে (নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের বাঞ্ছিত বস্তুগুলির) এবং (বাঞ্ছিত পদার্থ সেখানে বাস্তব পুত্রাদিরই ন্যায়), বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

[২. কোন কোন শাখার শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদি কাম্যবস্তুর সৃষ্টিকর্তাকে পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।]

বিরুদ্ধবাদিগণ অপর একটি যুক্তি দিয়া বলিতে চান যে, স্বপ্নের সৃষ্টিও পরমেশ্বরেরই নিজস্ব সৃষ্টি। "ইন্দ্রিয়াদি নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ জাগরিত থাকিয়া অভিপ্রেত বিষয় নির্মাণ করিতে থাকেন......তিনিই ব্রহ্ম"(কঠ ২.২.৮)। পুত্রাদি হইল সেই অভিপ্রেত বস্তু যাহা তিনি সৃষ্টি করেন। সুতরাং যেমন জাগ্রৎ অবস্থায় সেইরূপ স্বপ্নেও পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং স্বপ্নজগৎও সত্যই। এইজন্যই স্বপ্নে সৃষ্ট জগৎও মিথ্যা নহে, ইহা আমাদের ব্যবহারিক জগতের ন্যায়ই সত্য।

মায়ামাত্রং তু, কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।।৩।২।৩।।

মায়ামাত্রং (মায়া মাত্র) তু (কিন্তু) কার্ৎস্ন্যেন (সর্বথা, সর্বাংশে) অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ (তাহার স্বরূপ ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া)।

৩. কিন্তু (স্বপ্ন-জগৎ) মায়া মাত্র, কারণ, তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না (জাগ্রত অবস্থার সকল লক্ষণগুলি)।

[৩. কিন্তু স্বপ্নে যে রথাদি কাম্যবস্তু সৃষ্ট হয়, তাহা মায়ামাত্র— কারণ তাহাতে জাগ্রত অবস্থার সকল লক্ষণ থাকে না।]

এখানে 'তু' শব্দটি পূর্ববর্তী দুইটি সূত্রে বর্ণিত মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। স্বপ্ন জগৎটির জাগ্রৎ অবস্থার বাস্তব জগতের সহিত সর্বাংশে সাদৃশ্য নাই— স্থান, কাল, কার্য-কারণ, অ-বিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে স্বপ্নজগৎটি বাস্তব জগতের সহিত একরূপ নহে; এবং সেই কারণেই ঐ জগৎটি বাস্তব জগতের ন্যায় সত্য নহে। স্বপ্নাবস্থায় স্থান, কাল অথবা কার্য-কারণের কোন যথার্থতা থাকিতে পারে না। শরীরের অভ্যন্তরে রথ, অশ্বাদির ন্যায় বস্তুর অবস্থানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্থান নাই— এবং স্বপ্নে জীব দেহকে ত্যাগ করিয়াও যায় না— যদি জীব দেহ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিত, তাহা হইলে ভারতে থাকিয়া আমেরিকার স্বপ্নদর্শনের পর জাগ্রত হইলে জীব নিজেকে আমেরিকাতেই দেখিতে পাইত। অথবা মধ্য রাত্রে স্বপ্নদৃষ্ট সূর্যগ্রহণ— উপযুক্ত সময়ও নহে, অথবা স্বপ্নে দৃষ্ট কোন শিশুর সন্তান-সন্ততি লাভ কখনও সত্য হইতে পারে না। অধিকন্তু, কখন কখনও আমরা স্বপ্নে কোন বস্তুর রূপান্তরলাভও দেখিতে পাই— যেমন হয়তো কোন বৃক্ষ পর্বতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। "তিনি স্বয়ংই রথাদি সৃষ্টি করেন ইত্যাদি"র (বৃঃ ৪.৩.১০) অর্থ হইল এই যে, যে বস্তুর বাস্তব কোন সত্তা নাই তাহা স্বপ্নজগতে বর্তমান থাকিতে পারে— যেমন শুক্তিতে রজত না থাকিলেও উহা আছে বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নজগৎ সত্য, কারণ ইহাও বাস্তবজগতের ন্যায় পরমেশ্বরের সৃষ্টি— এই যুক্তিটি যথার্থ নহে— কারণ, স্বপ্নজগৎটি পরমেশ্বরের সৃষ্টি নহে, ইহা জীবেরই সৃষ্টি। "যখন এই আত্মা স্বপ্নদর্শন করেন তখন তিনি ... নিজেই (এই) দেহকে বিনাশ করিয়া ও (স্বপ্নদেহ) নির্মাণ করিয়া... স্বপ্ন দর্শন করেন"— (বৃহঃ ৪.৩.৯)। এই শ্রুতিবচনটি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, জীবই স্বপ্ন-জগতের সৃষ্টি-কার্য করে— পরমেশ্বর নহেন।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেঃ, আচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ।।৩।২।৪।।

সূচকঃ (শুভাশুভের সূচনাদায়ী) চ (এবং) হি (কারণ) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) আচক্ষতে (বলেন) চ (এবং) তদ্বিদঃ (স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিশেষ জ্ঞানী)।

৪. কিন্তু (স্বপ্নজগৎ মায়া হইলেও) ইহা একটি শুভাশুভের সূচক হিসাবে কার্যকর, কারণ (আমরা এইরূপই দেখিতে পাই) শ্রুতিতে (এবং) স্বপ্নরহস্যবেত্তা পণ্ডিতগণও (এইরূপ) বলিয়া থাকেন।

[৪. স্বপ্ন ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, শ্রুতির এবং স্বপ্ন রহস্যবেত্তা পণ্ডিতগণেরও এইরূপ অভিমত।]

যেহেতু স্বপ্নজগৎ মায়া, সেইজন্য স্বপ্নদৃষ্ট শুভাশুভজ্ঞাপক ইঙ্গিতগুলিও মিথ্যা এইরূপ যেন মনে না করা হয়— সেই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য এই সূত্রটি বলিতেছে যে, স্বপ্ন ভাগ্যের ভাবী শুভাশুভ বিষয়কে পূর্ব হইতেই বলিয়া দিতে সমর্থ। স্বপ্নগুলি হইতে যে-সকল বস্তুর আভাস পাওয়া যায় তাহারা সত্য— যদিও স্বপ্নগুলি স্বকীয়ভাবে মিথ্যাই। যেমন শুক্তিতে রৌপ্যের প্রতীতি যদিও মিথ্যা, তথাপি ইহা আমাদের মধ্যে যে আনন্দ উৎপাদন করে তাহা কিন্তু সত্যই। এই সূত্রটিও তাহাই বলিতেছে: "কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হইবে, তখন ঐ স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম সফল হইবে— ইহা জানিবে" (ছাঃ ৫.২.৮)।

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ ।।৩।২।৫।।

পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারা) তু (কিন্তু) তিরোহিতম্ (অজ্ঞতার দ্বারা যাহা তিরোহিত হইয়াছে) ততঃ (পরমেশ্বর হইতে) হি (যেহেতু) অস্য (জীবের) বন্ধবিপর্যয়ৌ (বন্ধন এবং ইহার বিপরীত—মুক্তি)।

৫. কিন্তু পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারা, যাহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে (অজ্ঞতার দ্বারা— অর্থাৎ পরমাত্মার এবং জীবের সাদৃশ্য— তাহা বিকশিত হয়); কারণ তাঁহা (পরমেশ্বর) হইতেই ইহার (জীবের) বন্ধন এবং মুক্তি।

[৫. পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ঐক্যভাবের অনুভবের আবরণটি (অজ্ঞান) দূর হয়; পরমেশ্বরই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির হেতু (তাঁহার ইচ্ছায়ই ইহা হয়)।

স্বপ্নজগৎ যে মিথ্যা তাহা ইতঃপূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এখন একটি আপত্তি উঠিতেছে। জীব পরমাত্মারই একটি অংশ বটে, সুতরাং ইহার মধ্যেও পরমাত্মার জ্ঞান শক্তি এবং প্রভুত্ব-শক্তি নিহিত আছে— যেমন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যেও অগ্নির সমজাতীয় দাহিকা শক্তিটি আছে। সুতরাং জীবও এইরূপভাবে ইচ্ছামাত্র পরমেশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ। এই সূত্রটি এই মতবাদকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, জীব অবস্থায় অবিদ্যার দ্বারা এই কর্তৃত্ব-শক্তিটি আচ্ছাদিত থাকে, এবং পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভের ফলে এই অবিদ্যা দূর হইলে পর 'আমিই ব্রহ্ম'— 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— এই অনুভবটি হয়। "পরমেশ্বরকে জানিলে সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয় এবং

অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ...। সেই পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে আত্মস্বরূপে ধ্যান করিলে অণিমাদি সর্ব ঐশ্বর্য লাভ হয়"— (শ্বেঃ ১.১১)। ইহার পূর্ব পর্যন্ত জীব তাহার ইচ্ছামত কোন বাস্তব পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। উপরন্তু, এই ক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় না, যেহেতু জীবের বন্ধন এবং মুক্তিও ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই আসে। মূল কথা হইল— পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাই হইল বন্ধনের কারণ, এবং তাঁহার সম্পর্কে জ্ঞানই মুক্তির হেতু।

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩।২।৬॥

দেহযোগাৎ (দেহের সঙ্গে ইহার সংযোগহেতু) বা (এবং) সঃ (তাহা জীবের কর্তৃত্ব-শক্তির আচ্ছাদন) অপি (ও)।

৬. এবং তাহা (জীবের কর্তৃত্বের আচ্ছাদন) ও (আসে) জীবের সহিত দেহের সম্বন্ধহেতু।

[৬. দেহের সহিত সম্বন্ধহেতু (সসীম) জীবের সত্য সঙ্কল্পাদি শক্তি তিরোহিত হয়।]

জীবের কর্তৃত্ব আচ্ছাদিত হইবার কারণটি এখানে বলা হইতেছে।— কারণটি হইল দেহের সহিত ইহার সম্বন্ধ ইত্যাদি। মায়ার ফলস্বরূপ ইহার বিভিন্ন সসীমতা সৃষ্টিকারী উপাধিহেতু ইহার জ্ঞান এবং কর্তৃত্ব-শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে— এবং এই মায়ার আবরণ জীবের উপর ততদিন পর্যন্তই থাকিবে যতদিন জীব নিজেকে ভ্রান্তভাবে দেহাদি বলিয়াই মনে করিবে। সুতরাং যদিও জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, তথাপি ইহার শক্তি প্রচ্ছন্নই থাকে।

অধিকরণ ২ : সুষুপ্তি অবস্থায় জীব।

এখন সুষুপ্তি অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তদভাবো নাড়ীষু, তচ্ছ্রুতেঃ, আত্মনি চ ॥৩।২।৭॥

তৎ-অভাবঃ [তাহার অভাব (স্বপ্নের) অর্থাৎ সুষুপ্তি] নাড়ীষু (নাড়ীর ভিতর) আত্মনি চ (এবং পরমাত্মার মধ্যে) তৎ-শ্রুতেঃ (যেহেতু ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়)।

৭. সেই অবস্থার অবর্তমানে (স্বপ্নাবস্থার— অর্থাৎ যখন সুষুপ্তি আসে) স্নায়ুতে এবং আত্মাতে; এবং ইহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়।

[৭. সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা নাড়ী, পুরীতৎ এবং ব্রহ্ম এই তিনটি পৃথক্ বস্তুর সহিতই মিলিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায়।]

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন অবস্থায় সুষুপ্তি ঘটে বলিয়া উল্লেখ আছে। "জীব যখন নিদ্রায় মগ্ন হয় ... এবং কিছুই জানে না, তখন সে নাড়ীসমূহ অবলম্বনে (হৃদয় আকাশে) প্রবেশ করে"— (ছাঃ ৮.৬.৩)। "সেই নাড়ীসকল অবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি শরীরে অবস্থান করেন" (হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থান করেন) (বৃহঃ ২.১.১৯)। "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ ইনি যখন এইভাবে নিদ্রিত হন... এই যে হৃদয়মধ্যস্থ (পরমাত্মারূপ) আকাশ, তাঁহাতে অবস্থান করেন—" (বৃহঃ ২.১.১৭)। এখন প্রশ্ন হইল, সুষুপ্তি কি এই সকল স্থানের কোন একটিতে সঙ্ঘটিত হয়— অর্থাৎ ইহাদিগকে কি পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা ইহাদিগকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে— এবং তাহারা একটি স্থানকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে বলিয়া মনে করিতে হইবে? বিরুদ্ধপক্ষ মনে করেন যে, যেহেতু স্থান নির্দেশক শব্দগুলিতে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সবকয়টিতেই সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগে অধিকরণেই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে— সেইজন্য তাহারা সমপদস্থ এবং সেইজন্যই বৈকল্পিক। যদি ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বুঝানো হইত তাহা হইলে শ্রুতিতে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ করা হইত। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ইহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই একই স্থানকে নির্দেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

এখানে আর কোন বিকল্প নাই, কারণ যদি আমরা বৈদিক শ্রুতি দুইটির মধ্যে যে কোনটিকে গ্রাহ্য বলিয়া মনে করি তাহা হইলে বেদের প্রামাণিকতাকে দুর্বল করা হইবে— যেহেতু দুইপক্ষের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিলে সাময়িকভাবে অপরটির প্রামাণ্যকে ক্ষুণ্ন করা হয়। আবার যেখানে বিষয়গুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সাধক তাহাদের সমবায়ের ক্ষেত্রেও একই বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— "সে এই প্রাসাদে শয়ন করে, সে খট্টায় শয়ন করে"— এই দুই বাক্যের অধিকরণকে এক করিতে গিয়া আমরা বলিয়া থাকি— "সে এই প্রাসাদে খট্টায় শয়ন করে"। এইভাবেই এখানেও বিভিন্ন শ্রুতিকে সমবেত করিয়াই বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মা নাড়ীর মধ্য দিয়া হৃদয়প্রদেশে গমন করিয়া সেখানে ব্রহ্মে স্থিত হয়।

এখানে এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে কেন আমরা ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে বর্তমান আধার এবং আধেয় সম্পর্ককে উপলব্ধি

করিতে পারি না? ইহার কারণ হইল এই যে, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব ব্রহ্মতেই লীন হইয়া থাকে— যেমন হ্রদের জলে নিমগ্ন একটি জলপূর্ণ ঘট; সেইরূপই জীবের কোন পৃথক্ সত্তা থাকে না। "তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন" (ছাঃ ৬.৮.১)। উপরন্ত, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিতে তিনটি স্থানকে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে— "ইহাদের মধ্যে অবস্থানকারী সেই ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় কোন স্বপ্ন দর্শন করে না। তখন সে একমাত্র প্রাণের (ব্রহ্মের) সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়"— (কৌঃ ৪.১৯)। সুতরাং সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মই হইলেন জীবের বিশ্রামের স্থল।

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩।২।৮॥

অতঃ (সুতরাং) প্রবোধঃ (জাগরণ) অস্মাৎ (ইহা হইতে)।

৮. অতএব ইহা (ব্রহ্ম) হইতেই (জীবের) জাগরণ হয়।

[৮. ব্রহ্ম বা আত্মাই যখন জীবের সুষুপ্তিস্থান, তখন এই আত্মা হইতেই জীবের জাগরণও হইয়া থাকে।]

"ঠিক তেমনি হে সৌম্য, এই জীবগণ সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না, 'আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি'" (ছাঃ ৬.১০.২)। এই উদ্ধৃতিতে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখন জীব সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন সে সৎ বা ব্রহ্ম হইতেই ফিরিয়া আসে। ইহা দ্বারাই নির্দেশ করা হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে— হিতা-প্রভৃতি নাড়ীতে অবস্থান করে না। কিন্তু যেহেতু জীব মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেইজন্য সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বকে অনুভব করিতে পারে না।

অধিকরণ ৩: একই জীব সুষুপ্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

স এব তু, কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

স এব (সেই একই জীব) তু (কিন্তু) কর্ম-অনুস্মৃতিশব্দ-বিধিভ্যঃ (কর্ম, স্মৃতি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং নৈতিক শিক্ষা হইতে) (জানা যায়)।

৯. কিন্তু একই জীব (সুষুপ্তির পর ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়) ইহা তাহার (কর্ম, স্মৃতি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং নৈতিক শিক্ষা হইতে) (বুঝিতে পারা যায়)।

[৯. সুষুপ্ত জীবই পুনরায় জাগ্রত হয়। ইহা তাহার কর্ম, স্মৃতি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং নৈতিক শিক্ষা হইতে জানা যায়।]

এখানে এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়— যেমন এক বিন্দু জল সমুদ্রে বিলীন হইলে সেই জলবিন্দুকে সমুদ্র হইতে পুনরায় বাহির করিয়া আনা কষ্টকর হয়, সেইরূপ সুষুপ্ত অবস্থায় ব্রহ্মে লীন সেই জীবই যে পুনরায় জাগরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, কোন একটি জীব ব্রহ্ম হইতে সুষুপ্তির পর ফিরিয়া আসে। এমন কোন নিশ্চিত নিয়ম থাকিতে পারে না যে, একই জীব ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসে। এই সূত্রটি উক্ত মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলিতে চায় যে, একই জীব সুষুপ্তির পর ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগমন করে এই সকল কারণে— (১) কোন ব্যক্তি নিদ্রার পূর্বে কোন অসমাপ্ত কাজকে নিদ্রা ভঙ্গের পর পুনরায় সম্পন্ন করিয়া থাকে— ইহা আমরা দেখিতে পাই। যদি ইহা একই জীব না হইত তাহা হইলে অপর জীবের কৃত অর্ধসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করার জন্য তাহার কোন আগ্রহ থাকিত না! (২) নিদ্রার পূর্বে এবং পরে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের একত্বের অভিজ্ঞতা। (৩) আমাদের পূর্ববর্তী ঘটনার স্মৃতি। (৪) শ্রুতি প্রমাণ; যেমন এই শ্রুতিটি— "উক্ত জীবগণ (নিদ্রাদির পূর্বে) ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ......যাহা ছিল (নিদ্রাদির পরে) ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে" (ছাঃ ৬.৯.৩)। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, একই জীব সুষুপ্তির পর ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসে। (৫) যদি সুষুপ্তির পথে গতিশীল ব্যক্তিটি ব্যুত্থিত ব্যক্তিটি হইতে পৃথক্ হইত, তাহা হইলে কর্ম বা জ্ঞান সম্পর্কে শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি নিরর্থক হইয়া যাইত। কারণ, যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রিত হওয়া মাত্র ব্রহ্মের সহিত চিরন্তনভাবে একীভূত হইয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্রীয় উপদেশের কোন মূল্যই থাকিত না।

এই সকল কারণেই একই জীব সুষুপ্তির পর ব্রহ্ম হইতে পুনরাগত হয়। এখানে জলবিন্দুর সমুদ্রে মিশ্রণের দৃষ্টান্তটি সুপ্রযুক্তভাবে সাদৃশ্যমূলক নহে, কারণ জলবিন্দু নির্বিশেষভাবেই সমুদ্রের জলের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়— এবং সেইজন্যই তাহা চিরকালের জন্যই হারাইয়া যায়। কিন্তু জীব তাহার উপাধিগুলি লইয়াই ব্রহ্মে লীন হয়। এইজন্যই একই জীব তাহার কর্ম এবং অবিদ্যাহেতু পুনরায় ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং তাহার কর্ম এবং অবিদ্যাই তাহাকে নিঃশেষে ব্রহ্মে লীন হইতে দেয় না।

অধিকরণ ৪ : মূর্চ্ছা-অবস্থার স্বরূপ।

মুগ্ধেঽর্ধসংপত্তিঃ, পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥

মুগ্ধে (মূর্চ্ছা অবস্থায়) অর্ধ সংপত্তিঃ (সুষুপ্তি অবস্থার আংশিক উপলব্ধি) পরিশেষাৎ (একমাত্র বিকল্পরূপে অবশিষ্ট বলিয়া)।

১০. মূর্চ্ছা অবস্থায় সুযুপ্তি অবস্থার আংশিক অনুভব লাভ করা যায়, যেহেতু ইহাই একমাত্র অনুকল্প অনুভবরূপে অবশিষ্ট থাকে।

[১০. মূর্চ্ছা জীবের অর্ধেক মরণাবস্থা, এবং ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মরণাবস্থার অতিরিক্ত একটি অবস্থা।]

এখানে এখন মূর্চ্ছা অবস্থার ব্যাপারটিকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হইতেছে। শরীরে অবস্থান কালে জীবের তিনটি মাত্র অবস্থা থাকে— জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। ইহার (জীবের) চতুর্থ অবস্থা হইল মৃত্যু। মূর্চ্ছা অবস্থাকে জীবের পঞ্চম অবস্থারূপে গণ্য করা যায় না— যেহেতু এইরূপ কোন অবস্থার কথা আমাদের জানা নাই। তাহা হইলে এই মূর্চ্ছা-অবস্থার স্বরূপটি কি? ইহা কি জীবের একটি পৃথক্ অবস্থা, অথবা এই তিনটি অবস্থারই অন্যতম অবস্থা? ইহা জাগ্রৎ বা স্বপ্ন হইতে পারে না, কারণ ইহাতে কোন চেতনা বা কোন কিছুর অনুভূতি থাকে না। ইহা সুষুপ্তিও নহে, কারণ সুযুপ্তি আনন্দ দেয়, মূর্চ্ছা আনন্দ দেয় না। ইহা মৃত্যুও নহে, কারণ জীব আবার মূর্চ্ছার পর প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সুতরাং এখন একমাত্র বিকল্প অবশিষ্ট রহিল এই যে, মূর্চ্ছাবস্থায় জীব আংশিকভাবে সুষুপ্তির অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, সেই অবস্থায় জীবের কোন সংজ্ঞা থাকে না এবং ইহা পরবর্তী কালে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সেই অবস্থাটি আংশিকভাবে মৃত অবস্থাও বটে, কারণ সেই অবস্থায় জীব দুঃখ এবং বেদনা অনুভব করে যাহার প্রতিক্রিয়া তাহার বিকৃত মুখে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকট হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি একটি পৃথক্ অবস্থাই বটে, যদিও ইহা সাময়িকভাবে ঘটে। ইহা যে একটি পঞ্চম অবস্থা নহে তাহার কারণ, ইহা অপর দুইটি অবস্থারই সংমিশ্রণ বিশেষ।

অধিকরণ ৫ : পরব্রহ্মের স্বরূপ।

পূর্ববর্তী চারিটি প্রকরণে 'ত্বম্' অথবা প্রতীয়মান জীব সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বপ্নের জগৎসৃষ্টিকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, যদিও জীবকে আপাতভাবে স্বপ্নে সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া মনে হয়, তথাপি যথার্থত ইহা অনাসক্তই বটে। সুষুপ্তি অবস্থায় পরব্রহ্মে জীবের বিলীন হওয়া দ্বারা সেই অনাসক্তির ভাবটিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। একই জীব নিদ্রাবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, এই উক্তির দ্বারা জীবের ক্ষণিকত্ব বা অস্থায়িত্বকে খণ্ডন করা হইয়াছে। মূর্চ্ছার বিষয়টি উল্লেখ করিয়া ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যদিও এই অবস্থায় জীবনের সকল অভিব্যক্তিই লুপ্ত হয়, তথাপি জীব সেখানে বর্তমান থাকে; এবং সেইহেতু

আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে, এমনকি মৃত্যুর পরও জীব বর্তমান থাকে। এইভাবেই ইহা প্রমাণিত হইল যে, জীব স্বয়ংপ্রজ্ঞ, চৈতন্যস্বরূপ, কেবলানন্দী এবং সর্বাবস্থার অতীত। 'ত্বম্'-এর এই অবস্থা বর্ণনার পর, 'তৎ'-এর স্বরূপ বিষয়ে পরবর্তী সূত্রগুলির দ্বারা আলোচনার অবতারণা করা হইতেছে।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্, সর্বত্র হি ।।৩।২।১১।।

ন (নহে) স্থানতঃ (স্থানের বিভিন্নতা হইতে) অপি (ও) পরস্য (পরব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গম্ (দুইপ্রকার [উভয় প্রকার] গুণসমূহ) হি (যেহেতু) সর্বত্র (সর্বত্র—শাস্ত্রের সর্বত্র ইঁহাকে অন্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

১১. স্থানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ব্রহ্ম সম্পর্কে উভয় প্রকার লক্ষণের কল্পনা করা যায় না, কারণ (শাস্ত্রের সর্বত্রই ইহাকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ নির্গুণ হিসাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে)।

[১১. জীব সর্বাবস্থায় পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া থাকিলেও তাহার কোন দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হয় না, ইহা শ্রুতিপ্রমাণে অবগত হওয়া যায়।]

শাস্ত্রে আমরা ব্রহ্মের দুইপ্রকার বর্ণনা পাই। কোন কোন শ্রুতিতে ইহাকে সগুণ এবং কোন কোন শ্রুতিতে ইহাকে নির্গুণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস" (ছাঃ ৩.১৪.২)— ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের সগুণত্বের কথা বলা হইয়াছে; পুনশ্চ (বৃঃ ৩.৮.৮)-এ বলা হইয়াছে—"ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৮.৮.)। এখানে কি আমরা উভয় শ্রুতিকেই ব্রহ্ম সম্পর্কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, যেহেতু ইহা হয় উপাধিযুক্ত অথবা নিরুপাধিক? অথবা ইহাদের একটিকে সত্য এবং অপরটিকে মিথ্যা বলিয়া জানিব? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোন্‌টি এবং কেনই বা গ্রাহ্য বা বর্জ্য? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, একই ব্রহ্ম সম্পর্কে উভয়টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ ইহা অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ। একই বস্তুর একই সময়ে দুইটি পরস্পরবিরোধী স্বরূপ থাকিতে পারে না। অথবা একটি বস্তুর সহিত অন্য একটি বস্তুর সম্পর্ক মাত্র ইহার স্বরূপকে পরিবর্তন করিতে পারে না— যেমন বর্ণহীন স্ফটিকের সান্নিধ্যে আগত একটি পুষ্পের রক্তিমা স্ফটিকের উপর প্রতিফলিত হইলেও ইহার স্বভাবকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। স্ফটিকের উপর লোহিতবর্ণের আরোপের কারণ অজ্ঞতা মাত্র—ইহা যথার্থ নহে। অথবা কোন বস্তুই তাহার যথার্থ স্বভাবের পরিবর্তন করিতে পারে না— ইহার অর্থ হইবে ধ্বংস। ব্রহ্ম সম্পর্কেও এই কথাটি সত্য। ব্রহ্মের সহিত

পৃথিবী ইত্যাদি গুণের সংযোগ অবিদ্যার সৃষ্টি মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং নির্গুণত্ব এই দুইটির মধ্যে আমাদিগকে নির্গুণত্বের পক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে— যেহেতু ইহাই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ, কারণ আমরা শাস্ত্রের সর্বত্রই দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মের সগুণত্বকে বর্জন করিয়া নির্গুণ হিসাবেই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হইয়াছে। "অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্"— ইত্যাদি (কঠঃ ১.৩.১৫)। ব্রহ্মের সগুণ বর্ণনা উপাসনার সৌকর্যের জন্য মাত্র— ইহা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নহে।

ন ভেদাদিতি চেৎ, ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

ন (না, এইরূপ নহে) ভেদাৎ (শাস্ত্রে ভিন্নভাবে উপদেশ হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) প্রত্যেকম্ (প্রত্যেকটি বিষয়ে) অতদ্বচনাৎ (ইহার বিপরীত উপদেশ হেতু)।

১২. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ইহা) এইরূপ নহে, কারণ (শাস্ত্রে) বিপরীত উপদেশই আছে, ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, না ইহা হইতে পারে না কারণ শ্রুতি ইহাদের উভয়েরই বিপরীত উপদেশ করেন।

[১২. যদি এইরূপ বলা হয় যে, ইহা এইরূপ হইতে পারে না, কারণ শাস্ত্রে ইহার ভিন্নত্বের উপদেশ আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, শ্রুতি শাস্ত্রে ইহাদের প্রত্যেকটিরই বিপরীতভাবের উপদেশও আছে।]

আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রুতি বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা বা উপাসনার জন্য ব্রহ্মের বিভিন্ন আকৃতির উপদেশ করিয়াছেন। কোন স্থলে ব্রহ্মকে চতুষ্পাৎরূপে, কোথাও বা ষোড়শ কলারূপে, অথবা অন্য কোথাও তাঁহাকে ত্রৈলোকদেহীরূপে, অথবা বৈশ্বানররূপে, এবং আরও বহুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম সগুণও বটেন। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, ব্রহ্ম সম্পর্কে এইরূপ সোপাধিক বর্ণনাকে শাস্ত্রে অস্বীকারই করা হইয়াছে— যেমন এই শ্রুতিটিতে— "এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, এবং যিনি এই অধ্যাত্ম, শরীরাবস্থিত, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ— তিনিই আত্মা" (বৃঃ ২.৫.১)। এই সকল শ্রুতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী ইত্যাদি সকল উপাধিতে একই পরমাত্মা বিরাজমান, সুতরাং একমাত্র অভেদভাব এবং একত্বই সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, বেদ ব্রহ্মকে বিচিত্র আকৃতিসমূহের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষা দেয়। আমরা যাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি— সেই বিষয়ে শ্রুতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট করিয়া

বলিয়াছেন যে, বিচিত্র রূপগুলি সত্য নহে— বাস্তবিকপক্ষে সর্বত্রই একটি মাত্র নিরাকার সত্তাই বিরাজমান।

অপি চৈবমেকে ॥৩।২।১৩॥

অপি চ (অধিকন্তু) এবম্ (এইরূপভাবে) একে (কেহ কেহ)।

১৩. উপরন্তু কেহ কেহ এইরূপভাবেই শিক্ষা দেন।

[১৩. বেদের কোন কোন শাখা স্বরূপ জীব এবং অরূপ ব্রহ্মের একত্র অবস্থানের কথা উপদেশ করেন। তাহা হইলেও ব্রহ্ম জীবের সংস্পর্শদ্বারা দুষ্ট হন না।]

বেদের কোন কোন শাখা প্রত্যক্ষভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের বহুত্ব-কল্পনা সত্য নহে— এবং যাহারা ব্রহ্মকে 'বহু' রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেখে তাহাদের প্রতি সাবধানী-বাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন—। "যে এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় (অর্থাৎ দ্বৈতের ন্যায়) দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়—" (কঠঃ ২.১.১১)। এবং বৃহদারণ্যক ৪.৪.১৯ শ্রুতিও ইহাই উপদেশ দেন।

অরূপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪॥

অরূপবৎ (রূপবিহীন) এব (একমাত্র) হি (নিশ্চিতভাবেই) তৎ-প্রধানত্বাৎ (তাহাই প্রধান বক্তব্য বলিয়া)।

১৪. ব্রহ্ম নিশ্চিতই একমাত্র নিরাকারই— কারণ তাহাই (ব্রহ্ম সম্পর্কিত) সকল শ্রুতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

[১৪. ব্রহ্ম সুনিশ্চিতভাবেই নিরাকার। কারণ সকল শ্রুতিই ব্রহ্মের নিরাকারত্বকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চান।]

ব্রহ্ম একমাত্র নিরাকারই। কারণ যে-সকল শ্রুতি ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মকে এইরূপভাবেই নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি ব্রহ্মের রূপ আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইলে যে-সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। এবং শাস্ত্র সম্পর্কে এইরূপ বিপর্যয়ের কল্পনা ধারণাতীত— কারণ শাস্ত্রসমূহের সামগ্রিকভাবে একটা উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য আছে। অপরপক্ষে যেখানে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে সেখানে শাস্ত্র ইহার সাকারত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন নাই— সেখানে ব্রহ্মের উপাসনার প্রসঙ্গেরই বিধান করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম নিরাকারই।

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ।। ৩ । ২ । ১৫ ।।

প্রকাশবৎ (আলোকের ন্যায়) চ (এবং) অবৈয়র্থ্যাৎ (নিরর্থক নহে বলিয়া)।

এবং আলোক যেমন (রূপবিশিষ্ট বস্তুর সান্নিধ্যে আসিয়া আকার ধারণ করে, সেইরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মও আকার ধারণ করেন) কারণ (শাস্ত্রে ব্রহ্মের সাকারভাবের উপদেশ) নিরর্থক নহে।

[১৫. শাস্ত্রে যে ব্রহ্মের সাকারভাবের উপদেশ আছে তাহা নিরর্থক নহে। নিরাকার আলোক যেমন সাকার বস্তুর সান্নিধ্যে আসিয়া আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মও উপাধিযুক্ত জীবের সান্নিধ্যে আসিয়া সাকার হন।]

ব্রহ্ম যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে যে-সকল শ্রুতিতে তাঁহাকে সাকাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদের কি হইবে? সেই সকল শ্রুতি কি নিরর্থক? ব্রহ্ম যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে সাকার ব্রহ্মের সকল উপাসনাই অসাড় হইয়া পড়ে, কারণ এইরূপ মিথ্যা উপাসনা কিভাবে সাধককে ব্রহ্মলোকে বা লোকান্তরে লইয়া যাইতে পারে? এই সূত্রে ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ঐ সকল (সাকার) শ্রুতি নিরর্থক নহে। যেমন নিরাকার আলোকরশ্মি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ছিদ্রপথে কোন গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় এবং তাহার গৃহের অন্ধকারকে দূর করিবার সামর্থ্যও সমানই থাকে— সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধিদ্বারা সসীম হইয়া সাকাররূপে প্রতিভাত হন। এইরূপ মায়োপহিত ব্রহ্মের উপাসনা ব্রহ্মলোক ইত্যাদি প্রাপ্তির পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। আবার এই ব্রহ্মলোক ইত্যাদিও পারমার্থিক আত্যন্তিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। সুতরাং ঐ সকল শ্রুতি সর্বতোভাবে নিরর্থক নহে। ইহা কিন্তু এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে— অর্থাৎ ব্রহ্ম যদিও সসীমগুণরাশির সঙ্গে সম্পৃক্ত তথাপি দ্বৈতভাবসম্পন্ন নহেন, কারণ ইহাদের কার্য কোন বস্তুর গুণ বা ধর্ম হইতে পারে না, এবং অধিকন্তু এই সকল সসীম উপাধি অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন মাত্র।

আহ চ তন্মাত্রম্ ।। ৩ । ২ । ১৬ ।।

আহ (বলা হয়) চ (এবং) তৎ-মাত্রম্ (তাহা, অর্থাৎ বিজ্ঞান মাত্র)।

১৬. এবং (শাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম তাহাই অর্থাৎ বিজ্ঞান মাত্রই)।

[১৬. এবং শাস্ত্র ব্রহ্মকে ‘প্রজ্ঞানঘন’ মাত্র বলিয়াছেন। সুতরাং সোপাধিক জীবত্ব তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না।]

এখন প্রশ্ন হইল— ঐ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপটি কি? "লবণখণ্ড যেমন অন্তর্বহিঃ-শূন্য, সর্বাংশেই সমরস, তেমনি এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন।" (বৃহঃ ৪.৫.১৩)। ইহা বিজ্ঞান মাত্র, স্বয়ংপ্রভ, সমরস এবং গুণরহিত।

দর্শয়তি চ, অথো অপি স্মর্যতে ।।৩।২।১৭।।

দর্শয়তি (শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন) চ (এবং) অথো (এইরূপ) অপি (এবং) স্মর্যতে (ইহা স্মৃতিতেও বর্ণিত আছে)।

১৭. (শ্রুতি শাস্ত্রে)ও ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং স্মৃতিতেও এইরূপেই বলা আছে।

[১৭. ব্রহ্মের নির্গুণত্ব শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে।]

ব্রহ্ম যে নির্গুণ তাহা শ্রুতি শাস্ত্র হইতেও প্রমাণিত হয়— কারণ শ্রুতি ব্রহ্মের উপর যে-কোন গুণের আরোপকে অস্বীকার করিয়াছেন। "সুতরাং অতঃপর (ব্রহ্মের) স্বরূপ বর্ণনা: 'নেতি, নেতি'। এই 'নেতি' (বৃহঃ ২.৩.৬) অপেক্ষা অন্য এবং যথার্থ কোন বর্ণনাই ব্রহ্মের হইতে পারে না।" যদি ব্রহ্মের কোন আকার থাকিত তাহা হইলে ইহা ঐরূপ প্রকাশক কোন শ্রুতির দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করা হইত, এবং তাহা হইলে সব কিছুকে অস্বীকার করিয়া 'নেতি, নেতি'— বলিবার কোন প্রয়োজন হইত না। স্মৃতিও ব্রহ্ম সম্পর্কে এইরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন: "তিনি আদিহীন অন্তহীন, পরব্রহ্ম তাঁহাকে সদসৎ কিছুই বলা যায় না" (গীতা ১৩.১২)। "এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে"— (গীতা ২.২৫)।

অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ ।।৩।২।১৮।।

অতএব (সেইজন্য) চ (ও) উপমা (তুলনা) সূর্যকাদিবৎ (সূর্যের প্রতিবিম্বাদির ন্যায়)।

১৮. সেইহেতুও (ব্রহ্ম সম্পর্কে) আমরা সূর্যের প্রতিবিম্বের উপমাকে গ্রহণ করি।

[১৮. ব্রহ্ম নিরাকার। সূর্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় জগতের সোপাধিক বিভিন্ন বস্তু ব্রহ্মের ছায়ামাত্র, যথার্থ ব্রহ্ম নহে— যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব সূর্য নহে।]

ব্রহ্ম যে নিরাকার তাহা আরও প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে ইহার পক্ষে প্রযোজ্য একটি উপমার সাহায্যে। যেহেতু ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন, সমরস এবং নিরাকারমাত্র— এবং যেহেতু ইহার সম্পর্কে সকল উপাধিই অস্বীকার করা হইয়াছে, সেইহেতু আমরা দেখিতে পাই যে শাস্ত্র ইহার সাকাররূপত্বকে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা জলের উপর একটি সূর্যের বহু প্রতিবিম্বের ন্যায়। ইহার অর্থ হইল এই যে, প্রতিবিম্বিত সূর্যগুলি মিথ্যা— ইহারা সোপাধিক সসীম সৃষ্টিমাত্র।

অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ ।।৩।২।১৯।।

অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (অনুভূত না হওয়ার জন্য) তু (কিন্তু) ন (নহে) তথাত্বম্ (সাদৃশ্য)।

১৯. কিন্তু (সেক্ষেত্রে) ইহার কোন সাদৃশ্য নাই, জলের ন্যায় দ্বিতীয় কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা ব্রহ্মে নাই।

[১৯. এই উপমাটি ভ্রান্ত। সূর্যের প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বস্তু জলের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের জন্য জলের ন্যায় দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রতীতি সম্ভব হয় না।]

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। পূর্বসূত্রের উপমাটি ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। আকারবিশিষ্ট সূর্যের ক্ষেত্রে, দূরস্থিত অন্যতর বস্তু জলে ইহার প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার এবং সর্বব্যাপী। সুতরাং ইহার দূরবর্তী দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকিতে পারে না— যাহা উপাধি হিসাবে ইহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই উপমাটি ভ্রান্ত।

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাৎ, উভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ।।৩।২।২০।।

বৃদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্ (হ্রাস ও বৃদ্ধিতে সক্রিয়তা) অন্তর্ভাবাৎ (অন্তর্বর্তিত্ব হেতু) উভয় সামঞ্জস্যাৎ (এই দুইক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া) এবম্ (এইরূপ)।

২০ ব্রহ্ম অন্তর্বর্তী বলিয়া (ইহার উপাধিগুলি) (মনে হয় যেন) তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধিতে সক্রিয় হইয়া থাকে। এই দুইটি ক্ষেত্রের এই সাদৃশ্যহেতু (১৮ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত), ইহা এইরূপই বটে (অর্থাৎ উপমাটি ভ্রান্ত নহে)।

[২০. অন্তর্বর্তী ব্রহ্ম তাঁহার উপাধির মাধ্যমে (প্রতিবিম্বের) হ্রাস বৃদ্ধিতে সক্রিয় থাকেন বলিয়া মনে হয়। এই উভয়ক্ষেত্রের (১৮ সূত্রে উল্লিখিত) সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা এইরূপই (যথার্থই) বটে; (অর্থাৎ উপমাটি ভ্রান্ত নহে)।]

সূর্যের প্রতিবিম্বের উপমাটি সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নহে— শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে। যেমন প্রতিবিম্বিত সূর্যের নানা বিকার দৃষ্ট হয়— ইহা জলের তরঙ্গের কম্পন প্রসারণ ও সঙ্কোচনের সঙ্গে কম্পিত হয়, অথবা আকার পরিবর্তিত হয় কিন্তু মূল সূর্যটি অপরিবর্তিতই থাকে— সেইরূপ ব্রহ্মও যেন উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সক্রিয় হন বলিয়া মনে হয়— উপাধির গুণগুলির অন্তর্বর্তী হইয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে বর্ধিত হন, হ্রাস প্রাপ্ত হন, সুখ দুঃখের ভোক্তা হন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম পরিবর্তিত হন না। সুতরাং এই সাদৃশ্যহেতু এই উভয়ের মধ্যে তুলনাটি ভ্রান্ত নহে।

দর্শনাচ্চ ॥৩।২।২১॥

দর্শনাৎ (শাস্ত্রের উপদেশহেতু) চ (এবং)।

২১. এবং শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ থাকার জন্য।

[২১. এবং শাস্ত্রেও (ব্রহ্মের জীব-শরীরে প্রবেশ ইত্যাদির) উপদেশ আছে বলিয়া উপমাটি ভ্রান্ত নহে।]

শাস্ত্রেও এইরূপ উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্ম শরীর এবং নানা উপাধিগুলিতে প্রবিষ্ট হন। "তিনি দ্বিপদ শরীরসকল নির্মাণ করিলেন, চতুষ্পদ শরীরসকল নির্মাণ করিলেন। সেই পরমপুরুষ প্রথমে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন। এই পুরুষই নিখিল দেহপুরে পুরিশায়ী হইয়া পুরুষ নামধারী হইয়াছেন" (বৃহঃ ২.৫.১৮)। এইরূপভাবেও ১৮ সংখ্যক সূত্রের উপমাটি ভ্রান্ত নহে।

সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্ম নিরাকার, প্রজ্ঞানঘন সমরস এবং নানাত্বরহিত।

অধিকরণ ৬: বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২.৩.৬ 'নেতি, নেতি' মন্ত্রটি বৃহদারণ্যকের ২.৩.১ মন্ত্রে বর্ণিত ব্রহ্মের স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় রূপকেই অস্বীকার করে— কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মকে অস্বীকার করে না।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২২॥

প্রকৃত-এতাবত্ত্বং (এই পর্যন্ত যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে) প্রতিষেধতি (নিষেধ করেন) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিকতর কিছু) ব্রবীতি (বলেন) চ (এবং)।

২২. এই পর্যন্ত যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা হইতেছে (এই 'নেতি, নেতি'— মন্ত্রের দ্বারা) এবং (শ্রুতি) (ইহার পর) ব্রহ্ম সম্পর্কে আরও অধিকতর কিছুও বলিয়াছেন।

[২২. এই পর্যন্ত ব্রহ্ম সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে ব্রহ্ম ততটুকু মাত্র নহেন, ইহার পর শ্রুতি ব্রহ্ম সম্পর্কে আরও অধিকতর কিছু বলিয়াছেন।]

"ব্রহ্মের দুইটি মাত্র রূপ আছে— মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ" (বৃহঃ ২.৩.১)। এইরূপে ব্রহ্মের মূর্তরূপ যথা পৃথিবী, জল, তেজ এবং অমূর্তরূপ যথা বায়ু, আকাশ, ইত্যাদি— এই দুইটির বর্ণনা করার পর উপসংহারে শ্রুতি বলিতেছেন— "অতএব অতঃপর 'নেতি, নেতি' ইহাই (ব্রহ্মের) নির্দেশ"— (বৃহঃ ২.৩.৬)। এখন প্রশ্ন হইল, এই দ্বৈত নিষেধ 'নেতি, নেতি' দ্বারা কি জগৎ এবং ব্রহ্ম উভয়কেই অস্বীকার করা হইল, অথবা উঁহাদের একটিকে নিষেধ করা হইল? বিরুদ্ধপক্ষ বলেন যে, এই উভয়কেই অস্বীকার করা হইয়াছে— এবং এই অস্বীকৃতির ফলস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা এবং সেইজন্যই ব্রহ্ম মিথ্যা জগতেরও আশ্রয় হইতে পারেন না। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহা আমাদিগকে শূন্যবাদের দিকেই লইয়া যায়। যদি উঁহাদের একটি মাত্রকে অস্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ব্রহ্মকে অস্বীকার করাই সমীচীন, কারণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ নহেন এবং সেইজন্য ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। জগৎকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না— কারণ ইহা আমাদের অনুভূতিগম্য। এই সূত্রে উপরের মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে— এই পর্যন্ত ব্রহ্মের মূর্ত এবং অমূর্ত রূপ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই 'নেতি, নেতি' শব্দের দ্বারা অস্বীকার করা হইয়াছে। এই নিষেধাত্মক শব্দগুলির দুইবার প্রয়োগের কারণ হইল ব্রহ্মের দুইটি রূপেরই অস্বীকার করা। 'ইতি' শব্দটি অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে— অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটি রূপকেই বুঝাইয়াছে। এখানে ব্রহ্মের দুইটি রূপই আলোচ্য বিষয়, স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন— কারণ ব্রহ্ম পূর্ববর্তী শ্রুতির মুখ্য বিষয়ও নহেন। অধিকন্তু, জগৎকে অস্বীকার করার পর শ্রুতি ইহার অপেক্ষা অধিকতর কিছুও ব্রহ্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন— অর্থাৎ বলিয়াছেন 'সত্যেরও সত্য' হইলেন ব্রহ্ম। ইহার দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্যরূপে বর্তমান এবং মায়াময় জগতের অধিষ্ঠান এবং জগৎ মায়ামাত্র। শ্রুতি ব্রহ্ম বিষয়েই উপদেশ করেন— সুতরাং শ্রুতি ব্রহ্মকেই অস্বীকার করিবেন এইরূপ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ব্রহ্ম হইলেন সত্যেরও সত্য—অর্থাৎ 'সৎ'-রূপী পৃথিবী, জল এবং অগ্নির অন্তরালবর্তী সত্য এবং 'তৎ'-রূপী বায়ু আকাশ ইত্যাদিরও

অন্তরালবর্তী সত্য ; অর্থাৎ প্রকৃতির মূর্ত ও অমূর্ত উভয়রূপেরই মূলীভূত সত্য। জগৎকে অস্বীকার করার মধ্যে জগতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই, ইহার দ্বারা জগতের পারমার্থিক বা অতীন্দ্রিয় সত্যতাকেই অস্বীকার করা হইয়াছে— ব্যবহারিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যতাকে অস্বীকার করা হয় নাই— জগতের তাহা যথাযথভাবেই থাকিয়া যায়। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ নন বলিয়া ব্রহ্মকে স্বীকার করা যায় না— এই আপত্তিটি ভিত্তিহীন ; কারণ শ্রুতির উদ্দেশ্যই হইল যাহা সাধারণত আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচরীভূত নহে তাহার উপদেশ দেওয়া ; তাহা না হইলে শ্রুতির উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়।

তদব্যক্তম্, আহ হি ॥৩।২।২৩॥

তৎ (তাহা, ব্রহ্ম) অব্যক্তম্ (অপ্রকাশিত) আহ (শাস্ত্র বলেন) হি (যেহেতু)।

২৩. সেই (ব্রহ্ম) অব্যক্ত, কারণ শাস্ত্রে ইঁহাকে এইরূপ বলা হইয়াছে।

[২৩. শাস্ত্র ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীতও বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।]

ব্রহ্ম যদি অস্তিত্বশীলই হন, তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? শ্রুতি বলেন যে, আমরা অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া ব্রহ্ম আমাদের কাছে অব্যক্ত। সেইজন্যই ইনি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন : "ব্রহ্ম চক্ষুদ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যার দ্বারাও ... নহেন" (মুঃ ৩.১.৮)।

অপি চ সংরাধনে, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩।২।২৪॥

অপি চ (এবং উপরন্তু) সংরাধনে (গভীর ধ্যানের দ্বারা) — (ইঁনি জ্ঞাত হন) প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি এবং স্মৃতি হইতেও জানিতে পারি)।

২৪. এবং উপরন্তু আমরা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে (জানিতে পারি) যে (ব্রহ্ম) গভীর ধ্যানে (প্রত্যক্ষীভূত হন)।

[২৪. ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও আমরা শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম গভীর ধ্যানে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হন।]

যদি ব্রহ্ম আমাদের নিকট প্রত্যক্ষীভূত না হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব না, এবং সেইহেতু আমাদের মুক্তিও হইবে না। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ব্রহ্ম শুধু তাহাদের নিকটই জ্ঞাত নহেন, যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়, কিন্তু যাঁহাদের

চিত্ত শুদ্ধ, তাঁহাদের অজ্ঞান দূর হইয়া যায় এবং তাঁহারা সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। এইরূপভাবে যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হন তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায়: "কোন বিবেকী অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন" (কঠঃ ২.১.১)। এবং মুণ্ডক ৩.১.৮ও এইরূপ বলেন। স্মৃতিতেও একই উক্তি আছে: "যোগিগণ অতন্দ্রভাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শ্বাসবায়ু রোধকরত তদগতচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিয়া তেজস্বরূপ ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন"— ইত্যাদি।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণি, অভ্যাসাৎ ।।৩।২।২৫।।

প্রকাশাদিবৎ (জ্যোতি ইত্যাদির ন্যায়) চ (এবং) অবৈশেষ্যং (কোন পার্থক্য নাই) প্রকাশঃ (ব্রহ্ম) চ (এবং) কর্মণি (কর্মে) অভ্যাসাৎ (শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ ইহার উল্লেখহেতু)।

২৫. যেমন আলোকাদির ক্ষেত্রে ইহাদের (বিম্ব প্রতিবিম্বের মধ্যে) কোন পার্থক্য নাই, (সেইরূপ) ব্রহ্ম এবং ইঁহার (অভিব্যক্তি) কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ পুনঃপুনঃ করা হইয়াছে।

[২৫. সূর্যাদি দৃষ্টান্তে সূর্য ও তাহার প্রতিবিম্বের মধ্যে যেমন তত্ত্বত কোন পার্থক্য নাই, তেমনি ব্রহ্ম (এবং ইঁহারই উপাধিযুক্ত) জীবের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই; কারণ শাস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ ইহাদের অভিন্নত্বের বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন।]

জীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপ (ইতঃপূর্বে) বর্ণিত হইয়াছে। এখানে এখন তাহাদের অভিন্নত্বের বিষয় ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

যদি পূর্ব সূত্রানুযায়ী ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু এবং জীব ধ্যাতা হন, তাহা হইলে ইহার তাৎপর্য এই হয় যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক নহেন— তাহাদের মধ্যে দ্বৈতভাব আছে। এই সূত্রটি ইহারই ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছে। যেমন সূর্য এবং জলে ইহার প্রতিবিম্বের মধ্যে বস্তুত কোন পার্থক্য নাই, কারণ প্রতিবিম্বটি সত্য নহে, ঠিক সেইরূপভাবেই একই ব্রহ্মও বিভিন্ন আকারে মূর্ত হইয়া ধ্যানাদি কার্যের উপাধিবিশিষ্ট হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হন। অবিদ্যাবশতই উপাসক জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে একটি ভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই। জীব এবং ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহা 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিবচনের পুনঃপুনঃ উপদেশ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল শ্রুতি ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করে।

অতো অনন্তেন, তথা হি লিঙ্গম্ ॥৩।২।২৬॥

অতঃ (সেইজন্য) অনন্তেন (অনন্তের সহিত) তথা (সেইরূপে) হি (যেহেতু) লিঙ্গম্ (শাস্ত্রে) ইহার উল্লেখ আছে।

২৬. সেইহেতু (জীব) অনন্ত ব্রহ্মের সহিত (এক হইয়া যায়); কারণ (শ্রুতিতে) এইরূপই উল্লেখ আছে।

[২৬. (অজ্ঞান দূর হইলে) জীব যে ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া অভিন্নত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রুতিতে আছে।]

সকল উপাধিজনিত পার্থক্যবোধের অজ্ঞতা যখন দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। "যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান"— (মুঃ ৩.২.৯)। যদি পার্থক্যটি যথার্থ হইত, তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যাইতে পারিত না। জ্ঞান অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু যাহা সত্য তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাহা হইলে, যেহেতু জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, সেইজন্য জীবের স্বতন্ত্র সত্তাটি বাস্তব সত্য নহে— এবং এইজন্যই জ্ঞানের দ্বারা ইহার নাশ হইয়া যায়— এবং একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং (জীব ও ব্রহ্মের) পার্থক্যটি সত্য নহে— অভিন্নত্বই সত্য।

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥৩।২।২৭॥

উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়েরই উপদেশ হেতু) তু (কিন্তু) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প এবং তাহার কুণ্ডলীর অবস্থার ন্যায়)।

২৭. কিন্তু (শ্রুতিতে) (ভেদ এবং অভেদ) এই উভয় প্রকার উপদেশহেতু (জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্কটি) সর্প এবং তাহার কুণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্কের ন্যায় (বুঝিতে হইবে)।

[২৭. শাস্ত্রে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ এই উভয়প্রকারেরই উপদেশ আছে। এই ভেদাভেদকে সর্প ও তাহার কুণ্ডলী অবস্থার সম্পর্কের ন্যায় তুলনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়।]

জীব এবং ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রমাণ করার পর সূত্রকার ভেদাভেদ মতবাদের সমীক্ষা দ্বারা এখন অভেদত্বের অধিকতর ব্যাখ্যার অবতারণা করিতেছেন। আমরা শাস্ত্রে "সমান সুন্দর পালকবিশিষ্ট দুইটি পক্ষী"— ইত্যাদি (মু ৩.১.১.) শ্রুতি পাই— ইহা হইতে

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্যটি বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য যথার্থই, যদিও জ্ঞানের দ্বারা ইহার ধ্বংস হইলে তাহারা একত্বই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্কটি ভেদ এবং অভেদ উভয়েরই দ্যোতক— যেমন একটি সর্প এবং তাহার কুণ্ডলীর মধ্যের সম্পর্কটি উভয়কেই বুঝায়। সর্প হিসাবে ইহা একই, কিন্তু যদি আমরা ইহাকে কুণ্ডলী, ফণা ইত্যাদি রূপে দেখি, তাহা হইলে সেখানে পার্থক্য অবশ্যই আছে। এইভাবেই জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বর্তমান।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা, তেজস্ত্বাৎ ॥৩।২।২৮॥

প্রকাশ-আশ্রয়বৎ (জ্যোতি এবং ইহার আশ্রয়ের ন্যায়) বা (অথবা) তেজস্ত্বাৎ (উভয়ই তেজোময় বলিয়া)।

২৮. অথবা রশ্মি ও তাহার আশ্রয়ের (মধ্যে সম্পর্কের) ন্যায়, কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়।

[২৮. রশ্মি এবং তাহার আশ্রয়বস্তু সূর্যের মধ্যে সম্পর্কটি যেইরূপ সেইরূপ (জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও) একই সত্তা আছে।]

ভেদাভেদের মতবাদটি প্রতিষ্ঠার জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইতেছে। জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্কটিকে জ্যোতিষ্ক এবং তাহার রশ্মির মধ্যের সম্পর্কের ন্যায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয়েই জ্যোতির্ময়— সেইহেতু ইহারা অভিন্ন; তথাপি তাহাদের দীপ্তির তীব্রতার তারতম্যহেতু তাহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া কথিত হয়। সেইরূপই জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্কটিও এই ভেদ এবং অভেদ দ্যোতক, কারণ জীব সসীম এবং ব্রহ্ম সর্বব্যাপী।

পূর্ববদ্বা ॥৩।২।২৯॥

পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) বা (অথবা)।

২৯. অথবা (জীব এবং ব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক) পূর্বে যেইরূপ বলা হইয়াছে— সেইরূপই।

[২৯. অথবা পূর্ববর্তী (২৫ সংখ্যক) সূত্রে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে যেইরূপ সম্পর্কের কথা প্রমাণ করা হইয়াছে— সেইরূপ সম্পর্ককেই গ্রহণ করিতে হইবে।]

পূর্ববর্তী দুইটি সূত্রে ভেদ এবং অভেদবাদীদের ভেদাভেদ মতবাদটির আলোচনা করিয়া এই সূত্রদ্বারা ভেদাভেদ মতকে খণ্ডন করা হইতেছে এবং সিদ্ধান্তরূপে বলা হইতেছে যে, ২৫ সংখ্যক সূত্রে যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে— তাহাই সত্য— অর্থাৎ ভেদজ্ঞানটি অবিদ্যাপ্রসূত, অভেদজ্ঞানটিই সত্য। কারণ, যদি ভেদত্বও সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার অবসান কখনও হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে মোক্ষ বিষয়ে শ্রুতির উপদেশগুলিও নিরর্থক হইয়া যায়; কারণ জীবের বদ্ধাবস্থাটি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন অবস্থাতেই মুক্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই ভেদজ্ঞান যদি অবিদ্যাপ্রসূত হয়, তাহা হইলে ইহা জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হইবে এবং অভেদজ্ঞানরূপ সত্যটি উপলব্ধ হইবে। সুতরাং ২৭ এবং ২৮ সংখ্যক সূত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে কুমারিল ভট্ট এবং ভাস্করাচার্য যাহাকে বিস্তার করিয়াছেন— তাহা সত্য নহে। ২৫ সংখ্যক সূত্রে যে মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে কেবল তাহাই সত্য।

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।৩০॥

প্রতিষেধাৎ (প্রতিষেধ, অস্বীকার হেতু) চ (এবং)।

৩০. এবং যেহেতু নিষেধ করা হইয়াছে— সেইজন্য।

[৩০. শ্রুতিতে ব্রহ্ম এবং জীবের দ্বৈতভাবকে প্রতিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া (জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্নই)।]

"তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই" (বৃঃ ৩.৭.২৩) ইত্যাদি। শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কোন চেতনসত্তাকে স্বীকার করেন না এবং 'নেতি, নেতি'— এই শব্দগুলির দ্বারা জগৎকে অস্বীকার করা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কোন সত্তা নাই। সুতরাং কোন প্রকার ভেদরহিত একমাত্র ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন।

অধিকরণ ৭: ব্রহ্ম এক এবং অদ্বৈত এবং অপর কোন কিছুকে অস্তিত্বশীল বলিয়া আপাতগ্রাহ্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহা আলঙ্কারিক বর্ণনা মাত্র।

পরমতঃ সেতূন্মানসংবন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩।২।৩১॥

পরম্ (মহত্তর) অতঃ (ইহা) [ব্রহ্ম হইতে] সেতু-উন্মান-সংবন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ (সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ ইত্যাদি বাচক শব্দগুলি হইতে) (বুঝা যায়)।

৩১. (ব্রহ্ম হইতে) মহত্তর কিছু আছে— সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ প্রভৃতি দ্যোতক শব্দগুলির (ব্রহ্ম সম্পর্কে ব্যবহার থাকায় বুঝিতে পারা যায়)।

[৩১. ব্রহ্ম সম্পর্কে সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম হইতেও বৃহত্তর পৃথক্ কিছুর অস্তিত্ব আছে।]

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই— এইরূপ উক্তি আপত্তিকর— কারণ শ্রুতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুরও উল্লেখ আছে। "যিনি আত্মা, তিনি (যেন) সেতুস্বরূপ (অর্থাৎ বাঁধ)"— (ছাঃ ৮.৪.১) ইত্যাদি। শ্রুতি হইতে বুঝা যায় সেতু যেন ব্রহ্ম হইতে অন্য কিছুকে পৃথক্‌কারী একটি ভিন্ন বস্তু। আবার ব্রহ্মের সসীম কোন আকারও আছে এইরূপ বুঝা যায় এই শ্রুতি হইতে— "ব্রহ্ম চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট" (ছাঃ ৩.১৮.২)— ইহা সুবিদিত যে, যাহা কিছু সীমাবদ্ধ হয়— তাহা অপর কিছুর দ্বারাই হইয়া থাকে; কেন না অন্য বস্তুর সহিত উহা সম্বন্ধযুক্ত থাকে। "এই প্রত্যগাত্মা যখন পরমাত্মার সহিত আলিঙ্গিত হন" (বৃহঃ ৪.৩.২১)— ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম হইতে অপর কোন পৃথক্ একটি সত্তাও আছে। 'আত্মা দ্রষ্টব্য' হইতে বুঝা যায় যে একজন দ্রষ্টা এবং একটি দৃশ্য আছে। এই সকল শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম "এক এবং অদ্বৈত" নহেন।

সামান্যাত্তু ॥৩।২।৩২॥

তু (কিন্তু) সামান্যাৎ (সাদৃশ্যহেতু)।

৩২. কিন্তু (ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে) সাদৃশ্যহেতু।

[৩২. সাদৃশ্যহেতু ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে— তত্ত্বত ব্রহ্ম ও সেতু ভিন্ন বস্তু নহে।]

'তু' শব্দটির দ্বারা পূর্ববর্তী সূত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা হইতেছে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নহে। ব্রহ্মকে সেতু (বাঁধ) বলা হয় এইজন্য নয় যে, সেতুর পারে কোন কিছু আছে— যেমন নদীর উপর বাঁধের পারে কিছু থাকে— কিন্তু একটা সাদৃশ্যের উপমা বুঝাইতে ইহার ব্যবহার করা হইয়াছে। উপমাটি এইরূপ— যেমন নদীর বাঁধ জলকে সংযত করিয়া রাখে এবং পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রের সীমার ন্যায় অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্মও জগৎকে এবং ইহার সীমাকে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। "সেতু উত্তীর্ণ হইয়া"— (ছাঃ ৮.৪.২) শ্রুতিটির অর্থ হইল ব্রহ্মকে

সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মকে উত্তীর্ণ হইয়া নহে— যেমন যখন আমরা বলি "তিনি ব্যাকরণে উত্তীর্ণ হইয়াছেন", তখন আমরা ইহাই বুঝাইতে চাই যে, তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রকে অধিগত করিয়াছেন।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩।২।৩৩॥

বুদ্ধ্যর্থঃ (সহজে বোধগম্য হইবার নিমিত্ত) পাদবৎ (চারি পাদের ন্যায়)।

৩৩. (ব্রহ্মকে মূর্ত আকারবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে) সহজে বোধগম্যতার জন্য (অর্থাৎ উপাসনার জন্য) ; চতুষ্পাদের ন্যায় (কল্পনা করা হইয়াছে)।

[৩৩. ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে পাদাদি রূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র উপাসনার সৌকর্যার্থে।]

ব্রহ্ম সম্পর্কে যে 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ', "ব্রহ্ম ষোড়শ কলাবিশিষ্ট"— ইত্যাদি আকার পরিমাণাদি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য হইল উপাসনার সৌকর্য, তাহা না হইলে সর্বব্যাপী অসীম ব্রহ্মের কল্পনা কষ্টকর। মনকে যেমন আমরা ব্রহ্মেরই ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, এবং কল্পনা করি যে, বাক্, নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণ ইহার চতুষ্পাদরূপে বর্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ম সম্পর্কেও আমরা কল্পনা করি যে, ইহা আকারবিশিষ্ট ইত্যাদি— এবং এই কল্পনা উপাসনার সুবিধার জন্যই, বস্তুত ব্রহ্মের কোন আকার নাই।

স্থানবিশেষাৎ, প্রকাশাদিবৎ ॥৩।২।৩৪॥

স্থানবিশেষাৎ (বিশেষ কোন স্থানহেতু) প্রকাশাদিবৎ (আলোক ইত্যাদির ন্যায়)।

৩৪. (ব্রহ্ম সম্পর্কে সংযোগ এবং ভেদের বর্ণনা) স্থান বিশেষের জন্যই হইয়া থাকে; যেমন আলোক ইত্যাদির ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

[৩৪. স্থান এবং পাত্রের দ্বারা আলোক আকাশ যেমন সীমিত হয়, সেইরূপ নিরাকার অসীম ব্রহ্মও উপাধিহেতু রূপবান বলিয়া কল্পিত হন।]

ব্রহ্মের সহিত (জীবের) যে ভেদ বর্ণনা করা হয় তাহা শুধুমাত্র উপাধির জন্যই হইয়া থাকে— ইহা ব্রহ্মের স্বরূপগত কোন পার্থক্যকে বুঝায় না। আমরা কোন গৃহকক্ষের অন্তর্গত এবং বহির্গত আলোকের (পার্থক্য) বিষয়ে আলোচনা করি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আলোক একটিই— ইহার পার্থক্য শুধু উপাধির জন্য। ঠিক সেইরূপভাবেই

উপাধি নাশের পর ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বিষয়ে যে বর্ণনা করা হয় তাহাও উপমামাত্র। যেমন কক্ষের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আলোক বাহিরের সাধারণ আলোকের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়, (সেইরূপ উপাধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে জীব ব্রহ্মের সহিত একই হইয়া যায়)।

উপপত্তেশ্চ ॥৩।২।৩৫॥

উপপত্তেঃ (যুক্তি হইতে) চ (এবং)।

৩৫. এবং ইহা যুক্তিসম্মতও বটে।

[৩৫. জীব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং ভেদ যে যথার্থ নহে তাহা যুক্তি দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়।]

এই সূত্রে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে যে, সম্বন্ধ এবং ভেদকে যথার্থরূপে গ্রহণ করা যায় না— ইহা রূপকমাত্র। সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত জীবের সংযোগ সম্বন্ধটি সত্য হইতে পারে না। "তিনি স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন" (ছাঃ৬.৮.১)— এই শ্রুতিবচনটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সংযোগ ব্যাপারটি স্বাভাবিক এবং ইহাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত অভেদত্বই বর্তমান— এখানে দুইটি বিভিন্ন বস্তুর সংযোগকে বুঝায় নাই। ঠিক এইরূপভাবেই উহাদের মধ্যে যে ভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য নহে— অবিদ্যা হেতুই যে এই প্রতীতি হয় তাহা অজস্র শ্রুতিবচন হইতেই জানিতে পারা যায়।

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৬॥

তথা (সেইরূপভাবেই) অন্যপ্রতিষেধাৎ (অন্য বস্তুসমূহের স্পষ্ট অস্বীকৃতি হইতে)ও (বুঝিতে পারা যায়)।

৩৬. এইরূপভাবেই অন্য বস্তুসমূহের স্পষ্ট অস্বীকৃতি হইতে (বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই)।

[৩৬. ব্রহ্ম ব্যতীত যে আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই তাহা পুনঃপুনঃ শাস্ত্রে উক্ত থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই একমাত্র অস্তিত্ববান বস্তু।]

ব্রহ্ম ব্যতীত যে আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই তাহা আরও যুক্তি দ্বারা বুঝানো হইতেছে। "এই সমস্তই আত্মা" (ছাঃ ৭.২৫.২): "এই সব কিছুই একমাত্র ব্রহ্ম"

(মুঃ ২.২.১১)— ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ।। ৩ । ২ ।৩৭ ।।

অনেন (ইহার দ্বারা) সর্বগতত্বম্ (সর্বব্যাপিত্বে) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্রহ্মের আয়তন বিষয়ে শাস্ত্রাদির উদ্ধৃতি হইতে) যেমন জানিতে পারা যায়।

৩৭. ইহার দ্বারা (ব্রহ্মের) সর্বব্যাপিত্ব (প্রতিষ্ঠিত) হইল, যেমন শাস্ত্রাদির উক্তি হইতেই (ব্রহ্মের) আয়তন বিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

[৩৭. ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর প্রতিষেধদ্বারা এবং শাস্ত্রাদিতে ব্যাপকত্ববাচক উক্তিগুলি হইতে ব্রহ্মের আয়তন (সর্বগতত্ব) সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী-ই।]

এই সূত্রে ব্রহ্মের সর্বত্রগামিত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় যাহা এই সিদ্ধান্তের পরিপূরক। শাস্ত্রে যে ব্রহ্মকে সেতু ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহাকে যথার্থ হিসাবে গণ্য করা যায় না— এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর সব বস্তুকে অস্বীকার করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র ব্রহ্মই সর্বব্যাপী। যদি 'সেতু' ইত্যাদিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া যান— তিনি সর্বব্যাপী হইতে পারেন না এবং ফলত শাশ্বতও হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে সর্বব্যাপী তাহা এই জাতীয় শ্রুতিবচন হইতেও জানিতে পারা যায়— "তিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী এবং সনাতন"। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৯.৬.৩.২) (গীতা ২.২৪ও দ্রষ্টব্য)

অধিকরণ ৮ : কর্মফল-দাতা ঈশ্বর।

ফলমতঃ, উপপত্তেঃ ।। ৩ । ২ । ৩৮ ।।

ফলম্ (কর্মফল) অতঃ (তাঁহা হইতে) উপপত্তেঃ (ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া)।

৩৮. (ঈশ্বর) হইতে কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ, ইহাই যুক্তিসম্মত।

[৩৮. জীবের কর্মফলদাতা যে ঈশ্বর তাহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।]

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করার পর, এখন সূত্রকার মীমাংসকদের কর্মফলদাতৃত্ববিষয়ে আলোচনার অবতারণা করিতেছেন। মীমাংসকগণের মতে কর্মই কর্মফলদাতা, ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের মতে ফলদাতা হিসাবে ঈশ্বরের কল্পনা অর্থহীন— কারণ, কর্মই স্বয়ং ভবিষ্যতে কর্মফল প্রদান করিতে পারে।

এই সূত্রটি এই মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বলে যে, একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কর্মফলদাতা। কর্ম হইল অচেতন এবং ক্ষণস্থায়ী এবং সেইজন্যই উহা কর্মকর্তার ইচ্ছামত ভবিষ্যতে ফল প্রদান করিতে পারে না। আমরা এমন কোন অচেতন বস্তু দেখি না যাহার উপাসনা করার পর ইহা উপাসককে ফলদান করিয়াছে। সুতরাং উপাসকগণ তাঁহাদের কর্মদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিলে একমাত্র ঈশ্বর হইতেই তাঁহাদের কর্মফল লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩।২।৩৯॥

শ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ হেতু) চ (এবং)।

৩৯. এবং শ্রুতিশাস্ত্রও এইরূপ উপদেশ করেন।

[৩৯. শ্রুতিশাস্ত্রেও এইজাতীয় উপদেশ আছে যে, কর্মফলদাতা ঈশ্বরই।]

শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, ঈশ্বরই জীবের কর্মফল দাতা। "এই আত্মাই মহান, অজ, অন্নাদ ও কর্মফলদাতা" (বৃঃ ৪.৪.২৪)।

ধর্মং জৈমিনিঃ, অতএব ॥৩।২।৪০॥

ধর্মং (যজ্ঞাদি ধর্মকর্মের ফল) জৈমিনিঃ (মুনি জৈমিনি) অতএব (এই কারণেই) বলেন।

৪০. ঋষি জৈমিনি একই কারণে (শাস্ত্রের প্রামাণ্য এবং যুক্তিসিদ্ধ কারণবশত) (মনে করেন যে যজ্ঞীয় কর্মাদিই কর্মফলদাতা)।

[৪০. যেহেতু ইহা শাস্ত্রে আছে এবং যেহেতু ইহা যুক্তিদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, সেইজন্য জৈমিনি মুনিও মনে করেন যে, কর্মই কর্মফলদাতা।]

পূর্বসূত্রে উল্লিখিত মতকে এখানে সমালোচনা করা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—"স্বর্গকামী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে" (তাণ্ড্য)। যেহেতু শাস্ত্রের প্রতিটি বিধিরই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেইজন্য ইহা যুক্তিযুক্তভাবেই ধরিয়া নেওয়া যায় যে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান স্বয়ংই ফলোৎপাদন করে। কিন্তু এই যুক্তিতে ইহা খণ্ডন করা যাইতে পারে যে, যেহেতু কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেইহেতু ইহা ভবিষ্যতের জন্য কোন ফলোৎপাদন করিতে পারে না। এই আপত্তিকে খণ্ডন করা হয় 'অপূর্ব' নামক একটি অলৌকিক সত্তার অনুমান করিয়া। কর্মদ্বারাই— কর্ম ধ্বংস হইবার পূর্বেই 'অপূর্ব' সৃষ্ট হয়, এবং এই অপূর্বের উপস্থিতির জন্যই সুদূর ভবিষ্যতেও কর্মফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ, যদি কর্মই

কোন ফলোৎপাদন করিতে না পারিত তাহা হইলে ইহা করিবার কোন সার্থকতাই থাকিত না। উপরন্তু একটি মাত্র কারণকে (ঈশ্বরকে) বহু এবং বিচিত্র ফলের হেতু বলিয়া অনুমান করাও যুক্তিযুক্ত নহে।

পূর্বংতু বাদরায়ণঃ, হেতুব্যপদেশাৎ ।।৩।২।৪১।।

পূর্বং (পূর্ববর্তী [কথিত ঈশ্বর]) তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ) হেতুব্যপদেশাৎ (তাঁহাকে [ঈশ্বরকে] সর্বকর্মের ফলের হেতু বলা হইয়াছে বলিয়া)।

৪১. কিন্তু ঋষি বাদরায়ণ (মনে করেন) যে, পূর্বোক্তই (ঈশ্বরই কর্মফলদাতা) যেহেতু তাঁহাকে (কর্মেরও) কারণ স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

[৪১. বাদরায়ণ কিন্তু মনে করেন যে, ফলদানে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সিদ্ধান্তই যথার্থ—কারণ শাস্ত্রেও ইহা বলা আছে।]

এখানে 'তু' শব্দটি ৪০ সংখ্যক সূত্রের মতকে খণ্ডন করিতেছে। কর্ম এবং অপূর্ব উভয়ই অচেতন, এবং সেইজন্যই কোন চেতনসত্তার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারা কোন ফলোৎপাদনে সক্ষম নহে। কারণ এইরূপ কোন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটিতে দেখা যায় না। কাণ্ড বা প্রস্তরের উপাসনা করিয়া কেহ কোন ফললাভ করিতে পারে না। সুতরাং কর্মের ফল একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসে— এবং ইহা আরও দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা হইতে যে, স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষকে তাঁহার ইচ্ছামত এইরূপ বা সেইরূপ (ভাল বা মন্দ) কার্য করাইয়া নেন। এবং জীব যেহেতু ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত হইয়াই কর্ম করিয়া থাকে সেইজন্য স্বয়ং ঈশ্বরই জীবের কর্মানুসারে যথাযোগ্য কর্মফলদাত। "তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই এই জগতে পরিচালিত করিয়া শুভকর্ম করাইয়া লন।" (কৌঃ৩.৮) "সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার নিকট হইতে কর্মফলদাতা আমারই দ্বারা বিহিত কাম্যবস্তু অবশ্যই লাভ করেন" (গীতা ৭.২১-২২)। ঈশ্বর যেহেতু জীবের পাপ এবং পুণ্যের বিচার করিতে পারেন, সেইজন্য একজাতীয় কারণ বহু জাতীয় ফলোৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহা বিচারসহ নহে।

পূর্ববর্তী চারটি প্রকরণে 'তৎ' নামক সত্তাটির বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমত দেখানো হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিরাকার, স্বয়ংপ্রভ এবং ভেদরহিত; দ্বিতীয়ত ব্রহ্মের মধ্যে বহুত্বকে অস্বীকার করি: ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, এবং পরিশেষে এই ব্যবহারিক জগতে ব্রহ্মকে সকল মানুষের কর্মের সকল ফলদাতা হিসাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। এইভাবেই 'তৎ' এবং 'ত্বম্' এই দুইটি সত্তাকে এই দুই পাদে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায় । তৃতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে 'তত্ত্বমসি' এই বৈদিক মহাবাক্যটির অন্তর্গত 'ত্বম্' এবং 'তৎ' এই দুইটি সত্তার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ইহারা অভিন্ন। এখন শাস্ত্র কতকগুলি উপাসনার (ধ্যান ধারণার) বিষয় উপদেশ করিতেছেন— যাহা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞানলাভের সহায়ক। অসীমকে ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং শাস্ত্র ব্রহ্মের কতকগুলি প্রতীকের কথা বলিতেছেন— যথা প্রাণ, আকাশ, এবং মন— প্রবর্তক সাধকগণ ইঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্ত্রসমূহ বৈশ্বানরের বিষয়ে ধ্যানের উপদেশও দিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইবার এই ধ্যান ধারণার পদ্ধতিকে বলা হয় বিদ্যা অথবা উপাসনা।

এই পাদে বিভিন্ন বিদ্যার বিষয় আলোচিত হইয়াছে যাহাদের সাহায্যে জীবাত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গেই স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠে যে, বেদের বিভিন্ন শাখাতে একই বিদ্যাকে যে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপদেশ করা হইয়াছে সেইগুলি কি একই, না ভিন্ন? এবং ফলত ঐগুলিকে কি একই উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, না পৃথক্ পৃথক্ভাবে উপাসনা করিয়া যাইতে হইবে? এখানেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কোন্ কোন্ বিদ্যা সমজাতীয় এবং এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং কোন্ কোন্ বিদ্যা কিছু পরিমাণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন-ই। এই বিদ্যাগুলিকে ব্যাখ্যা করার যে পূর্বাপর পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ: যেহেতু একমাত্র সত্য ব্রহ্মই সকল বেদেরই একমাত্র চরম উপলব্ধির বিষয়, সেইজন্য একই বিদ্যার বিশেষ বিশেষ অংশ, বিশেষ বিশেষ শাখায় বর্ণিত হইয়া থাকিলেও সেইগুলিকে একত্র সংহত করাই উপাসনার পক্ষে সহায়ক— কারণ, সকল শাখার অনুগামিগণের নিকটই ঐগুলি উপযোগী।

অধিকরণ ১: বিভিন্ন শাস্ত্রে (উপনিষদে) বা বিভিন্ন শাখাতে প্রাপ্ত অভিন্ন বা সমজাতীয় বিদ্যাকে একই বিদ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্, চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩।৩।১॥

সর্ব-বেদান্ত-প্রত্যয়ম্ (বিভিন্ন বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত) চোদনাদি-অবিশেষাৎ (বিধির— অর্থাৎ সংযোগ, রূপ এবং নামাদি ব্যাপারে) কোন পার্থক্য না থাকার জন্য।

১. (উপাসনাসমূহ) বিভিন্ন বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে (তাহা ভিন্ন নহে), কারণ ইহাদের বিধির প্রেরণা বিষয়ে (অর্থাৎ সম্বন্ধ রূপ ও নাম ইত্যাদি বিষয়ে) কোন ভিন্নতা নাই।

[১. ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইলেও উপাস্য বিষয় একই (ব্রহ্ম) এবং ফল (ব্রহ্ম-উপলব্ধি) বিষয়েও ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।]

বিভিন্ন বেদান্ত শাস্ত্রে বহু উপাসনা আছে যাহাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে 'প্রাণ' উপাসনার কথা। ইহাকে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার ছান্দোগ্য-উপনিষদেই অন্যভাবে উপদেশ করা হইয়াছে। এই জাতীয় উপাসনা— যাহাকে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে— তাহা কি এক, না ভিন্ন? বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, যেহেতু ইহাদের আকার ভিন্ন সেইহেতু ইহারা ভিন্ন-ই। এই সূত্রে এই বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, এই উপাসনাগুলি এক এবং অভিন্নই— কারণ ইহাদের বিধান, সম্বন্ধ, নাম এবং রূপ বিষয়ে বিভিন্ন শাখাবলম্বীদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। যেমন সকল শাখাতেই আছে এই নির্দেশ— "অগ্নিহোত্র যাগ সকলেরই কর্তব্য" ইত্যাদি (মৈঃ ৬.৩৬) — সেইজন্য প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ একটি-ই মাত্র, এবং যেমন জ্যোতিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞ বিভিন্ন শাখাতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা একটি-ই মাত্র; সেইরূপভাবে বিধিনিষেধাদি ব্যাপারেও ইহাদের অভিন্নতাহেতু উহারা একই— যেমন "যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন" (বৃহঃ ৬.১.১)। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই উভয় উপনিষদের মধ্যেও প্রাণ বিদ্যা সকল শাখাতেই এক এবং অভিন্ন। এইভাবেই উপাসনার ফল বিষয়েও উপনিষদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। "যিনি ইঁহাকে এইরূপভাবে জানেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া যান"— (তদেব ৬.১.১)। উপাসনার বিষয় প্রাণকে উভয় উপনিষদেই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উভয় উপাসনাকেই প্রাণবিদ্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং সর্ববিষয়েই কোন পার্থক্য না থাকায় এই উভয় বিদ্যা ভিন্ন নহে— একই। বিভিন্ন শাখাতে যে দহরবিদ্যা, বৈশ্বানর উপাসনা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা ইত্যাদির বর্ণনা আছে— সেই সকলের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই।

ভেদান্নেতি চেৎ, ন একস্যামপি ।।৩।৩।২।।

ভেদাৎ (ভেদহেতু) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) একস্যামপি (এমনকি একই বিদ্যার মধ্যেও)।

২. যদি এইরূপ বলা হয় (যে বিদ্যাসমূহ এক) নহে, কারণ (গৌণ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে) ভেদ আছে। (ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে) না, তাহা এইরূপ নহে, যেহেতু একই বিদ্যার মধ্যেও (এইরূপ গৌণ ব্যাপারে পার্থক্য থাকিতে পারে)।

[২. উপাসনার প্রকার ভেদ আছে— অতএব সর্ব বেদান্তবর্ণিত উপাসনা এক নহে— এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না— কারণ, উপাসনা এক হইলেও তাহার প্রকার ভেদ থাকিতে পারে।]

অপর একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে, যেহেতু বিভিন্ন শাখায় বর্ণিত বিদ্যাগুলির মধ্যে কথঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেইহেতু উপাসনাগুলি এক হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে উপাসনার বিষয় হিসাবে একটি ষষ্ঠ অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে: "তাঁহার পক্ষে ঐ অগ্নিই অগ্নি"— (বৃঃ ৬.২.১৪); অপরপক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাই— "পরন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিকে উপাসনা করেন"— (ছাঃ ৫.১০.১০)। সুতরাং দুইটি বিদ্যার আকারের পার্থক্যহেতু এই দুই বিদ্যা এক হইতে পারে না। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, ইহারা একই— কারণ একই বিদ্যার মধ্যেও আকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত স্বর্গাদি পঞ্চাগ্নি বৃহদারণ্যকে বর্ণিত পঞ্চাগ্নির সহিত অভিন্নই। সেইজন্যই এই দুই উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ষষ্ঠ অগ্নির উল্লেখ বা অনুল্লেখও আকারগত কোন ভেদ সৃষ্টি করিতে পারে না— কারণ, একই অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী ঘটকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, নাও করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, অধিকাংশ অগ্নিকেই উভয়ত্র গ্রহণ করার জন্য ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যার ক্ষেত্রেও ষষ্ঠ অগ্নিকেও যোগ করা উচিত। অগ্নির সংখ্যা বর্ধিত হইলেও 'পঞ্চাগ্নি'— এই নামটি ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ পঞ্চ এই সংখ্যাটি এই বিধির ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নহে।

অধিকন্তু, এমনকি একই শাখার একই বিদ্যার বর্ণনায় বিভিন্ন অধ্যায়ে এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তথাপি সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত এই বিদ্যাকে একই বিদ্যা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সেইহেতু, বিভিন্ন শাখায় এই প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও এক-জাতীয় বিদ্যাকে এক বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত— ইহারা আসলে ভিন্ন নহে।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ।।৩।৩।৩।।

স্বাধ্যায়স্য (বেদপাঠের) তথাত্বেন (এইরূপ হইবার নিমিত্ত) হি (কারণ) সমাচারে (সমাচার নামক গ্রন্থে) অধিকারাৎ (অধিকার থাকার জন্য) চ (এবং) সববৎ (সৌর ইত্যাদি সাতটি আহুতির ন্যায়) চ (এবং) তন্নিয়মঃ (সেই বিধি)।

৩. (মস্তকে অগ্নিকে বহন করিবার ব্রতটি সংশ্লিষ্ট) বেদপাঠের সহিত, কারণ সমাচারে (গ্রন্থে) ইহা এইরূপ বর্ণিত আছে। এবং (ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে) ইহা অথর্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীদের একটি গুণ বিশেষ, সেইরূপ সপ্ত আহুতি (সৌরাদি) বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

[৩. মস্তকে অগ্নিধারণ— শিরোব্রত ক্রিয়াটি বেদপাঠের সহিতই সংশ্লিষ্ট— কারণ সমাচার গ্রন্থে এইরূপ ক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা অথর্ববেদপাঠীদের একটি গুণ বিশেষ। সেইরূপেই সপ্তাহুতি ইত্যাদি বিষয়কেও স্বাধ্যায়েরই অঙ্গ হিসাবে বুঝিতে হইবে— উপাসনার পার্থক্য হিসাবে নহে।]

এখানে আরও একটি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদে যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেখানে বিদ্যার্থীকে মস্তকে অগ্নিকে বহন করার (শিরোব্রতের) বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিরুদ্ধবাদিগণ মনে করেন যে, অথর্ববেদাবলম্বীরা এই বিশেষ ব্রতটির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া— অন্যান্য বেদের বিদ্যা হইতে ইহাদের অনুষ্ঠেয় বিদ্যাটি ভিন্ন। এই সূত্রটি এই আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, এই 'শিরোব্রত' অনুষ্ঠানটি বিদ্যার কোন গুণ বা বিশেষণ নহে— ইহা অথর্ববেদের স্বাধ্যায়ের একটি ক্রিয়া মাত্র। বেদের ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ সমাচারে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যাই করা আছে। "যে ব্যক্তি (শিরোব্রত) আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করেন না"— (মুঃ ৩.২.১১) ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ইহা উপনিষদের পাঠ বা স্বাধ্যায়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট— বিদ্যার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শিরোব্রত অনুষ্ঠানটি ঐ বিশেষ বেদের স্বাধ্যায়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট— অন্যের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই— যেমন সপ্তাহুতির ক্রিয়াটি শুধুমাত্র অথর্ববেদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত অন্য কোন বেদের অগ্নি সম্পর্কে উপদেশের ক্ষেত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যার (উপাসনার) একত্বই প্রতিপন্ন হয়।

দর্শয়তি চ ।।৩।৩।৪।।

দর্শয়তি (উপদেশ দেয়) চ (এবং)।

৪. (শাস্ত্রও) এইরূপই উপদেশ প্রদান করেন।

[৪. সকল শ্রুতিও উপাসনার এই একত্বের কথাই বলিয়াছেন।]

"বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন"— (কঠ: ১.২.১৫) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নির্গুণ ব্রহ্মই হইলেন সকল বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইঁহার সম্পর্কে সকল বিদ্যাও (উপাসনাও) এক-ই হইবে। এইভাবে বৃহদারণ্যকে মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত বলিয়া বর্ণিত যে, বৈশ্বানররূপী সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে তাহাই ছান্দোগ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহা সুবিদিত:— "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা" (ছাঃ ৫.১৭.১)— ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে-সকল বৈশ্বানর বিদ্যাই এক। এইভাবে যেহেতু সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এক এবং বহু নহেন, সেইহেতু যে-সকল বিশেষ বিদ্যা ইহাদের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে— তাহারাও একই— বহু নহে। একই মন্ত্রসমূহ বিশেষ স্থানে বিহিত হইয়া প্রযুক্ত হইলেও ঐ সকল মন্ত্রই অন্যত্রও উপাসনার নিমিত্ত বিহিত হইয়া থাকে— ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, সকল বিদ্যাই এক। বৈশ্বানর বিদ্যা ব্যতীত অন্য বিদ্যা সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, এবং ফলত এই সকল উপাসনা বহু নহে— যদিও ইহারা বেদের বিভিন্ন শাখাতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিভিন্ন বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন করার পর, এখন ইহাদের ফল সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অধিকরণ ২: একই প্রকার বিদ্যাসমূহের খুঁটিনাটি যাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন শাখাতে বর্ণিত হইয়াছে— তাহাদিগকে একই উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎসমানে চ ।।৩।৩।৫।।

উপসংহারঃ (একত্র সম্মেলন) অর্থাভেদাৎ (যেহেতু উপাসনার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই) বিধিশেষবৎ (প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত গৌণ ক্রিয়াসমূহের ন্যায়) সমানে চ (এবং একই শ্রেণীর উপাসনার অন্তর্গত)।

৫. এবং (বিভিন্ন শাখাতে বর্ণিত) একই শ্রেণীর উপাসনাসমূহের মধ্যে (বিভিন্ন শাখাবর্ণিত উপাসনার অঙ্গীভূত ক্রিয়াবৈচিত্র্যকে) সংহৃত করিতে হইবে, কারণ উপাসনার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, যেমন একটি যজ্ঞের অন্তর্গত গৌণ ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন শাখাতে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিলেও একত্র সংবদ্ধ করা হয়।

[৫. সমস্ত বেদোক্ত উপাসনাই এক এবং অভিন্ন। তাহাদের যখন কোন ভেদ নাই, তখন সেই সেই উপাসনার অঙ্গগুলি উপাসনার একত্বহেতু উপসংহার (একত্র সমাবেশ) করা কর্তব্য। যেমন বিভিন্ন বেদোক্ত একই যজ্ঞে বিভিন্ন বিধানগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করার নিয়ম আছে।]

পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, বিভিন্ন শাখাতে যে বিদ্যাসমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদিগকে উপাসনার জন্য একত্র সংবদ্ধ করিতে হইবে— যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ্য মোটের উপর একই। নিজস্ব শাখার বহির্ভূত অন্য শাখাতে যে-সকল অনুষ্ঠানাদির কথা বলা হইয়াছে সেইগুলিও সাধনার পক্ষে উপযোগী, এবং সেইজন্যই এইগুলির একত্র উপসংহার করা প্রয়োজন— যেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অঙ্গ-ক্রিয়াগুলিকে বেদের বিভিন্ন শাখায় বর্ণিত প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় একত্র সংহৃত করা হইয়া থাকে।

অধিকরণ ৩: যে-সকল বিদ্যার বিষয়বস্তু যথার্থই ভিন্ন, তাহারা ভিন্নই যদিও অন্য বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিতে পারে।

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥

অন্যথাত্বং (পার্থক্য আছে) শব্দাৎ (কারণ, শাস্ত্রের উপদেশের পার্থক্যহেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ হইতে পারে না) অবিশেষাৎ (অভিন্নতাহেতু—মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে)।

৬. যদি এইরূপ বলা হয় (যে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত উদ্গীথ বিদ্যার মধ্যে) পার্থক্য আছে কারণ তাহাদের শ্রুতির মধ্যে (পার্থক্য আছে)। (তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে), না, তাহা নহে; কারণ তাহাদের (মূল উপাসনা বিষয়ে) কোন পার্থক্যই নাই।

[৬. বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উদ্গীথ বিদ্যা বিষয়ে শ্রুতিবচনের পার্থক্যহেতু ইহাদিগকে ভিন্ন বলা যায় না— কারণ উহাদের উভয়েরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন পার্থক্যই নাই।]

এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের অভিমতকে প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান যে, বিদ্যা দুইটি একই। "অতঃপর দেবগণ এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, 'আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান করুন'।" 'তথাস্তু' বলিয়া এই প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। (বৃহঃ ১.৩.৭) "অনন্তর এই যে মুখ্য প্রাণ তাঁহাকে দেবতারা 'ওম্' এইরূপ উদ্গীথ বিষয়ে উপাসনা করিলেন— ইনিই সেই মুখ্য প্রাণ" (ছাঃ ১.২.৭)। যেহেতু ইহাদের শ্রুতি এক নহে, সেইজন্য ইহারা এক হইতে পারে না— এইরূপ একটি আপত্তি এখানে উঠিতে পারে। কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে। (উভয়ের সাদৃশ্যের জন্য উভয়ের শ্রুতি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৩.৩.১ সূত্রে প্রদত্ত যুক্তি অনুসারে বিদ্যাগুলির মধ্যে ঐক্য আছে।

ন বা, প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ।।৩।৩।৭।।

ন বা (বরং নহে) প্রকরণ-ভেদাৎ (বিষয়বস্তুর পার্থক্যহেতু) পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ যেমন উদ্গীথ উপাসনায় পর-বরীয় (শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ) ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকার উপাসনার কথা উল্লেখ আছে।

৭. বরং বিদ্যাগুলির মধ্যে ঐক্য নাই বলিতে হয়, কারণ তাহাদের প্রকরণের ভেদ আছে; যেমন (উদ্গীথ উপাসনায়) জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মকে) (চক্ষু ইত্যাদিতে অবস্থানকারী উদ্গীথ বিষয়ে উপাসনায় পৃথক্‌ভাবেই কল্পনা করা হইয়াছে)।

[৭. প্রকরণের ভেদহেতু উপাসনাও বরং ভিন্নই— যেমন পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট (ব্রহ্মের) উদ্গীথ উপাসনা— হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ-উপাসনা হইতে ভিন্ন।]

এই সূত্রটি পূর্ব মতটিকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিতে চায় যে, দুইটি বিদ্যার মধ্যে বহুলাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের প্রকরণের ভিন্নতাহেতু তাহারা এক নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গীথ (মন্ত্রের) একটি মাত্র অংশ ওঁ অক্ষরটিকে মাত্র প্রাণ উপাসনার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে: "উদ্গীথ শব্দবাচ্য ওম্ এই (বর্ণাত্মক) অক্ষরকে উপাসনা করিবে" (ছাঃ ১.১.১)। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে সমগ্র উদ্গীথ

মন্ত্রকেই প্রাণরূপে উপাসনা করা হয় (বৃঃ ১.৩.২ দ্রষ্টব্য)। উপাসনার বিষয়বস্তুর এই পার্থক্যহেতু এই দুই বিদ্যাকে এক বলা যাইতে পারে না। উদ্গীথ উপাসনার "ইনিই (পরোবরীয়ান) উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর উদ্গীথ" (ছাঃ ১ .৯.২)— ইত্যাদি বিধানের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়— কারণ ছান্দোগ্য ১.৬ শ্রুতিতে উদ্গীথকে আদিত্যের অক্ষিতে অধিষ্ঠিত মনে করিয়া উপাসনা করা হয়।

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি ।।৩।৩।৮।।

সংজ্ঞাতঃ (নামের [একত্ব] হেতু) চেৎ (যদি) তৎ (ইহা) উক্তম্ (তাহা পূর্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে) অস্তি (বর্তমান আছে) তু (কিন্তু) তৎ (তাহা) অপি (ও)।

৮. যদি সংজ্ঞাহেতু (উভয় বিদ্যার একই নাম হওয়ার জন্য ইহারা একই এইরূপ বলা হয়)? — ইহার খণ্ডন পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইলেও (বিদ্যার নাম এক হইলেও ইহাদের পার্থক্য) থাকিয়াই যায়।

[৮. 'উদ্গীথ' এই নাম উভয়স্থলেই এক বলিয়া বিদ্যাও একই— এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ পূর্বসূত্রেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। সংজ্ঞা এক হইলেও যে বিষয়ের ভেদ হইতে পারে— ইহার দৃষ্টান্ত বহু আছে।]

নামের একত্বদ্বারা বিদ্যাও এক হইবে এইরূপ দাবি করা যুক্তিসঙ্গত নহে— কারণ ইহাদের বিষয়বস্তু ভিন্ন। পূর্ববর্তী সূত্রে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে। অধিকন্তু শাস্ত্রেও এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, ইত্যাদি বিভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ কাঠকে থাকায়, সব কয়টিকেই কাঠক বলা হয়। এইরকম ছান্দোগ্য ১.৬ এবং ছাঃ ১.৯.২-এর উদ্গীথ উপাসনার দুইটি বিদ্যা ভিন্ন।

অধিকরণ ৪ : 'ওম্'-কে উদ্গীথ বিদ্যায় বৈশিষ্ট্যদ্যোতকরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ 'ওম্' সকল বেদেই সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত।

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ।।৩।৩।৯।।

ব্যাপ্তেঃ (যেহেতু [ওম্] সকল বেদেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে) চ (এবং) সমঞ্জসম্ (সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

৯. এবং যেহেতু (ওম্) (সকল বেদেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে) (সেইহেতু ইহাকে উদ্গীথ শব্দদ্বারা বিশেষিত করাই) যুক্তিসঙ্গত।

[৯. এবং যেহেতু 'ওম্' শব্দটি সকল বেদেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেইহেতু উদ্গীথ বিদ্যার উপাসনায় 'ওম্'-কে বিশেষরূপে গ্রহণ করিলেই সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে।]

যেহেতু 'ওম্' সকল বেদেই সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেইজন্য আমাদিগকে বুঝিতে হইবে আমরা কোন্ বিশেষ 'ওম্'-এর উপাসনা করিব। উদ্গীথের অংশবিশেষ সেই 'ওম্'-কে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উদ্গীথ উপাসনা করিতে হইবে— আমরা এই 'ওম্'-কে সামবেদের 'ওম্' বলিয়াই জানিয়া থাকি। "উদ্গীথ শব্দবাচ্য 'ওম্' এই বর্ণাত্মক অক্ষরকে উপাসনা করিবে" (ছাঃ ১.১.১)।

অধিকরণ ৫ : প্রাণ বিদ্যার একত্ব।

সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩।৩।১০॥

সর্বাভেদাৎ (সর্বপ্রকার অভেদহেতু) অন্যত্র (অন্য স্থলে) ইমে (এইসকল গুণকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)।

১০. (বিদ্যার) অভিন্নতাহেতু সর্বত্র (অর্থাৎ যেখানে যেখানে প্রাণ বিদ্যার কথা আছে— সেইসকল শাখার বিভিন্ন শ্রুতিতে) এই বিশেষণগুলিকে (উল্লিখিত এই দুইটির সঙ্গেই যুক্ত করিতে হইবে) অন্যত্রও (অর্থাৎ কৌষীতকী উপনিষদেও)।

[১০. ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক বাক্যের সহিত কৌষীতকী উপনিষদের বাক্যের যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুসরণেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।]

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাণ বিদ্যায় আমরা দেখিতে পাই যে, বাক্ ইত্যাদির সম্পর্কে বিত্তবত্তম (সর্বাপেক্ষা বিত্তবান) ইত্যাদি বিশেষণ যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পরিশেষে প্রাণের সম্পর্কেই প্রযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কৌষীতকী উপনিষদে এইরূপ হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কৌষীতকী উপনিষদে এইরূপ উল্লেখ না থাকিলেও, সেখানেও কি এইরূপ গুণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ঐ গুণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে; যেহেতু এই তিনটি উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যাটি একই। এক এবং অভিন্ন বিদ্যার গুণগুলিকে, তাহারা যেখানেই উল্লিখিত থাকুক না কেন, এবং তাহার স্পষ্টত উল্লেখ না থাকিলেও তাহাদিগকে একত্র সংবদ্ধ করিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে।

অধিকরণ ৬ঃ ব্রহ্মবিষয়ে সকল উপাসনাতেই ব্রহ্মের লক্ষণবাচক 'আনন্দময়' ইত্যাদি গুণগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়াই এক উপাসনায় প্রয়োগ করিতে হইবে— অন্য কিছুকে নহে।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ।।৩।৩।১১।।

আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ এবং অন্যান্য গুণসমূহকে) প্রধানস্য (প্রধান বিষয়ের— অর্থাৎ ব্রহ্মের)।

১১. আনন্দ এবং অন্যান্য গুণসমূহকে (যাহা) ব্রহ্মের (যথার্থ লক্ষণকে প্রকাশ করে) (অন্যান্য সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মের উপাসনায় প্রয়োগ করিতে হইবে)।

[১১. 'আনন্দময়' প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক গুণসমূহ শাস্ত্রের যেখানেই থাকুক না কেন তাহাদিগকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রয়োগ করিতে হইবে।]

ব্রহ্মকে আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, সর্বব্যাপী, সর্বাত্মা, সত্য ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণে বিভিন্ন শ্রুতির বিভিন্ন শাখায় বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রের সর্বত্র সমস্তগুণের বর্ণনা করা হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে এইসকল গুণগুলিকে ব্রহ্ম উপাসনার ক্ষেত্রে একত্র সংবদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে কি না। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এইসকল গুণরাশিকে একত্র সংবদ্ধভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উপাস্য বিষয় (ব্রহ্ম) হইলেন সকল শাখাতেই এক এবং অভিন্ন। সেইহেতু বিদ্যাও (উপাসনাও) একই হইবে।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ উপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ।।৩।৩।১২।।

প্রিয়শিরস্ত্বাদি (প্রিয় [আনন্দ] ইহার শির— ইত্যাদি বিশেষণ) অপ্রাপ্তিঃ (সর্বত্র গ্রাহ্য নহে) উপচয়াপচয়ৌ (বৃদ্ধি এবং হ্রাস) হি (কারণ) ভেদে (পার্থক্যের ক্ষেত্রে সম্ভব)।

১২. 'প্রিয়শির' ইত্যাদি (গুণগুলি) সর্বত্র গ্রাহ্য নহে, (কারণ ইহা হ্রাস বৃদ্ধির অধীন), হ্রাসবৃদ্ধি সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে ভেদ আছে (ব্রহ্মের ক্ষেত্রে কোন ভেদ নাই, সেইজন্য এক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে)।

[১২. শির, পক্ষ, পুচ্ছ ইত্যাদি ব্রহ্মের অবয়বরূপ গুণের সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ এইরূপ অবয়ব-ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধিও স্বীকার করিতে হয়। ইহা শ্রুতি বিরুদ্ধ।]

'প্রিয়শির' ইত্যাদি গুণগুলি যাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র বর্ণিত ব্রহ্মের উপাসনার ক্ষেত্রে সমবেতভাবে গ্রহণীয় নহে। কারণ— প্রিয়ত্ব, তুষ্টি, মহাতুষ্টি, আনন্দ ইত্যাদি শব্দ এমন কতকগুলি গুণকে লক্ষ্য করে, যাহাদের হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্য পরস্পর এবং অন্য ভোক্তার (জীবের) ক্ষেত্রেও আপেক্ষিক এবং সেইজন্যই যেখানে শুধু ভেদ আছে সেখানেই তাহারা থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে ভেদরহিত, সেইহেতু এই উপাধিগুলি ইহার লক্ষণ হইতে পারে না। এবং সেইজন্যই শ্রুতির যেস্থানে যে প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে সেই স্থানেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন— অন্যক্ষেত্রে তাহাদের লইয়া যাওয়া ঠিক নহে।

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩॥

ইতরে (অন্য গুণরাশি) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যাৎ (উদ্দেশ্যের একত্বহেতু)।

১৩. কিন্তু অন্য বিশেষণগুলিকে (যথা আনন্দ ইত্যাদিকে সংগ্রহ করিতে হইবে কারণ ইহাদের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য একই)।

[১৩. প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং এই গুণগুলি ব্রহ্মের সহিত সমান অর্থবোধক। অতএব ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল আনন্দাদিগুণ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।]

আনন্দময়ত্ব, বিজ্ঞানময়ত্ব সর্বব্যাপিত্ব ইত্যাদি গুণসমূহ— যাহারা ব্রহ্মের লক্ষণবোধক, সেইসকল গুণকে সংগ্রহ করিতে হইবে, কারণ এই সকলের তাৎপর্য হইল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। এইসকল গুণরাশির উল্লেখ করা হইয়াছে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য— উপাসনার জন্য নহে।

অধিকরণ ৭: কঠোপনিষদের ১.৩.১০-১১ মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য হইল এই শিক্ষা দেওয়া যে, ব্রহ্ম হইলেন অন্য সব কিছু হইতে শ্রেষ্ঠ।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥

আধ্যানায় (উপাসনার নিমিত্ত) প্রয়োজন-অভাবাৎ (যেহেতু কোন প্রয়োজন নাই)।

১৪. (কাঠক ১.৩.১০-১১ শ্রুতি একমাত্র আত্মাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শিক্ষা দেন) ধ্যান বা উপাসনাদির জন্য (কিন্তু বিষয়সমূহের পারস্পরিক গুরুত্ব বা স্থান বুঝাইবার জন্য নহে) কারণ ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

[১৪. কঠোপনিষদের ১.৩.১০-১১ মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য হইল আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা— এবং আত্মা যে একমাত্র উপাস্য তাহা জ্ঞাপন করা। উপাসনার জন্যই এই মন্ত্রগুলি— বস্তুসমূহের তারতম্য নির্ণয় করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।]

"ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, এবং অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। ...পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা তিনিই পরমগতি" (কঠঃ ১.৩.১০-১১)। বিরুদ্ধবাদিগণ মনে করেন যে, এই বাক্যগুলি পৃথক্— এবং এক নহে এবং ইহারা একমাত্র আত্মাকেই লক্ষ্য করে। সেইজন্য শ্রুতির উদ্দেশ্য হইল এই শিক্ষা দেওয়া যে, "ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি...। এই সূত্রটি এই মতের খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, ইহারা সবগুলিই হইল একটি বাক্য; এবং ইহার বক্তব্য হইল এই যে, আত্মাই হইলেন ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য হইল আত্মার বিষয়ে ধ্যানের সহায়তা করা— যে ধ্যান হইতে ফলশ্রুতি হিসাবে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, কারণ আত্মজ্ঞানই মুক্তি দান করে। কিন্তু "ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি বিষয়জ্ঞান দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না— সেইজন্য এই বিষয়জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কখনও শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

আত্মশব্দাচ্চ ॥৩।৩।১৫॥

আত্মশব্দাৎ (আত্ম শব্দ হইতে) চ (এবং)।

১৫. এবং 'আত্মা' এই শব্দের উল্লেখ হেতু।

[১৫. আত্মা শব্দের উল্লেখ থাকা হেতু বুঝিতে হইবে যে, শির, পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে। কারণ আত্মার এইরূপ অবয়ব অসম্ভব।]

পূর্ববর্তী সূত্রে প্রতিষ্ঠিত মতকে এই বলিয়া আরও দৃঢ়তর করার জন্য, এখানে আলোচ্য বিষয় হইলেন— পরমাত্মা। "এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মারূপে প্রকাশিত হন না" (কঠঃ ১.৩.১২)— ইহার দ্বারা ইহাই লক্ষ্য করা হইল যে, অপর সব বস্তু অ-নাত্মা। কিন্তু যে-সকল বস্তুর পর পর উল্লেখ করা হইল, তাহা

সম্পূর্ণ অর্থহীন নহে, যেহেতু ইহা আমাদের বহির্মুখী মনকে ক্রমে ক্রমে আত্মমুখী হইতে সাহায্য করে— কারণ এই আত্মাকে গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা সুকঠিন।

অধিকরণ ৮: ঐতরেয় উপনিষদে ১.১ শ্রুতিতে যে আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি পরমাত্মা, সেইজন্যই অন্যত্র আত্মার যে-সকল গুণের উল্লেখ আছে তাহার সবগুলিকেই ঐতরেয়ক উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

আত্মগৃহীতিরিতরবৎ, উত্তরাৎ ॥৩।৩।১৬॥

আত্ম-গৃহীতিঃ (পরমাত্মাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে) ইতরবৎ (যেমন অন্য শ্রুতিতে— সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে—) উত্তরাৎ (পরবর্তী কালে উল্লিখিত গুণসমূহ হইতে)।

১৬. (ঐতরেয় উপনিষদের ১.১ শ্রুতিতে) পরমাত্মার বিষয়েই উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন অন্য শ্রুতিতে (সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনায়), কারণ ইহা আমরা পরবর্তী গুণসমূহের উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারি।

[১৬. আত্মা শব্দ সর্বত্রই পরমাত্মাবোধক। ঐতরেয় শ্রুতির প্রথমে আত্মা বলিতে পরমাত্মাকেই বুঝানো হইয়াছে কারণ শ্রুতির শেষাংশে "আমি বহু হইব"— এই উক্তির দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় 'আত্মা' পরমাত্মাই।]

"সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না"— (ঐঃ ১.১)। এখানে এই 'আত্মা' শব্দদ্বারা কি পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, না হিরণ্যগর্ভকে? ইহা পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। যেমন অন্যান্য শ্রুতিতেও 'আত্মা' শব্দটি সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে হিরণ্যগর্ভকে নহে: "আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল (তৈঃ ২.১)।" ইহা কিভাবে বুঝিতে পারিব?— কারণ ঐতরেয় শ্রুতির পরবর্তী অংশে আমরা পাই: "সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন— "আমি লোকসমূহ সৃজন করিব। (অতঃপর) তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন"— (ঐঃ ১.১-২)। "তিনি ঈক্ষণ করিলেন"— সৃষ্টির পূর্বে বর্ণিত এই গুণটি প্রাথমিক অর্থে অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মা শব্দদ্বারা পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে — হিরণ্যগর্ভকে নহে।

অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাৎ অবধারণাৎ ।।৩।৩।১৭।।

অন্বয়াৎ (পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্রানুসারে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) স্যাৎ (এইরূপ হইতেও পারে) অবধারণাৎ (স্পষ্ট উল্লেখ হেতু)।

১৭. যদি এইরূপ বলা হয় যে, আলোচনার সূত্রানুসারে (পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কিন্তু হিরণ্যগর্ভকে), (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) ইহা এইরূপই (অর্থাৎ পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে) — এইরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ হেতু (বুঝিব একমাত্র আত্মাই সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিলেন)।

[১৭. যদি বলা হয় যে, আলোচনার সূত্রানুসারে (এখানে আত্মা বলিতে পরমাত্মাকে নহে, হিরণ্যগর্ভকেই বুঝাইয়াছে) ইহার উত্তরে বলা যায় যে, না, ইহা এইরূপ নহে, এখানে পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে— কারণ এইরূপ স্পষ্ট উক্তি শ্রুতিতে আছে।]

ঐতরেয় উপনিষদের ১.১ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মাই চারিটি লোক (জগৎ) সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় এবং অন্যান্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা আকাশ, জল ইত্যাদি পঞ্চ ভূতকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার, ইহাও আমাদের নিকট সুবিদিত যে পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থসমূহ দ্বারা হিরণ্যগর্ভ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ঐতরেয় শ্রুতির আত্মা বলিতে পরমাত্মাকে বুঝায় না— কিন্তু হিরণ্যগর্ভকেই বুঝায়। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে— "সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল"(ঐ ১.১)— এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মাই বর্তমান ছিলেন। এই শ্রুতিবচনটি একমাত্র পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে— হিরণ্যগর্ভকে নহে। সুতরাং আমাদিগকে এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মাই প্রথমে পদার্থগুলি সৃষ্টি করিয়া পরে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন— যাহা অন্য শাখার শ্রুতিতে বর্ণনা করা আছে।

১৬ এবং ১৭ সংখ্যক সূত্রের পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য হইল এই যে— পরমাত্মার যে-সকল গুণ অন্যত্র বর্ণিত আছে, তাদের সব কয়টিকেই একত্র সংবদ্ধ করিয়া ঐতরেয়ক উপাসনায় প্রয়োগ করিতে হইবে।

অধিকরণ ৯: প্রাণ বিদ্যাতে মুখ প্রক্ষালনের কোন বিধান নাই; শুধু জলকে প্রাণের আবরকরূপে ধ্যান করিবার নির্দেশই আছে।

কার্যাখ্যানাদপূর্বম্ ।।৩।৩।১৮।।

কার্যাখ্যানাৎ (একটি কার্যের পুনরুল্লেখ হেতু স্মৃতিতে যাহার ব্যবস্থা দেওয়া আছে) অপূর্বম্ (যাহার বিধান অন্য কোথাও করা হয় নাই)।

১৮. (প্রাণ বিদ্যাতে জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালনের) উল্লেখহেতু একটি কার্যের পুনরুল্লেখই হইল (স্মৃতিতে ইহার বিধান আছে), যাহা অন্যত্র বিহিত হয় নাই (তাহাই এখানে শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে)।

[১৮. স্মৃতি এবং শ্রুতি উভয়ত্র আহারের পূর্বে এবং পরে আচমনের বিধান আছে— কিন্তু উভয় আচমনের অর্থ এক নহে। শ্রুত্যুক্ত আচমনের অর্থ জলকে প্রাণের আবরকরূপে ধ্যান করা। এখানে শ্রুত্যুক্ত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫.২.২. এবং বৃহদারণ্যকের ৬.১.১৪ শ্রুতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, আহারের পূর্বে এবং পরে জলদ্বারা আচমনের উল্লেখ আছে— এই আচমনের দ্বারা মনে করা হয় যে, প্রাণকে আবৃত করা হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রুতি কি এই উভয়টিরই ব্যবস্থা দিয়াছেন না শুধুমাত্র পরবর্তীটির। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যেহেতু পূর্ববর্তী মুখপ্রক্ষালন ব্যাপারটি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিধান করা হইয়াছে, সেইহেতু পরবর্তী ক্রিয়াটি— অর্থাৎ জলকে প্রাণের আবরণরূপে কল্পনা করিয়া ধ্যান করিবার ব্যবস্থাটিই মাত্র শ্রুতির বিধান।

অধিকরণ ১০ : একই শাখার একইরূপ বা অভিন্ন বিদ্যাসমূহকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, কারণ তাহারা একই।

সমান এবঞ্চ, অভেদাৎ ॥৩।৩।১৯॥

সমানে (একই শাখার অন্তর্গত) এবম্ (ইহা এইরূপই) চ (এবং) অভেদাৎ (অভিন্নতা হেতু)।

১৯. একই শাখার অন্তর্গত বিষয়েও ইহা এইরূপই হইবে (অর্থাৎ বিদ্যার একত্বই হইবে), অভিন্নতা হেতু (উপাসনার ব্যাপারে)।

[১৯. একই শাখার অন্তর্গত একই বিদ্যার গুণগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিতে হইবে— কারণ উপাসনার বিষয়ও একই (ব্রহ্ম)।]

বাজসনেয়ী শাখার অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা নামে একটি বিদ্যা আছে। ইহাতে এই শ্রুতিটি আছে: "মনোময় আত্মার ধ্যান করিবে" (শতপথ ব্রাঃ ১০.৬.৩.২)।

পুনশ্চ একই শাখার অন্তর্গত বৃহদারণ্যকে আমরা পাই,"ইহা মনোময়রূপ প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি (বৃহঃ ৫.৬.১)। এই দুইটি শ্রুতি কি একই বিদ্যাভুক্ত— যে বিদ্যার মধ্যে উভয় শ্রুতির অঙ্গগুলিকে সংবদ্ধ করিতে হইবে— অথবা ইহারা পৃথক্ দুইটি

বিদ্যা ? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ইহারা একই বিদ্যাভুক্ত, কারণ ইহাদের উভয়েরই উপাসনার বিষয়বস্তু হইলেন মনোময় আত্মা। একই শাখার অন্তর্গত একটি অনুরূপ বিদ্যার আঙ্গিকগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া উপাসনা করার যে নিয়মটি আছে, একই বিদ্যা বিভিন্ন শাখায় বর্ণিত হইলেও ইহাদের একত্র সংবদ্ধ করিয়া উপাসনা করার নিয়মটিও ঠিক ইহারই অনুরূপ। সুতরাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাও একটি-ই।

অধিকরণ ১১ : বৃহদারণ্যকের ৫.১.-২ মন্ত্রে পরব্রহ্মকে 'অহঃ' এবং 'অহং' নামে অভিহিত করিয়া ইঁহাদের সূর্যমণ্ডলে এবং দক্ষিণ অক্ষিতে অনুক্রমিকভাবে অবস্থান করার যে উল্লেখ আছে তাহাদিগকে একত্র সংবদ্ধ করা চলিবে না, কারণ ইহারা পৃথক্ দুইটি বিদ্যা।

সংবন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩।৩।২০॥

সংবন্ধাৎ (সম্বন্ধহেতু) এবম্ (এইরূপ) অন্যত্র (অন্যক্ষেত্রে) অপি (ও)।

২০ অন্যক্ষেত্রেও (অর্থাৎ সত্যব্রহ্ম বিদ্যার ক্ষেত্রে) এই সম্বন্ধ হেতু (অর্থাৎ সত্যব্রহ্মই উপাসনার বিষয়বস্তু হওয়ার জন্য) (আমাদিগকে অঙ্গগুলির এই প্রকার সমবায় করিতে হইবে— অর্থাৎ যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে করা হইয়াছে)।

[২০. উপাস্য যখন উভয়স্থলেই এক সত্য ব্রহ্ম, তখন শাণ্ডিল্য-বিদ্যার গুণ সংগ্রহের ন্যায় অহঃ এবং অহম্ এই দুইটি নামের বেলায়ও একটিকে অন্যত্র সংযোজিত করা উচিত বলিয়া মনে হয়। (পূর্বপক্ষ)]

এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের অভিমতকে ব্যক্ত করিতেছে। "সত্যই ব্রহ্ম......যিনি সত্যব্রহ্ম ইনিই সেই আদিত্য— তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষ" (বৃঃ ৫.৫.২)। এই শ্রুতি সত্যব্রহ্মের দেবতা এবং শরীর সংক্রান্ত (আদিত্য এবং অক্ষি) অধিষ্ঠান নিরূপণ করিতেছে এবং সত্যব্রহ্মের দুইটি গুপ্ত নামকেও অধিষ্ঠান প্রসঙ্গে শিক্ষা দেয়; পূর্ববর্তীটি হইল 'অহঃ' এবং পরবর্তীটি হইল 'অহম্'। এখন, শাণ্ডিল্যবিদ্যার দৃষ্টান্তানুসারে, যেহেতু উপাসনার বিষয় এক— অর্থাৎ সত্য ব্রহ্ম, সেইহেতু অঙ্গগুলিকেও আমাদের সংবদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং সত্যব্রহ্ম প্রসঙ্গে 'অহঃ' এবং 'অহম্' এই দুইটি নামকে একত্র সংবদ্ধ (করিয়া উপাসনা) করিতে হইবে।

ন বা, বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥

ন বা (বরং নহে) বিশেষাৎ (পার্থক্যহেতু)।

২১. বরং (এইরূপ) হইতে পারে না, কারণ (অধিষ্ঠানের) পার্থক্য আছে।

[২১. অন্যস্থলে তাহা বরং গ্রহণীয় নহে— কারণ (সূর্যমণ্ডল এবং অক্ষিগোলক) এই অধিষ্ঠানদ্বয়ের পার্থক্য আছে।]

এই সূত্রটি পূর্ববর্তী সূত্রের মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। যদিও বিদ্যাটি এক, তথাপি অধিষ্ঠানের পার্থক্যহেতু উপাসনার বিষয়বস্তু পৃথক্ হইয়া যাইবে— এইজন্য ইহাদের ভিন্ন নাম করা হইয়াছে। সুতরাং এই নাম দুইটির পরস্পর স্থানান্তর করা বা একত্র সংবদ্ধ করা সমীচীন হইবে না।

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২॥

দর্শয়তি (শাস্ত্রে) (এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে,) চ (এবং)।

২২. (শাস্ত্রে)ও এইরূপ উদ্‌ঘোষিত হয়।

[২২. এইরূপ স্থানভেদহেতু গুণও যে এক হয় না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত শ্রুতি শাস্ত্রে আছে।]

শাস্ত্র স্পষ্টতই গুণগুলিকে একত্র সংহত না করিয়া পৃথক্ রাখার নির্দেশ দিয়াছেন— কারণ, ইহা দুইটি ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিতেছে— ইহাদের একটি ব্যক্তি হইল সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ এবং অপরটি হইল অক্ষি গোলকস্থিত। যদি এখানে অঙ্গগুলিকে সংহত করার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ তুলনার অবতারণা করা হইত না।

অধিকরণ ১২ : রাণায়ণীয়-খিলে উল্লিখিত ব্রহ্মের গুণগুলিকে অন্য ব্রহ্ম- বিদ্যার— যথা শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নহে, কারণ পূর্ববর্তীটি হইল একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা, যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের পার্থক্য আছে।

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥৩।৩।২৩॥

সম্ভৃতিঃ ([বিশ্বকে] ধারণ করা) দ্যুব্যাপ্তিঃ (আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করা) অপি (ও) চ (এবং) অতঃ (এই একই কারণে— পূর্ববর্তী সূত্রে যে কারণ উক্ত হইয়াছে)।

২৩. একই কারণে (পূর্বসূত্রে যে কারণ দর্শিত হইয়াছে) (বিশ্বকে) ধারণ করা আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অধিষ্ঠান করা (ব্রহ্মের গুণ বলিয়া রাণায়ণীয়-খিলে উল্লিখিত আছে) তাহাও (ব্রহ্মের অন্যপ্রকার উপাসনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নহে)।

[২৩. তৈত্তিরীয় রাণায়ণীয় শাখার খিল বাক্যে ব্রহ্মের সম্ভৃতি ও দ্যুলোক ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের যে উল্লেখ আছে তাহাও এই কারণেই সেই সেই স্থলেই চিন্তনীয় কিন্তু সর্বত্র নহে। অন্য উপাসনায় তাহাদের গ্রহণ সমীচীন নহে।]

রাণায়ণীয় খিল বাক্যে এইরূপ একটি শ্রুতি আছে, "সেই শক্তিসমূহ একত্র সংহত হইয়া অবস্থান করিবার পূর্বেই ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন; পূর্ববর্তী ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে সমগ্র আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন"। ব্রহ্মের এই দুইটি গুণকে অন্যত্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে একত্র অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নহে। ইহার কারণ, পূর্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই, অর্থাৎ— অধিষ্ঠানের পার্থক্য। অধিকন্তু এই সকল গুণ এবং অন্য বিদ্যাসমূহে উল্লিখিত গুণরাশি— যেমন শাণ্ডিল্য-বিদ্যার গুণসমূহ— হইল এইরূপ যে, ইহাদের কোনটাই কোনটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্যও নাই। ব্রহ্মের সহিত কোন কোন বিদ্যার সম্পর্কমাত্রই ইহাদের ঐক্যবোধক নহে। ব্রহ্ম যদিও এক, তথাপি শক্তির বাহুল্যের জন্য বিভিন্নভাবে আরাধিত হইয়া থাকেন। উপসংহারে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, এই সূত্রে বর্ণিত উপাসনাটি হইল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বিদ্যা।

অধিকরণ ১৩: ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত পুরুষ-বিদ্যাগুলি এক নহে।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ।।৩।৩।২৪।।

পুরুষবিদ্যায়াম্-ইব (ছান্দোগ্য উপনিষদের পুরুষ-বিদ্যায় যেমন আছে) চ (এবং) ইতরেষাম্ (অন্যদের) অনাম্নানাৎ (উল্লেখ না থাকাহেতু— যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে)।

২৪. এবং (যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে) বর্ণিত পুরুষ-বিদ্যার গুণসমূহ অন্য উপনিষদের পুরুষ-বিদ্যায় উল্লেখ নাই— (যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে)— (সেইহেতু দুই পুরুষ-বিদ্যা এক নহে)।

[২৪. ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উভয় উপনিষদেই পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ আছে। যদিও বিদ্যার নাম এক, তথাপি এক স্থলের পুরুষ-বিদ্যা অপরস্থলের পুরুষ-বিদ্যা হইতে ভিন্ন। সুতরাং এক স্থলের গুণসমূহ অন্যস্থলে প্রযোজ্য নহে।]

পূর্ববর্তী সূত্রে বিদ্যাগুলিকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল, কারণ, একটি বিদ্যার মৌলিক গুণরাশি অপর বিদ্যায় স্বীকৃত ছিল না। এই সূত্রটি একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে যেখানে এমন একটি মৌলিক গুণ উভয় বিদ্যাতেই বর্তমান আছে। এই যুক্তিতেই বিরুদ্ধবাদিগণ মনে করেন যে, এই দুইটি বিদ্যা একই। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি বিদ্যা আছে, যাহা পুরুষ সংক্রান্ত, যেখানে পুরুষকে যজ্ঞের সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে: 'পুরুষই যজ্ঞ'। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও (১০.৬৪) একটি সমজাতীয় বিদ্যার উল্লেখ আছে, যেখানে পুরুষকে যজ্ঞের সহিত ঐরূপ অভিন্নরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে: "যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার নিকট যজ্ঞের আত্মাই হইলেন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী"— ইত্যাদি। মূল যে গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে— তাহা উভয়ক্ষেত্রেই হইল এই যে, পুরুষকে যজ্ঞের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে ইহা (অভিন্নতা) সত্ত্বেও এই দুইটি বিদ্যা এক নহে, কারণ তাহাদের আঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। অধিকন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত উপাসনার ফল হইল ব্রহ্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি, অন্যপক্ষে ছান্দোগ্যের ফল হইল দীর্ঘ আয়ু। সুতরাং বিদ্যা দুইটি ভিন্নই এবং সেইজন্যই দুই স্থলের আঙ্গিক উপাসনাগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করা যাইতে পারে না।

অধিকরণ ১৪: "(শত্রুর সমগ্র দেহকে) বেধ কর"— ইত্যাদি পৃথকীভূত মন্ত্রগুলি এবং কতকগুলি উপনিষদের সূচনাতে বর্ণিত যে কতকগুলি যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে ইহারা ব্রহ্ম-বিদ্যার অঙ্গ রূপে গণ্য হইতে পারে না, যে ব্রহ্ম-বিদ্যার কথা ঐ সকল উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত আছে।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥

বেধাদি (ছিন্নকরা ইত্যাদি) অর্থ ভেদাৎ (কারণ, তাহাদের ভিন্ন অর্থ আছে)।

২৫. বেধাদি (সম্পর্কিত কয়েকটি মন্ত্র) (বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, যদিও সন্নিহিত স্থানেই তাহাদের উল্লেখ আছে) কারণ তাহাদের একটি পৃথক্ অর্থ আছে।

[২৫. অথর্ববেদীয় উপনিষদে শরীর বিদীর্ণ করাদি বিষয়ে যে-সকল মন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না— কারণ ইহাদের একটি ভিন্ন অর্থ আছে।]

অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই মন্ত্রটিকে পাই:— "(শত্রুর সমগ্র শরীরকে) ভেদ কর, তাহার হৃদয়কে বিদীর্ণ কর"— ইত্যাদি। ঠিক এইরূপভাবেই আমরা অন্যান্য শাখার অন্যান্য উপনিষদেরও এই জাতীয় মন্ত্র পাই। এখন প্রশ্ন হইল, উপনিষদ্‌গুলির অতি সন্নিহিত ব্রাহ্মণগুলিতে এই জাতীয় মন্ত্রের এবং যজ্ঞাদির যে উল্লেখ আছে সেইগুলিকেও কি ঐ সকল উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই সকলকে বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নহে, কারণ ইহাদের অর্থ হইল ভিন্ন— এবং যেহেতু এইগুলি কতকগুলি যাজ্ঞিক ক্রিয়াকে নির্দেশ করে— সেইহেতু বিদ্যা বা উপাসনার সঙ্গে এইগুলির কোন সম্পর্কই নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভেদক্রিয়াটি কাহারও শত্রুকে বিনাশ করিবার কোন একটি অনুষ্ঠানবিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার।

অধিকরণ ১৫: ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পুণ্য এবং পাপরাশি তাঁহার মুক্তির পর তাঁহার বান্ধব এবং শত্রুগণের উপর বর্তায় এইরূপ একটি শ্রুতি আছে: এই উক্তিটি যেখানে যেখানে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সৎ এবং অসৎ কর্ম পরিহার করার প্রসঙ্গ আছে সেইসকল শ্রুতির ক্ষেত্রেই সত্য।

হানৌ তু, উপায়নশব্দশেষত্বাৎ, কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥

হানৌ (শুধুমাত্র) [যেখানে ভাল এবং মন্দ কর্ম উভয়কে পরিহার করিবার বিষয়ের উল্লেখ আছে], তু (কিন্তু) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ (যেহেতু 'গ্রহণ' শব্দটি ['পরিহার' শব্দটির] পরিপূরক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে) কুশা-ছন্দঃ-স্তুতি-উপগানবৎ (যেমন কুশ স্তুতিগুলির সংখ্যা গণনায় যাহা ব্যবহৃত হয়) ছন্দঃ স্তুতি এবং উপগান (আবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে) তৎ (তাহা) উক্তম্ (জৈমিনি মুনি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে)।

২৬. কিন্তু যেখানে (শুধুমাত্র) (ভাল এবং মন্দের) পরিহারকে উল্লেখ করা হইয়াছে, (সেখানে অন্য কর্তৃক এই ভাল এবং মন্দের গ্রহণকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে), কারণ 'গ্রহণ' এই শব্দটি হইল ('পরিহার' এই শব্দটির পরিপূরক,

যেমন কুশ, ছন্দঃ স্তুতি এবং মন্ত্রাবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে হইয়াছে)। ইহার বিধান (এইরূপ যে করিতে হইবে তাহা) (পূর্বমীমাংসায় জৈমিনি কর্তৃক) উক্ত হইয়াছে।

[২৬. কিন্তু যেখানে (শুধুমাত্র) ভাল এবং মন্দের 'পরিহারের' কথা-ই বলা হইয়াছে, সেখানে পরিপূরক শব্দ হিসাবে 'গ্রহণ' শব্দটিকেও লইতে হইবে। যেমন জৈমিনি ঋষির মতে কুশ, ছন্দঃ, স্তুতি মন্ত্রাবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পরিপূরক শ্রুতিকে অন্যস্থান হইতেও গ্রহণ করিতে হয়। পূর্বমীমাংসায় জৈমিনি এইরূপ পরিপূরক শব্দ বা শ্রুতি গ্রহণের বিধান দিয়াছেন।]

একই জাতীয় বিদ্যার অঙ্গগুলিকে একত্র সংহত করিবার বিষয়টি আলোচনার পর, গ্রন্থকার এখন উপাসকের কর্মফলাদির সমবায় বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

জৈমিনি ঋষি বলেন যে, কুশ, ছন্দঃ, স্তুতি এবং মন্ত্রাবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখের ক্ষেত্রে (ইহাদের সম্পূর্ণ অর্থবোধের জন্য) অন্য শ্রুতি হইতে পরিপূরক (বাক্যসমূহ) গ্রহণ করিতে হইবে। কোন কোন স্থলে কুশের শুধুমাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু অন্যস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই কুশগুলিকে ডম্বুর কাঠদ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে। প্রথম শ্রুতিবচনটিকে অন্যশ্রুতির আলোকে পরিপূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবেই ছন্দঃ, স্তুতি এবং মন্ত্রাবৃত্তি বিষয়েও পরিপূরক শ্রুতিকে সংগ্রহ করিতে হইবে। উপনিষদে যে-সকল বিদ্যার উল্লেখ আছে— তাহাদের উপাসকের কর্মফল বিষয়ে গ্রহণ-বর্জনাদির ব্যাপারেও এই নিয়মটি প্রয়োগ করা হইতেছে। আমরা কোন কোন শ্রুতিতে পাই যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ পুণ্য এবং পাপ উভয়কেই পরিহার করেন। যেমন, ছাঃ ৮.১৩ দ্রষ্টব্য। অন্য একটি উপনিষদে শুধুমাত্র ইহারই উল্লেখ করেন নাই, অধিকন্তু বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুণ্য এবং পাপ তাঁহার মিত্র এবং শত্রুগণ যথাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। (কৌঃ ১.৪ দ্রষ্টব্য) এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মিত্র এবং শত্রু কর্তৃক পুণ্য এবং পাপের গ্রহণকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে— যেমন জৈমিনি মুনির মীমাংসা গ্রন্থে এইরূপ গ্রহণ-বর্জনের নীতির কথা উল্লিখিত আছে— এবং যাহা এখানে পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সূত্রটিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যদি 'পরিহার' এই শব্দটির আলোচনাকে অন্যভাবে করা হয়। তর্কচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, ছান্দোগ্য এবং কৌষীতকী শ্রুতির 'ধু'ধাতুটিকে কম্পনার্থে ব্যাখ্যা করা যায়— পরিহার অর্থে নহে। সেইক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইবে এই যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও পাপ পুণ্যের সংস্পর্শ থাকিয়া যায়— যদিও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ফলগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এইরূপ অর্থে ব্যাখ্যা শুদ্ধ নহে, কারণ, কৌষীতকী উপনিষদের পরবর্তী শ্রুতিতে

দেখা যায় যে, অন্যেরা এই পুণ্য এবং পাপের অংশভাক্ হইয়া থাকেন। এবং ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না— যদি না ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার পাপপুণ্যকে বা শুভাশুভকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিতে পারেন।

অধিকরণ ১৬ : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের পাপপুণ্যের পরিহার মৃত্যুকালেই হইয়া থাকে— তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণের পথে নহে।

সাম্পরায়ে, তর্তব্যাভাবাৎ, তথা, হ্যন্যে ।।৩।৩।২৭।।

সাম্পরায়ে (মৃত্যুকালে) তর্তব্য-অভাবাৎ (আর কোন কিছু প্রাপ্তব্য না থাকা হেতু) তথা (সেইরূপই) হি (যেহেতু) অন্যে (অন্য শ্রুতিসমূহও)।

২৭. (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পুণ্যপাপ উভয় কর্মফল হইতে মুক্ত হন) মৃত্যুকালেই তাঁহার (ব্রহ্মলোকে চলার পথে কর্মফলের দ্বারা) আর কিছুই প্রাপ্তব্য থাকে না, কেন না অন্য শ্রুতিও এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।

[২৭. ব্রহ্মজ্ঞ দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রারব্ধ কর্মফল হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। তাঁহার কোন বাসনা না থাকায় ব্রহ্মলোকের পথে তাঁহার আর কোন প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে না। অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপ (মুক্তির বিষয়) উল্লেখ আছে।]

এখন এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে— কখন জীবাত্মা (সাধক) এই শুভাশুভ কর্মফল হইতে মুক্তি লাভ করেন? "তিনি বিরজা নদীর কূলে উপনীত হন, এবং একমাত্র মনের দ্বারাই তিনি ইহা উত্তীর্ণ হন, এবং সেখানে তিনি তাঁহার পাপপুণ্যকে পরিহার করেন" (কৌঃ ১.৪)। এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই বিরোধিগণ মনে করেন যে, ব্রহ্মলোকে চলার পথেই ব্রহ্মজ্ঞ কর্মফল হইতে মুক্ত হন—মৃত্যুর সময় নহে। এই সূত্রটি এই বিরুদ্ধমতকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কর্মফল হইতে মুক্ত হন। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত এবং আগামী কর্মের ফল নষ্ট হইয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় প্রারব্ধের লয় হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ই তাঁহার শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকার কর্মফল হইতেই মুক্তিলাভ করেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি হইল: ব্রহ্মলোকে চলিবার সময়, যে ব্রহ্মলোক হইল ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষ্য— ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শুভাশুভ ফল ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ তখন জীবাত্মার কোন স্থূল শরীর থাকে না, এবং শরীর ব্যতীত কোন সাধনাই সম্ভব নয়— যে সাধনার দ্বারা পাপ-পুণ্যকে ধ্বংস করা যায়। জীবাত্মা তখন ব্রহ্মলোকের পথে কোন কিছুর অনুভবও করিতে পারে না, সেইজন্যই আমাদের

মানিয়া নিতে হয় যে, পাপ এবং পুণ্য তখন পর্যন্ত থাকিয়াই যায়। বরং সাধক তাঁহার সাধনার দ্বারা তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বেই কর্মফলকে ধ্বংস করেন। শাস্ত্রও এইরূপ বলেন— "অশ্ব যেমন লোমসকল কম্পিত করিয়া (শ্রমাদি দূর করে) আমিও তেমনি পাপ বিধৌত করিয়া...ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই"...ইত্যাদি (ছাঃ ৮.১৩.১)। অধিকন্তু যে পর্যন্ত না সমস্ত শুভাশুভ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই পর্যন্ত কাহারও পক্ষে বিরজা নদী উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয় যে, (ব্রহ্মজ্ঞের) পাপ এবং পুণ্য মৃত্যুকালেই পরিত্যক্ত হয়— এবং কৌষীতকী উপনিষদের শ্রুতিগুলিকে সেইভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ছন্দতঃ, উভয়াবিরোধাৎ ॥৩।৩।২৮॥

ছন্দতঃ (তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী) উভয়-অবিরোধাৎ (যেহেতু সেইক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান হয়)।

২৮. (জীবাত্মার সাধনার ফল লাভাদির ব্যাখ্যা) তাঁহার ইচ্ছানুসারেই (সাধক জীবিতাবস্থায় শুভাশুভ হইতে মুক্তি লাভ করেন— মনে করাই যুক্তিযুক্ত) কারণ তাহা হইলেই একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় (সেইক্ষেত্রে) এই দুইটির মধ্যে (অর্থাৎ কার্য-কারণের মধ্যে এবং ছান্দোগ্য ও অন্য শ্রুতির মধ্যে)।

[২৮. জীবিতাবস্থাতেই জীবাত্মা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত হইতে পারেন। মৃত্যুর পর দেহ না থাকায় ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ সম্ভব নয়। কর্মফল ত্যাগ না হইলে মুক্তিও সম্ভব নয়। সুতরাং জীবিতাবস্থাতেই, মৃত্যুর সময়ই, পাপ-পুণ্য ধ্বংস হয়— এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারাই কার্য-কারণ এবং বিরুদ্ধ শ্রুতিবচনের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।]

যেহেতু বিদ্যার ফলেই জীবাত্মা সাধক মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করেন, সেইহেতু আমরা কেন মনে করি না যে, বিদ্যার ফল শুভাশুভ হইতে মুক্তিও মৃত্যুর পরই সাধক লাভ করেন? না, তাহা হইতে পারে না— কারণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী সাধনা পরিচালনা করা একমাত্র জীবিতাবস্থাতেই সম্ভব হয় এবং এই সাধনা হইতেই শুভাশুভের ধ্বংস সম্ভব হয়। এইরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নহে যে, কারণ উপস্থিত থাকিলেও কার্য উৎপন্ন হইতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া গেল। যতদিন পর্যন্ত দেহ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত জীবাত্মার পক্ষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সম্ভব নহে, কিন্তু পাপ-পুণ্যকে বা শুভাশুভকে পরিহার করিয়া ফেলা তেমন কষ্টকর নহে।

অধিকরণ ১৭: একমাত্র সগুণ ব্রহ্মবেত্তাই মৃত্যুর পর দেবযানে গমন করেন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবেত্তা নহেন।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা, অন্যথা হি বিরোধঃ ।।৩।৩।২৯।।

গতেঃ (মৃত্যুর পর দেবযানের পথে জীবাত্মার যাত্রার) অর্থবত্ত্বম্ (সার্থকতা) উভয়থা (উভয় প্রকারে) অন্যথা (তাহা না হইলে) হি (যেহেতু) বিরোধঃ (বিরোধ) (হইবার সম্ভাবনা)।

২৯. (জীবাত্মার) দেবযানের পথে যাত্রা দুইভাবে (অর্থাৎ নানাভাবে) প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ তাহা না হইলে ইহার মধ্যে একটা বিরোধ পরিদৃষ্ট হইবে।

[২৯. মৃত্যুর পর দেবযানের পথে যাত্রা দুইপক্ষেই (অর্থাৎ সগুণ এবং নির্গুণ উপাসক— উভয়ক্ষেত্রেই) প্রযোজ্য। তাহা না হইলে (শ্রুতিবচনের মধ্যে) একটা বিরোধ দৃষ্ট হইবে।]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন শুভাশুভের পরিহারকে অপর কর্তৃক ইহার গ্রহণ হয় বলিয়া মনে করা হয়, ঠিক সেইরূপভাবেই কি মৃত্যুর পর শুভাশুভ উভয়কে পরিহার করিয়া দেবযানের পথে যাত্রা সগুণ এবং নির্গুণ উভয়প্রকার ব্রহ্মের উপাসকেরই একইরূপ হয়? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ইহা শুধুমাত্র সগুণব্রহ্মের উপাসকের ক্ষেত্রেই সত্য— কারণ ব্রহ্মলোকটি অন্যত্র মহাকাশের বিশেষ কোন স্থানেই অবস্থিত, একমাত্র তাহা হইলেই যাত্রা করার ব্যাপারটি অর্থবহ হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়ার পর যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহা হইল অজ্ঞানের বিনাশ মাত্র। সুতরাং এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম-লীন ব্যক্তির পক্ষে যাত্রার সার্থকতা কোথায়? যদি এই দেবলোক যাত্রা তাঁহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে ইহা এইরূপ শ্রুতির বিরুদ্ধ হইবে: "(সেই বিদ্বান্) পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন"— (মুণ্ডক ৩.১.৩)। যিনি নিষ্পাপ, নিশ্চল ব্রহ্মের সহিত সাম্যপ্রাপ্ত হন, তিনি দেবযানের পথে কিভাবে অন্যত্র গমন করিতে পারেন? যেহেতু তিনি তাঁহার গন্তব্য ব্রহ্মে লীন হইয়াই গিয়াছেন— সেইহেতু তাঁহার পক্ষে দেবযান মার্গের যাত্রা অর্থহীন। সুতরাং একমাত্র সগুণ ব্রহ্মের উপাসকই দেবযান মার্গে গমন করিয়া থাকেন।

উপপন্নঃ, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ, লোকবৎ ।।৩।৩।৩০।।

উপপন্নঃ (যুক্তিসম্মত) তৎ-লক্ষণার্থ-উপলব্ধেঃ (যেসব লক্ষণ থাকিলে যাত্রা সম্ভব হয়, তাহা [শাস্ত্রে] পাওয়া যায় বলিয়া) লোকবৎ (যেমন লৌকিক জগতেও দৃষ্ট হয়)।

৩০. (উপরে যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহা যুক্তিসম্মতই বটে। কারণ, যে-সকল লক্ষণ থাকিলে (দেবযানের) যাত্রা সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা (সগুণ উপাসনার ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়— নির্গুণ উপাসনার ক্ষেত্রে নহে); যেমন লৌকিক জগতেও এইরূপ (দৃষ্ট হয়)।

[৩০. সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে যে পার্থক্য করা হইয়াছে— তাহা যুক্তিসম্মতই হইয়াছে। কারণ সগুণ উপাসনার ক্ষেত্রেই ভিন্নস্থানে গমনের প্রসঙ্গ থাকে— নির্গুণ উপাসনার ক্ষেত্রে নহে। এইরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে এবং লৌকিক জগতের ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়।]

সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকদের যানের (যাত্রা পথের) যে পার্থক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্তই বটে, কারণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসকের এইরূপ যাত্রার হেতু এবং লক্ষণসমূহ কৌষীতকী উপনিষদের বিদ্যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়। এই শ্রুতিতে কতকগুলি ফলের কথা বলা হইয়াছে যাহা উপাসকগণ নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াই পাইয়া থাকেন— যেমন রথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন। কিন্তু নির্গুণ উপাসনা হইতে যে পূর্ণজ্ঞান লাভ বা অজ্ঞানের ধ্বংস হয়— তাহার ক্ষেত্রে এই যাত্রার কোন সার্থকতা নাই। জাগতিক লোকব্যবহারের দৃষ্টান্তেও এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। যদি কোন গ্রামে যাইতে হয়, তাহা হইলে সেইগ্রামে পৌঁছাইবার পথটি ধরিয়াই যাইতে হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এইরূপ কোন যাত্রার প্রয়োজন হয় না।

অধিকরণ ১৮ : সগুণ ব্রহ্মের সকল উপাসকই মৃত্যুর পর দেবযানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, শুধুমাত্র যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন তাঁহারাই নহেন, যদিও এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার মধ্যেই এইরূপ যানের কথা আছে।

অনিয়মঃ সর্বাসাম্, অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ।।৩।৩।৩১।।

অনিয়মঃ (এই বিষয়ে কোন নিষেধ নাই) সর্বাসাম্ (দেবযানে যাত্রা) (সকল প্রকার সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) অবিরোধঃ (ইহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই) শব্দ-অনুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়স্থলেই এইরূপ দেখা যায়)।

৩১. (দেবযানের পথে জীবাত্মার গমন) (শুধুমাত্র সগুণ ব্রহ্মের কতিপয় বিদ্যার মধ্যেই) সীমিত নহে। (ইহা সগুণ ব্রহ্মের সকল প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য)। ইহাতে কোন বিরোধিতাও নাই— কারণ এইরূপ উল্লেখ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ত্রই আছে।

[৩১. শ্রুতিতে যেখানে যেখানে দেবযান গতির উল্লেখ আছে, শুধুমাত্র সেই সেই উপাসনার ক্ষেত্রেই দেবযান গতি হয়— এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। সমস্ত প্রকার ব্রহ্মোপাসকগণের পক্ষেই তাহা গ্রহণীয়, কারণ শ্রুতি ও স্মৃতির এইরূপই নির্দেশ আছে।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যার সাধনার ফলস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, সাধক মৃত্যুর পর দেবযানের পথে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈশ্বানর বিদ্যার ফল রূপে এইরকম কিছু স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বিদ্যার ফলেও সাধক মৃত্যুর পর দেবযানের মাধ্যমে গমন করেন কি না। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, যে-কোন বিদ্যার সাধকই হউন না কেন, তিনি মৃত্যুর পর এই পথ দিয়া (দেবযান দিয়া) গমন করেন। কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় স্থলেই এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তন্মধ্যে যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যাকে জানেন এবং যে পরিব্রাজকগণ ও বাণপ্রস্থিগণ অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির সেবা করেন তাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন"— (ছাঃ ৫.১০.১)। এই শ্রুতিটি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নির উপাসনা করেন এবং বনে বাস করিয়া, শ্রদ্ধা ও তপস্যা-সম্পন্ন হইয়া অপর যে-কোন বিদ্যার সাহায্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন— তাঁহাদের উভয়েই দেবযান পথে গমন করিয়া থাকেন। স্মৃতিও যে এই মতের সমর্থন করেন, তাহা গীতার ৮.২৬ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

অধিকরণ ১৯ : পূর্ণজ্ঞানী ব্রহ্মভূত মহাপুরুষগণ বিশেষ দৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ।।৩।৩।৩২।।

যাবৎ- অধিকারম্ (যতদিন পর্যন্ত না উদ্দেশ্য [প্রয়োজন] সিদ্ধ হয়) অবস্থিতিঃ (ততদিন দৈহিক) (অবস্থান), আধিকারিকাণাম্ (যে মহাপুরুষগণের দৈব উদ্দেশ্য থাকে তাঁহাদের)।

৩২. যাঁহাদের কোন (দিব্য) উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার সংকল্প থাকে, তাঁহাদের (দেহে) অবস্থিতি ততদিন পর্যন্ত থাকে— যতদিন না সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

[৩২. বশিষ্ঠ নারদাদির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ আধিকারিক পুরুষগণ লোক-কল্যাণের দিব্য উদ্দেশ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পরও দেহে অবস্থান করেন— যতদিন পর্যন্ত না তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।]

ঋষি অপান্তরতম পুনরায় ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সনৎকুমার স্কন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপেই বশিষ্ঠ নারদাদির ন্যায় ঋষিগণও পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি?— ইহা হইল বিরুদ্ধপক্ষের জিজ্ঞাসা। এই সূত্রটি এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলিতেছে:— সাধারণত কোন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু যাঁহাদের বিশেষ কোন (দৈব) উদ্দেশ্য পূরণ করার সংকল্প থাকে, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। সেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ একবার বা একাধিকবার জন্মিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, এবং ইহার পর তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। কিন্তু এই পুনর্জন্মে তাঁহারা অবিদ্যার অধীন হন না। তাঁহাদের সঙ্গে জীবন্মুক্তের তুলনা প্রযোজ্য— যেমন জীবন্মুক্তগণ জ্ঞানলাভের পরেও যে পর্যন্ত তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্মফল থাকে— সেই পর্যন্ত দেহে অবস্থান করেন। এই জাতীয় মহাপুরুষগণের দিব্য উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্মের সঙ্গে তুলনীয়।

অধিকরণ ২০: সকল প্রকার ব্রহ্মোপাসনাতেই বিভিন্ন শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মের নেতিবাচক গুণগুলিকেও সংবদ্ধ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ, সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥৩।৩।৩৩॥

অক্ষরধিয়াং (অক্ষরব্রহ্মের নেতিবাচক গুণগুলির ধ্যান ধারণা বিষয়ে) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সমবায়) সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্ (কারণ যেহেতু নেতিবাচকগুণসম্পন্ন ব্রহ্ম এবং অক্ষরব্রহ্ম স্বরূপত একই) ঔপসদবৎ (উপসদের [দেবতার উদ্দেশ্যে বলির] ন্যায়) তৎ (ইহা) উক্তম্ (বলা হইয়াছে ঋষি জৈমিনি কর্তৃক)।

৩৩. কিন্তু অক্ষরব্রহ্ম বিষয়ক নেতিবাচক গুণসমূহকে বিভিন্ন শ্রুতি হইতে সংবদ্ধ করিয়া, সকল প্রকার অক্ষরব্রহ্মের উপাসনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ ইহাদের সকলগুলি একই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ইহার কারণ হইল, নেতিবাচক বিশেষণের মাধ্যমে বর্ণিত ব্রহ্ম এবং অক্ষরব্রহ্ম স্বরূপত একই; যেমন উপসদ

(দেবতার উদ্দেশ্যে বলি) মূলত একই। (পূর্ব মীমাংসায় জৈমিনি মুনি) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

[৩৩. মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মকে অক্ষররূপে উপাসনার ক্ষেত্রে বহু নেতিবাচক গুণের উপাসনার কথা আছে। এখন প্রশ্ন হইল সর্বত্রই কি এই নেতিবাচক অক্ষরব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে? উত্তর হইল, 'হ্যাঁ'। কারণ উপসদের ন্যায়— ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। সুতরাং সর্বত্রই ব্রহ্মের উপাসনাতেই ইহা গ্রহণীয়। ইহা জৈমিনির মত।]

"হে গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা ইঁহাকে সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন। ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ" ইত্যাদি (বৃহঃ ৩.৮.৮)। পুনরায় অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই, "পরা বিদ্যা হইল তাহা যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়।" সেই 'অদৃশ্য, অগ্রাহ্য' ইত্যাদি (মুঃ ১.১.৫-৬)। এখন প্রশ্ন হইল, এই দুই শ্রুতিতে বর্ণিত নেতিবাচক গুণগুলিকে কি একই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে, না তাহারা পৃথক্ দুইটি বিদ্যা। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, এই সকল নেতিবাচক গুণগুলি স্পষ্টত: ব্রহ্মের স্বরূপকে প্রকাশ করে না, যেমন আনন্দময়, সত্য ইত্যাদি অস্তিবাচক গুণসমূহ করিয়া থাকে। সুতরাং ৩.৩.১১ সংখ্যক সূত্রে গৃহীত নীতি এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না— কারণ এইরূপ সমবায়ের দ্বারা এখানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রত্যেকটি নেতিবাচক বিশেষণ সেই সেই শ্রুতির ক্ষেত্রেই মাত্র তাৎপর্যবহ— যেখানে যেখানে তাহাদের উল্লেখ আছে— অন্যত্র ইহাদের কোন সার্থকতা নাই। এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে— এই জাতীয় নেতিবাচক বিশেষণগুলিকেও একত্র সমবেত করিতে হইবে— কারণ নেতিবাচক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশও একই। এবং উপদেশের বিষয়বস্তুও সেই একই অক্ষরব্রহ্ম। ৩.৩.১১ সংখ্যক সূত্রের প্রণালী এখানেও প্রযোজ্য, যদিও সেখানে ব্রহ্মের সমবেত গুণগুলি ছিল অস্তিবাচক এবং এখানকার গুণগুলি নেতিবাচক— কারণ এখানে পরোক্ষ পদ্ধতিতে একই ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে উপসদ-বলি প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে উপমা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপসদ প্রদানের মন্ত্রগুলি শুধুমাত্র সামবেদেই আছে। কিন্তু যজুর্বেদের পুরোহিতগণ অন্য বেদের অন্তর্ভুক্ত এই মন্ত্রগুলিকেও প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতির বিধান পূর্বমীমাংসায় জৈমিনি মুনি করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপভাবেই, এখানেও অক্ষরব্রহ্মের উপাসনায় নেতিবাচক গুণগুলিকে সমবেত করিয়া গ্রহণ ও প্রয়োগ করিতে হইবে।

অধিকরণ ২১ : মুণ্ডক ৩.১.১ এবং কঠ ১.৩.১ এই উভয়স্থলে বর্ণিত বিদ্যা একই।

ইয়দামননাৎ ॥৩।৩।৩৪॥

ইয়ৎ-আমননাৎ (কারণ ইহাকে) এই পরিমাণ মাত্র রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৪. কারণ (একই বিদ্যাকে) এইভাবে— এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

[৩৪. সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যাতেই— একই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া অস্তিবাচক বা নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া উপাসনা করা হয়।]

"সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদুফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে"— (মুঃ ৩.১.১)। অন্যত্র আমরা পাই "নিজ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী দুইজন পুরুষ......আছেন" ইত্যাদি (কঠঃ ১.৩.১)। এই দুইটি শ্রুতির মধ্যে কি আমরা দুই-টি বিদ্যা দেখিতে পাই, না মাত্র একটি-ই? বিরোধিগণ মনে করেন যে এখানে দুইটি বিদ্যার বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, পূর্বসূত্রে অক্ষরব্রহ্মের উপাসনার উপাস্য বিষয়টি ছিল একই, কিন্তু এখানে উপাসনার বিষয় হইল ভিন্ন। এখানকার উপাসনার বিষয়ের পার্থক্য উক্ত শ্রুতিবচন দুইটি হইতেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন— মাত্র একজনই ফল ভক্ষণ করেন, অপর জন করেন না; কিন্তু কঠ উপনিষদে আছে উভয়েই তাহাদের সুকর্মের ফল ভোগ করেন। সুতরাং উপাসনার (ধ্যানের) বিষয়টি এক নহে। এই সূত্রটি উক্ত মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিতেছে যে— উহারা উভয়েই একই বিদ্যার অন্তর্গত। কারণ, উভয়েই একই পরমেশ্বরকে নানাভাবে (জীবরূপে) অবস্থান করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, দুইটি শ্রুতিরই উদ্দেশ্য হইল পরব্রহ্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করা। ১.২.১১ সংখ্যক সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর প্রকৃতপক্ষে কর্মফল ভোগ করেন না— কিন্তু জীবপ্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ থাকায় মনে করা হয় যেন তিনি কর্মফল ভোগ করেন। **জীবই** কর্মফল ভোগ করেন বটে— যেমন, যখন আমরা বলি, "ছত্রধারী লোকগুলি" তখন কিন্তু তাহাদের মধ্যে হয়তো একজনই ছত্রধারী। সুতরাং উপাসনার বিষয়টি এক বলিয়া বিদ্যা দুইটিও একই।

অধিকরণ ২২: বৃহদারণ্যকের ৩.৪.১ এবং ৩.৫.১ শ্রুতিতে বর্ণিত বিদ্যা দুইটি একই।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ।।৩।৩।৩৫।।

অন্তরা (সব কিছুরই অন্তরতম সত্তা হেতু) ভূতগ্রামবৎ (পদার্থসমূহের ক্ষেত্রে যেইরূপ) স্বাত্মনঃ (একই অভিন্ন আত্মা বিষয়ে উপদেশ)।

৩৫. সকল কিছুরই অন্তরতম সত্তা হিসাবে একই আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে— যেমন সকল পদার্থের (মূলেও আছে একটি মাত্র সত্তা)।

বৃহদারণ্যকে আমরা উষস্ত-কর্তৃক যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিতে দেখি:— "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁহার বিষয় আমার নিকট বিশেষরূপে বলুন।" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন: "যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা" (বৃহঃ ৩.৪.১)। এই একই উপনিষদের ৩.৫.১ শ্রুতিতে কহোলের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ এবং জরামৃত্যুর অতীত, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা।" প্রতিপক্ষ মনে করেন যে, এই দুইটি পৃথক্ বিদ্যা— এবং ইহাদের উদ্দিষ্ট (সাধ্য) বস্তুও ভিন্নই; কেন না প্রদত্ত উত্তর দুইটি ভিন্ন। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, এখানে উদ্দিষ্ট হইলেন এক পরমাত্মা। কারণ একই শরীরে একই সময়ে দুই আত্মাকে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান থাকার কল্পনা করা অসম্ভব, যেমন পাঁচটি পদার্থ, যাহাদের সমবায়ে এই দেহ গঠিত তাহাদের কোন একটি মাত্রকে সকল পদার্থের অন্তরতম বলিয়া যথার্থভাবে কল্পনা করা সম্ভব নয়, যদিও আপেক্ষিকভাবে কোন একটি পদার্থ অন্য পদার্থের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে। অনুরূপভাবেই একটিমাত্র আত্মাই সকল কিছুর অন্তরতমরূপে অবস্থান করিতে পারেন। অতএব উক্ত দুইটি শ্রুতির দুইটি উত্তরে বর্ণিত আত্মা দুইটিকে এক এবং অভিন্নরূপেই উপদেশ করা হইয়াছে।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, উপদেশান্তরবৎ ।।৩।৩।৩৬।।

অন্যথা (তাহা না হইলে) ভেদ-অনুপপত্তিঃ (পুনঃপুনঃ ভেদের উক্তির সামঞ্জস্য সম্ভব নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না, তাহা নহে) উপদেশান্তরবৎ (ইহাকে অন্য উপদেশের ন্যায় মনে করিতে হইবে) (যেমন ছান্দোগ্যে আছে)।

৩৬. যদি এইরূপ বলা হয় যে (এই দুইটি বিদ্যা ভিন্নই, কারণ) তাহা না হইলে পুনঃপুনঃ উক্তির কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না, (তাহার উত্তরে বলা যায়)— না, ইহা এইরূপ হইতে পারে না; (ইহা হইল) (ছান্দোগ্যে বর্ণিত) (পুনরুক্তির ন্যায়) আর একটি উপদেশ।

[৩৬. শ্রুতিতে একই বিষয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তরে যে বিভিন্ন উপদেশ তাহা মূলত ভিন্ন নহে; একই বিষয়কে দৃঢ়তরভাবে বুঝাইবার জন্য নানাভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য এক, প্রকাশ ভিন্ন।]

এখানে এইরূপ একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, যদি দুইটি শ্রুতি দুইটি পৃথক্ আত্মার উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে ইহাদের পুনরুক্তির কোন সার্থকতাই থাকিত না। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এখানকার পরিস্থিতিটি এইরূপ নহে। এখানে পুনরুক্তির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল জিজ্ঞাসু শিষ্যকে জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক হইতে আরও এবং দৃঢ়তরভাবে বুঝিতে সাহায্য করা। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি হইতে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না যে, এখানে দুইটি পৃথক্ আত্মার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। যেমন 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবচনটি ছান্দোগ্য উপনিষদে নয়বার উক্ত হইলেও আমাদের এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না যে, সমগ্র ছান্দোগ্য উপনিষদে একাধিক বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। প্রশ্নের উত্তরগুলির মধ্যে পার্থক্যের হেতু হইল এই যে, দ্বিতীয় উত্তরের ক্ষেত্রে আত্মার সম্পর্কে বিশেষ একটা কিছু উপদেশ করা হইয়াছে। প্রথম উত্তরে উপদিষ্ট হইল যে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন— দ্বিতীয় উত্তরে বলা হইল যে, ইহা সকল আপেক্ষিক গুণসমূহের ঊর্ধ্বে।

অধিকরণ ২৩: ঐতরেয় আরণ্যক ২.২.৪.৬ শ্রুতিতে পারস্পরিক উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, শুধু একমুখীন উপাসনার নহে।

ব্যতিহারঃ, বিশিংষন্তি হীতরবৎ ।।৩।৩।৩৭।।

ব্যতিহারঃ (উপাসনার) (পারস্পরিকতা) বিশিংষন্তি (শাস্ত্রসমূহ) (ইহার) (বিধান দিয়া থাকেন) হি (কারণ), ইতরবৎ (অন্যক্ষেত্রে যেইরূপ আছে সেইরূপ)।

৩৭. পারস্পরিক (উপাসনার কথা) (শাস্ত্রে আছে), কারণ অন্য ব্যাপারের ন্যায় শাস্ত্র এইরূপ বিধান দিয়াছেন।

[৩৭. শাস্ত্রে পারস্পরিক উপাসনার উল্লেখ আছে যথা "আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি"— ইত্যাদি— যেমন অন্যত্রও এইরূপ পারস্পরিকতা দৃষ্ট হয়।]

আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে পাই "আমি যাহা উনি তাহা, উনি যাহা আমিও তাহা" (২.২.৪.৬)। এখানে প্রশ্ন হইতেছে এখানে কি উপাসনাটি পারস্পরিক ধর্মী?— অর্থাৎ, উপাসক কি প্রথমে নিজেকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিবেন এবং পরে বিপরীত ক্রমে নিজের মধ্যেই আদিত্যকে ধ্যান করিবেন, অথবা শুধুমাত্র প্রথমোক্ত পদ্ধতিতেই উপাসনা করিবেন? প্রতিপক্ষ মনে করেন যে, এক পক্ষ হইতেই উপাসনা করিতে হইবে, উভয় পক্ষ হইতে বিপরীতক্রমে নহে। কারণ প্রথম উপাসনাটির একটি তাৎপর্য আছে— যেহেতু ইহা জীবকে ব্রহ্মের স্তরে উন্নীত করে, কিন্তু ব্রহ্মকে জীবের স্তরে অবনমিত করার কোন সার্থকতা নাই। এই সূত্রটি এই মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, উপাসনা পারস্পরিকভাবে উভয়পক্ষ হইতেই করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে এইরূপ উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়। শ্রুতি স্পষ্টভাবেই বিপরীতক্রমে পারস্পরিক উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন— যেমন অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে সত্যসঙ্কল্পরূপে ধ্যান করিতে হইবে— এবং এইরূপ উপদেশ অন্যত্র আরও আছে। ইহার দ্বারা ব্রহ্মকে অবনমিত বা ক্ষুন্ন করা হয় না, কারণ যাঁহার কোন দেহই নাই, তাঁহাকে আকারবিশিষ্টরূপে উপাসনা করা যায় না।

অধিকরণ ২৪: বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৫.৪.১ এবং ৫.৫.২ অংশে সত্যব্রহ্ম সম্পর্কে একই বিদ্যার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩।৩।৩৮॥

সা এব (সেই একই সত্য বিদ্যা) হি (কারণ) সত্যাদয়ঃ (সত্য ইত্যাদি বিশেষণগুলি)।

৩৮. এই একই (সত্য-বিদ্যাকে উভয়স্থলেই উপদেশ করা হইয়াছে), কারণ (সত্য ইত্যাদি) (গুণসমূহ) (উভয় ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়)।

[৩৮. ছান্দোগ্যে সৎ-বিদ্যা প্রকরণে প্রথমে সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের যে-সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, পরেও যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার উল্লেখ আছে— সেই সেই স্থলেও সর্বত্রই সেই সকল গুণকে সংগ্রহ করিতে হইবে।]

বৃহদারণ্যকের ৫.৪.১ শ্রুতিতে আমরা পাই, "যে কেহ এই মহান, পূজ্য, প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই সকল লোক জয় করেন"। পুনরায় আমরা ৫.৫.২

শ্রুতিতে পাই— "যিনি সত্যব্রহ্ম ইনিই সেই আদিত্য— তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ... তিনিই পাপরাশিকে ধ্বংস করেন"। এই দুইটি সত্যবিদ্যা কি এক, না ভিন্ন? এই সূত্রটি বলে যে, এই দুইটি একই, কারণ দ্বিতীয় শ্রুতিটি প্রথম শ্রুতির সত্যকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— "তিনি, যিনি সত্যস্বরূপ" ইত্যাদি। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই দুইপ্রকার সাধনার ফল ভিন্ন— কারণ ইহা শ্রুতি দুইটিতেই দেখিতে পাওয়া যায়: প্রথম শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ সাধক ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে তিনি পাপকে ধ্বংস করেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ফল একটি-ই— দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফলের উল্লেখের উদ্দেশ্য হইল শুধুমাত্র প্রশংসা মুখে সত্যের বিষয়ে আরও উপদেশকে দৃঢ় করা।

অধিকরণ ২৫: ছান্দোগ্য ৮.১.১ এবং বৃহদারণ্যক ৪.৪.২২ শ্রুতিতে বর্ণিত গুণরাশিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে— কারণ উভয় শ্রুতিতেই কতকগুলি সাধারণ গুণের উল্লেখ আছে।

কামাদীতরত্র তত্র চ, আয়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৯॥

কামাদি (যথার্থ বাসনা ইত্যাদি) ইতরত্র (অন্যতরটির মধ্যে) তত্র (অন্যত্র [যেগুলির উল্লেখ আছে]) চ (এবং) আয়তনাদিভ্যঃ (আয়তন বা আশ্রয়াদি হেতু)।

৩৯. (সত্য ইত্যাদির ন্যায় গুণসমূহ) কামনা ইত্যাদি (যাহা ছান্দোগ্যে বর্ণিত হইয়াছে— সেই সকলকে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে) অন্য উপনিষদে (অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে), এবং অন্যত্র (অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা তাহা ছান্দোগ্যের উপাসনায়ও সংগ্রহ করিতে হইবে) কারণ, আয়তন ইত্যাদি (বিষয়ের বর্ণনা উভয়ত্রই এক)।

[৩৯. ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকে উপদিষ্ট ব্রহ্মের গুণসকল ভিন্নভাবে বর্ণিত হইলেও, উভয়স্থলেই এই আত্মাকে একই আয়তনে (হৃদয়াকাশে) স্থিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যাটি একই।]

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮.১.১ শ্রুতিতে আমরা পাই— "ব্রহ্মনগরস্থানীয় এই শরীরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ প্রাসাদ আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম আছেন" ইত্যাদি। পুনরায় বৃহদারণ্যক ৪.৪.২২ শ্রুতিতে আছে— "এই যে আত্মা বুদ্ধিতে

উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি এই মহান জন্মরহিত পরমাত্মাই বটেন। ...হৃদয়মধ্যে আকাশশব্দবাচ্য যে পরমাত্মা আছেন, তাঁহাতে ইনি (সুষুপ্তিকালে) শয়ন করেন"। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এখানে দুই উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যা দুইটি কি এক? এবং সেইজন্য কি ইহাদের অঙ্গগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিতে হইবে, অথবা পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে উহারা উভয়ে একই বিদ্যার অন্তর্গত, এবং এইজন্যই একটির গুণসমূহকে অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে— কারণ উভয়ত্র বর্ণিত গুণগুলির মধ্যে বহুগুণেই সাধারণ। উভয়ত্রই আয়তন এক, এক ঈশ্বরই উভয়স্থলে উপাস্য— এইরূপ আরও বহু সাধারণ ধর্ম উভয়স্থলে আছে। অবশ্য, উভয় শ্রুতির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। ছান্দোগ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে— আর বৃহদারণ্যকে উপদেশ করা হইয়াছে নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে। কিন্তু যেহেতু সগুণ ব্রহ্ম বস্তুতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন— সেইহেতু এই সূত্রটি ব্রহ্মের মহিমা কীর্তনের জন্যই উভয়স্থলের গুণসমূহকে একত্র সংবদ্ধ করিবার নির্দেশ দিতেছে— উপাসনার নিমিত্ত নহে।

অধিকরণ ২৬: উপবাসের দিনে প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান অকর্তব্য।

আদরাদলোপঃ ।।৩।৩।৪০।।

আদরাৎ (শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত) অলোপঃ (কোন কিছু পরিহার করা সমীচীন নহে)।

৪০ (শ্রুতি-বিহিত প্রাণাগ্নিহোত্র ক্রিয়ার প্রতি) শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত (এই ক্রিয়ার) পরিহার অকর্তব্য।

[৪০. (শ্রুতির বিধান হইল প্রাণাগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করা।) শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হেতু এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অবশ্যই করণীয়, পরিহার অকর্তব্য।]

এই সূত্রটিতে বিরুদ্ধপক্ষের মত প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের বৈশ্বানর বিদ্যায় খাদ্য গ্রহণের পূর্বে উপাসককে প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা'— এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যেই অন্ন উৎসর্গ করিবার বিধান আছে। এই পঞ্চাগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানটির উপর শ্রুতি এতই গুরুত্ব আরোপ করেন যে, এমনকি অতিথি-সেবার পূর্বেও প্রাণের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন করার বিধান দিয়াছেন; যদিও হিন্দুমাত্রেই নিজে অন্নগ্রহণের পূর্বেই অতিথি-সেবা করেন বলিয়া মনে করা হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এমনকি উপবাসের দিনেও কি পঞ্চাগ্নিহোত্র ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেই

হইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে এই ক্রিয়াটিকে পরিহার করা সমীচীন নহে। সুতরাং উপবাসের দিনেও অন্ততপক্ষে কয়েক বিন্দু জলের দ্বারা আচমন করিয়াও এই অনুষ্ঠানটি করিতেই হইবে— কারণ শ্রুতি ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

উপস্থিতেঽতঃ, তদ্বচনাৎ ॥৩।৩।৪১॥

উপস্থিতেঃ (যখন অন্ন পরিবেশিত হয়) অতঃ (তাহা হইতে) তৎ-বচনাৎ [কারণ (শ্রুতি) এইরূপ বিধান করেন]।

৪১. যখন অন্ন পরিবেশন করা হয়, তখন তাহা হইতে (পঞ্চাগ্নিহোত্র ক্রিয়া করিতে হইবে) কারণ (শ্রুতি) এইরূপ বিধানই করিয়াছেন।

[৪১. শ্রুতি শাস্ত্রের ব্যবস্থাতে আছে যে, আহারের পূর্বে পরিবেশিত অন্ন হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়া পঞ্চাগ্নিহোত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। সেইজন্য আহারের প্রসঙ্গ না থাকিলে পঞ্চাগ্নিরও প্রসঙ্গ নাই।]

এই সূত্রটি পূর্ববর্তী সূত্রের মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, উপবাসের দিনে পঞ্চাগ্নিহোত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। কারণ শ্রুতিতে আছে— "সুতরাং যে অন্ন সর্বাগ্রে উপস্থিত হইবে, উহা আহুতিরূপে অর্পণীয়। উক্ত হোতা (বা ভোক্তা) প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করিবেন উহা 'প্রাণায় স্বাহা'— এই মন্ত্রে অর্পণ করিবেন" (ছাঃ ৫.১৯.১)। শ্রুতি শুধুমাত্র অন্নের অগ্রভাগের আহুতির উপরই এখানে গুরুত্ব দিয়াছেন— এবং যে যে দিনে উহা ভক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হইবে, শুধুমাত্র সেই সেই দিনের অনুষ্ঠানেই প্রাণকে অন্ন আহুতি দিবার কথা বলিয়াছেন— উপবাসের দিনেও এইরূপ করিতে হইবে— তাহা বলেন নাই।

অধিকরণ ২৭: কতিপয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে কয়েকটি উপাসনার উল্লেখ আছে; ইহাদের সঙ্গে যজ্ঞের কোন আঙ্গিক সম্পর্কই নাই— সুতরাং এইগুলি যজ্ঞের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে না।

তন্নির্ধারণানিয়মঃ, তদ্দৃষ্টেঃ, পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩।৩।৪২॥

তৎ-নির্ধারণ-অনিয়মঃ (তাহা অবশ্যই কর্তব্য— এইরূপ কোন নিয়ম নাই) তৎ-দৃষ্টেঃ (শ্রুতিতে এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া) পৃথক্ (পৃথক্) হি (কারণ) অপ্রতিবন্ধঃ (কোন বাধা নাই) ফলম্ (ফল বিষয়ে)।

৪২. তাহার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন নিয়ম নাই (অর্থাৎ কতিপয় যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলির) ; (স্বয়ং শ্রুতিই) ইহা বলিতেছেন ; কারণ (উপাসনার) একটি স্বতন্ত্র ফল আছে, (তাহা হইল যজ্ঞের ফলের) প্রতিবন্ধকতা না করা।

[৪২. উপাসনার সঙ্গে যজ্ঞের কোন অপরিহার্য সম্পর্ক নাই। কোন কোন যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাসনার অনুষ্ঠান অনেকস্থলেই ঐচ্ছিক। উপাসনা যজ্ঞাদির ফলের প্রতিবন্ধকও নহে।]

বর্তমান আলোচ্য বিষয় হইল— কতকগুলি যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় উপাসনার যে উল্লেখ আছে তাহা কি অপরিহার্যরূপে অবশ্যই করণীয়— এবং ইহা কি যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? এই সূত্রের মতানুসারে এইরূপ উপাসনার সঙ্গে যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ ইহাদের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে কোন নিয়ম নাই। অপরপক্ষে শাস্ত্র স্পষ্টতই বলেন যে, উপাসনার সহিত অথবা উপাসনা ব্যতীতই যজ্ঞানুষ্ঠান করা যাইতে পারে। "যিনি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই এই অক্ষরেরই দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন" (ছাঃ ১.১.১০)। ছাঃ ১.১০.৯ শ্রুতিও দ্রষ্টব্য। শ্রুতি অধিকন্তুভাবে যজ্ঞের ফল হইতে উপাসনার একটি পৃথক্ ফলের উল্লেখ করিয়া থাকেন— যেমন ইহা হইল যজ্ঞের ফললাভের প্রতিবন্ধকতা দূর করা বা যজ্ঞের ফলকে ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর করা। "বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়" (ছাঃ ১.১.১০)। ইহার অর্থ হইল, মূল যজ্ঞ তাহার নিজস্ব ফল দিবেই, কিন্তু উপাসনা এই ফলকে আরও ব্যাপকতর করিবে। সুতরাং উপাসনা-সহিত এবং উপসনা-রহিত যজ্ঞের ফলের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই কারণেই উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ নহে, সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠান করার ইচ্ছানুসারে ইহার অনুষ্ঠান করাও যাইতে পারে, আবার না করিলেও চলিতে পারে। 'অপ্রতিবন্ধ' শব্দটিকে এইরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে: উপাসনা রহিত যজ্ঞের বিহিত ফল তো আছেই। কিন্তু উপাসনা ফললাভের যে-কোন প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে। অবশ্য, ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, উপাসনা যজ্ঞেরই অঙ্গ। কোন কোন সময় যজ্ঞানুষ্ঠাতার দুষ্কৃতির প্রভাবে ফললাভে বিলম্ব ঘটে— কিন্তু উপাসনা এই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে, এবং শীঘ্রই ফললাভ হয়। এখানে অবশ্য যজ্ঞ ফললাভের জন্য উপাসনার উপর নির্ভর করে না— যদিও বা ফললাভে বিলম্ব ঘটিতে পারে। সুতরাং উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ নহে, সেই কারণেই ইহার অনুষ্ঠান ঐচ্ছিক।

অধিকরণ ২৮: বায়ু এবং প্রাণের উপাসনার মধ্যে বহুক্ষেত্রে মৌলিক ঐক্য থাকিলেও উহাদিগকে পৃথক্ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

প্রদানবদেব, তদুক্তম্ ॥৩।৩।৪৩॥

প্রদানবৎ (আহুতি প্রদানের ন্যায়) এব (ঠিক অনুরূপভাবে) তৎ (তাহা) উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে)।

৪৩. (বায়ু এবং প্রাণের ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য তাহাদের উপাসনার মধ্যেও পার্থক্য আছে যদিও এই দুইটি বস্তুত একই); (ইহা হইল) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদানের ঠিক অনুরূপ (পুরডাশ প্রদানের সময় শাস্তা ইন্দ্র, রাজা ইন্দ্র এবং অধিপতি ইন্দ্র ইত্যাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আহুতি প্রদান করা হয়)। ইহা (জৈমিনি মুনি পূর্বমীমাংসা সূত্রে) উল্লেখ করিয়াছেন।

[৪৩. প্রাণ এবং বায়ু স্বরূপত এক হইলেও তাঁহাদের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের উপাসনাকেও ভিন্ন ভিন্নভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন ইন্দ্র দেবতা হিসাবে এক হইলেও, তাঁহার শাসকত্ব, রাজত্ব এবং আধিপত্য ইত্যাদি ক্রিয়াগত পার্থক্যের জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান কালে উহা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবেই করিতে হয়।]

ছান্দোগ্য উপনিষদে সংবর্গবিদ্যার উপাসনায় দেহ প্রসঙ্গে প্রাণের এবং দেবতা প্রসঙ্গে বায়ুর ধ্যান করিবার নির্দেশ আছে। বহু শ্রুতিতেই এইরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রাণ এবং বায়ু স্বরূপত একই। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ মনে করেন যে এই দুই উপাসনাকে একত্র সংবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই সূত্রটি উক্ত মতবাদকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, বায়ু এবং প্রাণের স্বরূপগত অভিন্নতা থাকিলেও তাহাদের উপাসনাকে পৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ তাঁহাদের অধিষ্ঠানের ভিন্নতাহেতু তাঁহাদের ক্রিয়াও ভিন্ন। যেমন ইন্দ্র স্বরূপত একই দেবতা হইলেও শাস্তা ইন্দ্র, রাজা ইন্দ্র এবং অধিপতি ইন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষমতার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই আহুতি প্রদান করা হয়। সেইভাবেই বায়ু এবং প্রাণের উপাসনাকে পৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই নীতিতে জৈমিনি মুনি তাঁহার পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অধিকরণ ২৯ : বৃহদারণ্যকের অগ্নিরহস্যের অগ্নিসমূহ যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গ নহে— ইহারা একটি পৃথক্ বিদ্যার সৃষ্টি করে।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ, তদ্ধিবলীয়ঃ, তদপি ।।৩।৩।৪৪।।

লিঙ্গ-ভূয়স্ত্বাৎ (লক্ষণের বাহুল্য হেতু), তদ [ইহা] (লিঙ্গ, লক্ষণ) হি (যেহেতু) বলীয়ঃ (অধিকতর শক্তিশালী) তৎ (তাহা) অপি (ও)।

৪৪. লক্ষণগুলির বাহুল্য হেতু (বাজসনেয়ী শাখাবলম্বীদের অগ্নিরহস্যে মন, বাক্য ইত্যাদির অগ্নিসমূহ যজ্ঞের অঙ্গ নহে), কারণ ইহার (লক্ষণ বা লিঙ্গের) প্রাধান্য (প্রকরণ অপেক্ষা) অধিকতর বলবান। ইহাও (জৈমিনি মুনিরই অভিমত)।

[৪৪. অগ্নিরহস্যের (শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত) মন, .বাক্, চক্ষু ইত্যাদি নামক অগ্নিসমূহ যজ্ঞের অঙ্গ নহে। এখানে প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের প্রাধান্য হেতু। ইহাকে একটি বিদ্যারূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাও জৈমিনি মুনিরই অভিমত।]

শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিরহস্যে মন, বাক, চক্ষু ইত্যাদি নামে কতিপয় অগ্নির উল্লেখ আছে। এখানে প্রশ্ন হইল, এই অগ্নিসমূহ কি সেখানে উল্লিখিত যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ, না ইহারা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা? এই সূত্রটি বলিতেছে যে,যদিও প্রাথমিক দৃষ্টি এবং বিচারে মনে হয় যে, প্রকরণ অনুযায়ী ইহারা যজ্ঞেরই অংশ বিশেষ— তথাপি ইহারা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারও সৃষ্টি করে। কারণ, ইহাদের মধ্যে বহু পরিচায়ক লক্ষণসমূহ (লিঙ্গ) আছে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহারা একটি বিদ্যাই। এবং পূর্বমীমাংসা মতে প্রকরণ হইতে লিঙ্গেরই প্রাধান্য বেশি।

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎস্যাৎক্রিয়া, মানসবৎ ॥৩।৩।৪৫॥

পূর্ব-বিকল্প (প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিকল্প) প্রকরণাৎ (প্রকরণ [আলোচ্য বিষয়] হেতু) স্যাৎ (হওয়া উচিত) ক্রিয়া (যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ) মানসবৎ (কল্পিত পানীয়বৎ)।

৪৫. (পূর্ব সূত্রে যে-সকল অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহারা হইল প্রথমে যাহা উক্ত হইয়াছিল তাহারই বিকল্পস্বরূপ (অর্থাৎ যথার্থ যজ্ঞাগ্নিস্বরূপ)— প্রকরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। এই অগ্নিগুলিকে যজ্ঞেরই অংশবিশেষ মনে করা সঙ্গত যেমন কল্পিত পানীয়ের ক্ষেত্রে।

[৪৫. পূর্বপক্ষগণ মনে করেন যে, এই অগ্নিসমূহ যজ্ঞেরই অংশ, পৃথক্ বিদ্যা নহে। কল্পিত পানীয়ের ন্যায় প্রকরণ বিচারে ইহাদিগকে যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।]

বিপক্ষীয়গণ আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেন। কোন কোন যজ্ঞবিশেষে প্রজাপতির উদ্দেশ্যে সোমরস প্রদান করা হয়— সেখানে পৃথিবীকে পানপাত্র এবং সমুদ্রকে সোমরস বলিয়া কল্পনা করা হয়। ইহা একটি মানসক্রিয়া মাত্র— অথচ ইহা যজ্ঞেরই একটি অঙ্গ। সুতরাং এই অগ্নিসমূহও— যদিও মানসিক এবং কল্পিত, তথাপি যজ্ঞেরই অঙ্গ— একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে গ্রহণ করা ঠিক নহে— কারণ প্রকরণ অনুযায়ী ইহার বিষয়বস্তু হইল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। এই অগ্নিসমূহকে বরং প্রথমোক্ত যজ্ঞাগ্নির বিকল্পরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন।

অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৬॥

অতিদেশাৎ (গুণগুলির প্রয়োগ প্রথম অগ্নি হইতে এই অগ্নির উপর) (পরিবর্ধিত করিবার জন্য) চ (এবং)।

৪৬. (মূল যথার্থ অগ্নি হইতে বিশেষণগুলিকে এই কল্পিত অগ্নিগুলির উপর) পরিবর্ধিত করিবার জন্য (ইহারা যজ্ঞেরই অঙ্গ)।

[৪৬. (পূর্বপক্ষীয়গণ বলেন যে) যজ্ঞানুষ্ঠানের অগ্নির সহিত একই প্রকরণে মন ইত্যাদিরূপ কল্পিত অগ্নির সাদৃশ্য বর্ণনা করায়— ঐসকল বিশেষণগুলি যজ্ঞের অগ্নির বিকল্প বলিয়াই বুঝিতে হইবে।]

পূর্বপক্ষীয়গণ তাঁহাদের মতের সপক্ষে আরও একটি যুক্তি এখানে প্রদর্শন করিতে চান। শ্রুতি সংশ্লিষ্ট অংশে মূল অগ্নির সমস্ত গুণগুলিকে কল্পিত অগ্নি মন ইত্যাদির উপর আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং এই কল্পিত অগ্নিগুলিও যজ্ঞেরই অঙ্গ।

বিদ্যৈব তু, নির্ধারণাৎ ॥৩।৩।৪৭॥

বিদ্যা (বিদ্যা) এব (নিশ্চিতই) তু (কিন্তু) নির্ধারণাৎ (কারণ [শ্রুতি] এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন)।

৪৭. কিন্তু (অগ্নিসমূহকে) বরং একটি বিদ্যারূপে গণ্য করাই সমীচীন, কারণ (শ্রুতি) এইরূপই নির্ধারণ করিয়াছেন।

[৪৭. (পূর্বপক্ষের উত্তরে এখানে বলা হইয়াছে যে)— এই সকল কল্পিত অগ্নি বিদ্যারই অঙ্গীভূত— যজ্ঞের অঙ্গ নহে। কারণ ইহাই শ্রুতির নির্দেশ।]

এখানে 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষের মতকে খণ্ডন করিয়াছে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই অগ্নিগুলি একটি বিদ্যারই অঙ্গীভূত— কারণ শ্রুতি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়াছেন— "শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ইহাদের সৃষ্টি" এবং "উপাসনা এবং জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার জন্য এই সকলকে (অগ্নিকে) সৃজন করা হইয়াছে।"

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৪৮॥

দর্শনাৎ (যেহেতু লিঙ্গ [লক্ষণ] গুলি) দৃষ্ট হয়, চ (এবং)।

৪৮. এবং যেহেতু (লিঙ্গগুলি) দৃষ্ট হয়।

[৪৮. অগ্নিগুলিকে বিদ্যারই অঙ্গীভূত বুঝিতে হইবে, কারণ উহার লিঙ্গ (লক্ষণাদি) বর্ণিত হইয়াছে।]

৪৪ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে— সেইগুলিই লিঙ্গ।

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৯॥

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাৎ (শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের অধিকতর বলবত্তা হেতু) (অর্থাৎ লিঙ্গ, বাক্য ইত্যাদির সংযোগ) চ (এবং) ন বাধঃ (খণ্ডন করা যায় না)।

৪৯. এবং যেহেতু শ্রুতি ইত্যাদির (অর্থাৎ লিঙ্গ বাক্যাদিরও গুরুত্ব সমধিক) সেইজন্য (অগ্নিসমূহ যে বিদ্যারই অঙ্গ) তাহা খণ্ডন করা চলে না।

[৪৯. প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি (লিঙ্গ ও বাক্য) বলবান। সুতরাং উক্ত অগ্নিসমূহ বিদ্যারই অঙ্গ (কারণ শ্রুতিতে এইরূপ বলা আছে)।]

শ্রুতি স্পষ্টতই বলিয়াছেন— "এইসকল অগ্নিকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই প্রজ্বলিত করা হইয়াছে"। ইহাদের লিঙ্গ হইল এই: "তিনি যখন সুপ্ত থাকেন, তখনও সকল প্রাণী তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া এই সকল অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে।" এইসকল অগ্নির প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল অগ্নি মানসকল্পিতই। নিদ্রিতাবস্থায় বাস্তবিক যজ্ঞের কোন অনুষ্ঠান চলে না। বাক্যদ্বারা সংযোগের দৃষ্টান্ত হইল: "একমাত্র উপাসনার সাহায্যেই উপাসকগণের এইসকল অগ্নি প্রজ্বলিত হয়"। এই তিনটি শুধুমাত্র প্রকরণ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ, দৃষ্টশ্চ, তদুক্তম্ ॥৩।৩।৫০॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ (অনুবন্ধ [পূর্বাপর সংযোগ] ইত্যাদি [প্রসার প্রভৃতি] হইতে) প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ (যেমন অন্যান্য বিদ্যাকেও পৃথক্ বলিয়া জানা যায়) দৃষ্টঃ (ইহাও সেইরূপই দৃষ্ট হয়) চ (এবং) তৎ-উক্তম্ (জৈমিনি মুনিকর্তৃক ইহা বিহিত হইয়াছে)।

৫০. অনুবন্ধ এবং (বিস্তার ইত্যাদি) হইতে জানা যায় যে, অগ্নিসমূহ একটি পৃথক্ বিদ্যারই অন্তর্গত, যেমন (শাণ্ডিল্যাদি) অপর বিদ্যাসমূহ পৃথক্ই বটে।

এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রকরণ অন্য হইলেও যজ্ঞকে স্বতন্ত্র বলিয়াই গণ্য করা হয়। ইহা (পূর্বমীমাংসা সূত্রে জৈমিনি কর্তৃক) উক্ত হইয়াছে।

[৫০. যেমন প্রকরণ এক হইলেও অনুবন্ধাদির দ্বারা কর্ম হইতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতির পার্থক্য জানা যায়, সেইরূপ এই স্থলেও অনুবন্ধাদির দ্বারা মনরূপাদি অগ্নি প্রভৃতিকে যজ্ঞক্রিয়াদি হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। এইরূপ গ্রহণের পদ্ধতিটি জৈমিনি মুনি পূর্বমীমাংসা সূত্রে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।]

এই সূত্রটি ৪৭ সংখ্যক সূত্রে প্রদর্শিত যুক্তিকে আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য অতিরিক্ত একটি যুক্তি উপস্থাপিত করিতেছে। সম্পৎ—উপাসনার (সাদৃশ্য ভিত্তিক উপাসনা) উদ্দেশ্যে শ্রুতি মানসিক ক্রিয়ার যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গের সহিত সাধারণ যজ্ঞক্রিয়ার একটা সংযোগ স্থাপন করেন— যথা "মানসক্রিয়ার দ্বারা এই অগ্নিগুলিকে প্রজ্বলিত করা হয়, মানসক্রিয়ার দ্বারা যজ্ঞবেদি নির্মিত হয়...এই যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই মনের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়"। ইহা তখনই সম্ভব হয়, যদি সদৃশ বস্তুগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সুস্পষ্ট পার্থক্যও বর্তমান থাকে।

শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যাদির ন্যায় এই অগ্নিগুলিও একটি পৃথক্ বিদ্যারই অন্তর্গত, যদিও একটি যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গেই ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্তু বেদের কর্মকাণ্ডে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, আবেষ্টি যজ্ঞকে— যদিও ইহা রাজসূয় যজ্ঞের সহিতই উল্লিখিত, তথাপি জৈমিনি মুনি পূর্বমীমাংসা সূত্রে ইহাকে একটি স্বতন্ত্র যজ্ঞরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।

ন সামান্যাদপি, উপলব্ধেঃ,
মৃত্যুবৎ, নহি লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৫১॥

ন (নহে) সামান্যাৎ অপি (সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও) উপলব্ধেঃ (কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়) মৃত্যুবৎ (মৃত্যুর ক্ষেত্রের) ন হি লোকাপত্তিঃ (কারণ পৃথিবী কখনও অনুরূপ অগ্নি হইয়া যায় না কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও)।

৫১. সাদৃশ থাকা সত্ত্বেও (অগ্নির সহিত কল্পিত পানীয়ের) ইহারা যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয় না, কারণ, এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, (নানা যুক্তি বিবেচনায় তাহারা একটি পৃথক্ বিদ্যার অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য হয়; (এখানে মানসক্রিয়াগুলি হইল ঠিক সেইরূপ) যেমন মৃত্যুর ক্ষেত্রে জগৎ অগ্নিই হইয়া যায় না— যদিও তাহাদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকে।

[৫১. শুধু সাদৃশ্য থাকিলেই যজ্ঞ এবং উপাসনা এক হয় না। মনোময় অগ্নি যজ্ঞক্রিয়াময় অগ্নির সহিত এক হইতে পারে না— যদিও ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। মৃত্যু সম্পর্কে শ্রুতির দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুর সময় অগ্নির সহিত জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও জগৎ সম্পূর্ণ অগ্নিময়ই হইয়া যায় না।]

এই সূত্রটি ৪৫ সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত পূর্বপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করিতেছে। প্রতিপক্ষীয়গণ সেই সূত্রে যে সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসহ নহে— ইহার যুক্তিসমূহ পূর্বেই উপস্থাপিত করা হইয়াছে— সেই যুক্তি হইল— শ্রুতি, লিঙ্গ ইত্যাদির বিষয় বিবেচনা, উল্লিখিত অগ্নিসমূহ শুধু মানুষের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে— কোন যজ্ঞানুষ্ঠানকে নহে। শুধুমাত্র সাদৃশ্য দ্বারা বিপরীত মতকে সমর্থন করা যায় না। কোন না কোন বিষয়ে যে-কোন বস্তুর সহিত যে-কোন বস্তুর সাদৃশ্য থাকিতে পারে— তথাপি বস্তুসমূহ পরস্পর স্বতন্ত্রই। যে দৃষ্টান্তটি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইল একটি সাধারণ বিশেষণ 'মৃত্যু'— যাহা অগ্নি এবং আদিত্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "সেই আদিত্যমণ্ডলবর্তী পুরুষটি মৃত্যুই বটেন" (শত ব্রা. ১০.৫.২.৩)। 'অগ্নিই মৃত্যু'— (বৃহঃ ৩.২.১০)। এই সাদৃশ্যটি অগ্নি এবং সূর্যমণ্ডলবর্তী পুরুষকে এক করিতে পারে না। আমরা অন্যত্রও পাইঃ "হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিধ" (ছাঃ ৫.৪.১)। এখানে সমিধ ইত্যাদির সাদৃশ্যহেতু পৃথিবী বাস্তবিকপক্ষেই অগ্নি হইয়া যায় না।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ।।৩।৩।৫২।।

পরেণ (পরবর্তী [ব্রাহ্মণ] হইতে) চ (এবং) শব্দস্য (শ্রুতির) তাদ্বিধ্যম্ (এইরূপ একত্ব) ভূয়স্ত্বাৎ (বাহুল্যহেতু) তু (কিন্তু) অনুবন্ধঃ (সংযোগ)।

৫২. এবং পরবর্তী (ব্রাহ্মণ) হইতে (আলোচ্য) শ্রুতির বিষয়টি এইরূপ হওয়ার জন্য (অর্থাৎ পৃথক্ একটি বিদ্যারূপে গণ্য হওয়ার জন্য) (জ্ঞাত হয়)। কিন্তু (যথার্থ অগ্নির সহিত মানসকল্পিত অগ্নির) সংযোগটি বাহুল্যহেতু (পরবর্তী মানস অগ্নির গুণগুলি এই সকল অগ্নির বিষয়েও কল্পিত হয়)।

[৫২. মানসকল্পিত অগ্নির উল্লেখ ব্রাহ্মণের পরেই করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা মানস অগ্নির সহিত ক্রতুময় অগ্নির একবিধত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে মানসাগ্নির অঙ্গসমূহ সংখ্যায় অধিক থাকায়— ইহাদিগকে বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গরূপেই গণ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ এই সকল অগ্নি সমবায়ে বিদ্যা বা উপাসনাকেই বুঝিতে হইবে— যজ্ঞকে নহে।]

পরবর্তী একটি ব্রাহ্মণে আমরা পাই— "যেখানে সকল কামনার পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা সেখানে উপনীত হন। শুধুমাত্র ক্রিয়াবান্ যাঁহারা, তাঁহারা সেখানে যাইতে পারেন না" ইত্যাদি। এখানে বিদ্যা বা জ্ঞান-উপাসনার প্রশংসা এবং (যজ্ঞাদি) কর্মের অবমূল্যায়ন করা হইয়াছে। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি— অর্থাৎ অগ্নিসমূহ বিদ্যারই অঙ্গ— ইহাই শ্রুতির উপদেশ। এই সকল অগ্নির সহিত বাস্তব অগ্নির সম্পর্ক এইজন্য নহে যে, তাহাদের যজ্ঞের সহিত সম্পর্ক আছে, কিন্তু বাস্তব অগ্নির বহু গুণই বিদ্যার অগ্নিসমূহের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে।

অধিকরণ ৩০ : আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন একটি সত্তা।

এই পর্যন্ত উপাসনাগুলিরই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উপাসনাগুলির সার্থকতা নির্ভর করে দেহ বহির্ভূত এমন একটি ব্যক্তিসত্তার— যিনি উপাসনাসমূহের ফল ভোগ করিতে পারেন। এইরূপ একটি ব্যক্তিসত্তার অবর্তমানে সকল উপাসনাই— এমনকি সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশই নিরর্থক হইয়া যায়। সুতরাং এই প্রকরণে দেহ বহির্ভূত একটি আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করা যাইতেছে।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩।৩।৫৩॥

একে (কেহ কেহ, অস্বীকার করেন) আত্মনঃ (দেহ বহির্ভূত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে)। শরীরে (সতি) ভাবাৎ (ইহা বর্তমান আছে শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর বর্তমান আছে)।

৫৩. কেহ কেহ দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার কোন (অস্তিত্বকে) (স্বীকার করেন না) কারণ ইহা একমাত্র শরীরেই অবস্থান করেন।

[৫৩. কেহ কেহ (চার্বাকাদি) দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার কোন অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, দেহই আত্মা। যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ-ই আত্মা আছেন।]

এই সূত্রটি বস্তুবাদী চার্বাকদের মতবাদকে উপস্থাপিত করিতেছে— যাঁহারা মনে করেন যে দেহব্যতিরিক্ত আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই। চার্বাকগণ বলেন যে, মানুষ চেতনাগুণসম্পন্ন একটি দেহমাত্র এবং মানুষের দেহের এই চেতনা হইল কতকগুলি বস্তুসমবায়ে উৎপন্ন একটি রাসায়নিক পদার্থের ন্যায়। যেমন কতকগুলি বস্তু একত্র করিলে মাদকতাগুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক বস্তুর সৃষ্টি হয়— যদিও প্রতিটি বস্তুর

পৃথক্ কোন মাদকতাগুণ নাই। মানবদেহের চৈতন্যও সেইরূপই কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি। তাঁহারা এইভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন:— এই চেতনা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ দেহটি থাকে। দেহব্যতীত চেতনশক্তি অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা দেহেরই একটি গুণ বিশেষ। এইজন্যই এই দেহে আত্মা বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই।

ব্যতিরেকঃ, তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ, ন তু, উপলব্ধিবৎ ॥৩।৩।৫৪॥

ব্যতিরেকঃ (পৃথক্‌ভাব) তদ্‌ভাব-অভাবিত্বাৎ (কারণ, চেতনা শরীর থাকিলেও সব সময় থাকে না) ন (না এইরূপ নহে) তু (কিন্তু) উপলব্ধিবৎ (উপলব্ধির ন্যায়)।

৫৪. কিন্তু ইহা (এইরূপ) নহে। দেহ হইতে পৃথক্ (একটি আত্মা) (অবশ্যই আছেন); কারণ, দেহ থাকিলেও (মৃত্যুর পর) চেতনা থাকে না; যেমন উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমরা ইহা অনুভব করিয়া থাকি।

[৫৪. দেহ হইতে পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, চৈতন্য দেহের গুণ নহে। দেহ বর্তমান থাকিলেও মৃত্যুর পর ইহার চেতনা থাকে না। ইহা আমরা উপলব্ধি হইতেই বুঝিতে পারি।]

এই সূত্রটি পূর্বসূত্রে বর্ণিত মতবাদের খণ্ডন করিতেছে। চেতনা দেহের গুণ হইতে পারে না, কারণ মৃত্যুর পর আমরা মৃতব্যক্তির দেহে কোন চেতনা দেখিতে পাই না। সুতরাং এই চেতনা দেহব্যতিরিক্ত অথচ দেহবাসী কোন সত্তারই হইবে। পুনশ্চ, চার্বাকগণ এ-কথাও স্বীকার করেন যে, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তু হইতে ভিন্ন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমরা যাহারা এই দেহের প্রতীতি লাভ করি, তাহারা নিশ্চয়ই দেহ হইতে ভিন্ন। এবং এই সত্তাই, যিনি আমাদের এই দেহকে উপলব্ধি করেন— তিনিই আত্মা— এবং এই চৈতন্য হইল আত্মারই ধর্ম— বরং ইঁহারই স্বরূপ।

অধিকরণ ৩১: যজ্ঞের ক্রিয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উপাসনাই, যথা উদ্‌গীথ উপাসনা— সকল শাখার ক্ষেত্রেই গ্রহণীয়।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩।৩।৫৫॥

অঙ্গাববদ্ধাঃ (যজ্ঞাঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাসনাসমূহ) তু (কিন্তু) ন (নহে) শাখাসু (বিশেষ শাখাসমূহের সহিত) হি (যেহেতু) প্রতিবেদম্ (প্রত্যেক বেদেই)।

৫৫. কিন্তু (যজ্ঞাঙ্গের সঙ্গে) সংশ্লিষ্ট (উপাসনাসমূহ) প্রত্যেক বেদের (বিশেষ কোন) শাখাসমূহের মধ্যেই (সীমাবদ্ধ) নহে, (কিন্তু ইহার সকল শাখার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট), কারণ (সর্বত্র একই উপাসনার উপদেশ আছে।)

[৫৫. যজ্ঞকর্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলি যে যে শাখায় উল্লিখিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে। কারণ ঐ সকল উপাসনা সর্বত্রই এক।]

৫৫. যজ্ঞকর্মাঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি উপাসনার উল্লেখ আমরা পাই, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'ওম্' উপাসনার কথা। ইহা 'প্রাণ'রূপে উদ্গীথ উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা পৃথিবীরূপেও উদ্গীথ উপাসনার সঙ্গে যুক্ত— এইরূপ অন্যত্রও। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইসকল উপাসনা কি শুধুমাত্র উদ্গীথ প্রভৃতির সঙ্গেই এবং বেদের একটিমাত্র শাখার সঙ্গেই উপাস্য বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে— অথবা বেদের সকল শাখাতেই ইহা পরিব্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণীয়? এই সংশয় এইজন্য উৎপন্ন হয় যে, উদ্গীথ ইত্যাদিকে বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে পাঠ করা হয়— যাহার জন্য মনে হয় ইহারা বুঝি পরস্পর ভিন্ন। এই সূত্রটি— ইহারা শাখাবিশেষ মাত্র সীমাবদ্ধ— এই মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। যেহেতু শাস্ত্র এই উপাসনাগুলিকে সাধারণ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন— সেইজন্যই ইহারা সকল শাখাতেই একইরূপে পরিব্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ।।৩।৩।৫৬।।

মন্ত্রাদিবৎ (মন্ত্রাদির ন্যায়) বা (অথবা অপরপক্ষে) অবিরোধঃ (তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই)।

৫৬. অথবা অপরপক্ষে মন্ত্রাদির ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

[৫৬. মন্ত্র প্রভৃতি যেমন কোন কোন শাখাবিশেষে উল্লিখিত হইলেও প্রধানভূত যজ্ঞের একতাহেতু সকল শাখাতেই বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও উদ্গীথাদি সকল উপাসনার একত্বহেতু ঐ জাতীয় উপাসনা সকল শাখাতেই গ্রাহ্য হইতে পারে।]

যেমন কোন একটি ক্রিয়ানুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি শাখার মন্ত্রাদিকে অন্য শাখান্তর্গত সেই ক্রিয়াতে বিনিযুক্ত করা যায়, ঠিক সেইরূপভাবেই বিশেষ কোন বেদের শাখান্তর্গত কোন একটি উপাসনাকে অন্য শাখাতেও প্রয়োগ করা যায়।

অধিকরণ ৩২ : বৈশ্বানর উপাসনা সামগ্রিকভাবে একটি উপাসনাই বটে।

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং, তথা হি দর্শয়তি ॥৩।৩।৫৭॥

ভূম্নঃ (সমগ্র অনুষ্ঠানের আকারের উপর) ক্রতুবৎ (যেমন যজ্ঞে করা হয় সেইরূপ) জ্যায়স্ত্বং (গুরুত্ব) তথা (সেইরূপ) হি (কারণ) দর্শয়তি (শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করেন)।

৫৭. বৈশ্বানর উপাসনার সমগ্র আকারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়— যেমন একটি যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগ্রিকতার উপরই গুরুত্ব থাকে— কারণ শ্রুতি এইরূপ উপদেশই করেন।

[৫৭. বৈশ্বানর উপাসনার বিষয়ে সামগ্রিক রূপের উপাসনার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে— যেমন যজ্ঞের নানা অঙ্গ থাকিলেও সামগ্রিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ শ্রুতিতে এইরূপ নিদর্শনই আছে।]

আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫.১১-১৮ শ্রুতিতে বৈশ্বানর উপাসনার কথা জানিতে পারি— এই উপাসনায় ঈশ্বরকে বিশ্বের আকারে ধ্যান করিবার নির্দেশ আছে— এই ধ্যানে দ্যুলোককে ঈশ্বরের শিরোদেশ এবং আদিত্যকে তাঁহার অক্ষিরূপে— এইরূপে আরও নানাভাবে ধ্যান করিবার নির্দেশ আছে। উপনিষদের ঐ সকল পাদে উপাসনার বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ফললাভের কথা উল্লিখিত আছে। যেমন তাঁহার মস্তককে দ্যুলোক-রূপে ধ্যান করিবার ফল হইল: "তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ সম্ভূত হয়" (ছাঃ ৫.১২.২)। এখন প্রশ্ন হইল শ্রুতি কি এখানে শুধুমাত্র একটি বৈশ্বানর উপাসনার কথাই বলিয়াছেন অথবা খণ্ড খণ্ড উপাসনার কথাও বলিয়াছেন? এই সূত্রটি বলিতেছে এখানে সামগ্রিকভাবে বৈশ্বানর উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। অংশবিশেষের জন্য পৃথক্ ফলের কথাই বলা হইয়াছে। উপাসনাগুলিকে প্রধান উপাসনার সঙ্গে একত্র সংহত করিয়া একটি সমবায়রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি যে উপাসনাটিকে সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং আংশিক উপাসনাকে যে অনুমোদন করেন না, তাহা এই জাতীয় উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়— "তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত" (ছাঃ ৫.১২.২)। এই উপাসনাটি হইল কতকগুলি যজ্ঞানুষ্ঠানের ন্যায়— যে-সকল যজ্ঞে কতকগুলি গৌণ উপ-যজ্ঞও থাকে— এই সকল উপ-যাগের সমষ্টির ফল হইতেই মুখ্য যজ্ঞটির ফল লাভ হয়। এখানে যে একটি সামগ্রিক উপাসনাই উদ্দিষ্ট তাহা বুঝিতে পারা যায় যখন আমরা লক্ষ্য করি

যে, এই পাদটির প্রারম্ভে আছে:— "কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম"? (ছাঃ ৫.১১.১)।— ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র ব্রহ্মই হইলেন উপাসনার অনুসন্ধের বস্তু। ইহার পরিসমাপ্তিতেও এইরূপই আছে: "দ্যুলোকই উক্ত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক" ইত্যাদি (ছাঃ ৫.১৮.২)।

অধিকরণ ৩৩: শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা ইত্যাদির ন্যায় অন্যান্য বিদ্যাকে পৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে— একটি সামগ্রিক উপাসনাতে সমবেত করা সমীচীন হইবে না।

নানা, শব্দাদিভেদাৎ ॥৩।৩।৫৮॥

নানা (বিভিন্ন) শব্দাদিভেদাৎ (শব্দাদির পার্থক্য হেতু)।

৫৮. শাণ্ডিল্য, দহর ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যাগুলি ভিন্নই, যেহেতু (শ্রুতি) তাহাদের সম্পর্কে পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

[৫৮. সমস্ত উপাসনায় একই ব্রহ্ম উপাস্য হইলেও এবং ব্রহ্মফল প্রাপ্তি এক হইলেও শব্দ-ভেদ থাকায় বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ স্বীকার করিতে হইবে।]

পূর্ববর্তী সূত্রে ইহা দেখানো হইয়াছিল যে, যদিও শ্রুতি বৈশ্বানর উপাসনার অংশ বিশেষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি শ্রুতি ইহাকে একটি সামগ্রিক উপাসনারূপে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যকেই উপদেশ করিয়াছেন। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়াই বিপক্ষগণ বলেন যে, যেহেতু উপাসনার বিষয় হইলেন একই পরমেশ্বর, সেইজন্য, আমাদিগকে শাণ্ডিল্য বিদ্যা, দহর বিদ্যা, সত্য বিদ্যা এবং এইজাতীয় অন্যান্য বিদ্যাকেও একত্র সংহত করিয়া একটি বিদ্যারূপেই পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। এই সূত্রটি উক্ত বিপক্ষিয় মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, এই বিদ্যাগুলি পরস্পর ভিন্নই। কারণ শ্রুতি 'তিনি জানেন', "তিনি ধ্যান করুন", "তিনি ইহার ধারণা করুন", ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্বমীমাংসা মতানুসারে এই শব্দের নানাত্বই হইল ইহাদের কর্মানুষ্ঠানের পার্থক্যবোধের পরিচায়ক। এখানে 'আদি' শব্দটি অন্যান্য কারণ থাকারও নির্দেশক— যথা গুণগত ভেদ ইত্যাদি। যদিও উপাস্য একই পরমেশ্বর, তথাপি বিভিন্ন উপাসনায় তাঁহার বিভিন্ন গুণের কল্পনা করা হয় বলিয়া সেখানে তিনি ভিন্নই। অধিকন্তু, নানাজাতীয় বিদ্যাগুলিকে একত্র সংহত করিয়া উপাসনা করা একটি অসম্ভব ব্যাপারও বটে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাকে পৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করা বিধেয়— একটি মাত্র সাধারণ উপাসনায় ইহাদের সংহত করা সমীচীন হইবে না।

অধিকরণ ৩৪ : ব্রহ্ম সম্পর্কিত বিদ্যাগুলির মধ্য হইতে সাধকের রুচি অনুযায়ী একটি মাত্র যে-কোন বিদ্যা গ্রহণীয়।

বিকল্পঃ, অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ ।।৩।৩।৫৯।।

বিকল্পঃ (ইচ্ছানুরূপ গ্রহণীয়) অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ (সকল বিদ্যারই একই ফল বলিয়া)।

৫৯. (বহু বিদ্যার মধ্য হইতে) ইচ্ছানুযায়ী (যে কোন বিদ্যা গ্রহণীয়), কারণ (সকল বিদ্যার) ফলই এক।

[৫৯. ব্রহ্ম বিষয়ে বহু উপাসনা আছে। ইচ্ছানুরূপ যে-কোন একটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ সকল বিদ্যার ফলই এক।]

যেহেতু সকল উপাসনারই উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মোপলব্ধি, সেইহেতু সাধকের অভিরুচি অনুসারে যে-কোন একটি বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলাভ পর্যন্ত উহাতে একনিষ্ঠ হইয়া সাধন করিলেই যথেষ্ট। এবং যদি যে-কোন বিদ্যার সাহায্যেই হউক, ব্রহ্মলাভ হইয়া যায়— তাহা হইলে অন্যগুলিকে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনই হয় না। উপরন্তু একই সময়ে একাধিক উপাসনার সাধনা শুধু চিন্তাবিক্ষেপেরই কারণ হইবে— এবং সেইজন্য উপাসনার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। সেইজন্য সাধক একটি মাত্র উপাসনাকে অবলম্বন করিবেন।

অধিকরণ ৩৫ : বিশেষ কোন বাসনা পূরণের জন্য সাধক ইচ্ছামত একাধিক বিদ্যাকে গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারেন।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা, পূর্বহেত্বভাবাৎ ।।৩।৩।৬০।।

কাম্যাঃ (বিশেষ কোন কামনা পূর্তির জন্য উপাসনা) তু (কিন্তু) যথাকামং (নিজের ইচ্ছানুসারে) সমুচ্চীয়েরন্ (সমবেত করা যাইতে পারে) ন বা (অথবা নহে) পূর্ব-হেতু-অভাবাৎ (পূর্বের কোন কারণ না থাকা হেতু)।

৬০. কিন্তু কোন বিশেষ কামনার পূর্তির জন্য একাধিক বিদ্যাকে সমবেত করা অথবা না করা সাধকের ইচ্ছাধীন, কারণ (পূর্বসূত্রে) উল্লিখিত হেতুর অভাব (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছার অভাব) (এখানে বর্তমান)।

[৬০. সকাম উপাসনা একাধিক হইতে পারে— এবং ইহাদের সমবায়ও সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটিমাত্র স্বীয় রুচিকর উপাসনাকেই অবলম্বন করিতে হইবে।]

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মোপাসনা সংক্রান্ত উপাসনার যে-কোন একটিকে মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, এবং একই সময়ে একাধিক উপাসনাকে গ্রহণ করা সমীচীন নহে— কারণ একটি মাত্র বিদ্যাই ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, এবং একাধিক বিদ্যা মনের বিক্ষেপের কারণ হইতে পারে। তবে, নানা প্রকারের বিদ্যা আছে যেগুলি ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য করা হয় না— কিন্তু কোন কামনাবিশেষের পূর্তির জন্যই করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩.১৫.২ এবং ৭.১.৫ শ্রুতিতে বর্ণিত উপাসনাগুলির কথা। এখন প্রশ্ন হইল, কোন উপাসক কি এই বিদ্যাগুলির মধ্য হইতে একটিমাত্র বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া সেই উপাসনাতেই নিবদ্ধ থাকিবেন, অথবা, একসঙ্গে একাধিক বিদ্যার উপাসনা করিবেন, এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যেহেতু এই সকল বিদ্যার ফল ভিন্ন, ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় এক নহে— সেইহেতু সাধকের ইচ্ছানুযায়ী একসঙ্গে একটি বা একাধিক বিদ্যাও গৃহীত হইতে পারে।

অধিকরণ ৩৬ : যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্মাঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলিকে ইচ্ছানুসারে সংহত করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা না করাও যাইতে পারে।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩।৩।৬১॥

অঙ্গেষু (উপাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট যজ্ঞকর্মাঙ্গ বিষয়ে) যথা-আশ্রয়-ভাবঃ (যে যে কর্মাঙ্গের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট সেই সেই ভাবেই তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে)।

৬১. যজ্ঞ-কর্মাঙ্গের সহিত যে-সকল উপাসনা যুক্ত সেই সকল উপাসনা বিষয়ে— তাহারা যে যে কর্মাঙ্গের সঙ্গে যুক্ত সেই সেইগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

[৬১. উদ্‌গীথাদি কর্মাঙ্গের আশ্রিত বিদ্যা ঐ সকল কর্মাঙ্গের ন্যায়ই গ্রহণীয়— অর্থাৎ উদ্‌গীথাদি যেমন কর্মের অঙ্গ, তদ্রূপ ঐ সকল উদ্‌গীথাদি অঙ্গে আশ্রিত বিদ্যাসকলও কর্মের অঙ্গীভূত। (ইহা পূর্বপক্ষ।)]

৬১-৬৪ সংখ্যক সূত্রগুলি পূর্বপক্ষের মতকে প্রকাশ করিতেছে। বিভিন্ন বেদে একটি যজ্ঞ-সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া আছে। আবার শ্রুতিসমূহ নিজেরাই

বিধান দিতেছেন যে, বিভিন্ন বেদে উল্লিখিত এই সকল কর্মাঙ্গকে সংবদ্ধ করিতে হইবে— সমগ্র মুখ্য যজ্ঞটিকে যথাযথভাবে সম্পাদন করিবার জন্য। এখন প্রশ্ন হইল, এই যজ্ঞাঙ্গগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলি সম্পর্কে কি নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, কর্মাঙ্গের সম্পর্কে যে নিয়ম প্রযোজ্য, কর্মাঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলি সম্পর্কেও সেই নিয়মই অনুসরণীয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে— সমস্তগুলি উপাসনাকেও সংবদ্ধভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬২॥

শিষ্টেঃ (শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে) চ (এবং)।

৬২. এবং শ্রুতির নির্দেশ অনুসারেও (উপাসনার ভেদ নাই)।

[৬২. শ্রুতির নির্দেশমত— উপাসনার ভেদের উল্লেখ নাই।]

যেমন যজ্ঞের কর্মাঙ্গগুলি বিভিন্ন বেদে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত আছে, সেইরূপ ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলিও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। এই সকল উপাসনার মধ্যে কোন ভেদের উল্লেখ শ্রুতিতে নাই।

সমাহারাৎ ॥৩।৩।৬৩॥

৬৩. সংশোধনহেতু (ভ্রান্তি হইলে পুনরায় সংশোধন করিবার নির্দেশ আছে বলিয়া)।

[৬৩. উদ্গীথাদি দুষ্ট হইলে তাহা যথা বিধানে সংশোধন করিতে হয়। এক বেদের প্রযুক্ত দোষ অন্য বেদের মন্ত্রে শোধন হয়— সুতরাং ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট।]

পূর্বপক্ষ এখানে আর একটি যুক্তি উপস্থাপিত করিতেছেন। "যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব; যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ — যে উদ্গাতার এইরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার দ্বারা যদি কখনও দোষযুক্ত উদ্গান হইয়া যায়, তবে তিনি (ঐ জ্ঞানের বলে) হোতার সুনিষ্পন্ন কর্ম হইতে ফল আহরণ করিয়া উহার প্রতিকার করেন" (ছাঃ ১.৫.৫)। এখানে বলা হইয়াছে যে, (সামবেদের গায়ক) উদ্গাতা যদি কোন দোষ করেন তবে (ঋগ্বেদের আহ্বায়ক পুরোহিত) হোতা তাহার সংশোধন করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উপাসনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন বেদে বর্ণিত হইলেও তাহারা পরস্পর সম্পর্কযুক্তই বটে। সুতরাং এইগুলির সব কয়টিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩।৩।৬৪॥

গুণ-সাধারণ্য-শ্রুতেঃ (প্রণব) (ওম্ কে-শ্রুতি সমস্ত বেদেই একপ্রকার বলিয়া উপদেশহেতু) চ (এবং)।

৬৪. শ্রুতি 'ওম্' এই ধ্বনিকে (উদ্গীথবিদ্যার) সাধারণ অবলম্বন বলিয়া সকল বেদেই ঘোষণা করার জন্য (সব কিছুরই অনুষ্ঠান করণীয়)।

[৬৪. যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ বা প্রণবকে শ্রুতি সমস্ত বেদেই এক প্রকার বলিয়াছেন। সুতরাং তদাশ্রিত উপাসনাও সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠেয়।]

"ওঙ্কার অবলম্বনে বেদবিদ্যাবিহিত কর্ম প্রবৃত্ত হয়"— (ছাঃ ১.১.৯)। 'ওম্' এই ধ্বনিকে সকল বেদের সকল উপাসনার সাধারণ অবলম্বন হিসাবে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সকল বিদ্যার আশ্রয়ই যখন এক এবং ইহার অন্তরে স্থিত বিদ্যাগুলিও একই— সুতরাং সকল বিদ্যাই অনুষ্ঠেয়।

ন বা, তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৫॥

ন বা (বরং নহে) তৎসহভাব-অশ্রুতেঃ (শ্রুতি তাহাদের সহভাবের কথা উপদেশ না করা হেতু)।

৬৫. (যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্পর্কিত উপাসনাগুলিকে বরং সংবদ্ধ না করাই উচিত) যেহেতু শ্রুতি ইহাদিগকে সহভাবাপন্ন বলিয়া উপদেশ করেন নাই।

[৬৫. শ্রুতি সমস্ত উপাসনাকে সকলের জন্য বিধান না দেওয়ার জন্য অঙ্গ উপাসনাসমূহের সমুচ্চয়ভাব গ্রহণীয় নহে।]

এই সূত্রটি এবং পরবর্তী সূত্রটিদ্বারা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইতেছে। বিভিন্ন বেদে পরিব্যাপ্ত যজ্ঞগুলিকে সংহত করিবার পদ্ধতিটি ইহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাসনাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে (যজ্ঞ সমবায়ের ক্ষেত্রে) যদি উপদেশসমূহকে সংবদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে যজ্ঞটিই পণ্ড হইবে। কিন্তু উপাসনাগুলিকে সংহত করিয়া অনুষ্ঠান না করিলে কোন হানি হইবে না, কারণ উপাসনাসমূহ যজ্ঞের ফলকে বর্ধিত করে মাত্র (৩.৩.৪২ দ্রষ্টব্য)। এইগুলি যজ্ঞ হইতে অবিচ্ছেদ্য নহে। সুতরাং ইহাদের অনুষ্ঠান করিলেও চলে, না করিলেও ক্ষতি নাই।

দর্শনাচ্চ ।। ৩ । ৩ । ৬৬ ।।

দর্শনাৎ (কারণ শ্রুতি এইরূপ বলেন) চ (এবং)।

৬৬. এবং যেহেতু শ্রুতিও এইরূপ বলেন। (সমবায় নিষ্প্রয়োজন)।

[৬৬. শ্রুতিতেও দেখা যায় যে উপাসনাগুলির সহভাবের কোন নিয়ম নাই। সুতরাং উপাসনার সমবায় ঐচ্ছিক।]

"এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই (পর্যবেক্ষক পুরোহিত) যজ্ঞ, যজমান ও ঋত্বিক্‌বৃন্দকে রক্ষা করেন"— (ছাঃ ৪.১৭.১০)। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রুতি উপাসনাগুলির সমবায় ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তবে সকল পুরোহিতই সকল উপাসনাকে জানিতেন, এবং সেইক্ষেত্রে শ্রুতি যে বিশিষ্টগুণসম্পন্ন ব্রহ্মা নামীয় পুরোহিতকে অন্য পুরোহিতগণ হইতে বিশিষ্টতাদান করিয়াছেন তাহার কোন সার্থকতাই থাকিত না।

সুতরাং উপাসনাগুলিকে উপাসকের অভিরুচি অনুসারে সমবেত করা যাইতে পারে, অথবা নাও করা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থ পাদ

পূর্ববর্তী পাদে বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে— যে-সকল বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই পাদে আলোচনা করা হইতেছে যে, এই ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পাদিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা ইহা স্বয়ং মানুষের পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ। মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গের কামনার পূর্তির-ই চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হইল, ব্রহ্মজ্ঞান কি মানুষের এইসকল উদ্দেশ্যের কোনটিকে পূরণ করে, অথবা ইহা শুধুমাত্র যজ্ঞীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহা যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে বিশেষ কতকগুলি গুণে ভূষিত করে?

অধিকরণ ১ : ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠানের অধীন নহে।

পুরুষার্থোঽতঃ, শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ।।৩।৪।১।।

পুরুষার্থঃ (মানব জীবনের প্রার্থিত বিষয়) অতঃ (ইহা হইতে) শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে) ইতি (এইরূপ বলেন) বাদরায়ণঃ (ঋষি বাদরায়ণ)।

১. ইহা হইতে (উৎপন্ন হয়) পুরুষার্থ, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ আছে; ঋষি বাদরায়ণ এইরূপ বলেন।

[১. ঋষি বাদরায়ণ বলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই সাধকের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতিও ইহাই বলেন।]

ঋষি বাদরায়ণ শ্রুতি-নিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান মানুষকে পরম পুরুষার্থ দান করে— এবং ইহা যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। ইহা মোক্ষের কারণ। যে শ্রুতির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ :— "আত্মবিদ্ শোক অতিক্রম করেন" (ছাঃ ৭.১.৩); "যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।" (মুঃ ৩.২.৯); "যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্মই প্রাপ্ত হন" (তৈঃ ২.১)।

শেষত্বাৎপুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ।।৩।৪।২।।

শেষত্বাৎ (যজ্ঞক্রিয়ার পরিপূরক বলিয়া) পুরুষ-অর্থবাদঃ (কর্তার প্রশংসা বা অর্থবাদমাত্র) যথা (যেমন) অন্যেষু (অন্য ক্ষেত্রেও) ইতি (এইরূপ) (বলেন) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি)।

২. যেহেতু (আত্মা) যজ্ঞক্রিয়ার পরিপূরক, (সেইহেতু) (আত্মজ্ঞান লাভের) ফল কর্তার অর্থবাদ মাত্র। জৈমিনি মুনি বলেন যে— এইরূপ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।

[২. জৈমিনির মতে কর্তা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হওয়ায় বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতি কর্তার অর্থবাদ মাত্র। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

জৈমিনি মুনির মতে বেদসমূহ মানুষের বাসনাবিশেষের, এমনকি মোক্ষলাভেরও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান করে মাত্র— ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নহে। বেদান্তবাদীরা যেমন মনে করেন যে ব্রহ্মজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র ফল উৎপাদন করে— তিনি তাহা মনে করেন না— তিনি মনে করেন যে, ইহা কর্তার মাধ্যমে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাপার মাত্র। যদি কেহ নিজেকে দেহ হইতে পৃথক্ একটি সত্তা বলিয়া সচেতন না থাকে— এবং যদি সে মনে না করে যে মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিয়া যজ্ঞের ফল ভোগ করিতে পারিবে, তাহা হইলে সে যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্তই হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত শ্রুতিসমূহ কর্তাকে শুধুমাত্র জ্ঞান দান করে— সেইজন্য ইহা যজ্ঞক্রিয়ার অধীন একটি ক্রিয়াঙ্গ মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে বেদান্ত শাস্ত্র যে-সকল ফলের কথা বর্ণনা করেন তাহা অর্থবাদ মাত্র, যেমন শাস্ত্রে এইরূপ ফল অন্যান্য ক্রিয়া সম্পর্কেও অর্থবাদ হিসাবেই উক্ত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, জৈমিনি মনে করেন যে— সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তিনি দেহাতীত হইয়াও বাঁচিয়া থাকিবেন, তখনই সাধক (কর্তা) যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হন— যেমন যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য দ্রব্যাদিও সংশোধন ক্রিয়ার মাধ্যমেই যোগ্য হয়।

আচারদর্শনাৎ ॥৩।৪।৩॥

আচার-দর্শনাৎ (শাস্ত্র হইতে আচারাদি দর্শন হেতু)।

৩. কারণ আমরা (শাস্ত্র হইতে) (ব্রহ্মপুরুষের) এইরূপ আচরণ (যজ্ঞানুষ্ঠানাদি) দেখিতে পাই।

[৩. শাস্ত্রে দেখা যায় যে জনকাদির ন্যায় বহু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।]

"জনক নামে প্রসিদ্ধ বিদেহ সম্রাট বহুদক্ষিণা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"— (বৃঃ ৩.১.১);— "মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি" (ছাঃ ৫.১১.৫)।

জনক এবং অশ্বপতি উভয়েই আত্মজ্ঞ ছিলেন। যদি তাঁহারা এই আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠানের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই দুইটি শ্রুতি হইতেই আমরা নিশ্চিতভাবেই জানিতে পারি যে, তাঁহারা অবশ্যই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে শুধুমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়— বেদান্তবাদীরা যেমন মনে করেন তেমনি আত্মজ্ঞানের দ্বারা নহে।

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪॥

তৎ-শ্রুতেঃ (কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন)।

৪. তাহা (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান যে যজ্ঞকর্মাঙ্গের অধীন গৌণ হিসাবে গণ্য) শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন।

[৪. বিদ্যা বা উপাসনা যে যজ্ঞাধীন কর্মাঙ্গ তাহা শ্রুতির উপদেশ হইতেও জানা যায়।]

"বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়" (ছাঃ ১.১.১০)— এই শ্রুতিটি স্পষ্টতই বলিতেছেন যে, জ্ঞান হইল যজ্ঞেরই অঙ্গ-বিশেষ।

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩।৪।৫॥

কারণ এই দুইটি (জ্ঞান এবং কর্ম) একসঙ্গেই গমন করে (প্রয়াত আত্মার সঙ্গে [মৃত্যুর পর] ফলোৎপাদনের জন্য)।

[৫. জ্ঞান এবং কর্ম প্রয়াত আত্মার অনুসরণ করে— তাহার কৃতকর্মের ফলোৎপাদনের জন্য।]

"বিদ্যা ও কর্মের ফল ও অতীত সংস্কার তাঁহার সহিত গমন করে" (বৃঃ ৪.৪.২)। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বিদ্যা এবং কর্ম একই সঙ্গে আত্মার অনুসরণ করে এবং তাহার ভোগের যোগ্য কর্ম-ফলোৎপাদন করে। বিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে (এককভাবে) এইরূপ কোন ফল উৎপাদনে সক্ষম নহে।

তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩।৪।৬॥

তদ্বতঃ (বেদের তাৎপর্যবেত্তা ব্যক্তির জন্য) বিধানাৎ (শাস্ত্রের বিধান [কর্ম] থাকার জন্য)।

৬. কারণ (শাস্ত্রসমূহ) কর্মের (বিধান করেন) (যাঁহারা বেদের যথার্থ মর্ম অবগত হইয়াছেন— তাঁহাদের জন্যও)।

[৬. যাঁহাদের বেদের মর্মজ্ঞান আছে, শ্রুতি তাঁহাদের জন্যই কর্মের বিধান করেন।]

শাস্ত্র শুধু তাঁহাদের জন্যই যজ্ঞাদি কর্মের বিধান করেন যাঁহাদের বেদ-জ্ঞান আছে। আত্মজ্ঞান এই বেদজ্ঞানেরই অন্তর্গত। সুতরাং বিদ্যা এককভাবে কোন ফলোৎপাদন করিতে পারে না।

নিয়মাচ্চ ॥৩।৪।৭॥

নিয়মাৎ (বিহিত নিয়মানুযায়ী) চ (এবং)।

৭. এবং এই বিষয়ে (কর্মানুষ্ঠানের) নিয়ম বিহিত থাকার জন্য।

[৭. নিয়মিতভাবে কর্মানুষ্ঠান করার বিধানও শ্রুতিতে আছে।]

"যে ব্যক্তি এই জগতে শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক, তিনি (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন"— (ঈশ ২); "অগ্নিহোত্র যজ্ঞটি বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী— কারণ বার্ধক্য অথবা মৃত্যুহেতুই ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়" (শত. ব্রাঃ ১২.৪.১.১)। এই সকল শাস্ত্রবিধান হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বিদ্যা কর্মের অধীন।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবম্, তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৮॥

অধিক-উপদেশাৎ (যেহেতু শাস্ত্র শিক্ষা দেন যে, পরমাত্মাই হইলেন সর্বোপরি পৃথক্ কিছু) তু (কিন্তু) বাদরায়ণস্য (বাদরায়ণের মত হইল) এবম্ (এইরূপ— অর্থাৎ যথার্থ) তৎদর্শনাৎ (যেহেতু শাস্ত্রে তাহা দৃষ্ট হয়)।

৮. যেহেতু শাস্ত্র উপদেশ করেন যে, পরমাত্মাই হইলেন কর্তা হইতে পৃথক্ কোন একটি সত্তা, সেইজন্য বাদরায়ণের মতই শুদ্ধ— কারণ শাস্ত্রেও এইরূপ দৃষ্ট হয়।

২-৭ সংখ্যক সূত্রগুলি হইল মীমাংসকদের মত— ৮-১৭ সূত্রগুলি দ্বারা এই মতের খণ্ডন করা হইবে।

বেদান্তশাস্ত্র সসীম কর্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মার বিষয়ে উপদেশ করেন নাই—কিন্তু

কর্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মা সম্পর্কেই উপদেশ করিয়াছেন। এইজন্যই বেদান্ত-শাস্ত্র পরমাত্মা সম্পর্কে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কর্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মার জ্ঞান হইতে পৃথক্, এই অসীম নির্গুণ পরমাত্মার জ্ঞান শুধু যে সাধককে সাধনার ব্যাপারে সাহায্য করে তাহাই নহে— ইহার দ্বারা কর্তার সকল কর্মের (কর্মফলের) বিলোপ হয়। বেদান্তশাস্ত্র যে এই পরমাত্মারই উপদেশ করেন তাহা এই প্রকার শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়: "যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্"— (মুঃ ১.১.৯); "গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে" ইত্যাদি (বৃহঃ ৩.৮.৯)।

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩।৪।৯॥

তুল্যং (একই রূপ) তু (কিন্তু) দর্শনম্ (শ্রুতিরও ইহাই শিক্ষা)।

৯. শ্রুতির উপদেশ কিন্তু সমভাবে দুই মতকেই সমর্থন করে।

[৯. জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করার এবং না করার উভয় বিধানই তুল্যরূপে শাস্ত্রে দেওয়া আছে।]

এই সূত্রটি ৩ সংখ্যক সূত্রে প্রকাশিত মতকে খণ্ডন করিতেছে। ঐ সূত্রে দেখানো হইয়াছিল যে, জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করেন। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, শাস্ত্রে এইরূপ প্রমাণও তুল্যভাবেই পাওয়া যায় যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে আর কোন করণীয় কর্ম নাই। "এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিবেন"— (বৃহঃ ৩.৫.১)। আমরা শ্রুতি হইতে আরও জানিতে পারি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন— "প্রিয়ে, অমৃতত্বের সাধন এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (তদেব, ৪.৫.১৫)। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞের কর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল কর্মফলে অনাসক্তি এবং এইজন্য, অনাসক্ত কর্ম বাস্তবিকপক্ষে কর্মই নহে। সুতরাং মীমাংসার আপত্তির যুক্তিটি দুর্বল।

অসার্বত্রিকী ॥৩।৪।১০॥

১০. (৪ সংখ্যক সূত্রে যে শ্রুতিবচনটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহা সর্বত্র প্রযোজ্য (সত্য) নহে।

[১০. শ্রুতিতে বিদ্যাসহযোগে কর্মের যে বিধান তাহা সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। শুধু উদ্গীথ বিদ্যায় প্রযোজ্য।]

বিদ্যা যজ্ঞের ফলকে বিস্তারিত করে— ইত্যাদি শ্রুতিবচন সকল প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে— ইহা শুধুমাত্র উদ্গীথ সম্পর্কেই গ্রহণীয়— কারণ ঐ প্রকরণের আলোচ্য বিষয় ছিল উদ্গীথ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩।৪।১১॥

বিভাগঃ (জ্ঞান এবং কর্মের বিভাগ আছে) শতবৎ (যেমন একশতকে দুই জনের মধ্যে বিভাগ করিতে যাহা করিতে হয়)।

১১. কর্ম এবং জ্ঞানের (ফলের) বিভাগ করিতে হয়, যেমন একশতকে (দুই জনের মধ্যে ভাগ করিতে গেলে) যেইরূপ করিতে হয়।

[১১. (বিদ্যা ও কর্ম প্রয়াত পুরুষের অনুগামী হয়) পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত (ফল দানের জন্য)— যেমন শতমুদ্রাকে দুই ভাগ করিলে পৃথক্ পৃথক্ ফলই হয়।]

এই সূত্রটি ৫ সংখ্যক সূত্রে প্রদর্শিত মতকে খণ্ডন করিতেছে। "বিদ্যা ও কর্মের ফল ও অতীত সংস্কার তাঁহার সহিত গমন করে" (বৃঃ ৪.৪.২)। এখানে জ্ঞান এবং কর্মকে পৃথক্ পৃথক্ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে— এবং ইহার অর্থ হইবে এই যে জ্ঞানের একটি ভিন্ন ফল এবং কর্মেরও অন্য ফল। যেমন একশতকে দুই জনের মধ্যে পৃথক্ ভাগ করিয়া দিতে বলিলে আমরা প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করিয়া দুই ভাগে পৃথক্ভাবে দিয়া থাকি। ইহাদের দুইয়ের মধ্যে কোন সমবায় থাকে না। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়াও ৫ সংখ্যক সূত্রকে খণ্ডন করা যায়। উদ্ধৃত শ্রুতিটি শুধুমাত্র বিদ্যা এবং কর্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন— যাহা পুনর্জন্মলাভকারী জীবাত্মারই অনুসরণ করে— কিন্তু মুক্ত জীবের নহে। কারণ— এই শ্রুতিটি "যে ফলাকাঙ্ক্ষী তাহার এইরূপ (পুনর্জন্ম) হয়"— (তদেব, ৪.৪.৬)— ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব উল্লিখিত শ্রুতিটি পুনর্জন্মলাভকারী জীবাত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুক্ত জীবাত্মা সম্পর্কে শ্রুতি বলিয়াছেন— "পরন্তু যিনি কামনা পরতন্ত্র নহেন, (তিনি কখনও পুনর্জন্ম লাভ করেন না)"— ইত্যাদি (তদেব, ৪.৪.৬)।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩।৪।১২॥

১২. (শাস্ত্র তাঁহাদের জন্যই মাত্র যজ্ঞাদি কর্ম বিধান করেন) যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন।

[১২. কেবল বেদাদি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই (যজ্ঞাদি কর্মের বিধান করা হইয়াছে)।]

এই সূত্রটি ৬ সংখ্যক সূত্রকে খণ্ডন করিতেছে।

যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যজ্ঞাদি কর্ম সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারাই যজ্ঞকর্ম করিবার অধিকারী। যাঁহারা উপনিষদ্ হইতে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য কোন কর্মেরই বিধান নাই। আত্মজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কোন সংশ্রবই নাই।

ন, অবিশেষাৎ ॥৩।৪।১৩॥

ন (নহে) অবিশেষাৎ (বিশেষভাবে [শাস্ত্রে] উল্লেখ নাই বলিয়া)।

১৩. (জ্ঞানী সম্পর্কে) বিশেষ উল্লেখ না থাকায় ইহা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

[১৩. "কর্ম করিয়া শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা কর"— ইত্যাদি বিধান জ্ঞানীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য নহে।]

এই সূত্রটি ৭ সংখ্যক সূত্রকে খণ্ডন করিতেছে। ঐ সূত্রে উল্লিখিত ঈশোপনিষদের মন্ত্রটি হইল একটি সাধারণ উপদেশ— এবং সেখানে এমন কোন বিশেষ উল্লেখ নাই যে, ইহা জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এইরূপ কোন বিশেষ বিধানের উল্লেখ না থাকায় উহা জ্ঞানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে।

স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥৩।৪।১৪॥

স্তুতয়ে (জ্ঞানের বিদ্যার প্রশংসার নিমিত্ত) অনুমতিঃ (অনুমতি) বা (বরং)।

১৪. (যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের) অনুমতি বরং (বিদ্যার) প্রশংসারই নিমিত্ত।

[১৪. ঈশোপনিষদে যে কর্মের বিধান দেওয়া আছে— তাহা অনেকটা বিদ্যার প্রশংসার জন্যই।]

আত্মজ্ঞানীর পক্ষে যে কর্মের বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা বিদ্যারই প্রশংসার জন্য। ইহার মধ্যে যে প্রশংসাবাদ আছে তাহা এইরূপ:— আত্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপীই কর্মানুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন— কিন্তু আত্মজ্ঞান হেতু তিনি কোন কর্মফলের দ্বারাই বদ্ধ হইবেন না।

কামকারেণ চৈকে ॥৩।৪।১৫॥

কামকারেণ (তাহাদের [আত্মজ্ঞদের] ইচ্ছানুসারে) চ (এবং) একে (কেহ কেহ)।

১৫. এবং কোন কোন (আত্মজ্ঞ পুরুষ) তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে (সমস্ত কর্ম হইতে বিরত হইয়াছেন)।

[১৫. ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্রহ্মজ্ঞের কর্মানুষ্ঠান ঐচ্ছিক। জনকাদি ঋষিরা ব্রহ্মকর্ম করিয়াছেন—আবার কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের পর কর্ম করেন নাই।]

৩ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জনক এবং অন্যেরা ব্রহ্মজ্ঞানের পরও কর্ম করিয়াছেন। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জ্ঞানলাভের পর স্বেচ্ছায় সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। মূল বক্তব্য হইল, অপরের সম্মুখে আদর্শ স্থাপনের জন্য কেহ কেহ কর্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, আবার অন্যেরা না-ও করিতে পারেন। কর্ম-বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

উপমর্দং চ ॥৩।৪।১৬॥

উপমর্দ (ধ্বংস) চ (এবং)।

১৬. এবং (শাস্ত্র বলেন যে, জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা) বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

[১৬. বিদ্যা কর্মের অঙ্গ নয়। বরং জ্ঞানের দ্বারা কর্মফল ধ্বংসই হয়।]

জ্ঞান সকল অবিদ্যাকে ধ্বংস করে— এবং অবিদ্যার সৃষ্টি— (অহংজ্ঞানী) কর্তা, ক্রিয়া এবং কর্মফলকেও ধ্বংস করে। "কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?"— (বৃঃ ৪.৫.১৫)। আত্মজ্ঞান হইল সকল কর্মের বিরোধী— এবং এইজন্যই সম্ভবত ইহা কর্মাঙ্গের অধীন হইতে পারে না।

ঊর্ধ্বরেতঃসু চ, শব্দে হি ॥৩।৪।১৭॥

ঊর্ধ্বরেতঃসু (যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় [সন্ন্যাসী] তাঁহাদের ভিতর বিদ্যা প্রতিভাত হয়) চ (এবং) শব্দে (শাস্ত্রে) (এই চতুর্থ জিতেন্দ্রিয় আশ্রমের উল্লেখ আছে) হি (যেহেতু)।

১৭. যাঁহারা (সন্ন্যাসী) তাঁহাদের মধ্যেই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) পরিস্ফুট হয়। কারণ (এই চতুর্থ আশ্রমের উল্লেখ) শাস্ত্রে আছে।

[১৭. সন্ন্যাস আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন— কর্মের নহে। সুতরাং বিদ্যা কর্মাঙ্গ নহে।]

শাস্ত্রে আছে যে, শমদমাদিসম্পন্ন সন্ন্যাস আশ্রমে—অর্থাৎ চতুর্থ আশ্রমে বিদ্যা লাভ হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবেক-বিচার ব্যতীত অন্য কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধান-ই নাই। সুতরাং বিদ্যা কিভাবে কর্মের অধীন (কর্মাঙ্গ) হইতে পারে? শাস্ত্রের এই সকল শ্রুতি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, জীবনে সন্ন্যাসাশ্রম নামে একটি অবস্থা আছে: "ধর্মের বিভাগ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান একটি ধর্ম বিভাগ;...ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন; কিন্তু যিনি (প্রণবরূপ ব্রহ্ম প্রতীকে) ব্রহ্মোপাসনা করেন তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন"— (ছাঃ ২.২৩.১): "পরিব্রাজকগণ মাত্র এই লোককে (আত্মাকে) পাইবার ইচ্ছাতেই পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন"— (বৃঃ ৪.৪.২২); (মুঃ ১.২.১১) এবং (ছাঃ ৫.১০.১ শ্রুতিও দ্রষ্টব্য)। যে কোন সাধক গৃহস্থাশ্রমাদিতে প্রবেশ না করিয়াও এই সন্ন্যাসাশ্রমকে অবলম্বন করিতে পারেন— ইহা হইতেই বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য (মুখ্যত্ব) বুঝিতে পারা যায়।

অধিকরণ ২: সন্ন্যাস শাস্ত্রেরই বিধান।

পরামর্শ জৈমিনিরচোদনা চ, অপবদতি হি ।।৩।৪।১৮।।

পরামর্শ (উল্লেখ মাত্র) জৈমিনিঃ (জৈমিনি) অচোদনা (কোন বিধান সেখানে নাই) চ (এবং) অপবদতি হি (কারণ শাস্ত্র) (ইহাকে নিন্দা করেন)।

১৮. জৈমিনি মুনি (মনে করেন যে, পূর্বসূত্রের শ্রুতিতে যাহা আছে) তাহা একটি উল্লেখ মাত্র (সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়ে)— ইহা কোন বিধান নহে, কারণ (অন্যান্য শ্রুতি সন্ন্যাসকে) নিন্দাই করিয়াছেন।

[১৮. আচার্য জৈমিনি মনে করেন— 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' এই শ্রুতিবাক্যে যে সন্ন্যাসের কথা আছে তাহা উল্লেখ মাত্র— বিধি নহে। অধিকন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাও অন্যান্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।]

পূর্ববর্তী সূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিটি (ছাঃ ২.২৩.১) প্রসঙ্গে জৈমিনি বলেন যে, যেহেতু শব্দত (সন্ন্যাস শব্দটিকে ব্যবহার করিয়া) ঐ শ্রুতিতে সন্ন্যাসের কোন বিধান

দেওয়া নাই, সেইজন্য ইহা একটি উল্লেখ মাত্র, বিধান নহে। পূর্ববর্তী সূত্রে উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের শ্রুতি বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া ইহা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন। এখানে শ্রুতি একটি ঘটনার বিবৃতিমাত্র দিয়াছেন, সন্ন্যাসের বিধান দেন নাই। অধিকন্তু শ্রুতি এখানে ব্রহ্মনিষ্ঠাকে প্রশংসা করিয়াছেন। "কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন"। যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এবং সারাজীবন ঊর্ধ্বরেতঃ-ব্রত পালন দ্বারা বিবিধ প্রকার লোকে গমন করা যায়। কিন্তু অমৃতত্ব লাভ শুধুমাত্র তিনিই করিতে পারেন যিনি ব্রহ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ। ইহাই শ্রুতির মূল বক্তব্য। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি শ্রুতি আছে, যাহাতে সন্ন্যাসের নিন্দা করা হইয়াছে: "আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া) সন্তান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে" (তৈঃ ১.১১.১); "যাহার পুত্রসন্তান নাই, তাঁহার সংসারে অধিকার নাই" (তৈঃ ব্রাঃ ৭.১৩.১২)— এবং এইপ্রকার আরও অনেক শ্রুতিবচন আছে।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ, সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯॥

অনুষ্ঠেয়ং (অনুষ্ঠান করা উচিত) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ মুনি বলেন) সাম্যশ্রুতেঃ (কারণ শ্রুতি সমানভাবেই চারিটি আশ্রমের কথাই বলিয়াছেন)।

১৯. বাদরায়ণ ঋষি (মনে করেন যে, সন্ন্যাসাশ্রমও) অনুষ্ঠেয়, কারণ (উক্ত) শ্রুতিসমূহ সমভাবেই (চারিটি আশ্রমের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।)

[১৯. বাদরায়ণ মনে করেন যে গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমও অবশ্যই গ্রহণীয়; কারণ উভয় প্রকার শ্রুতিই রহিয়াছে।]

উক্ত শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কর্ম গৃহস্থের সম্পর্কে, তপস্যা বানপ্রস্থীর পক্ষে, স্বাধ্যায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং 'দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠার' কথা সন্ন্যাসীর পক্ষে কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি সমানভাবেই সকল আশ্রমের জীবনের চারিটি অবস্থার কথাই বলিয়াছেন। অন্যত্র যাহার বিধান দেওয়া আছে— প্রথম তিনটি আশ্রম সম্পর্কে সেই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। সন্ন্যাস সম্পর্কেও শ্রুতি এইভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাসও শ্রুতি বিহিত— এবং সকলেরই সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান অবশ্যই করণীয়।

বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩।৪।২০॥

বিধিঃ (শাস্ত্রের অনুষ্ঠেয় বিধান) বা (অথবা বরং) ধারণবৎ (যেমন সমিৎপানি হইয়া গুরুসমীপে গমনের বিধির সেইরূপ)।

২০. বরং ইহাকে একটি বিধান (বলিয়া এই শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন), যেমন সমিৎপানি হইয়া (গুরু সমীপে গমনের) বিধান আছে।

[২০. বরং ইহাকে (সন্ন্যাসকে) একটি বিধি বলিয়াই (শ্রুতির নির্দেশ) বুঝিতে হইবে—যেমন গুরু সমীপে সমিধ-হস্তে যাইবার বিধান আছে।]

এখন এই সূত্রটি ইহাই প্রমাণ করিতে চায় যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্রুতিটি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন ব্যাপারে এইরূপ একটি শ্রুতি আছে: "সমিধকে নিম্নদেশে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইবে, কারণ দেবতার উদ্দেশে হইলে সমিধকে উপরি ভাগে ধারণ করিবে"। এই শ্রুতির শেষ অংশকে জৈমিনিমুনি বিধিবাক্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যদিও ইহার মধ্যে বিধিসূচক কোন শব্দের ব্যবহার হয় নাই, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ বিধিবাক্য অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার অপূর্বতার জন্যই ইহা একটি বিধিবাক্য। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়াই এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ছাঃ ২.২৩.১ শ্রুতিতে সন্ন্যাস বিষয়ে একটি বিধি আছে— এবং ইহা শুধুমাত্র উল্লেখ নহে— কারণ অন্যত্র ইহাকে কোথাও বিধিরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকন্তু অন্যত্র এমন সব শ্রুতি আছে যেখানে প্রত্যক্ষভাবেই সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে: "অথবা তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গার্হস্থ্য আশ্রম কিংবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারেন"—(জাবালঃ ৪)।

পুনরায় জৈমিনি নিজেই বলিতেছেন যে, যদি অর্থবাদও হয়, তাহা হইলেও প্রাসঙ্গিক হইতে গেলে ইহাকে বিধির সহিত পরিপূরক সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে। উল্লিখিত শ্রুতিতে নিশ্চল ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রশংসাবাদ আছে, এবং সেইজন্যই ইহার বিধিজাতীয় একটা মূল্য আছে। এখন প্রশ্ন হইল, যিনি যজ্ঞাদি কর্মে সদা ব্যাপৃত, তাঁহার পক্ষে কি সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা আছে? ব্রহ্মনিষ্ঠার অর্থ হইল সর্বপ্রকার চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া নিরন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করা। শ্রৌত যজ্ঞাদিকর্মে নিযুক্ত কোন গৃহস্থের পক্ষেই এইরূপ ধ্যান সম্ভব নহে। ইহা সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে।

ইহাও সত্য নহে যে, শ্রৌতাদি কর্মে অসামর্থ্যহেতু শুধুমাত্র খঞ্জ, অন্ধাদি ব্যক্তিগণের জন্যই সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। উপরি উক্ত (জাঃ ৪) শ্রুতি এইরূপ কোন পার্থক্য করেন নাই। অধিকন্তু সন্ন্যাসকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির একটি পন্থা বলিয়া গণ্য করা হয়— এবং বিশেষ কতকগুলি বিধির মাধ্যমেই ইহাকে গ্রহণ করিতে হয়। "গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিত মস্তক অপরিগ্রাহী পরিব্রাজকই নিজেকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করিয়া

তোলেন।” সুতরাং সন্ন্যাস শাস্ত্রেরই বিধান এবং সন্ন্যাসীর জন্য বিহিত বলিয়াই জ্ঞান কর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অধিকরণ ৩. ছান্দোগ্যঃ ১.১.৩ শ্রুতিতে উল্লিখিত বিদ্যাগুলি অর্থবাদ মাত্র নহে, ইহা উপাসনারই বিধান।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, ন, অপূর্বত্বাৎ ।।৩।৪।২১।।

স্তুতিমাত্রম্ (প্রশংসা মাত্র) উপাদানাৎ (কর্মাঙ্গের সহিত ইহাদের উল্লেখ হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে) অপূর্বত্বাৎ (ইহার অপূর্বত্বহেতু)।

২১. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ছাঃ ১.১.৩-এ যাহার উল্লেখ আছে তাহা) প্রশংসামাত্র কারণ (যজ্ঞকর্মাঙ্গের সহিত) ইহাদের উল্লেখ আছে, (ইহার উত্তরে আমরা বলিব) না, এইরূপ হইতে পারে না, কারণ, এখানে এইমাত্র ইহার প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্বে কোথাও নাই)।

[২১. ছান্দোগ্যে উদ্গীথকে যজ্ঞকর্মের অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রশংসা-সূচক বাক্য মাত্র বলা যায় না। পূর্বে কোন স্থানে ইহাকে বিধি না বলায় উহাকে উদ্গীথ উপাসনার বিধান বলিয়াই মনে করিতে হইবে।]

“সেই যে উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার, উহাই রসসমূহের মধ্যে রসতম, সর্বোত্তম, পরমাত্মার স্থানীয় এবং অষ্টম” (ছাঃ ১.১.৩)। “এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নি সাম” (তদেব ১.৬.১)। বিরোধিপক্ষ মনে করেন যে, এই শ্রুতিগুলি প্রশংসাবাদ মাত্র, ইহারা ওঙ্কার উপাসনার বিধি নহে— ইত্যাদি। এই শ্রুতিবচনগুলি এইজাতীয়:— ‘স্রুবই পৃথিবী’, ‘কূর্মই সূর্য’—যাহা স্রুব ইত্যাদিকে মহিমান্বিত করে মাত্র। বিরুদ্ধপক্ষের এই মতকে এই সূত্রের দ্বিতীয়ার্ধে খণ্ডন করা হইয়াছে। এখানে উপমাটি যথার্থভাবে প্রযোজ্য নহে। অর্থবাদ বা প্রশংসার একটি উদ্দেশ্য থাকিতে হইলে ইহার সহিত বিধির একটা পরিপূরক সম্পর্ক থাকিতে হইবে। এখানে উপমা হিসাবে যেশ্রুতিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি বিধিবাদীয় শ্রুতির প্রায় সম পর্যায়েরই। সুতরাং এইগুলিকে অর্থবাদ বা প্রশংসা হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতির যে অংশে উদ্গীথ ওঙ্কারকে ‘রসসমূহের মধ্যে রসতমরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপনিষদেরই অন্তর্গত— ইহাকে কর্মকাণ্ডের উদ্গীথ বিধির সঙ্গে যুক্ত করা সঙ্গত নহে। এইজন্যই, ইহার

অপূর্বত্বহেতু (পূর্বে কখনও উল্লিখিত না হইবার জন্যে) ইহা একটি বিধিই— অর্থবাদ মাত্র নহে।

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩।৪।২২॥

ভাব-শব্দাৎ (বিধিজাতীয় ভাবদ্যোতক শব্দের প্রয়োগ হেতু) চ (এবং)।

২২. এবং এমন কতগুলি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে— যাহা বিধিরই ভাবদ্যোতক।

[২২. 'উপাসনা করিবে'— এইরূপ শব্দদ্বারা বিধান হেতু শ্রুতির এই বাক্যকে উপাসনারূপেই গ্রহণ করিতে হইবে— প্রশংসামাত্ররূপে নহে।]

এই শ্রুতিতে (ছাঃ ১.১.১) 'ওঙ্কারের' উপাসনা করিবার স্পষ্ট বিধান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ স্পষ্ট বিধিসূচক শ্রুতি থাকার জন্য পূর্বসূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিকে আমরা 'ওঙ্কারের' প্রশংসামাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

অধিকরণ ৪ : উপনিষদে যে সকল আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহা পারিপ্লব আখ্যায়িকার ন্যায় নহে, সেগুলি কর্মাঙ্গ নহে। এই কাহিনীগুলি হইল উপদিষ্ট বিদ্যার অর্থবাদজ্ঞাপক।

পারিপ্লবার্থা ইতি চেৎ, ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥৩।৪।২৩॥

পারিপ্লবার্থাঃ (পারিপ্লব কাহিনীর উদ্দেশ্যে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে) বিশেষিতত্বাৎ (যেহেতু বিশেষ কতকগুলি কাহিনীকেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে)।

২৩. যদি এইরূপ বলা হয় যে, উপনিষদে যে সকল কাহিনী আছে তাহা পারিপ্লব অনুষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য। ইহার উত্তরে আমরা বলিব, "না— তাহা নহে।" কারণ পারিপ্লবের জন্য শ্রুতি কতকগুলি বিশেষ কাহিনীকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

[২৩. 'পারিপ্লব' হইল অশ্বমেধযজ্ঞে পঠিত কাহিনী-সমষ্টি। উপনিষদের কাহিনীগুলি পারিপ্লবার্থে ব্যবহৃত হয় না— কারণ পারিপ্লবের কাহিনীগুলি শ্রুতি নির্দিষ্ট করা আছে।]

অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানটি একবৎসর সময়ব্যাপী হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠাতা এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে কিছুদিন পর পর কতকগুলি কাহিনী শ্রবণ

করিতে হয়। এই কাহিনী-সমষ্টিকে বলা হয় পারিপ্লব, এবং ইহা একটি যজ্ঞকর্মাঙ্গও বটে। এখন প্রশ্ন হইল, উপনিযদের কাহিনীগুলিও কি একই উদ্দেশ্যে গৃহীত হইবে?— যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তো ইহারাও যজ্ঞকর্মাঙ্গ হইয়া যায়— এবং সেই ক্ষেত্রে ইহার অর্থ এই হয় যে, জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডেরই অধীন। উল্লিখিত কাহিনীগুলি হইল যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী কাহিনী, প্রতর্দন কাহিনী ইত্যাদি— যেগুলি বৃহদারণ্যক, কৌষীতকী এবং অন্যান্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

এই সূত্রটি বলে যে, ইহারা পারিপ্লব অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নহে— কারণ পারিপ্লবের কাহিনীগুলি শ্রুতি দ্বারা নির্ধারিত। যে কোন কাহিনী ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না। উপনিষদের কাহিনীগুলিকে এইজাতীয় কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥৩।৪।২৪॥

তথা (সেইরূপভাবে) চ (এবং) একবাক্যতা-উপবন্ধাৎ (একত্বভাবে সংবদ্ধ থাকা হেতু)।

২৪. এবং এইরূপভাবেই (এইগুলি সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উদাহরণস্বরূপ) একই সঙ্গে গ্রথিত হইয়া আছে বলিয়া।

[২৪. উপনিষদ্ বর্ণিত কাহিনীগুলি ঐগুলির নিকটতম বিদ্যার বিষয়কে বিস্তারিত করিবার জন্য ইহার (বিদ্যার) সহিত এক হইয়া সন্নিবিষ্ট আছে। ইহারা বিদ্যার সহায়ক, পারিপ্লবের অঙ্গ নহে।]

উপনিযদের কাহিনীগুলি যেহেতু পারিপ্লবের অঙ্গ নহে, সেইজন্য ইহারা বিদ্যার ব্যাখ্যানের জন্যই উল্লিখিত। বিদ্যার্থিগণের ধারণার সৌকর্যার্থে আখ্যানাকারে অবতারণা করা হইয়াছে— ইহার দ্বারা বিদ্যার্থিগণ বর্ণিত বিদ্যাবিষয়ে আরও মনোযোগী হইতে পারিবে।

অধিকরণ ৫: সন্ন্যাসিগণের যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩।৪।২৫॥

অতএব (সেইজন্য) চ (এবং) অগ্নি-ইন্ধনাদি-অনপেক্ষা (অগ্নি প্রজ্বলনাদি ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হয় না)।

২৫. এবং সেইজন্যই অগ্নি প্রজ্বলনাদি ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

[২৫. 'জ্ঞানেই মুক্তি' শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকার জন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম নিষ্প্রয়োজন।]

৩.৪.১ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞান দ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়— ইহাই জীবনের লক্ষ্য। যেহেতু একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই এই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেইহেতু সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রুতিবিহিত গৃহস্থের করণীয় যজ্ঞাদি অগ্নিক্রিয়ানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই।

অধিকরণ ৬ : যেহেতু শ্রুতিবিহিত কর্মানুষ্ঠানাদি পরোক্ষভাবে জ্ঞানের সহায়ক— সেইহেতু ইহাদের উপযোগিতা আছে।

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ ।।৩।৪।২৬।।

সর্বাপেক্ষা (সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা আছে) চ (এবং) যজ্ঞাদি-শ্রুতেঃ (কারণ, জ্ঞানলাভের সহায়ক হিসাবে শ্রুতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিহিত করিয়াছেন) অশ্ববৎ (পথ চলার সহায়ক অশ্বের ন্যায়)।

২৬. এবং সকল শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজন আছে, কারণ শাস্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন (জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে মাত্র, যদিও জ্ঞানের ফল মোক্ষলাভের জন্য ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই)— যেমন অশ্বের প্রয়োজন হয় (রথ চালনার জন্য কিন্তু হল চালনার জন্য নহে)।

[২৬. জ্ঞানলাভের সহায়ক হিসাবে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধানই শাস্ত্রে আছে, কিন্তু মোক্ষলাভের সঙ্গে যজ্ঞাদির সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক নাই। যেমন গমন কার্যের জন্য অশ্বের প্রয়োজন— কিন্তু উদ্দিষ্ট দেশ প্রাপ্ত হইলে গমনের ফলের সঙ্গে অশ্বের সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক থাকে না।]

পূর্ব সূত্র হইতে হয়তো আমরা ধারণা করিব যে, যজ্ঞাদি কর্মের মোটেই কোন প্রয়োজন নাই। এই সূত্রটি বলে যে, এই সকল ক্রিয়ার উপযোগিতা আছে— এবং শাস্ত্রেও ইহাদের বিধান আছে— কারণ ইহারা জ্ঞানলাভের সহায়ক। কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ সাধনে ইহাদের কোন ভূমিকাই নাই। মোক্ষলাভ একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব— কর্মদ্বারা নহে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া মনকে শুদ্ধ করে, এবং এইরূপ শুদ্ধ মনেই আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হন। সুতরাং জ্ঞান উৎপাদনের পরোক্ষ উপায়রূপে কর্মের উপযোগিতা আছে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাঽপি তু, তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭॥

শম-দমাদি-উপেতঃ স্যাৎ (সাধককে শম-দমাদিসম্পন্ন হইতে হইবে) তথা অপি (যদি তাহাই হয় তাহা হইলেও) তু (কিন্তু) তদ্বিধেঃ (যেহেতু এই সকলের বিধান আছে) তদঙ্গতয়া (জ্ঞানের সহায়ক রূপে) তেষাম্-অবশ্য-অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ (এবং এইজন্য, অবশ্যই ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে)।

২৭. কিন্তু যদি ইহা এইরূপই হয় (অর্থাৎ যদিও জ্ঞানলাভের জন্য কর্মানুষ্ঠানের বিধান শ্রুতিতে [বৃহঃ ৪.৪.২২] নাও থাকে), তথাপি সাধককে শম-দমাদিসম্পন্ন হইতে হইবে; যেহেতু জ্ঞানলাভের সহায়ক রূপে ইহাদের উপদেশ করা হইয়াছে— সেইজন্য অবশ্যই ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

[২৭. যজ্ঞাদি কর্মে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। বিদ্যার শেষ ফল মোক্ষলাভের জন্য শম, দম তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-অভ্যাস শাস্ত্রে বিহিত আছে। বিদ্যার অঙ্গীভূত রূপে শমদমাদি সাধনের বিধি থাকায় তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।]

"ব্রাহ্মণগণ নিত্য স্বাধ্যায় যজ্ঞ, দান ইত্যাদি দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" (বৃহঃ ৪.৪.২২)। এই শ্রুতিতে এমন কোন শব্দ নাই যাহার জন্য বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধান আছে। এইজন্যই বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কোন কর্মানুষ্ঠানের মোটেই প্রয়োজন নাই। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যদি ইহা সত্যও হয় তাহা হইলেও শ্রুতি শমদমাদি অভ্যাসের বিধান করিয়াছেন: "এইজন্যই এইরূপ জ্ঞানী, শান্ত, দান্ত, উপরত...হইয়া নিজের দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন" (বৃহঃ ৪.৪.২৩)।

এই শ্রুতিটি বিধিবাদীরধমী, কারণ, "তস্মাৎ" এই শব্দটি প্রকরণের প্রশংসাসূচক সুতরাং ইহা বিধির সহিতই সংশ্লিষ্ট। কেন না বিধির অবর্তমানে এই প্রশংসাটি (অর্থবাদটি) নিরর্থক হইয়া যাইত। যেহেতু এই গুণগুলির বিধান দেওয়া হইয়াছে— সেইহেতু এইগুলি অবশ্যই আচরণীয়। শমদমাদি সাক্ষাৎভাবেই জ্ঞানলাভের সহায়ক— কিন্তু কর্মের সহায়তা হইল পরম্পরাক্রমে।

অধিকরণ ৭: জীবনসংশয়স্থলেই কেবল খাদ্যাখাদ্যের বিচার বর্জনীয়।

সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮॥

সর্ব-অন্ন-অনুমতিঃ (সর্বপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করার অনুমতি) প্রাণাত্যয়ে চ (জীবন বিপন্ন হইলেও) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে)।

২৮. (শুধুমাত্র) যখন জীবন বিপন্ন হয় (তখন সেখানে) যে কোন প্রকার খাদ্য নির্বিচারে গ্রহণ করার অনুমতি আছে, কারণ শ্রুতিতেই এইরূপ নির্দেশ আছে।

[২৮. প্রাণোপাসকের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। অন্নাভাবে প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে অন্ন বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে।]

"যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার নিকট কোন অন্নই অনন্ন হয় না" (ছাঃ ৫.২.১)। বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, এই উক্তির অপূর্বত্বহেতু (পূর্বে কোথাও উল্লেখ নাই বলিয়া) ইহা প্রাণোপাসকদের পক্ষে একটি বিধি। এই জাতীয় উক্তি অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহার একটি বিধিবাদীয় গুরুত্ব আছে। এই সূত্রটি উক্ত মতের খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, ইহা বিধি নহে, শুধু একটি ঘটনার বিবৃতি মাত্র। যেখানে বিধির অনুমানের কোন হেতু নাই, সেখানে ইহার ধারণা অযৌক্তিক। নিষিদ্ধ খাদ্য তখনই ভক্ষণ করা যাইতে পারে যখন জীবন বিপন্ন— যেমন ঋষি চাক্রায়ণ খাদ্যাভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইলে এইরূপ করিয়াছিলেন। শ্রুতি হইতেই আমরা এই ঘটনাটি জানিতে পারি।

অবাধাচ্চ ॥৩।৪।২৯॥

অবাধাৎ (এইরূপ অবিরোধ হেতু) চ (এবং)।

২৯. এবং যেহেতু (এইরূপ) (খাদ্য বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি) বিরুদ্ধ নহে।

[২৯. সর্বান্ন ভক্ষণের বিধি বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু আহার শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে।]

"আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়"— (ছাঃ ৭.২৬.২)। এই শ্রুতিবচনটি তখনই বিরুদ্ধ হইবে না, একমাত্র যদি আমরা উপরি প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করি— অন্যথা নহে।

অপি চ স্মর্যতে ॥৩।৪।৩০॥

অপি চ (অধিকন্তু) স্মর্যতে (স্মৃতিও এইরূপ বলেন)।

৩০. অধিকন্তু স্মৃতিও এইপ্রকার বিধান দেন।

[৩০. মনু সংহিতাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রাণ সঙ্কটকালে নির্বিচারে খাদ্য গ্রহণের বিধি আছে।]

স্মৃতি শাস্ত্রও বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ বা অজ্ঞ উভয়েই জীবন-সংকট কালে যে কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন; তখন ইহাতে কোন পাপ হইবে না। কিন্তু তাঁহারা বহুপ্রকার খাদ্যকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন।

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ।।৩।৪।৩১।।

শব্দঃ (শাস্ত্রগ্রন্থ) চ (ও) অতঃ (এইজন্য) অকামকারে (যথেচ্ছাচারকে নিষেধ করে অনুজ্ঞা— যথেচ্ছাচারে)।

৩১. এবং এইজন্য শাস্ত্র যথেচ্ছাচারকে নিষেধ করিতেছেন।

[৩১. শাস্ত্রসমূহ খাদ্য বিষয়ে যথেচ্ছাচারকে নিষেধই করিয়াছেন। আপৎকাল ভিন্ন খাদ্যের বিচার অবশ্যই করণীয়।]

যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নিষেধাত্মক কতকগুলি শ্রুতি আছে। যথাকামাচার এবং সংযম শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতা আমাদের জ্ঞানলাভের সহায়ক নহে। "অতএব ব্রাহ্মণগণ সুরাপান করিবেন না" (কাঠক সংহিতা)— এইজাতীয় শ্রুতিসমূহ সংযম শৃঙ্খলার জন্যই বিহিত হইয়াছে।

অতএব ইহাই প্রমাণিত হইল যে, শ্রুতি প্রাণোপাসনাকারীদের জন্য অবিচারে সর্বপ্রকার খাদ্য গ্রহণের কোন বিধান দেন নাই।

অধিকরণ ৮ : জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী না হইলেও প্রত্যেকেরই আশ্রমোচিত কর্তব্য অবশ্যই আচরণীয়।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রম কর্মাপি ।।৩।৪।৩২।।

বিহিতত্বাৎ (যেহেতু বিধান করা হইয়াছে সেইজন্য) চ (এবং) আশ্রম কর্ম (আশ্রমোচিত কর্মাদি) অপি (ও)।

৩২. এবং আশ্রমবিহিত কর্মগুলি (অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে), তাঁহাকেও (যিনি মোক্ষকামনা করেন না), কারণ, ইহা (কর্মগুলি) তাঁহার কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে।

[৩২. আশ্রমবিহিত কর্ম সকলেরই করণীয়, কারণ, ইহাই শাস্ত্রের বিধান।]

২৫ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কর্ম হইল জ্ঞানলাভের একটি উপায়। এখন প্রশ্ন হইল, যিনি জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি এই সকল কর্মানুষ্ঠান কেন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যেহেতু এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমের জন্যই বিহিত, সেইজন্য সকলকেই আশ্রমোচিত ধর্ম পালন করিতে হইবে।

সহকারিত্বেন চ ।।৩।৪।৩৩।।

সহকারিত্বেন (এবং জ্ঞানলাভের সহায়ক উপায়হেতু) চ (এবং)।

৩৩. জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়াও এই সকল কর্তব্য কর্ম অবশ্য আচরণীয়।

[৩৩. জ্ঞানলাভই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়াও এই সকল কর্তব্য কর্ম অবশ্য পালনীয়।]

এখানে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞান উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক, কিন্তু জ্ঞানের ফল লাভের, অর্থাৎ মোক্ষলাভের সহায়ক নহে— জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব নহে।

সর্বথাপি ত এব, উভয়লিঙ্গাৎ ।।৩।৪।৩৪।।

সর্বথা অপি (সর্বক্ষেত্রেই) তে এব (সেই কর্তব্যগুলি অবশ্য করণীয়) উভয় লিঙ্গাৎ (যেহেতু উভয়প্রকার বিধিসূচক লক্ষণই বর্তমান)।

৩৪. সর্বক্ষেত্রেই এই একই (শাস্ত্রবিহিত) কর্মগুলির (অনুষ্ঠান করিতে হইবে) কারণ উভয়পক্ষেই সূচক লক্ষণসমূহ বর্তমান।

[৩৪. মুমুক্ষু এবং গৃহী উভয়ের পক্ষে যে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান তাহা একই কর্ম, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নহে।]

এখন প্রশ্ন হইল, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের পক্ষে এবং জ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের পক্ষে যে সকল শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে— তাহারা কি ভিন্ন প্রকৃতির, না একই? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, আশ্রমিক বা জ্ঞানলাভেচ্ছু উভয়ের ক্ষেত্রেই একই জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ত্রই ইহা দৃষ্ট হয়।

"ব্রাহ্মণগণ নিত্য স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন"... ইত্যাদি (বৃঃ ৪.৪.২২)। এই শ্রুতিটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কর্মকাণ্ডে বিবিধ

ফল লাভের জন্য যে-সকল ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া আছে, সেই সকলকে জ্ঞানলাভের সহায়ক রূপেও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। স্মৃতিও একই নির্দেশ দেন, "যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন" ইত্যাদি (গীতা ৬.১)। ঐ সকল অবশ্য করণীয় কর্মানুষ্ঠান জ্ঞানেরও সহায়ক বটে।

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩।৪।৩৫॥

অনভিভবং (বিজিত বা পরাজিত হয় না) চ (এবং) দর্শয়তি (শাস্ত্র ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন)।

৩৫. এবং শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায় যে, (ব্রহ্মচর্যাদি গুণের দ্বারা ভূষিত কোন সাধক) (ক্রোধাদি রিপুর দ্বারা) অভিভূত হন না।

[৩৫. "ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়"— এই শ্রুতির অর্থ হইল জ্ঞানের উৎপত্তির বাধক যে-সকল পাপ তাহা যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব কর্ম আশ্রমোচিতরূপে করণীয়— এবং ইহা জ্ঞানের সহায়ক।]

"কারণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয় সেই আত্মার নাশ হয় না" (ছা: ৮.৫.৩)। এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্মচর্যাদির ন্যায় সমজাতীয় কর্মানুষ্ঠান জ্ঞানের সহায়ক। ব্রহ্মচর্যাদি গুণের দ্বারা ভূষিত সাধক ক্রোধ-ঈর্ষা প্রভৃতির দ্বারা পরাভূত হন না, এইজন্য তাঁহার চিত্তও চঞ্চল হয় না এবং সেইহেতু তিনি (জ্ঞানের) সাধনায় সক্ষম হন।

অতএব কর্মাদি অনুষ্ঠান আশ্রমিকদের পক্ষে অবশ্য করণীয়— এবং ইহারা জ্ঞানলাভেরও সহায়ক।

অধিকরণ ৯: যাঁহারা দুই আশ্রমের মধ্যবর্তী, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে।

অন্তরা চাপি তু, তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩।৪।৩৬॥

অন্তরা (দুই আশ্রমের) মধ্যবর্তী (ব্যক্তিসকল), চ (এবং) অপি তু (ও) তদ্দৃষ্টেঃ (এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় বলিয়া)।

৩৬. এবং (দুই আশ্রমের) মধ্যবর্তী (সাধকগণ)ও (ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী), কারণ এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

[৩৬. আশ্রম বহির্ভূত, অন্তরাহিত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। যেমন শাস্ত্রে রৈক্ক বাচক্নবী ইত্যাদির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।]

এখন প্রশ্ন হইল, সন্দিগ্ধ অসহায় অবস্থায় পতিত মানুষ, যাহাদের আশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানের সামর্থ্যাদি নাই— অথবা যাহারা দুই আশ্রমের মধ্যবর্তী অবস্থায় বর্তমান— দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, যেমন, একজন বিপত্নীক ব্যক্তি— ইহাদের কি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে অথবা— নাই? বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, তাহাদের অধিকার নাই, কারণ তাহারা জ্ঞান লাভের জন্য আশ্রমোচিত কোন কর্মেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না।

এই সূত্রটি বলিতেছে যে, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— যথা রৈক্ক এবং গার্গী। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। (ছাঃ ৪.১ এবং বৃহঃ ৩.৬ এবং ৮ দ্রষ্টব্য)

অপি চ স্মর্যতে ।।৩।৪।৩৭।।

অপি চ (অধিকন্তু) স্মর্যতে (স্মৃতি শাস্ত্রেও ইহা উল্লিখিত) আছে।

৩৭. স্মৃতি শাস্ত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে।

[৩৭. শ্রুতির ন্যায় স্মৃতি গ্রন্থেও সম্বর্ত এবং অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টান্ত আছে।]

সম্বর্ত এবং অন্যান্য বহু ঋষি কোন কর্মাদির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই মহাযোগী পদারূঢ় হইয়াছিলেন।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ।।৩।৪।৩৮।।

বিশেষ-অনুগ্রহঃ (বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের অনুগ্রহে) (ফলে) চ (এবং-ও)।

৩৮. বিশেষ-জাতীয় কর্মানুষ্ঠানের অনুগ্রহেও জ্ঞান লাভ হয়।

[৩৮. (শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানে অক্ষম হইলে) বিশেষ ক্রিয়াদি (জপ প্রার্থনা ইত্যাদি) দ্বারাও জ্ঞানলাভ সম্ভব।]

কোন বিপত্নীক ব্যক্তি—যিনি যথার্থ অর্থে 'গৃহস্থ' নহেন, অথবা কোন দরিদ্র ব্যক্তি যাঁহার আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গতি নাই— এইরূপ ব্যক্তিগণও প্রার্থনা, উপবাস, জপাদি বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন— অনাশ্রমীদের অনুষ্ঠেয় কর্মাদির সহিত এইজাতীয় কর্মানুষ্ঠানের কোন বিরোধ নাই।

অতস্তিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩।৪।৩৯॥

অতঃ (ইহা হইতে) তু (কিন্তু) ইতরৎ (অন্যটি) জ্যায়ঃ (শ্রেয়তর) লিঙ্গাৎ (যেহেতু সূচক লক্ষণ আছে) চ (এবং)।

৩৯. ইহা অপেক্ষা কিন্তু অন্যটি (অর্থাৎ কোন আশ্রমভুক্ত হওয়া) শ্রেয়, (শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে উল্লেখ থাকা হেতু) এবং সূচক লক্ষণ থাকার জন্য (শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে)।

[৩৯. যদিও অনাশ্রমী হইয়াও বিদ্যালাভ করা যায় তথাপি অনাশ্রমী না হইয়া কোন আশ্রমকে অবলম্বন করাই শ্রেয়, কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেই আশ্রম গ্রহণের উপদেশ আছে।]

যদিও দুই আশ্রমের মধ্যবর্তী থাকিয়াও বিদ্যালাভ সম্ভব, তথাপি শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেই বলেন যে, কোন আশ্রমাবলম্বী হইয়া সাধনা করাই জ্ঞান লাভের পক্ষে শ্রেয়তর উপায়। "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদিদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন"— ইত্যাদি (বৃঃ ৪.৪.২২)— ইহা হইল শ্রুতির একটি প্রত্যক্ষ উক্তি। "অন্য বিনি পুণ্যকৃৎ ব্রহ্মবিদ্" ইত্যাদি (বৃহঃ ৪.৪.৯) এবং "ব্রাহ্মণ একদিনের জন্যও অনাশ্রমী হইয়া বাস করিবেন না"— এইগুলি হইল যথাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতির পরোক্ষ নির্দেশ।

অধিকরণ ১০: যিনি আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নহে।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ, জৈমিনেরপি, নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৩।৪।৪০॥

তদ্ভূতস্য (যিনি তাহা [শ্রেষ্ঠ আশ্রম] লাভ করিয়াছেন— সন্ন্যাসাশ্রম লাভ করিয়াছেন) তু (কিন্তু) ন (না) অতদ্ভাবঃ (সেই অবস্থা [সন্ন্যাসাবস্থা] হইতে বিচ্যুত) জৈমিনেঃ (জৈমিনির—ইহা অভিমত—) অপি (ও) নিয়ম-অতদ্রূপ-অভাবেভ্যঃ (নিয়ম, নিষেধ এইরূপ প্রত্যাবর্তনের পক্ষে থাকার জন্য)।

৪০. কিন্তু যিনি সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠ আশ্রমকে একবার অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পূর্বাশ্রমে প্রত্যাবর্তনের কোন বিধি নাই, যেহেতু এইজাতীয় প্রত্যাবর্তনের পক্ষে নিষেধই আছে। মুনি জৈমিনিও এই মত পোষণ করেন।

[৪০. সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তন শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং শিষ্টাচারও নহে। মুনি জৈমিনিও তাহাই বলেন।]

একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করা যায় কি না— এখন এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই সূত্রটি বলে যে, সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে ফিরিতে পারেন না— কারণ শাস্ত্র স্পষ্টভাবে ইহা নিষেধ করিয়াছেন— "তাঁহাকে অরণ্যেই গমন করিতে হইবে— তিনি অরণ্য হইতে (সন্ন্যাস আশ্রম হইতে) প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না।" কিন্তু উচ্চতর আশ্রমে উন্নয়নের জন্য যেরূপ বিধি-নিয়মাদি শাস্ত্রে বিহিত আছে— সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সেইরূপ কোন নিয়ম নাই। ইহা শিষ্টাচার বিরোধীও বটে। সুতরাং কেহ সন্ন্যাস আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন না।

অধিকরণ ১১: নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত (সন্ন্যাস) ভঙ্গের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

ন চ আধিকারিকমপি, পতনানুমানাৎ, তদযোগাৎ ॥৩।৪।৪১॥

ন (নাই) চ (এবং) আধিকারিকম্ (প্রায়শ্চিত্ত— যাহা গুণাবলী বর্ণনার অধ্যায়ে বর্ণিত আছে) অপি (এমনকি) পতন-অনুমানাৎ (স্মৃতি হইতে যেহেতু এই ব্যাপারে সন্ন্যাস হইতে পতনের অনুমান করা হয়)। তদযোগাৎ (এবং যেহেতু এই ক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা নাই)।

৪১. এবং যদিও (পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে) গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনার অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তথাপি ইহা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী— [সন্ন্যাসীর] জন্য উল্লিখিত হয় নাই), কারণ (এইক্ষেত্রে) স্মৃতি শাস্ত্রে পতনের অনুমান করা হইয়াছে এবং যেহেতু এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা (এই ক্ষেত্রে— সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে) কার্যকরী নহে।

[৪১. ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ হইলে শাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের (সন্ন্যাসী) জন্য নহে; তাহা উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীদের পক্ষে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের ব্রতভঙ্গে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, স্মৃতি শাস্ত্রে তাহা বলা হইয়াছে।

যাঁহারা আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিচারের ভ্রান্তিবশত তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন— তাহাদের বিষয় এখানে আলোচনার সূচনা

করা হইতেছে। এই সূত্রে বিরুদ্ধপক্ষের মত আলোচিত হইতেছে— তাঁহাদের মতে এইরূপ ব্রতভঙ্গের কোন প্রায়শ্চিত্ত-ই নাই। কারণ, এইরূপ কোন অনুষ্ঠানের উল্লেখ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গের জন্য নাই, পূর্বমীমাংসার ৬.৮.২২ অংশে যে প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে, তাহা সাধারণ বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীদের পক্ষে প্রযোজ্য— নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের পক্ষে নহে। এইরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্মৃতি এইজাতীয় পতনকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অসংশোধনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একজন ছিন্নশির ব্যক্তিকে চিকিৎসাদ্বারা সুস্থ করা যায় না। "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছে এইরূপ আত্মঘাতী ব্যক্তির কোন শুদ্ধিকর প্রায়শ্চিত্ত আমি দেখি না"। স্মৃতি এখানে সাধারণ ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নাই— সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্মানুষ্ঠান সাধারণ ব্রহ্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকদের ক্ষেত্রে নহে। অধিকন্তু, পূর্বমীমাংসায় যে প্রায়শ্চিত্ত বিধির কথা আছে তাহা এই ক্ষেত্রে কার্যকর নহে, কারণ, এই অনুষ্ঠান করিতে হইলে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য বিবাহ করিতে হইবে, এবং বিবাহ করিবার অর্থ হইল— ইহার পর তিনি আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিলেন না।

উপপূর্বমপি তু একে ভাবম্, অশনবৎ তদুক্তম্ ।।৩।৪।৪২।।

উপপূর্বম্ ('উপ'— এই উপসর্গবিশিষ্ট, অর্থাৎ উপ-পাতক বা গৌণ পাতক ক্ষুদ্র অপরাধ), অপি তু (কিন্তু) একে (কেহ কেহ) ভাবম্ (অস্তিত্ব) অশনবৎ (যেমন ভক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত) তৎ (ইহা) উক্তম্ (পূর্বমীমাংসায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

৪২. কিন্তু কেহ কেহ (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে পাতককে) একটি উপ-পাতক (গৌণ পাতক) বলিয়াই মনে করেন, এবং সেইজন্য সাধারণ ব্রহ্মচারীর খাদ্যাদি বিষয়ে পাতকের ক্ষেত্রে যেমন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে সেইরূপ নৈষ্ঠিকের ক্ষেত্রেও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে বলিয়া গণ্য করেন। ইহা পূর্বমীমাংসায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

[৪২. কেহ কেহ বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ মহাপাতক নহে, উপপাতক মাত্র; অতএব ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। সেইরূপ ভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে পূর্বমীমাংসায় সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুপত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য পাতকগুলি উপ-পাতকই— মহাপাতক নহে— এবং

বিহিত অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব— যেমন সাধারণ ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ খাদ্যাদি ব্যাপারে উপপাতক করিয়া প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পুনরায় বিশুদ্ধিলাভ করেন। এইরূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে নাই— শাস্ত্রের এইরূপ বিধির উল্লেখ করিবার অর্থ হইল এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহার ব্রত রক্ষার গুরুদায়িত্বকে সর্বদা স্মরণ রাখিবেন এবং তাহাতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিবেন। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ব্যবস্থা। বাস্তবিকপক্ষে স্মৃতি ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত কর্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। "ব্রহ্মচারী যখন তাহার ব্রত ভঙ্গ করিবেন, তখন তিনি দ্বাদশ রাত্রি কৃচ্ছ্র তপস্যা করিবেন, তখনই তিনি এমন একস্থানে উপনীত হইবেন যাহা বৃক্ষ এবং তৃণাদি পরিপূর্ণ।" সন্ন্যাসিগণও কিছুটা রূপান্তরিতভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর্মানুষ্ঠান করিতে পারেন।

অধিকরণ ১২ : নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ব্রত ভঙ্গ করিলে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন।

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩॥

বহিঃ (বাহিরে) তু (কিন্তু) উভয়থা-অপি (উভয় ক্ষেত্রেই) স্মৃতেঃ (স্মৃতি হইতে) আচারাৎ (আচার হইতে) চ (এবং)।

৪৩. কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই (তাহাদিগকে রাখিতে হইবে) সমাজের বাহিরে, কারণ (ইহাই) স্মৃতির (বিধান) এবং (সমাজের) প্রথা।

[৪৩. উপ-পাতক বা মহাপাতক উভয় ক্ষেত্রেই ব্রতভঙ্গকারীকে সমাজের বাহিরেই রাখিতে হইবে, কারণ ইহাই স্মৃতি নির্দেশ এবং সামাজিক আচার।]

ব্রতভঙ্গ মহাপাতক বা উপপাতকহেতুই হউক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক সজ্জনগণ পাতকী ব্রতভঙ্গকারীর সংশ্রব ত্যাগ করিবেন; কারণ, স্মৃতি এবং লোকাচার উভয়েই ইহার নিন্দা করেন।

অধিকরণ ১৩ : যজ্ঞাঙ্গীভূত উপাসনার অনুষ্ঠান পুরোহিতই করিবেন— যজমান করিবেন না।

স্বামিনঃ, ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩।৪।৪৪॥

স্বামিনঃ (যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর [যজমানের] উপাসনা করণীয়) ফলশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে ফলের ভোক্তার উল্লেখ আছে বলিয়া) ইতি (ইহা— এই অভিমত) আত্রেয়ঃ (ঋষি আত্রেয়)।

৪৪. যজমান-ই উপাসনার কর্তা, কারণ শ্রুতি ইহার একটি ফলের বিষয় উল্লেখ করেন। ইহা— আত্রেয় ঋষির মত।

[৪৪. আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার কর্তা যজমানই, (পুরোহিত নহেন), কারণ, ইহার ফল শ্রুতিতে উল্লেখ করা আছে।]

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়াছে: যজ্ঞকর্মানুষ্ঠানে কতকগুলি যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা আছে; এইসকল উপাসনা কে করিবেন, যজমান— না পুরোহিত? বিরোধিপক্ষের মুখপাত্র আত্রেয় মুনি বলেন— ইহার অনুষ্ঠান যজমানই করিবেন, যেহেতু শ্রুতি এইসকল উপাসনার জন্য বিশেষ একটি ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিঃ, তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ।।৩।৪।৪৫।।

আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিকের [পুরোহিতের] কর্তব্য) ইতি (এইরূপ) ঔড়ুলোমি (ঋষি ঔড়ুলোমি) তস্মৈ (তাহার জন্য) হি (যেহেতু) পরিক্রীয়তে (তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে)।

৪৫. (এই যজ্ঞকর্মাঙ্গ উপাসনাসকল) পুরোহিতেরই কর্তব্য— এইরূপ ঔড়ুলোমি মুনি মনে করেন। কারণ তাঁহাকে (পুরোহিতকে) দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে (সমগ্র যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য)।

[৪৫. ঔড়ুলোমি মুনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাগুলি পুরোহিতই করিবেন— কারণ সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছে।]

যেহেতু পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছে সমগ্র যজ্ঞটি সম্পন্ন করিবার জন্যই, এবং ইহার দ্বারা যেন সমগ্র যজ্ঞের সমগ্র ফলই যজমান ক্রয় করিয়া নিয়াছেন, এবং সেইজন্যই যজ্ঞকর্মাঙ্গের উপাসনাও পুরোহিতের উপরই নির্ধারিত হয়—যজমানের উপর নহে। ইহা ঔড়ুলোমি মুনির অভিমত।

শ্রুতেশ্চ ।।৩।৪।৪৬।।

শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] চ (ও)।

৪৬. এবং যেহেতু শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন।

[৪৬. যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা যে পুরোহিতই করিবেন তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। ফল যজমানেরই।]

"যজ্ঞকর্মে পুরোহিত যে-সকল মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন, সেই সকল প্রার্থনার ফল যজমানের কল্যাণেই প্রযুক্ত হইবে" (শতঃ ব্রাঃ ১.৩.১.২৬)। এই জাতীয় শ্রুতি হইতেই জানা যায় যে, যে-সকল যজ্ঞাঙ্গ উপাসনায় কর্তা পুরোহিত—সেই সকল উপাসনার ফলও যজমানগামীই হয়। সুতরাং ঔড়ুলোমির মত অভ্রান্ত—কারণ ইহা শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত।

অধিকরণ ১৪ : বৃহঃ ৩.৫.১ শ্রুতিতে পাণ্ডিত্য এবং বালভাবের সহিত মৌনব্রতেরও বিধান আছে।

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতঃ বিধ্যাদিবৎ ॥৩।৪।৪৭॥

সহকার্যন্তরবিধিঃ (জ্ঞানের সহায়ক অন্য একটি বিধান) পক্ষেণ (একটি পক্ষ [শর্ত] রূপে) তদ্বতঃ (জ্ঞানবানের জন্য) তৃতীয়ম্ (তৃতীয় একটি) বিধ্যাদিবৎ (বিধি প্রভৃতির ক্ষেত্রে [যেরূপ দেওয়া হয়])।

৪৭. (মৌনভাব) (জ্ঞানের) সহায়ক অপর একটি বিধান, ইহা তৃতীয় বিধান (অপর দুইটি ব্যতীত— যাহাদের স্পষ্টভাবেই বিহিত করা হইয়াছে) ইহা একটি বিকল্প (উপায়) (যেখানে বহুত্বজ্ঞান বর্তমান আছে) জ্ঞানীর পক্ষে; যেমন অন্যান্য বিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

[৪৭. মৌনব্রত পাণ্ডিত্য এবং বালভাবের ন্যায় তৃতীয় একটি জ্ঞান-সহায়ক উপাসনা। বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তির উপাসনা সিদ্ধির জন্য যজ্ঞাদির ন্যায় মৌনও একটা বিকল্প বিধি।]

"এইজন্যই ব্রাহ্মণ আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিদ্যারূপ বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। নিঃশেষে জ্ঞানবল ও আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অতঃপর মননশীল হইবেন।" (বৃঃ ৩.৫.১) এখন প্রশ্ন হইতেছে এই মৌন অবস্থা কি শাস্ত্রবিহিত অথবা তাহা নহে? বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, শাস্ত্র ইহার কোন বিধান দেন নাই। যেহেতু সেখানে বিধিসূচক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। শ্রুতিতে শুধু বলা হইয়াছে যে, তিনি মুনি হইয়া যান। অপরপক্ষে পাণ্ডিত্য এবং সর্বকামনারহিত বালভাব সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান 'হওয়া উচিত'—ইত্যাদি আছে। অধিকন্তু পাণ্ডিত্য বলিতে জ্ঞানকেই বুঝায় এবং এই মননশীলতাও এই পাণ্ডিত্যেরই অন্তর্গত, কারণ ইহাও অল্পবিস্তর জ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং মননশীলতা শ্রুতিতে একটা অভিনব কিছু নহে, ইহা যেহেতু

পাণ্ডিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত— এবং ইহা যেহেতু অপূর্ব (অভিনব) নহে, ইহার কোন বিধিবাদীয় গুরুত্ব নাই।

এই সূত্রটি উপরি উক্ত মতকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, 'মৌন' বা মননশীলতাকে পাণ্ডিত্য এবং বালভাবের পর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া শাস্ত্র বিধান দিয়াছেন। কারণ মৌনভাব শুধুমাত্র জ্ঞান নহে, ইহা ধ্যানশীলতা এবং অবিচল জ্ঞাননিষ্ঠাকেও বুঝায়— এবং এইজন্যই ইহা পাণ্ডিত্য হইতে পৃথক্ কিছু। অতএব, পূর্বে ইহার কোন উল্লেখ না থাকার জন্য, ইহা একটি অপূর্বই (নূতন কিছু), এবং সেইহেতু এই শ্রুতির বিধিবাদীয় গুরুত্ব আছে। সেই সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ধ্যানপরায়ণতা (মনন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ— যিনি এখন পর্যন্ত একত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই এবং যিনি অতীত সংস্কারহেতু পুনঃপুনঃ নানাত্বের ভাবনারই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ।।৩।৪।৪৮।।

কৃৎস্নভাবাৎ (গার্হস্থ্যাশ্রম জীবনে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া) তু (অবশ্যই) উপসংহারঃ (পরিচ্ছেদটি শেষ হইয়াছে) গৃহিণা (গৃহীর দ্বারা করণীয় কর্তব্য বর্ণনায়)।

৪৮. অবশ্যই গৃহস্থের জীবনের কর্তব্যের মধ্যে (সকল আশ্রমের কর্তব্যই) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এই অধ্যায়টি শেষ হইয়াছে গার্হস্থ্যাশ্রমের সকল কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া।

[৪৮. গার্হস্থ্যাশ্রমেই সকল আশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। গৃহস্থ অবস্থা হইতেই সন্ন্যাস অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। তাই গৃহস্থাশ্রমের গুরুত্ব আছে। গৃহীর কর্তব্যের মধ্যে সকল কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত।]

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মচারীদের করণীয় কর্মাদির উল্লেখের পরই গৃহস্থের করণীয় ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সন্ন্যাস আশ্রমের কর্তব্যাদির কোন উল্লেখ না করিয়াই এখানে অধ্যায়টি শেষ হইয়াছে। যদি সন্ন্যাসও একটি আশ্রম হয় তাহা হইলে এই স্থলে সন্ন্যাসাশ্রমের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা হইল না কেন? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই— ইহার বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যই, শ্রুতি সন্ন্যাস আশ্রমের কোন উল্লেখ না করিয়াই বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন, সন্ন্যাস একটি বিহিত আশ্রম নহে— এইরূপ চিন্তা করিয়া নহে। গার্হস্থ্যাশ্রমটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, তাহাকে নিজ আশ্রমের কর্তব্য পালনের পরেও অন্যান্য আশ্রমগুলির কর্তব্যও যথা— স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয় সংযম

ইত্যাদিও পালন করিতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমে অল্প বিস্তর সকল আশ্রমের ধর্মই পালন করিতে হয়।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩।৪।৪৯॥

মৌনবৎ (মুনি [সন্ন্যাস] অবস্থার ন্যায়) ইতরেষাম্ (অন্যগুলির) অপি (ও) উপদেশাৎ (শাস্ত্রীয় উপদেশ হেতু)।

৪৯. যেহেতু শাস্ত্র অন্য আশ্রমগুলির (ব্রহ্মচর্য এবং বানপ্রস্থের) উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ মৌন (সন্ন্যাস) আশ্রমেরও উপদেশ দিয়াছেন।

[৪৯. কারণ শাস্ত্র সন্ন্যাস আশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ করিয়াছেন।]

যেমন শ্রুতি সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধান দিয়াছেন, সেইরূপই বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমেরও উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি চারিটি আশ্রমের মধ্য দিয়াই চর্যার উপদেশ দিয়াছেন— পর্যায়ক্রমে অথবা একটির পর অপরটির। 'অন্যদের' এই বহুবচন ব্যবহার— দ্বিবচন না বলিয়া— হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইটি আশ্রমকেই ভিন্নজাতীয়রূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

অধিকরণ ১৫ : বালকবৎ অবস্থা হইল সরলতা, কামক্রোধাদি হইতে মুক্তভাব।

অনাবিষ্কুর্বন্, অন্বয়াৎ ॥৩।৪।৫০॥

অনাবিষ্কুর্বন্ (নিজেকে প্রচার না করিয়া, আত্মশ্লাঘা না করিয়া) অন্বয়াৎ (আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে)।

৫০. (বাল্যভাব হইল) আত্মশ্লাঘা (নিজের অহমিকার) প্রকাশ না করা— প্রসঙ্গ হইতে (ইহা বুঝিতে হইবে)।

[৫০. (উপনিষদে যে প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে) বাল্যভাব হইল আত্মশ্লাঘা এবং অহমিকাবিহীন পবিত্র সরলতা।]

৪৭ সংখ্যক সূত্রে বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে শ্রুতিটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে জ্ঞানলাভের পর সাধকের বালভাবে অবস্থানের বিষয় বিহিত আছে। এখন প্রশ্ন হইল, এই বালভাব বলিতে যথার্থত কি বুঝায়? ইহা কি পাপ পুণ্য বোধ বিরহিত একটি শিশুর যথেচ্ছ আচরণ বুঝায়, না— ইহা অহঙ্কার বিরহিত সরল পবিত্র শিশুভাব

বুঝায়? এই সূত্রটি বলে যে ইহা নিরহঙ্কার, সরল, শিশুভাবকেই বুঝায়— অজ্ঞতাপূর্ণ বালসুলভ যথেচ্ছাচারকে নহে— কারণ ইহা জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর। ইহার অর্থ হইল জ্ঞানী কখনও ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করিবেন না এবং তিনি অকপট এবং নিরহঙ্কার হইবেন। ইহা একটি শিশুর স্বভাবসুলভ সহজাত সরলতাকেই বুঝায়। প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইলে একমাত্র এইরূপ অর্থই যথাযথ— কারণ পবিত্রতা এবং সরলতা জ্ঞানের সহায়ক।

অধিকরণ ১৬: যখন বিদ্যার সাধনা করা হয় তখনই জ্ঞানোৎপত্তির সময়।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৫১॥

ঐহিকম্ (এই জীবনে) অপি (ও) অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে (যদি প্রবৃত্ত সাধনার কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে) তৎ-দর্শনাৎ (কারণ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়।)

৫১. (জ্ঞানের ফলোদয় হইতে পারে) এই জন্মেই, যদি ইহার (প্রবৃত্ত সাধনার) কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

[৫১. কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে এই জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়।]

২৬ সংখ্যক সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানলাভের নানা উপায় প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল এই সকল সাধনোপায় হইতে উদ্ভূত জ্ঞান কি এই জন্মেই লাভ হয়, না জন্মান্তরে লাভ হয়? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হয় যদি বহিরাগত কোন প্রতিবন্ধক ইহার বিকাশের পথে বাধা না হয়। কারণ, অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনাও ঘটে, যখন হয়তো জ্ঞানের উন্মেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঠিক তখনই ইহা অন্য একটি গুরুতর কর্মের ফলোদয়ের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে পরজন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন যে, আত্মজ্ঞান লাভ করা খুবই কঠিন। "আত্ম সম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ পর্যন্ত করিতে পায় না, এবং শ্রবণ করিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না" (কঠঃ ১.২.৭)। গীতাও এইরূপ বলেন "ঐ জন্মে তিনি পূর্বজন্মার্জিত ব্রহ্ম বিষয়িনী বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া"...ইত্যাদি (গীতা ৬.৪৩)। "যত্নশীল যোগী বহু প্রযত্নের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মের পর সিদ্ধ মনোরথ হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হন।" (তদেব, ৬.৪৫)

অধিকন্তু পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান যে কখনও পরজন্মে বিকশিত হয়, তাহা আমরা জানিতে পারি ঋষি বামদেবের জীবন হইতে। তিনি মাতৃগর্ভেই জ্ঞানী হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বামদেবের এই জ্ঞান নিশ্চিতই তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ছিল, কারণ তিনি তো মাতৃগর্ভে কোন বিদ্যার উপাসনা করিতে পারেন নাই। কোন প্রতিবন্ধকতা হেতু পূর্বের জন্মে তাঁহার জ্ঞান প্রকট হইতে পারে নাই, এবং মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁহার এই প্রতিবন্ধকতা দূর হইলে পর, অতীত সাধনার ফলরূপ জ্ঞান প্রকট হয়।

অধিকরণ ১৭ : মোক্ষ বা ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই— সর্বক্ষেত্রেই উহা একরূপ।

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ, তদবস্থাবধৃতে-স্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৩।৪।৫২॥

এবং (এইরূপভাবে) মুক্তিফল-অনিয়মঃ (জ্ঞানলাভের ফলরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই) তৎ-অবস্থা-অবধৃতেঃ (কারণ শ্রুতি সেই অবস্থাকে ঘোষণা করিয়াছেন অপরিবর্তনীয়রূপে)।

৫২. (জ্ঞানের) ফলশ্রুতি মোক্ষ বিষয়ে এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ শ্রুতি এই অবস্থাকে (চিরন্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)।

[৫২. মোক্ষলাভ কখন কিভাবে হইবে— জ্ঞানের ফল কিভাবে দেখা দিবে— এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। শ্রুতি এই অবস্থাকে অনির্বচনীয় বা চিরন্তন বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করাই মোক্ষ বা মুক্তি।]

পূর্ববর্তী সূত্রে দেখা গিয়াছে যে, জ্ঞান এইজন্মে বা জন্মান্তরে উৎপন্ন হইতে পারে— ইহা নির্ভর করে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি না এবং সাধকের উপাসনার তীব্রতা কিরূপ তাহার উপর। অনুরূপভাবে এখানে একটা সন্দেহ থাকিতে পারে যে, হয়তো এইরূপ কোন নিয়ম থাকিতে পারে যাহার দ্বারা জ্ঞানের ফল-শ্রুতি মোক্ষলাভ করা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে প্রশ্ন হইল, জ্ঞানলাভের পর কি মোক্ষ বিলম্বিত হইতে পারে? এবং সাধকের গুণানুসারে জ্ঞানের কি মাত্রাগত ভেদ আছে? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, মোক্ষ বিষয়ে এইরূপ কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কারণ শ্রুতিবচনসমূহ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, চরম মোক্ষ-অবস্থাটি একই প্রকার, ইহার মাত্রাগত

কোন প্রভেদ নাই। চরম মুক্তির অবস্থা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান"— এবং ইহার মধ্যে কোন ভেদ-বৈচিত্র্য নাই— যেহেতু ব্রহ্ম হইলেন সর্বগুণরহিত। যেখানে গুণ-বৈচিত্র্য আছে সেখানেই ভেদভাব সম্ভব যেমন সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ভেদানুযায়ী উপলব্ধিরও পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম সম্পর্কে অনুভব বিষয়ে ইহা একটিই অনুভব হইবে— বহু হইতেই পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে মোক্ষলাভেরও কোন বিলম্ব হইতে পারে না— কেন না ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপারটিই হইল মোক্ষ বা মুক্তি।

"শ্রুতি সেই অবস্থাকে অবধারণ করিয়াছেন" এই বাক্যাংশের পুনরুক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই অধ্যায়টি এখানে সমাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-সূত্র

চতুর্থ অধ্যায় । প্রথম পাদ

তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানলাভের উপায়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে জ্ঞানলাভের ফল এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। প্রারম্ভে কিন্তু জ্ঞান-লাভের উপায়সংক্রান্ত একটি বিশেষ আলোচনাই করা হইতেছে।

অধিকরণ ১ : শাস্ত্রবিহিত আত্মোপাসনা জ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্ত পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে।

আবৃত্তিঃ, অসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১॥

আবৃত্তিঃ ([পুনঃ পুনঃ] অভ্যাস প্রয়োজন) অসকৃৎ (পুনঃপুনঃ) উপদেশাৎ (যেহেতু শাস্ত্র এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন)।

১. (আত্মোপদেশ সম্বন্ধে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের) অভ্যাস করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্র পুনঃপুনঃ ইহার উপদেশ করিয়াছেন।

[১. ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য শাস্ত্রবিহিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে, কারণ ইহাই শাস্ত্রের বহুল নির্দেশ।

"হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়" (বৃঃ ২.৪.৫)। "ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন" (তদেব, ৪.৪.২১)। এখন প্রশ্ন হইল, এখানে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা কি শুধু একবার মাত্র অনুষ্ঠানের জন্য না পুনঃপুনঃ ইহার অভ্যাস করিতে হইবে? বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, ইহার অনুষ্ঠান একবারই করিলে চলিবে, যেমন প্রয়াজ-জাতীয় যজ্ঞানুষ্ঠান একবার করিলেই বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়। এই সূত্রটি উক্ত মতবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, শ্রবণাদি ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে যে-পর্যন্ত না ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অবশ্য যদি একবারের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া যায় তাহা হইলে তো ভালই— তাহা না হইলে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পর্যন্ত ইহার পুনঃ-পুনঃ অভ্যাস প্রয়োজন। শ্রবণাদি ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলেই পরিণামে জ্ঞানলাভ হয়। এখানে প্রয়াজের দৃষ্টান্তটি সুপ্রযোজ্য নহে। কারণ সেখানে পরিণাম হইল অদৃষ্ট— যাহার

ফল ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে উদ্ভূত হইবে। আর, এখানে (ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে) ফল হইল প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্তই প্রক্রিয়াটির পুনঃপুনঃ অভ্যাস অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে। অধিকন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের প্রথমটিতে (শ্রবণ, মনন ইত্যাদি) পুনঃপুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে— ইহার দ্বারা শ্রুতি ইহাই বুঝাইতে চান যে উপায়গুলি পুনঃপুনঃ অভ্যাসের একটি গুরুত্ব আছে। পুনশ্চ 'মনন' এবং 'নিদিধ্যাসন' একটি মানসিক ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অভ্যাসকেই বুঝায়। কারণ, যখন আমরা বলি "সে ইহার মনন বা ধ্যান করিতেছে"— তখন আমরা বুঝাইতে চাই যে, সে ধ্যানের বিষয়কে অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্মরণ করিয়া যাইতেছে। 'নিদিধ্যাসনের' ক্ষেত্রেও ঠিক একইরূপ করি। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্রের উপদেশের পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হয়। আর যে-সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্র পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিবার কথা স্পষ্টত বলেন নাই এই সিদ্ধান্তটি সেখানেও প্রযোজ্য— যেমন উপরি উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্রুতিবচনটির ক্ষেত্রে (বৃঃ ৪.৪.২১)।

লিঙ্গাচ্চ ॥৪।১।২॥

লিঙ্গাৎ (লক্ষণসূচক চিহ্ন হইতে) চ (ও)।

২. এবং (এইজাতীয়) লক্ষণসূচক (শাস্ত্রবচন হইতেও) বুঝিতে পারা যায়।

[২. পুনঃপুনঃ অভ্যাসের যে প্রয়োজন আছে— তাহা অন্যান্য সমজাতীয় শাস্ত্রবচন হইতেও জানা যায়।]

"বহু রশ্মির দৃষ্টিতে উপাসনা কর, তাহা হইলে তোমার বহু পুত্র হইবে" (ছাঃ ১.৫.২)। এই শ্রুতিটি উদ্গীথকে সূর্যরূপে ধ্যান না করিয়া রশ্মিরূপে উপাসনা করার উপদেশ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপাসনার বিধানই দিয়াছেন। এবং এই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য— তাহা অন্যান্য উপাসনার ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই— এই উক্তি সত্য নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রুতি 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সেই ব্রহ্ম— এই বাক্যটিকে পুনঃপুনঃ উপদেশ করিতেন না। হয়তো খুব উন্নত স্তরের এমন সাধক থাকিতে পারেন, যাঁহার হয়তো ইন্দ্রিয়জগতের কোন বিষয়ের উপরই আসক্তি নাই— এইরূপ সাধকের ক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রবণের ফলেই হয়তো জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ উন্নত অবস্থাসম্পন্ন সাধক অতি দুর্লভ। সাধারণ দেহাভিমানী ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ

একবার মাত্র শ্রবণের দ্বারা সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা পুনঃপুনঃ সত্যের ধ্যান ধারণার দ্বারাই দূর হইতে পারে—এবং তখনই তাহাদের জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং ক্রমশ এই অভ্যাসের দ্বারাই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়—এবং পরিশেষে ইহা একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। যখন দেহবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, তখনই পরমাত্মা তাঁহার সকল পবিত্রতা লইয়া নিজেকে প্রকট করেন।

অধিকরণ ২ : পরব্রহ্মের উপাসনায় (ধ্যানের সময়) ধ্যাতা নিজেকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিবেন।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩॥

আত্মেতি (আত্মারূপে) তু (কিন্তু) উপগচ্ছন্তি (জানেন) গ্রাহয়ন্তি (উপদেশ করেন) চ (এবং)।

৩. কিন্তু (শ্রুতিবচনসমূহ) স্বীকার করেন (ব্রহ্মকে) আত্মারূপে (উপাসকের) এবং অন্যকেও শিক্ষা দেন (ব্রহ্মকে এইরূপ অনুভব করার জন্য)।

[৩. কিন্তু শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মকে উপাসকের আত্মারূপে জানেন এবং অপরকেও এইরূপ ধারণা করিতে উপদেশ দেন। ধ্যেয় ব্রহ্মই আমার আত্মা— এইরূপ ধ্যানের উপদেশই শ্রুতিসমূহ দিয়া থাকেন।]

এখন প্রশ্ন হইল, সাধক (জীব) পরমাত্মাকে কি নিজের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবেন— না নিজ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করিবেন।— ইহাই বর্তমান আলোচ্য বিষয়। প্রতিপক্ষ বলেন যে, সাধক পরব্রহ্মকে নিজ হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়াই ধারণা করিবেন— কারণ, ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। কারণ জীব হইল দুঃখাদির অধীন, ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন। এই সূত্রটি প্রতিপক্ষের উক্ত অভিমতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, ব্রহ্মকে নিজের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, কারণ স্বরূপত উভয়েই এক ও অভিন্ন— জীবাত্মার দুঃখাদি অনুভবের কারণ হইল তাহার উপাধি— তাহার অন্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতা (পূর্ববর্তী ২.৩.২৯ দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে— যাবালগণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন— "আমিই তুমি, হে ঈশ্বর, এবং তুমিই আমি।" অন্যান্য শাস্ত্রীয় শ্রুতিবচনেও আছে— একই ঘোষণা: 'আমিই ব্রহ্ম' (বৃঃ ১.৪.১০), "এই আত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২)। এই শ্রুতিবচনগুলিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে— গৌণ অর্থে নহে; যেমন

গৌণ অর্থে— 'মনই ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩.১৮.১)— এইরূপভাবে গ্রাহ্য নহে। এখানে শ্রুতি মনকে (ধ্যানের) উপাসনার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং ব্রহ্মকে আমাদের আত্মাস্বরূপেই ধ্যান (উপাসনা) করিতে হইবে।

অধিকরণ ৩: যেখানে ব্রহ্মের প্রতীককে ধারণা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উপাসক প্রতীককে নিজের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিবেন না।

ন প্রতীকে, ন হি সঃ ॥৪।১।৪॥

ন (নহে) প্রতীকে (প্রতীকে) ন (তাহা নহে) হি (যেহেতু, কারণ) সঃ (তিনি)।

৪. (উপাসক, ধ্যাতা) প্রতীকের মধ্যে নিজেকে দেখিবেন না, কারণ প্রতীক (উপাসকের স্বরূপ) নহে।

[৪. উপাসক প্রতীকের সঙ্গে নিজের একত্ব কল্পনা করিয়া ধ্যান করিবেন না, কারণ সাধক প্রতীক নহেন।]

'মনই ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩.১৮.১)। এইরূপ উপাসনায় যেখানে মনকে ব্রহ্মের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে— সেখানে কি উপাসক নিজেকে মনের সহিত এক কল্পনা করিয়া— 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ স্থলের ন্যায় ধ্যান করিবেন? প্রতিপক্ষগণ বলেন যে, উপাসক এইরূপই ধ্যান করিবেন, কারণ বেদান্তমতে মন ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট, এবং সেইজন্য মনও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তেমনি ধ্যাতা জীবও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, ধ্যাতাও মনের সহিত অভিন্ন, সুতরাং ধ্যাতা তাঁহার ধ্যানেও নিজেকে মনের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করিবেন। এই সূত্রটি উপরের যুক্তিকে খণ্ডন করিতেছে। প্রথমত, যদি প্রতীক মনকে ব্রহ্মের সহিত একরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ইহা আর প্রতীক থাকিতে পারে না— যেমন কোন অলঙ্কারকে যদি আমরা স্বর্ণ বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে আমরা অলঙ্কারটির অলঙ্করত্ব বৈশিষ্ট্যটিকে বিস্মৃত হইয়া যাই। পুনশ্চ: যদি ধ্যাতা জীবাত্মা তাঁহার ব্রহ্মত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাহা হইলে তখন তিনি আর ধ্যাতা জীবাত্মারূপে পৃথক্ থাকিতে পারেন না। ধ্যানের ব্যাপারটি ততক্ষণ পর্যন্তই সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধ্যাতা এবং ধ্যেয়ের পার্থক্যটি বর্তমান আছে— এবং একত্ব অনুভব করা হয় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত নানাত্ব জ্ঞান আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যাতা উপাসনার প্রতীক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেইহেতু তিনি নিজের (আত্মাকে) স্বরূপকে প্রতীকের মধ্যে দেখিতে পারেন না।

অধিকরণ ৪ : প্রতীকোপাসনার ক্ষেত্রে প্রতীককে ব্রহ্মরূপে দেখিতে হইতে পারে— কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমে (ব্রহ্মকে প্রতীকরূপে) নহে।

ব্রহ্মদৃষ্টিঃ, উৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫॥

ব্রহ্ম-দৃষ্টিঃ (ব্রহ্মরূপে দেখা) উৎকর্ষাৎ (উৎকর্ষ হেতু)।

৫. (প্রতীককে) ব্রহ্মরূপে দেখিতে হইবে (কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমে নহে), কারণ ইহার দ্বারা প্রতীকের উৎকর্ষ বিধান করা হইবে।

[৫. প্রতীককে ব্রহ্মরূপে দর্শন করা বিধেয়, কিন্তু ব্রহ্মকে প্রতীকরূপে ধ্যান করা বিধেয় নহে কারণ তাহা হইলে প্রতীকটি ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া যায়।]

'মনই ব্রহ্ম', 'আদিত্যই ব্রহ্ম'— ইত্যাদি প্রতীক উপাসনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন জাগে যে, এখানে আমরা প্রতীককেই কি ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিব, না ব্রহ্মকেই প্রতীক বলিব? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, মন, আদিত্য ইত্যাদি প্রতীককেই ব্রহ্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে— কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমটি নহে। কারণ, একটি নিম্নস্তরের বস্তুকে উচ্চস্তরের বস্তুরূপে দেখিতে পারাকেই আমরা উন্নতি বলিতে পারি— ইহার বিপরীতক্রমে নহে। যেহেতু আমাদের লক্ষ্য হইল নানাত্বের ধারণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করা, সেইহেতু আমাদের সেই সকল প্রতীককেই ব্রহ্মরূপে ধারণা করিতে হইবে।

অধিকরণ ৫ : যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ক্ষেত্রে প্রতীক দেবতাদির উপরই ব্রহ্মত্ব আরোপ করিতে হইবে—কিন্তু বিপরীতক্রমে তাহা করা যাইবে না।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গে, উপপত্তেঃ ॥৪।১।৬॥

আদিত্যাদি-মতয়ঃ (আদিত্য ইত্যাদির ধারণা) চ (এবং) অঙ্গে (যজ্ঞের অঙ্গ-ক্রিয়াদিতে) উপপত্তেঃ (যেহেতু তাহা হইলেই সঙ্গতি রক্ষা হয়)।

৬. এবং আদিত্যাদির কল্পনাকে (স্থাপন করিতে হইবে) (যজ্ঞকর্মের) অঙ্গসমূহের উপর। কারণ, (একমাত্র তাহা হইলেই শাস্ত্রের উপদেশসমূহ) সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

[৬. যজ্ঞাঙ্গের আদিত্যাদি প্রতীককে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মকে আদিত্যরূপে কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না। শুধুমাত্র এইরূপভাবে উপাসনা করিলেই শ্রুতির উপদেশ সঙ্গত হইবে।]

"এই যিনি তাপ দান করেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে" (ছাঃ ১.৩.১); "পৃথিব্যাদি-লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে"— ইত্যাদি (ছাঃ ২.২.১)। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিগুলিতে যে উপাসনার কথা যজ্ঞাঙ্গ সম্পর্কিত কর্ম বিষয়ে বলা হইয়াছে, সেই উপাসনা কিভাবে করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম উদ্ধৃত শ্রুতির ধ্যানে আদিত্যকে কি উদ্গীথরূপে ধ্যান করিতে হইবে, না উদ্গীথকে আদিত্যরূপে? উদ্গীথ এবং আদিত্যের মধ্যে এমন কোন লক্ষণ নাই যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর— কিন্তু পূর্ববর্তী সূত্রে ব্রহ্মের প্রাধান্য হেতু প্রতীককে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করার উপদেশই গ্রহণীয় ছিল। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যজ্ঞ-কর্মাঙ্গ উদ্গীথ যাহার বিষয় এখানে আলোচিত হইতেছে— ইহাকে আদিত্যরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে— এবং এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্র বলেন, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে যজ্ঞকর্মের ফল বর্ধিত হয়। যদি আমরা উদ্গীথকে আদিত্যরূপে ধ্যান করি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা একটি আনুষ্ঠানিক শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং একটি অপূর্বের সৃষ্টি হয়— যাহা সমগ্র যজ্ঞেরই অদৃশ্য ফলস্বরূপ। কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমে যদি আদিত্যকে উদ্গীথরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে এই ধ্যানের দ্বারা আদিত্যের বিশুদ্ধি ক্রিয়া— অপূর্বের উৎপাদন করিতে পারিবে না— যেহেতু আদিত্য যজ্ঞক্রিয়ার একটি অঙ্গ নহে। সুতরাং উপাসনা যজ্ঞের ফলকে বর্ধিত করে— এই শাস্ত্রবচনটিকে যদি সত্য হইতে হয় তাহা হইলে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গটিকেও আদিত্যাদিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

অধিকরণ ৬: উপবেশন করিয়াই উপাসনা (ধ্যান) কর্তব্য।

আসীনঃ, সম্ভবাৎ ॥৪।১।৭॥

আসীনঃ (উপবিষ্ট অবস্থায়) সম্ভবাৎ (সম্ভবহেতু)।

৭. (উপাসনা করিতে হইবে) উপবেশন করিয়া কারণ (এইরূপভাবেই) ইহা সম্ভব।

[৭. উপাসনা বা ধ্যান আসনে উপবেশন করিয়াই করা সম্ভব।]

যেহেতু উপাসনা বা ধ্যান একটি মানসিক ব্যাপার, সেইহেতু দৈহিক সংস্থানের বিষয় চিন্তনীয় নহে— বিরুদ্ধবাদিগণ এইরূপ মত পোষণ করেন। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, উপবেশন করিয়াই ধ্যান করিতে হইবে, কারণ দণ্ডায়মান বা শায়িত অবস্থায় ধ্যান করা সম্ভব নহে। উপাসনাকালে সাধককে কোন একটি বিষয়ের উপর মনকে স্থির করিতে হয়, এবং দণ্ডায়মান বা শায়িত অবস্থায় ইহা অসম্ভব।

ধ্যানাচ্চ ।।৪।১।৮।।

ধ্যানাৎ (ধ্যান শব্দটি হইতে) চ (ও) (তাহাই— উপাসনাই বুঝা যায়)।

৮. এবং 'ধ্যান' হইতেও বুঝিতে পারা যায় (উপাসনাও ধ্যানই)।

[৮. ধ্যান এবং উপাসনা একই এবং আসনে না বসিলে ধ্যান বা উপাসনা যথাযথ হয় না।]

'উপাসনা' শব্দটিও ধ্যান বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই বুঝাইয়া থাকে— অর্থাৎ স্থির-দৃষ্টিতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালিত না করিয়া কোন একটি বস্তু বা বিষয়বিশেষের উপর মনঃসংযোগ করা। ইহা একমাত্র আসীন অবস্থাতেই সম্ভবপর হয়।

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ।।৪।১।৯।।

অচলত্বং (অচলভাব) চ (এবং) অপেক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া)।

৯. (পৃথিবীর) অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়াই (অচলত্ব বিষয়ে শাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে)।

[৯. পৃথিবীর স্থিরত্বকে লক্ষ্য করিয়াই স্থির হইয়া ধ্যানের উপদেশ আছে। আসনে স্থির হইয়া ধ্যান সম্ভব— শায়িত বা চলিত অবস্থায় নহে।]

"পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে"— এইজাতীয় উক্তির মধ্যে পৃথিবীর উপর ধ্যানশীলতার গুণকে আরোপ করা হইয়াছে; কারণ, স্থিরত্ব বা অচলত্বই ইহার গুণ। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অবিচলতা বা স্থিরতা ধ্যানের একটি পরিমাপক শর্ত, এবং এই স্থিরতা বা ধ্যান একমাত্র উপবিষ্ট অবস্থাতেই সম্ভব হয়— দণ্ডায়মান বা চলমান অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে।

স্মরন্তি চ ।।৪।১।১০।।

স্মরন্তি (স্মৃতি শাস্ত্র বলে) চ (এবং)।

১০. স্মৃতি শাস্ত্রও (একই কথা) বলেন।

[১০. গীতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রেও আসনে উপবেশন করিয়া ধ্যান-উপাসনাদি করিবার নির্দেশ আছে।]

"পবিত্রস্থানে নিজের আসনটি স্থাপন করিয়া"— ইত্যাদি (গীতা ৬.১১)— এই শাস্ত্র বচনটিতে ধ্যানের নিমিত্ত আসীন অবস্থারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অধিকরণ ৭ : ধ্যানের (উপাসনার) ব্যাপারে স্থানের কোন বিধি-নিষেধ নাই।

যত্রৈকাগ্রতা তত্র, অবিশেষাৎ ।।৪।১।১১।।

যত্র (যে কোন স্থানে) একাগ্রতা (মনঃসংযোগ হয়) তত্র (সেখানে) অবিশেষাৎ (বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকা হেতু)।

১১. যেখানেই মনের একাগ্রতা হইবে সেখানেই (ইহার অভ্যাস করিতে হইবে), (স্থান বিষয়ে) বিশেষ কোন নির্দেশ নাই।

[১১. ধ্যান বা উপাসনার স্থানবিশেষের কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই। যেখানেই মনঃসংযোগ হইবে সেখানেই ধ্যান করা যায়।]

উপাসনার উদ্দেশ্য হইল মনের একাগ্রতা আয়ত্ত করা, সুতরাং যে কোন স্থানেই মনঃসংযোগ হউক না কেন তাহাই উপাসনার উপযুক্ত স্থান। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন— "উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক যে কোন স্থান নির্বাচন কর", "মন যেখানে চঞ্চল, সেখানে তাহাকে একাগ্র করা উচিত"— এবং এইরূপ আরও উক্তি আছে। কিন্তু যে সকল স্থান পরিচ্ছন্ন, এবং প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি, বালুকা— ইত্যাদি হইতে মুক্ত, সেইসকল স্থানই প্রশস্ত, কারণ এই জাতীয় স্থানই ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু যে কোন স্থানই হউক না কেন— স্থানবিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই।

অধিকরণ ৮ : আমৃত্যু উপাসনা করিতে হইবে।

আপ্রায়ণাৎ, তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।।৪।১।১২।।

আপ্রায়ণাৎ (মৃত্যু পর্যন্ত) তত্র (তখন) অপি (এমনকি) হি (যেহেতু) দৃষ্টম্ (শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়)।

১২. মৃত্যু পর্যন্ত (উপাসনা করিতে হইবে) কারণ (তাহাদের অনুষ্ঠান) সেইসময় পর্যন্ত (শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে— দেখা যায়)।

[১২. মোক্ষলাভ না হইলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আজীবন উপাসনা করিয়া যাইবার উপদেশ শাস্ত্রে আছে।]

এই পাদের প্রথম প্রকরণে বলা হইয়াছিল যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্তই পুনঃপুনঃ ব্রহ্মের উপাসনা (ধ্যান) করিতে হইবে। এখন অন্যান্য ফললাভের জন্য আচরিত উপাসনাগুলির প্রসঙ্গ সম্পর্কে প্রশ্নাদির আলোচনা আরম্ভ করা যাইতেছে। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, কিছুকাল পর এইজাতীয় উপাসনা বন্ধ করা যাইতে পারে— তাহা হইলেও একবার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ন্যায় এই সকল উপাসনা ফল দিতেই থাকিবে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই-জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান আমৃত্যু করিতে হইবে, কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি এইরূপ নির্দেশই দেন। "যে চিন্তা করিয়া তিনি এই জগৎ হইতে চলিয়া যান" (শতঃ ব্রাঃ ১০.৬.৩.১)। "প্রয়াণকালে তিনি যেইরূপ চিন্তা করিয়া এই শরীর ত্যাগ করেন" (গীতা ৮.৬)। সারা জীবন অভ্যাস না থাকিলে মৃত্যুকালে পরবর্তী জীবনের গতি নির্ণয়কারী এইরূপ চিন্তা লাভ করা যায় না। সেইজন্যই মৃত্যু পর্যন্ত ধ্যান উপাসনার অভ্যাস করিয়া যাইতে হইবে।

অধিকরণ ৯ : ব্রহ্মজ্ঞান অতীত এবং অনাগত দুষ্কর্মের ফলকে ধ্বংস করে।

তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ,
তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩॥

তৎ-অধিগমে (যখন তাহার উপলব্ধি হয়) উত্তর-পূর্ব-অঘয়োঃ (অনাগত এবং অতীত পাপসমূহের) অশ্লেষ-বিনাশৌ (অসংস্পর্শ এবং ধ্বংস) তৎ-ব্যপদেশাৎ (যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে)।

১৩. যখন সেই (ব্রহ্মকে) লাভ করা যায় তখন যথাক্রমে অনাগত (পাপের) অসংস্পর্শ এবং অতীত পাপের ধ্বংস হয়, কারণ এইরূপ উক্তি (বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে)।

[১৩. ব্রহ্মলাভ হইলে অতীতকালের পাপের বিনাশ হয় এবং ভাবী কালের পাপের সংস্পর্শ হয় না। শাস্ত্রে এইজাতীয় উক্তি আছে।]

এখানে জীবন্মুক্তি অবস্থার বর্ণনা করা হইতেছে। বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, জ্ঞান ব্যতিরেকেই মুক্তি লাভ সম্ভবপর হয় শুধু যদি মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কৃত সকল অতীত পাপকর্মের ফল ভোগ শেষ হইয়া থাকে। কারণ স্মৃতি বলেন, "কর্ম ফলদান না করা পর্যন্ত বিনষ্ট হয় না"। কর্মের বিধান অপরিহার্য। এই সূত্রটি বলে যে, যখন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার সমগ্র অতীত পাপরাশি বিনষ্ট

হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ কোন পাপও তাঁহার সংস্রবে আসিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মলাভ করিয়াই তিনি অনুভব করিতে পারেন যে, তিনি কখনও অতীতে কর্মের কর্তা ছিলেন না, বর্তমানেও তিনি কর্তা নহেন, এবং ভবিষ্যতেও কর্তা হইবেন না। সেইজন্যই, এইরূপ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তি পাপ ফলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন না। শ্রুতিও এই ঘোষণাই করিয়াছেন— "মুঞ্জার শীষের তূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন (নিঃশেষে) ভস্মীভূত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি এই বিদ্যাটি এইরূপে জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র হবন করেন, তাহার নিখিল পাপ নিঃশেষিত হয়" (ছাঃ ৫.২৪.৩); "কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" (মুঃ ২.২.৮); "পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি এবম্প্রকার ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না" (ছাঃ ৪.১৪.৩)। স্মৃতি কর্মবিধানের যে অখণ্ডনীয়তার কথা বলেন, তাহা শুধুমাত্র সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, এবং এইরূপভাবেই কর্মশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মোক্ষফলের উদয় হয়। তাহা না হইলে মোক্ষ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

অধিকরণ ১০: ব্রহ্মজ্ঞ একই ভাবে সৎকর্মের দ্বারাও প্রভাবিত হন না।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ, পাতে তু ॥৪।১।১৪॥

ইতরস্য (অন্যটির) অপি (ও) এবম্ (এইরূপে) অসংশ্লেষঃ (সংস্রবহীনতা) পাতে (মৃত্যু কালে) তু (কিন্তু)।

১৪. ঠিক এইভাবেই অপরটিরও (পুণ্যেরও) কোন সংশ্লেষ হয় না, কিন্তু মৃত্যুতে (মুক্তি, অর্থাৎ বিদেহমুক্তি নিশ্চিতই হইবে)।

[১৪. পাপের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পুণ্যও বিনষ্ট হয়— মৃত্যুর পর তাঁহার পুণ্যের সহিতও কোন সংস্রব থাকে না। তাই, মৃত্যুর পর তিনি সুনিশ্চিতভাবেই বিদেহমুক্তিলাভ করেন।]

যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, সেইজন্য তিনি পুণ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হন না। তিনি পাপ পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করেন। "তিনি উভয়কেই অতিক্রম করেন"— (বৃঃ ৪.৪.২২)। এবং যেহেতু তিনি জ্ঞানলাভের পর পাপ বা পুণ্য কিছুদ্বারাই লিপ্ত থাকেন না, এবং যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার অতীত পাপসমূহও বিনষ্ট হয়— সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁহার মুক্তি অবধারিত।

অধিকরণ ১১ : যে-সকল কর্ম এখন পর্যন্ত ফল দিতে আরম্ভ করে নাই জ্ঞানের দ্বারা শুধুমাত্র সেই সকল কর্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয়— যে সকল কর্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা নহে।

অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে, তদবধেঃ ॥৪।১।১৫॥

অনারব্ধকার্যে (যে সকল কার্যের ফল এখনও প্রসব হয় নাই) এব (শুধুমাত্র) তু (কিন্তু) পূর্বে (পূর্বকর্ম সকল) তদবধেঃ (সেই পর্যন্ত) [মৃত্যু পর্যন্ত], ইহার সীমা।

১৫. কিন্তু (তাঁহার) শুধুমাত্র পূর্ব-কর্মগুলিই— যাহা তখনও পর্যন্ত ফল দিতে আরম্ভ করে নাই— (জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়); কারণ, মৃত্যু পর্যন্তই সীমা (শাস্ত্র বলিয়াছেন মৃত্যুতে মুক্তিলাভ হয়)।

[১৫. ব্রহ্মজ্ঞানীর সঞ্চিত (যাহা এখনও ফল দেয় নাই) এবং ক্রিয়মাণ (ভাবী) কর্মফলই বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধ কর্মফল তাঁহাকে মৃত্যু পর্যন্ত ভোগ করিতেই হয়। মৃত্যুর পরই তিনি 'বিদেহমুক্তি' লাভ করেন।]

পূর্ববর্তী দুইটি প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের প্রাক্তন সকল কর্ম বিনষ্ট হয়। কিন্তু, অতীত কর্ম হইল দ্বিবিধ: সঞ্চিত— অর্থাৎ যাহার ফল এখন পর্যন্ত ভোগ করা হয় নাই, এবং প্রারব্ধ— অর্থাৎ যাহা ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যাহা এই দেহকে সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে জ্ঞানলাভে উন্নীত করিয়াছে। বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর এই দুই প্রকার কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়— কারণ তাঁহারা মুণ্ডক উপনিষদের শ্রুতি দেখাইয়া বলিতে চান যে, মুণ্ডক তো সকল কর্মই ব্রহ্মজ্ঞানের পর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অধিকন্তু সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ উভয় কর্ম বিষয়েই ব্রহ্মজ্ঞ একই প্রকারে কর্তৃত্ববোধ রহিত। সুতরাং ইহাই যুক্তিসম্মত যে, জ্ঞান লাভ হইলে উভয়প্রকার কর্মই বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই সূত্রটি এই মতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া বলিতেছে যে, জ্ঞানের দ্বারা শুধুমাত্র সঞ্চিত কর্মই বিনষ্ট হয়, প্রারব্ধ বিনষ্ট হয় না— প্রারব্ধ ভোগের দ্বারাই মাত্র বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রারব্ধ কর্মের বেগ ব্রহ্মজ্ঞের দেহে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে এইদেহে অবস্থান করিতেই হইবে। যখন প্রারব্ধ কর্ম নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখনই তাঁহার দেহের পতন হইবে, এবং তিনি মুক্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার এই প্রারব্ধ কর্মের গতিকে রোধ করিতে পারে না— যেমন একজন ধনুর্ধরী তাঁহার

নিক্ষিপ্ত শরের গতিকে নিবৃত্ত করিতে পারে না—। যখন শরের গতিশক্তি আপনা হইতে নিঃশেষ হয়, তখনই শরটি বিশ্রামলাভ করে। শ্রুতিশাস্ত্রও এইজাতীয় উক্তির মধ্যে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন: "যতক্ষণ তিনি দেহমুক্ত না হন, ততক্ষণই তাঁহার (ব্রহ্মলীন হওয়ার) বিলম্ব হয়; অতঃপর অবিলম্বে তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন" (ছাঃ ৬.১৪.২) যদি ইহা এইরূপ না হইত তাহা হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কোন গুরু থাকিতেন না। সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধকর্মসমূহ বিনষ্ট হয় না।

অধিকরণ ১২: দশম প্রকরণে যে কর্মানুষ্ঠানাদির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা নিত্যকর্ম বিষয়ে প্রযোজ্য নহে।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্যায়ৈব, তদ্দর্শনাৎ ॥৪।১।১৬॥

অগ্নিহোত্রাদি ((নিত্য করণীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান) তু (কিন্তু) তৎ-কার্যায় (সেই [ব্রহ্মজ্ঞান] কার্যের জন্যই) এব (মাত্র) তৎ-দর্শনাৎ (শাস্ত্রাদিতে এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া)।

১৬. কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি (নিত্য কর্মের ফল) (জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না) ইহারা একই ফল ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই (মুক্তিরই) কারণ, যেহেতু ইহার সমর্থনে বহু শ্রুতি আছে।

[১৬. অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের ফল ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। বরং ঐ সকল নিত্য কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানলাভেরই সহায়ক হেতুরূপে গণ্য হয়। তাই ইহাদের ফলও আমৃত্যু থাকে। ইহার সমর্থনে বহু শ্রুতিবচনও আছে।]

কর্মানুষ্ঠানাদির মধ্যে বিশেষ কোন ফল লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপদেশ আছে— যথা স্বর্গাদি লাভের জন্য কর্ম করা। পুনরায় অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় অন্য কতকগুলি নিত্যক্রিয়ার বিধান দেওয়া আছে— যাহার প্রত্যক্ষ কোন ফল নাই— অথচ শীল চর্যার নিষ্ঠার জন্য এইগুলির বিধান করা হইয়াছে। বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পূর্বে এই সকল নিত্য কর্মের ফলও বিনষ্ট হইয়া যায়— যেমন কাম্য কর্মাদির ফল নষ্ট হয়— কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কর্তৃত্বাভিমানরাহিত্য উভয় কর্মের ক্ষেত্রেই সমান।

এই সূত্রটি এই মতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলে যে, অতীতের কৃত নিত্যকর্ম নষ্ট হয় না। কর্ম দুইপ্রকার: নৈমিত্তিক কর্ম— যাহা নির্দিষ্ট কোন ফললাভের নিমিত্ত করা হয়, এবং অন্যপ্রকার কর্ম যাহা জ্ঞানলাভের সহায়ক। জ্ঞানলাভের পূর্বপর্যন্ত

কৃত সকল প্রকার নিত্যকর্ম হইল এই পরোক্ত কর্ম। এবং যেহেতু জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়— সেইহেতু নিত্যকর্মসমূহও মুক্তিলাভের পরোক্ষ সহায়ক বলিতে পারা যায়। সুতরাং ইহাদের ফল মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী।

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪।১।১৭॥

অতঃ (ইহা হইতে) অন্যা (ভিন্ন) অপি (ও) হি (নিশ্চিতই) একেষাম্ (কোন কোন শাখার) উভয়োঃ (উভয়ের)।

১৭. নিশ্চিতই (কতকগুলি সৎকর্ম) এবং ইহা হইতে ভিন্ন (অগ্নি-হোত্রাদি নিত্যকর্মও আছে), (যাহাদের সম্বন্ধে কোন কোন শাখার মন্তব্য আছে) (জৈমিনি এবং বাদরায়ণ) উভয়েই (এইমত পোষণ করেন)।

[১৭. নিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যান্য কামনাপূরক নানা কর্মও আছে। জৈমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়ের মতানুসারেই কাম্য-কর্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক নহে।]

অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের ন্যায় কতকগুলি কর্মানুষ্ঠান আছে— যাহা বিশেষ কোন ফল লাভের জন্য করা হয়। এই কর্মানুষ্ঠানগুলি সম্পর্কেই কোন কোন বেদের শাখায় এইরূপ উক্তি আছে: "তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পুণ্যকর্মের এবং শত্রুগণ পাপকর্মের ফলের উত্তরাধিকারী হন।" জৈমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়েই এই মত পোষণ করেন যে, কাম্যকর্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক নহে।

অধিকরণ ১৩: বিদ্যা অথবা উপাসনার সঙ্গে সংবদ্ধ নহে এইরূপ যজ্ঞকর্মও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হয়।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪।১।১৮॥

যৎ-এব (—যাহা কিছু) বিদ্যয়া (বিদ্যা [জ্ঞান] দ্বারা) ইতি (এইরূপ) হি (যেহেতু)।

১৮. কারণ (এই শ্রুতিটি) "বিদ্যার দ্বারা (তিনি যাহা করেন)"— হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

[১৮. বিদ্যাসহকারে যাহা করা যায়— যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম— তাহা শীঘ্র ফলদান করে। বিদ্যাহীন কর্মও একেবারে ব্যর্থ হয় না, উহা বিলম্বে ফলদান করে।]

নিত্যকর্ম যাহা জ্ঞান উৎপাদনের সহায়ক তাহা দুই প্রকার: উপাসনার সহিত সংবদ্ধ কর্ম এবং উপাসনার সহিত অসংবদ্ধ কর্ম। যেহেতু উপাসনা-সহিত কর্ম উপাসনারহিত কর্ম হইতে শ্রেয়, সেইজন্য বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, উপাসনাসহিত কর্মই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের সহায়ক। এই সূত্রটি বিপক্ষমতকে খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিতেছে যে—"উপাসনাদিসহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়" (ছাঃ ১.১.১০)—এই শ্রুতিবচনটির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ফলদানের অধিকতর কার্যকারিতার বিষয় হইতে বুঝিতে পারা যায়— যে সকল কর্ম উপাসনার সহিত সংবদ্ধ নহে, তাহারাও সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক নহে— যদিও উপাসনা-সহিত কর্মই অধিকতর কার্যকর (ফলপ্রদ)।

অধিকরণ ১৪: ভোগের মাধ্যমে প্রারব্ধ কর্ম নিঃশেষ হইলে পরই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯॥

ভোগেন (ভোগের দ্বারা) তু (কিন্তু) ইতরে (অন্য দুইটি কর্মের) ক্ষপয়িত্বা (ক্ষয় করিয়া) সম্পদ্যতে (ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান)।

১৯. কিন্তু ভোগের দ্বারা অপর দুইটি কর্ম নিঃশেষ করিয়া (অর্থাৎ শুভ এবং অশুভ প্রারব্ধ— যাহারা ফলদানে বিরত ছিল), তিনি (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যান।

[১৯. ভোগের দ্বারা পাপ এবং পুণ্য উভয়প্রকার প্রারব্ধ ফল ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব করেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান।]

বিরুদ্ধপক্ষ বলেন যে, ব্রহ্মবিদ্ জীবদ্দশায় যেমন নানাত্বরূপে জগৎকে দেখেন মৃত্যুর পরও সেইরূপ নানারূপেই দেখিতে থাকিবেন; অন্য কথায় বলিতে গেলে, বিরুদ্ধবাদিগণ স্বীকার করিতে চাহেন না যে, ব্রহ্মজ্ঞ মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলিতেছে যে, ফলদান করিয়াই প্রারব্ধ কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যদিও সেই অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞকে জীবন্মুক্তরূপে ব্যবহারিক লোক-জগতে অবস্থান করিতে হয়, তথাপি যখন ভোগের দ্বারা এই সকল কর্ম সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মজ্ঞ মৃত্যুতে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। তখন তিনি আর নানাত্ব দর্শন করেন না— যেহেতু প্রারব্ধের ন্যায় কোন কারণ তখন বর্তমান থাকে না, এবং যেহেতু প্রারব্ধসহ সকল কর্মই মৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মের সহিত এক-ই হইয়া যান।

ব্রহ্ম-সূত্র

চতুর্থ অধ্যায় । দ্বিতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে ইহা দেখানো হইয়াছে যে, সঞ্চিত কর্মের বিনাশের পর ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং প্রারব্ধকর্ম নিঃশেষ হইলে, মৃত্যুতে তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিকে সাধারণত এইভাবেই প্রথমপাদে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনটি পাদে প্রারব্ধকর্ম নিঃশেষিত হইবার পর যে মুক্তিলাভ হয়, সেই মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিশেষ পাদটিতে মৃত্যুর পর সগুণব্রহ্মের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ কিভাবে দেবযানের মাধ্যমে ভ্রমণ করেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেবযানের যাত্রার বিবরটিকেই লক্ষ্য রূপে রাখিয়া—কিভাবে মৃত্যুকালে জীবাত্মা ধাপে ধাপে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অগ্রসর হন, তাহার-ই বর্ণনা দ্বারা এই পাদের সূচনা করা হইতেছে।

অধিকরণ ১ঃ মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া মনে লয়প্রাপ্ত হয়।

বাঙ্মনসি, দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ।।৪।২।১।।

বাক্ (বাক্য, বাগিন্দ্রিয় ক্রিয়া) মনসি (মনে) দর্শনাৎ (কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়) শব্দাৎ (শাস্ত্রবচন হইতে) চ (এবং)।

১. বাক্ মনে (লীন হয়), কারণ এইরূপই দেখা যায়, এবং শাস্ত্রেও (এইরূপ) উক্তি আছে।

[১. মৃত্যুকালে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয়—এবং শ্রুতিও তাহাই বলেন।]

"হে সৌম্য, এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়" (ছাঃ ৬.৮.৬)। এই শ্রুতিটি মৃত্যুকালে কি ঘটে তাহা বর্ণনা করিতেছে। এই শ্রুতি অনুসারে বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়, মন প্রাণে, এবং এইরূপভাবে পরপর লয় হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বাগিন্দ্রিয় কি ইন্দ্রিয়রূপেই মনে লয়প্রাপ্ত হয়, না ইহার ক্রিয়ামাত্র লীন হয়? বিপক্ষগণ মনে

করেন যে, যেহেতু শ্রুতিতে বাক্‌ক্রিয়ার লীন হইবার কথা স্পষ্টত উল্লেখ নাই, সেইহেতু আমাদের বুঝিতে হইবে যে বাক্-ইন্দ্রিয়ই মনে লয়প্রাপ্ত হয়।

এই সূত্রটি এই মতবাদকে খণ্ডনপ্রসঙ্গে বলে যে, শুধুমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াটিই মনে লয়প্রাপ্ত হয়। মন ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদান কারণ নহে— এবং সেইজন্যই ইহারা মনে লীন হইতে পারে না। শুধুমাত্র উপাদান কারণেই কার্যগুলি লীন হইতে পারে, এবং যেহেতু মন ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদান কারণ নহে, সেইজন্যই আমাদের বুঝিতে হইবে যে, এখানে 'বাক্' বলিতে ইন্দ্রিয়কে নহে বাক্ ক্রিয়াকেই বলা হইয়াছে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, সেইহেতু ইহা (বাক্ ক্রিয়া) মনে লয়প্রাপ্ত হইতে পারে— যদিও মন বাক্‌ক্রিয়ার কারণ নহে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তির বিষয়গুলি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত থাকিলেও অগ্নি জলেই নির্বাপিত হইয়া লীন হয়। সুতরাং শাস্ত্রের উদ্ধৃতিটি বাক্-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বুঝাইয়াছে— যেহেতু বস্তুটি এবং বস্তুর ক্রিয়াটিকে একইরূপে দেখা হইয়াছে। আমরা ইহাও লক্ষ্য করি যে, একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রথমেই তাহার বাক্‌শক্তিকে হারায়— যদিও তাহার মন তখনও পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, বাক্ ক্রিয়াই— বাগিন্দ্রিয় নহে— মনে লয়প্রাপ্ত হয়।

অত এব চ সর্বাণ্যনু ॥৪।২।২॥

অতঃ এব (এই একই কারণে) চ (এবং) সর্বাণি (সকল ইন্দ্রিয়ই) অনু (পরে—অনুগমন করে)।

২. এবং একই কারণে সকল (ইন্দ্রিয়ই) মনের অনুসরণ করে অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই মনে বিলীন হয়।

[২. বাক্-ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়ই একই কারণে মনে লয়প্রাপ্ত হয় (মৃত্যুকালে)।]

১ সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত একই কারণে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াও বাক্ ইন্দ্রিয়েরই অনুসরণ করে— অর্থাৎ মনেই বিলীন হয়। "তেজই উদান। সেইজন্যই যাহার স্বাভাবিক তেজ শান্ত হইয়াছে, সে (শরীর ত্যাগ করিয়া) মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়" (প্রশ্ন ৩.৯)। এই শ্রুতি হইতেই জানা যায় যে, সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই মনে লয় প্রাপ্ত হয়।

অধিকরণ ২ : মনের ক্রিয়া প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়।

তন্মনঃ প্রাণে, উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥

তৎ (তাহা) মনঃ (মন) প্রাণে (প্রাণে) উত্তরাৎ (শ্রুতির পরবর্তী বাক্যাংশ হইতে জানা যায়)।

৩. মন যে প্রাণে (লয়প্রাপ্ত হয়) (তাহা দৃষ্ট হয়) পরবর্তী বাক্যাংশ হইতে (উদ্ধৃত শ্রুতিটির)।

[৩. মৃত্যুকালে মন যে প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয় তাহা উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের পরের অংশ হইতেই জানা যায়।]

যে মনে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াগুলি লয়প্রাপ্ত হয়, সেই মনই পর্যায়ক্রমে প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়— কারণ ১ সংখ্যক সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'মন প্রাণে'। এখন, বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, এখানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন বলিয়া, মনই—তাহার ক্রিয়া নহে— প্রাণে বিলীন হয়— কারণ প্রাণকে মনের উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁহারা এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত করেন— "মন অন্নময়, (অন্ন) প্রাণ জলময়" (ছাঃ ৬.৬.৫) এবং "জল পৃথিবী সৃজন করিলেন" (ছাঃ ৬.২.৪)। যখন মন প্রাণে বিলীন হয়, তখন পৃথিবীর জলে বিলীন হওয়ার ন্যায় ইহা একই ব্যাপার; কারণ, মনই হইল অন্ন বা পৃথিবী, এবং প্রাণ হইল জল। সুতরাং শ্রুতি এখানে মনের ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন না, স্বয়ং মনেরই প্রাণে বিলীন হইয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন।

এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডন করিতেছে— এবং বলিতেছে যে, পরোক্ষভাবে এইরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় আমাদের নিকট যুক্তিগ্রাহ্য নহে—যাহাতে আমরা বুঝিব যে, স্বয়ং মনই প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখানেও, একমাত্র (মনের) ক্রিয়াই লয়প্রাপ্ত হয় এবং ইহা ১ সংখ্যক সূত্রে প্রদর্শিত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বুঝিতে পারি—অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির মনের ক্রিয়াটি যখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখনও তাহার প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।

অধিকরণ ৩ : প্রাণের ক্রিয়া জীবাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়।

সোঽধ্যক্ষে, তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪॥

সঃ (সেই প্রাণ) অধ্যক্ষে (অধ্যক্ষে-জীবে) তৎ-উপগমাদিভ্যঃ (যেহেতু সেই স্থলে গমন করে— ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক উক্তি আছে)।

৪. সেই প্রাণ জীবে লয়প্রাপ্ত হয় কারণ, (এই জাতীয় অর্থবোধক শ্রুতি বচন)—তাহার নিকট উপনীত হয়— ইত্যাদি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

[৪. প্রাণ জীবাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়। কারণ, ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি স্পষ্টতই আছে।]

১ সংখ্যক সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিতে আমরা পাইয়াছি— "প্রাণ তেজে লীন হয়"। তাহা হইলে ইহা কিরূপে বলা যায় যে— প্রাণক্রিয়া জীবাত্মাতে লীন হয়— ইহাই হইল প্রতিপক্ষের আপত্তি। এই সূত্রটি ইহার যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, প্রাণ-ক্রিয়ার জীবাত্মাতে লয় হইবার উক্তিটি এই শ্রুতিতে পাওয়া যায়— "মরণ কালে ইন্দ্রিয়বর্গ এই ভোক্তার চারিদিকে সমবেত হয়" (বৃহঃ ৪.৩.৩৮)। এবং "প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়"— (বৃহঃ ৪.৪.২)। ১ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত শ্রুতি কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করেন না— ইহা আমরা পরবর্তী সূত্রের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারিব।

ভূতেষু, তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।২।৫॥

ভূতেষু (ভূতসমূহের মধ্যে) তৎ-শ্রুতেঃ (এইরূপ শ্রুতিবচন হইতে জানিতে পারা যায়)।

৫. (প্রাণ-সহিত জীব) ভূতসমূহের মধ্যে বিলীন হয়— এইরূপ শ্রুতি আছে।

[৫. জীবসংযুক্ত প্রাণ শুধুমাত্র তেজের সহিতই মিলিত হয় না, পরন্তু পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেই মিলিত হয়— শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি আছে।]

"প্রাণ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়"— বলিতে যদি আমরা বুঝি যে প্রাণসহিত জীব তেজে বিলীন হয়— তাহা হইলে এই উক্তি এবং পূর্ববর্তী সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রাণ প্রথমে জীবাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং পরে প্রাণসহিত জীব তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতসমূহের সূক্ষ্ম সারাংশে আশ্রয় গ্রহণ করে—এই সূক্ষ্ম দেহই পরবর্তী দেহের বীজস্বরূপ।

নৈকস্মিন্, দর্শয়তো হি ॥৪।২।৬॥

ন (নহে) একস্মিন্ (একটির মধ্যে) দর্শয়তঃ (উভয়েই ঘোষণা করে— এইরূপ) হি (যেহেতু)।

৬. প্রাণসহিত জীব যে শুধুমাত্র একটি পদার্থেই বিলীন হয় তাহা নহে, কারণ (শ্রুতি এবং স্মৃতি) উভয়েই ঘোষণা করেন (যে ইহা পঞ্চভূতেই লীন হয়)।

[৬. উৎক্রান্ত জীব শুধুমাত্র তেজের সূক্ষ্ম অবস্থাতেই লীন হয় না—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই ইহাকে পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মরূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করার কথা বলিয়াছেন।]

মৃত্যুকালে যখন জীবাত্মা একটি দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে আশ্রয় নিতে চায় তখন ইহা পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপের মধ্যেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, শুধুমাত্র তেজের মধ্যে নহে— কারণ ভাবী দেহ গঠনের জন্য তাহার পঞ্চভূতেরই প্রয়োজন হয়। (৩.১.২ সূত্র দ্রষ্টব্য)

অধিকরণ ৪ : দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইবার পদ্ধতি মার্গ পর্যন্ত গতি সগুণ ব্রহ্মবেত্তা এবং সাধারণ মানুষের একই প্রকার হয়।

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ, অমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪।২।৭॥

সমানা (সমান, একই) চ (এবং) আসৃতি-উপক্রমাৎ (তাহাদের যানের আরম্ভ পর্যন্ত) অমৃতত্বং (অমৃতত্ব ব্রহ্ম-উপলব্ধি) চ (এবং) অনুপোষ্য (অবিদ্যাকে দগ্ধ না করিলে হইবে না)।

৭. সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অজ্ঞানী মানুষের মৃত্যুকালীন যাত্রাটি একই, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজ নিজ মার্গে যাত্রা আরম্ভ করে; তখন সগুণ ব্রহ্মবিদের অমৃতত্ব (ব্রহ্মোপলব্ধি) কিন্তু আপেক্ষিক মাত্র—কারণ তাহার অবিদ্যা তখনও দগ্ধ হয় নাই।

[৭. মৃত্যুর পর নিজ নিজ মার্গে গমনের পূর্ব পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্মবিদের এবং বদ্ধজীবের গতি একই প্রকার। যেহেতু সগুণ ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় নাই, সেইজন্য তাহার অমৃতত্ব (ব্রহ্ম-উপলব্ধি) আপেক্ষিক মাত্র।]

নির্গুণ ব্রহ্মবিদের কোন উৎক্রমণই নাই। তাঁহার ক্ষেত্র ব্যতীত, বিপক্ষবাদিগণের মতে—সগুণ ব্রহ্মবিদের এবং একজন বদ্ধজীবের মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, মৃত্যুর পর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মলোকে গমন করেন—এবং বদ্ধজীব পুনরায় মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, সগুণ ব্রহ্মবিদ্ মৃত্যুকালে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেহ হইতে নির্গত হন এবং পরে দেবযানে গমন করেন। অন্যপক্ষে বদ্ধজীব

অন্য কোন নাড়ীর মধ্য দিয়া অন্য পথে গমন করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ যানে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের একই গতি থাকে, কারণ এই অবস্থাটি অনেকটা জীবদ্দশারই ন্যায়—এবং এই অবস্থায় উভয়েই একই প্রকার সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন।

অধিকরণ ৫ : মৃত্যুকালে অগ্নি প্রভৃতির পরম দেবতায় লয়প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি আত্যন্তিকভাবে লীন হওয়া নহে।

তদাঽপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪।২।৮॥

তৎ (তাহা) আ অপীতেঃ (জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ পর্যন্ত) সংসার-ব্যপদেশাৎ (কারণ, শাস্ত্র আপেক্ষিক অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন)।

৮. তাহা (সূক্ষ্ম শরীর) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পর্যন্ত বর্তমান থাকে, কারণ (শাস্ত্র) (তখন পর্যন্ত) আপেক্ষিক অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

[৮. মৃত্যুর পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পর্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহ বর্তমান থাকে। কারণ শাস্ত্রে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত জীবের সূক্ষ্মদেহে অবস্থানের কথা আছে।]

১ সংখ্যক সূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিতে আমরা পাই— "এবং তেজ পরমদেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয়"। বিরুদ্ধবাদিগণের বক্তব্য হইল— যেহেতু তেজ এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ পরম দেবতাতে বিলীন হয়— যে পরমদেবতা হইলেন পদার্থসমূহের কারণ— সেই পরমদেবতাতে লীন হওয়াই তো চরমভাবে বিলীন হইয়া যাওয়া। সুতরাং মৃত্যুতে সকলেই মুক্তিলাভ করে। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই বিলীন হওয়া চরম বিলীন হওয়া নহে— ইহা সুষুপ্তির বিলীন হওয়ার ন্যায় বিলীন হওয়া। এই পদার্থসমূহের ক্রিয়ামাত্র ইহাতে বিলীন হয়, স্বয়ং পদার্থসমূহ নহে। জ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্ত চরম বিলীনভাব আসিতে পারে না—কারণ, শ্রুতি বলেন যে, তখনও পর্যন্ত জীব একটি অবস্থিতির মধ্যে অবস্থান করে। "কোন কোন জীবাত্মা দেহ ধারণ করিবার জন্য গর্ভে প্রবেশ করে" (কঠঃ ২.২.৭)। যদি মৃত্যুতে বিলীন হইয়া যাওয়াই চরম বিলীনাবস্থা হইত, তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইত না।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ, তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯॥

সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম) প্রমাণতঃ (আকৃতি বিষয়ে) চ (এবং) তথা (এইরূপ) উপলব্ধেঃ (ইহা উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

৯. (এই সূক্ষ্ম দেহটি) স্বভাবত (অণু-সূক্ষ্ম) এবং আকারে, কারণ, ইহাকে এইরূপই অনুভব হয়।

[৯. এই সূক্ষ্ম দেহটি (প্রকৃতি) এবং আকৃতিগতভাবেই সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ, কারণ (শাস্ত্র হইতে) এইরূপই উপলব্ধি হয়।]

মৃত্যুকালে স্থূল পদার্থসমূহের সার মাত্র গ্রহণ করিয়া যে সূক্ষ্মদেহ নির্মিত হয়, এবং যে সূক্ষ্মদেহে আত্মা অবস্থান করেন তাহা প্রকৃতি এবং আকৃতিগতভাবে অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই)। "ইহা নাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া— নাড়ীর মধ্য দিয়া উৎক্রান্ত হয়"— এই শাস্ত্র উক্তি হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহাকে অবশ্যই সূক্ষ্ম এবং আকারে ক্ষুদ্র হইতেই হইবে। ইহার স্বচ্ছতাগুণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়—কেন ইহা কোন স্থূলবস্তুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, অথবা ইহার উৎক্রমণের সময় কেন ইহাকে দেখা যায় না।

নোপমর্দেনাতঃ ॥৪।২।১০॥

ন (নহে, হয় না) উপমর্দেন (ধ্বংস দ্বারা) অতঃ (সেইহেতু)।

১০. এইজন্য (স্থূল দেহ) বিনষ্ট হইলেও (সূক্ষ্ম দেহ বিনষ্ট হয় না)।

[১০. সূক্ষ্ম দেহটি স্বচ্ছ এবং স্থূল উপাদানরহিত বলিয়াই স্থূলদেহের ধ্বংস হইলেও ইহার বিনাশ বা পরিবর্তন হয় না।]

অস্যৈব চ-উপপত্তেঃ-এষ উষ্মা ॥৪।২।১১॥

অস্য এব (একমাত্র এই সূক্ষ্ম শরীরে-ই) চ (এবং) উপপত্তেঃ (সম্ভাবনা হেতু) এষঃ (এই) উষ্মা (দেহের উত্তাপ)।

১১. এবং এই (সূক্ষ্ম দেহতেই) এই (দৈহিক) উত্তাপ বর্তমান থাকে, কারণ (একমাত্র) ইহাই সম্ভব।

[১১. সূক্ষ্ম দেহের উত্তাপই স্থূলদেহে অনুভূত হয়, কারণ সূক্ষ্ম শরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মা থাকে না।]

প্রাণীর মধ্যে যে দৈহিক উত্তাপ অনুভূত হয় তাহা সূক্ষ্ম দেহেরই উত্তাপ— স্থূল দেহের নহে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্তই উত্তাপ অনুভূত হয়— কিন্তু মৃত্যুর পর আর হয় না।

অধিকরণ ৬ঃ মৃত্যুকালে নির্গুণ ব্রহ্মবিদের প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না।

প্রতিষেধাদিতি চেৎ, ন, শারীরাৎ ॥৪।২।১২॥

প্রতিষেধাৎ (নিষেধহেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, এইরূপ নহে) শারীরাৎ (জীবাত্মা হইতে)।

১২. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (ব্রহ্মজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না), কারণ শ্রুতি ইহা অস্বীকার করিয়াছেন—(ইহার উত্তরে আমরা বলিব) না, এইরূপ হইতে পারে না (কারণ শ্রুতি প্রাণের উৎক্রমণ নিষেধ করিয়াছেন জীবাত্মা হইতে [দেহ হইতে নহে])।

[১২. অন্যত্র নিষেধহেতু ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্তি হয় না, যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমরা বলিব— না, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞেরও উৎক্রান্তি হয়। উক্ত নিষেধ দেহ হইতে উৎক্রান্তি নহে, জীব হইতে।]

এই সূত্রটিতে প্রতিপক্ষের মত ব্যক্ত হইতেছে। "তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না" (বৃঃ ৪.৪.৬)। এই শ্রুতিবচনটি নির্গুণ ব্রহ্মবিদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বলে যে, মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। প্রতিপক্ষ মনে করেন যে, প্রাণের এই উৎক্রমণটির প্রতিষেধ হইল জীব হইতে— দেহ হইতে নহে। প্রাণ জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না—ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহা দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না—কেন না তাহা হইলে তো কখনও মৃত্যুই হইত না। মাধ্যন্দিন শাখার শ্রুতি হইতে ইহা আরও স্পষ্টতরভাবেই বুঝিতে পারা যায় 'তাহা হইতে'— ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞের আত্মা প্রাণের সহিত দেহ হইতে নিক্রান্ত হয়।

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥৪।২।১৩॥

স্পষ্টঃ (স্পষ্টভাবে) হি (যেহেতু) একেষাম্ (কোন কোন শাখার)।

১৩. কারণ, (উৎক্রমণের নিষেধ) স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে কোন কোন (শাখার শ্রুতিতে)।

[১৩. ব্রহ্মজ্ঞের ক্ষেত্রে যে প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা কোন কোন শাখার শ্রুতি হইতে স্পষ্টই জানা যায়।]

এই সূত্রটি প্রতিষেধকে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আত্মার সঙ্গে নহে, কারণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ববর্তী সূত্রের মতকে খণ্ডন করিতেছে।

প্রাণ যে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না তাহা এইজাতীয় শ্রুতি হইতে স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে: "তিনি (অতিভাগ) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানীর যখন মৃত্যু হয় তখন ইহার ইন্দ্রিয়াদি ইহা হইতে উৎক্রান্ত হয় কিংবা হয় না"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হয় না। তাহারা তাঁহাতেই বিলীন হয়"— ইত্যাদি (বৃঃ ৩.২.১১)। সুতরাং মাধ্যন্দিন শাখার শ্রুতিপাঠ হইতেও আমরা 'ইহা হইতে'— এই বাক্যাংশকে দেহের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ইহাও সত্য নহে যে, যদি প্রাণ উৎক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু হইবে না— কারণ, ইহারা দেহে অবস্থান করে না, কিন্তু দেহের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখনই জীবন অসম্ভব হইয়া যায়— এবং এই অবস্থাকেই আমরা সাধারণ লৌকিক ভাষায় বলিয়া থাকি যে, 'লোকটির মৃত্যু হইল'। অধিকন্তু, যদি জীবের সহিত প্রাণ দেহ হইতে চলিয়াই যাইত, তাহা হইলে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ জীবের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত— এবং ইহার ফলে কখনও মোক্ষলাভ হইত না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না।

স্মর্যতে চ ॥৪।২।১৪॥

স্মর্যতে (স্মৃতি শাস্ত্রও [এইরূপ বলেন] চ (এবং)।

১৪. এবং স্মৃতিও এইরূপই বলেন।

[১৪. ব্রহ্মজ্ঞের নিষ্ক্রমণের নিষেধ স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে।]

"যাঁহার কোন পন্থা নাই, তাঁহার পন্থা আবিষ্কার করার জন্য দেবগণও স্বয়ং বিভ্রান্ত হন, (মহাঃ ১২.২৭০.২২)— এখানে ব্রহ্মজ্ঞের নিষ্ক্রমণকে এইরূপভাবে প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

অধিকরণ ৭: মৃত্যুকালে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞের ইন্দ্রিয়সমূহ ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

তানি পরে, তথাহ্যাহ ॥৪।২।১৫॥

তানি (সেই প্রাণসকল) পরে (পরব্রহ্মে) তথা (সেইরূপভাবে) হি (যেহেতু) আহ (শাস্ত্র বলেন)।

১৫. ঐসকল (প্রাণ) পরব্রহ্মে (লয়প্রাপ্ত হয়) কারণ (শ্রুতিতে) এইরূপ উক্তি আছে।

[১৫. ঐ-সকল ইন্দ্রিয় এবং ভূতসমূহ মৃত্যুকালে পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রেও এইরূপ উক্তি আছে।]

মুমূর্ষু ব্রহ্মজ্ঞের ক্ষেত্রে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের এবং স্থূল ভূতসমূহের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত প্রাণের কি গতি হয় তাহাই এই সূত্রে আলোচিত হইতেছে। তাঁহার এই সকল ইন্দ্রিয় এবং ভূতসমূহ পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। "পরিদ্রষ্টা পুরুষের ষোড়শ কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয় এবং উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়" (প্রঃ ৬.৫)। "প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা স্ব স্ব কারণে গমন করে" (মুঃ৩.২.৭)। এই শ্রুতিটি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে একটি উপসংহার দান করে। ইহার মতে শরীর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কারণ-রূপে পঞ্চভূতে ফিরিয়া যায়। পূর্ববর্তী শ্রুতিটি একটি আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকোণ হইতে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাগতিক সমগ্র বস্তুনিচয়ই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়, যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ভ্রান্ত সর্প রজ্জুতে বিলীন হয়।

অধিকরণ ৮ : নির্গুণ ব্রহ্মবিদের কলাসমূহ মৃত্যুকালে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়।

অবিভাগঃ, বচনাৎ ।।৪।২।১৬।।

অবিভাগঃ (অভেদত্ব) বচনাৎ (যেহেতু শ্রুতিবচন এইরূপ আছে)।

১৬. কলাগুলি ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় এইরূপ শ্রুতি আছে।

[১৬. শ্রুতিবচন হইতে জানা যায় যে, কলাগুলি ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যায়।]

"তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তখন তিনি পুরুষ এই নামেই অভিহিত হন। এইরূপ বিদ্বান্ কলাতীত ও অমর হন"— (প্রঃ ৬.৫)। কলাসমূহ পরব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্মবিদের ক্ষেত্রে এই বিলীনভাব আত্যন্তিক— কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এইরূপ নহে। সেই ক্ষেত্রে কলাগুলি সূক্ষ্ম বীজাকারে অবস্থান করে এবং ইহাই হয় তাহার ভবিষ্যৎ জন্মের কারণ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের ক্ষেত্রে যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া দেয়—এবং যেহেতু অজ্ঞানেরই ফল কলাসমূহ সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য পুনর্জন্মের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

অধিকরণ ৯ : সগুণ ব্রহ্মবিদের আত্মা মৃত্যুকালে হৃদয়ে আসে এবং সেখান হইতে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া উৎক্রান্ত হয়।

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ, হার্দানুগৃহীতাঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৭॥

তৎ-ওকঃ-অগ্রজ্বলনং ([আত্মার] আবাসস্থল [সেই হৃদয়ের] ঊর্ধ্বভাগের প্রজ্বলিত অবস্থা) তৎ-প্রকাশিত-দ্বারঃ (এই আলোকের দীপ্তির দ্বারা দীপ্যমান সেই পথের সহিত) বিদ্যাসামর্থ্যাৎ (বিদ্যার সামর্থ্যহেতু) তৎ-শেষ-গতি-অনুস্মৃতি-যোগাৎ (বিদ্যার অংশীভূত সেই পথের অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারণার যথাযথ অনুষ্ঠান হেতু) চ (এবং) হার্দানুগৃহীতাঃ (হৃদয়বাসী [সেই পুরুষের] অনুগ্রহহেতু) শতাধিকয়া (যিনি শতের পারে তাঁহার দ্বারা)।

১৭. (যখন সগুণ ব্রহ্মবেত্তার আত্মা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত, সেই সময়) আত্মার আবাসস্থল হৃদয়ের ঊর্ধ্বভাগ দীপ্যমান হয়; এই আলোক দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মার গমন পথ দিয়া আত্মা বাহির হইয়া যান, তাঁহার গমনের সহায়ক হন সেই হৃদয়বাসী পুরুষ— এবং আত্মা ১০০ নাড়ীর পরে যে সুষুম্না নাড়ী তাহার মধ্য দিয়া নির্গত হন। বিদ্যার সামর্থ্যহেতু এবং বিদ্যার অংশীভূত সেই পথের যথাযথ অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারণার ফলেই এইভাবে সুষুম্নাপথে ব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি হয়)।

[১৭. হৃদয়ে শতাধিক নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে সুষুম্নার গতি ঊর্ধ্ব দিকে। হৃদয়ে পরম পুরুষও অবস্থান করেন। সাধকের নিরন্তর ধ্যান ধারণার ফলে তাঁহার হৃদয়ের ঊর্ধ্বভাগ প্রদীপ্ত হইয়া সদা দীপ্যমান থাকে। অন্তরস্থিত সেই পরমপুরুষের সহায়তায় সগুণ ব্রহ্মবেত্তা সেই সুষুম্না পথে মৃত্যু কালে নির্গত হইয়া যান।]

এই সূত্রটিতে সগুণ ব্রহ্মবেত্তার দেহ হইতে নির্গমনের ব্যাপারটি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই ৭ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মার নাড়ীমুখ প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্মবেত্তার এবং একজন সাধারণ অজ্ঞ মানুষের একই প্রকার গতি হইয়া থাকে। মানুষের মৃত্যু প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক শ্রুতি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন— "সেই আত্মা যখন দুর্বল হন এবং যেন সংজ্ঞাহীন হন, তখন ইন্দ্রিয়বর্গ ইঁহার নিকটে আসেন... ইনি হৃদয়াকাশেই আসেন" (বৃঃ ৪.৪.১); পুনশ্চ— "উক্ত হৃদয়ের নিষ্ক্রমণদ্বার

তখন সমুজ্জ্বল হয়। চক্ষু, ব্রহ্মরন্ধ্র, বা অপর দেহাবয়বের ভিতর দিয়া এই জীবাত্মা ঐ জ্যোতি অবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন" (তদেব, ৪.৪.২)। এই সকল শ্রুতি হইতেই জানা যায় যে, মৃত্যুকালে আত্মা তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ হৃদয়ের নিকটবর্তী হয়। আত্মার উৎক্রমণের মুহূর্তে, পূর্বকৃত কর্মানুযায়ী ইহার পরবর্তী জন্মগ্রহণ বিষয়ে একটি চেতনা বর্তমান থাকে— এবং সেই চেতনার দ্বারা অভিব্যক্ত পরবর্তী দেহে ইহা প্রবেশ করে। হৃদয়ের ঊর্ধ্বভাগ আলোকিত হয় বলিতে এই ব্যাপারটিকেই বুঝানো হইয়াছে। এই বিশেষ চেতনাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা হৃদয় হইতে নির্গত অসংখ্য নাড়ীর যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া চক্ষু, কর্ণ, ব্রহ্মরন্ধ্র অথবা দেহের অন্য কোন অংশে উপনীত হয় এবং পরিশেষে বিশেষ কোন পথ দিয়া চিরতরে উৎক্রান্ত হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইল, এই নির্গমন কি একজন সগুণব্রহ্মবিদ্ এবং একজন সাধারণ মানুষে উভয়ের ক্ষেত্রেই একরূপ না ভিন্ন? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, যদিও হৃদয়ের ঊর্ধ্বভাগের প্রজ্বলন ব্যাপারটি উভয়ক্ষেত্রেই অভিন্ন তথাপি হৃদয় গুহাবাসী পরম পুরুষের কৃপায় সগুণ ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়াই কেবল নিষ্ক্রান্ত হন— অপরপক্ষে অন্যেরা নির্গত হয় দেহের অন্যান্য অংশ দিয়া। ইহা সগুণ ব্রহ্মবিদের জ্ঞান এবং একশত একতম সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া নিষ্ক্রমণ পথের নিরন্তর ধ্যান ধারণার জন্যই সম্ভব। এই শ্রুতিটি-ই ইহার ব্যাখ্যা— হৃদয়ের একশত একটি (প্রধান) নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। (বিদ্বান্) তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করেন। তির্যকগামী অপর নাড়ীগুলি (কেবল) 'দেহত্যাগেরই দ্বার'— (ছাঃ ৮.৬.৬)।

অধিকরণ ১০ : সগুণ ব্রহ্মবিদের আত্মা মৃত্যুর পর সূর্যরশ্মিকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।

রশ্ম্যনুসারী ॥৪।২।১৮॥

রশ্মি-অনুসারী (রশ্মিকে অনুসরণ করিয়া)।

১৮. (মৃত্যু সময়ে সগুণ ব্রহ্মবিদের আত্মা) (সূর্য) রশ্মিকে অনুসরণ করে।

[১৮. ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ মস্তিষ্কের নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্যরশ্মি অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।]

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাই, "...ঠিক তেমনি এই সূর্যকিরণরশ্মি এই দেহে এবং ঐ আদিত্যমণ্ডলে উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ সূর্যমণ্ডল হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া উহারা নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়" [এবং এই নাড়ীসকল হইতে বিস্তৃত

হইয়া ঐ সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়]। (৮.৬.২) ; পুনশ্চ, "যখন তিনি এই শরীর হইতে নির্গত হন, তখন তিনি এই সকল রশ্মি অবলম্বনে উর্ধ্বে উৎক্রান্ত হন"— ইত্যাদি (৮.৬.৫)। এই শ্রুতিগুলি হইতেই আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, সগুণব্রহ্মবিদ্ এই দেহ হইতে সুষুম্নাপথে নির্গত হইয়া সূর্যরশ্মিকে অনুসরণ করেন। এখানে একটি সন্দেহ জাগে, রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলেও কি আত্মা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করেন? এই সূত্রটি বলে যে, রাত্রে বা দিনে যখনই হউক মৃত্যুর পর আত্মা রশ্মির অনুসরণ করে।

নিশি ন ইতি চেৎ, ন, সংবন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥৪।২।১৯॥

নিশি (রাত্রিকালে) ন (নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) সম্বন্ধস্য যাবৎ-দেহ-ভাবিত্বাৎ (কারণ দেহ থাকা পর্যন্ত এই সম্বন্ধ থাকিবেই) দর্শয়তি (শ্রুতি এইরূপ বলেন) চ (এবং)।

১৯. যদি এইরূপ বলা হয় যে, রাত্রিকালে (আত্মা) (রশ্মির অনুসরণ) করে না, (তাহার উত্তরে আমরা বলিব) না, তাহা নহে, কারণ (রশ্মির সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ) যতদিন পর্যন্ত দেহ থাকে, ততদিন পর্যন্তই থাকে; (শ্রুতিও) এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

[১৯. রাত্রিতে সূর্যরশ্মি না থাকায় তৎকালে মৃত বিদ্বান্ পুরুষের রশ্মি অনুসরণ হয় না— এইরূপ বলা যায় না; কারণ দেহধারণ কাল হইতেই নাড়ীর সহিত রশ্মির সংযোগ থাকে বলিয়া শ্রুতিপ্রমাণ আছে।]

পূর্ব সূত্রের উল্লিখিত ৮.৬.২ সংখ্যক ছান্দোগ্য শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহটি বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই রশ্মি এবং নাড়ীসমূহের সম্বন্ধটিও বর্তমান থাকে। সুতরাং আত্মা দিন অথবা রাত্রি যখনই নির্গত হোক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। অধিকন্তু, রাত্রিতে সূর্যরশ্মির সংখ্যাল্পতাবশত ইহার অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে না পারিলেও সূর্যরশ্মি রাত্রিতেও বর্তমান থাকে। শ্রুতিতেও এইরূপ উল্লেখ আছে, "রাত্রিকালেও সূর্য তাহার রশ্মি বিকিরণ করে।" বিদ্যার ফলকে দিবা বা রাত্রির মৃত্যুর আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল বলিয়া গণ্য করা যায় না।

অধিকরণ ১১ : সূর্যের দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও সগুণব্রহ্মজ্ঞের আত্মা ব্রহ্মলোকেই গমন করিয়া থাকে।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥৪।২।২০॥

অতঃ (সেই একই কারণে) চ (এবং) অয়নে (সূর্যের অয়ন বা পরিক্রমায়) অপি (ও) দক্ষিণে (দক্ষিণায়নে)।

২০. এবং একই কারণে (আত্মা রশ্মির অনুসরণ করে) সূর্যের দক্ষিণায়ন কালেও।

[২০. দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মলোকেই গমন করিয়া থাকে।]

বিপক্ষগণ এখানে একটি আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে সূর্যের দক্ষিণায়নে মৃত ব্রহ্মজ্ঞের আত্মা সূর্যরশ্মিকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে না, কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন যে, যিনি শুধুমাত্র সূর্যের উত্তরায়ণকালেই মৃত হন, তাঁহারই আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করে। অধিকন্তু ইহাও লিখিত আছে যে, ভীষ্ম দেহত্যাগের জন্য সূর্যের উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, একই কারণে, যাহা পূর্ববর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে— অর্থাৎ জ্ঞানের ফলকে বিশেষ কোন সময়ে মৃত্যুর উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে করার অযৌক্তিকতা হেতু—সগুণ ব্রহ্মবিদ্ সূর্যের দক্ষিণায়নে ব্রহ্মলোকেই গমন করিয়া থাকেন। "যাঁহারা এইরূপ জানেন ...তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন" (ছাঃ ৫.১০.১)— এই শ্রুতিটিতে উত্তরায়ণের ব্যাপারটি কোন সময়বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে উক্ত নহে— ইহা বিশেষ কোন দেবতার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা আমরা ৪.৩.৪ সূত্রে দেখিতে পাইব। ভীষ্মের উত্তরায়ণের অপেক্ষা অনেকটা প্রচলিত লোকপ্রথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এবং তিনি যে পিতৃদত্ত বরের জন্য ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতে পারে।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্তে চৈতে ॥৪।২।২১॥

যোগিনঃ প্রতি (যোগিগণের বিষয়ে) চ (এবং) স্মর্যতে (স্মৃতিতে বলা আছে) স্মার্তে (কোন স্মৃতির শাখায়) চ (এবং) এতে (এই দুইটি)।

২১. এবং (এই সময়সমূহ) যোগীদের সম্পর্কেই স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এবং এই দুইটিকে (যোগ এবং সাংখ্য যাহাদের মতে ইঁহারা সাধনা করেন) স্মৃতি শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় (শ্রুতিরূপে নহে।)

[২১. এই সময়বিষয়ে যোগিদের ক্ষেত্রেই স্মৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং এই দুইটিকে (যোগ এবং সাংখ্যকে— যাহার নির্দেশমত যোগিগণ সাধনা করেন) স্মৃতি শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় (শ্রুতি শ্রেণীতে নহে)।]

গীতাতে আমরা এইরূপ কতকগুলি শ্লোক পাই যাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি দিবাভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা আর এই মর জগতে প্রত্যাবর্তন করেন না, (গীতা ৮.২৩,২৪ দ্রষ্টব্য)। এই উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করিয়া বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, পূর্বসূত্রের সিদ্ধান্তটি শুদ্ধ হইতে পারে না। এই সূত্রটি এই আপত্তির খণ্ডন প্রসঙ্গেই বলিতেছে যে, গীতায় সময় সম্পর্কে এই জাতীয় বিশেষ বিধান শুধুমাত্র সেই সকল যোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁহারা যোগ এবং সাংখ্য মতানুসারে উপাসনা করিয়া থাকেন; এবং এই দুইটি হইল স্মৃতি—শ্রুতি নহে। সুতরাং গীতায় উক্ত এই সময়াদি বিষয়ের বিধিনিষেধ যাঁহারা শ্রুতি অনুসারে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

ব্রহ্ম-সূত্র

চতুর্থ অধ্যায় । তৃতীয় পাদ

পূর্ববর্তী পাদে সগুণ ব্রহ্মবিদের আত্মা দেববানের মাধ্যমে কিভাবে গমন করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই পাদে এই পন্থা বা 'যান'সমূহ বিষয়েরই আলোচনা করা হইতেছে।

অধিকরণ ১ : অর্চিরাদি দেবযানই হইল ব্রহ্মলোক যাত্রার পথ।

অর্চিরাদিনা, তৎপ্রথিতেঃ ॥৪।৩।১॥

অর্চিঃ-আদিনা (অর্চিরাদি দেবযানমার্গে) তৎ-প্রথিতেঃ (তাহাই প্রসিদ্ধ শ্রুতি অনুসারে)।

১. অর্চিরাদি দেবযানমার্গে (মৃত্যুর পর সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের আত্মা ব্রহ্মলোকে গমন করে)— ইহা (শ্রুতি হইতে) ভালভাবেই জানা যায়।

[১. বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ আছে।

পূর্ববর্তী পাদে বলা হইয়াছে যে, সগুণ ব্রহ্মবেত্তা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই পথটি সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন মত ব্যক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির মতে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্ত আত্মা সর্বপ্রথম অর্চিনামক দেবতাকে প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ৫.১০.১ এবং বৃঃ ৬.২.১৫ দ্রষ্টব্য।) বৃহদারণ্যক অন্য একটি বিদ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, সর্বপ্রথম ইহা বায়ুকে প্রাপ্ত হয়— বৃঃ ৫.১০.১ দ্রষ্টব্য। কৌষীতকীর মতে ইহা সর্বপ্রথম অগ্নিলোকে গমন করে— কৌঃ ১.৩ দ্রষ্টব্য। মুণ্ডক উপনিষদের মতে ইহা আদিত্যমার্গে গমন করে— মুঃ ১.২.১১ দ্রষ্টব্য। এখন প্রশ্ন হইল, এই সকল শ্রুতি কি বিভিন্ন পথের উল্লেখ করিয়াছেন, না একই দেবযানের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন? বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মলোকগমনের বিভিন্ন পথেরই বর্ণনা দিয়াছেন। এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডন করিতেছে এবং বলিতেছে যে, এই শ্রুতিসমূহ একই পথের উল্লেখ করিয়াছে এবং অর্চিরধিষ্ঠিত একই দেবযানপন্থার বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খের বর্ণনা দিয়াছে। এইরূপ বলিবার যুক্তি কি? কারণ, সমগ্র শ্রুতি

হইতেই ইহা সুবিদিত যে, ইহাই সকল ব্রহ্মজ্ঞের যাত্রা পথ। "যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যে পরিব্রাজকগণ ও বানপ্রস্থিগণ অরণ্যে (থাকিয়া) শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির সেবা করেন, তাঁহারা অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন"— ইত্যাদি (ছাঃ ৫.১০.১)— শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যে কোন বিদ্যার মাধ্যমেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হউক না কেন, ইহা সকল ব্রহ্মজ্ঞকেই অর্চিরাদি দেবতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। অধিকন্তু, সর্বক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক— ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। সুতরাং পন্থাকে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য করার কোন কারণ নাই— যদিও ইহাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেহেতু পথের কিছুটা অংশ সকল শ্রুতিতেই স্বীকৃত, সেইজন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ততেই উপনীত হইতে হয় যে, পথটি একই—যদিও বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় বিভিন্ন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি, পন্থাটির সামগ্রিক ধারণার জন্য সবগুলি বর্ণনাকেই সংবদ্ধ করিতে হইবে।

অধিকরণ ২ : উৎক্রান্ত আত্মা সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্তির পর বায়ু দেবতাকে প্রাপ্ত হন।

বায়ুমব্দাৎ, অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২॥

বায়ুম্ (বায়ুদেবতাকে) অব্দাৎ (সাংবাৎসরিক দেবতা হইতে) অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ (বিশেষ এবং সামান্য উপদেশের উল্লেখ এবং অনুল্লেখহেতু)।

২. (সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্ত আত্মা) সাংবাৎসরিক দেবতা হইতে বায়ুদেবতার নিকট গমন করে—বিশেষ উল্লেখের বর্তমানতা এবং অবর্তমানতা হেতু (ইহা বুঝিতে পারা যায়)।

[২. সগুণ ব্রহ্মবিদের দেহ নির্গত আত্মা প্রথমে বৎসরাভিমানী দেবতার নিকট যায় এবং সেখান হইতে বায়ুদেবতার নিকট যায়—বিশেষ উল্লেখের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি হেতু এইরূপই বুঝিতে হইবে, (কারণ নানা শ্রুতিতে নানাভাবে ইহা বর্ণিত আছে)।]

পূর্ববর্তী সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শ্রুতি আত্মার সঞ্চরণের একই মার্গের বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। এই সূত্রটি অতিক্রমণের স্তরগুলির একটি পারম্পর্য নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। কৌষীতকী উপনিষদে পথটির বর্ণনা এইরূপ দেওয়া আছে: "এই উপাসক দেবযান প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন এবং পরে পরে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র এবং প্রজাপতিলোক হইয়া শেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন" (কৌঃ ১.৩)। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পথটিকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "তাঁহারা অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ,

শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তরদিকে গমন করেন, ঐ মাসসমূহ হইতে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইতে) সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে (প্রাপ্ত হন।) (ছাঃ ৫.১০.১)।

এই দুইটি শ্রুতিতে প্রথম যে দেবতাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া বলা হইয়াছে, তিনি হইলেন অগ্নিদেবতা। সুতরাং আত্মার যাত্রার প্রথম স্থানটি দুইটি শ্রুতি হইতেই স্পষ্টতই পাওয়া গেল; কারণ উভয় শ্রুতিই বলেন যে, দেবযানে প্রবিষ্ট হইয়া উৎক্রান্ত আত্মা এই (অগ্নি) দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। এই উভয় শ্রুতিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে বায়ু দেবতাকে, বর্ষদেবতা এবং সূর্যদেবতার মধ্যস্থলেই স্থাপন করিতে হইবে। কেন?— কারণ নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখের এখানে কোন উপস্থিতিও নাই অবর্তমানতাও নাই। "(বিদ্বান) পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহার জন্য.....ছিদ্র নির্মাণ করেন,.....সেই ছিদ্রপথে উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন" (বৃহঃ ৫.১০.১)। এই শ্রুতিটি ইহা নির্দিষ্ট করল যে, বায়ু সূর্বের অব্যবহিত পূর্বেই আসেন, কারণ এখান হইতেই আমরা একটা নির্ধারিত পৌর্বাপর্ব লক্ষ্য করি। কিন্তু অগ্নিদেবতার পরবর্তী কালে বায়ুর আসার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ নাই, শুধুমাত্র সাধারণ একটি উক্তি আছে: "তিনি অগ্নিলোক হইতে বায়ুলোকে আসেন।" এই দুই স্তরের মধ্যবর্তীস্থলে আরও বহু স্তর আছে যাহা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। পুনরায় এই শ্রুতিতে আছে: "উত্তরায়ণ দেবতা হইতে তিনি দেবলোক-দেবতাকে প্রাপ্ত হন" (বৃঃ ৬.২.১৫)। বায়ুদেবতা এবং সূর্যদেবতার অব্যবহিত পৌর্বাপর্বক্রম রক্ষার জন্য আমাদিগকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আত্মাটি দেবলোকদেবতা হইতে বায়ুদেবতাতে গমন করেন। পুনশ্চ, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির মধ্যে দেবলোকদেবতার কোন উল্লেখ পূর্বটিতে নাই, পরবর্তী শ্রুতিটিতে সংবর্ষাভিমানী দেবতারও কোন উল্লেখ নাই। পথের সামগ্রিক বর্ণনার জন্য এই উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; এবং যেহেতু বৎসর মাসের সহিত সংবদ্ধ সেইহেতু সংবৎসরাভিমানী দেবতা দেবলোক দেবতার পূর্ববর্তী হইবেন।

অধিকরণ ৩: বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইবার পর আত্মা বরুণলোক প্রাপ্ত হয়।

তড়িতোঽধি বরুণঃ, সংবন্ধাৎ ॥৪।৩।৩॥

তড়িতোঽধি (বিদ্যুদভিমানী দেবতার পরে) বরুণঃ (বরুণ বৃষ্টি দেবতা আসেন) সংবন্ধাৎ (সম্বন্ধহেতু)।

৩. বিদ্যুৎদেবতাকে প্রাপ্ত হইবার পরে (আত্মা) বরুণদেবতাকে (প্রাপ্ত হন), যেহেতু এই দুইজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান।

[৩. বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, আত্মা বিদ্যুৎলোকের পরেই বরুণলোকে যান।]

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে— "সূর্য হইতে চন্দ্রে এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ-লোকে"। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে— "বায়ুদেবতা হইতে বরুণদেবতাতে"। এই দুই শ্রুতিকে সংযুক্ত করিয়া আমাদের বরুণকে বিদ্যুতের পরেই স্থাপন করিতে হয়— কারণ ইহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

বরুণ হইলেন বৃষ্টির দেবতা এবং বিদ্যুৎ বর্ষণের পূর্বেই আসেন। সেইজন্যই বিদ্যুতের পর বরুণের আগমন। এবং বরুণের পর আসেন ইন্দ্র এবং প্রজাপতি— কারণ তাঁহাদের জন্য আর অন্য কোন স্থান নাই। এবং কৌষীতকী উপনিষদ্‌ও তাঁহাদের স্থান সেখানেই নির্ধারিত করিয়াছেন।

সুতরাং দেবযানের অবস্থানগুলির সম্পর্কে গণনা হইল এইরূপ: প্রথমে হইলেন অগ্নি-দেবতা, তারপর অহঃদেবতা, তারপর শুক্লপক্ষদেবতা, তারপর ষান্মাসিক উত্তরায়ণ-দেবতা, সাংবাৎসরিকদেবতা, দেবলোকদেবতা, বায়ুদেবতা, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা, বিদ্যুৎদেবতা, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং সর্বশেষে ব্রহ্মলোক।

অধিকরণ ৪ : দেবযান বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রুতি যে 'অর্চিঃ' ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার দ্বারা সেই সেই অভিমানী দেবতাকে বুঝিতে হইবে— এই সকল দেবতাই স্তরে স্তরে আত্মাকে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

আতিবাহিকাঃ, তল্লিঙ্গাৎ ॥৪।৩।৪॥

আতিবাহিকাঃ (ইঁহারা হইলেন আত্মার পরিচালক দেবতা) তৎ-লিঙ্গাৎ (যেহেতু তাঁহাদের দ্যোতক লিঙ্গ বা চিহ্ন আছে)।

৪. ইঁহারা হইলেন আত্মাকে দেবযানের পথে পরিচালনা করার দেবতাবিশেষ, কারণ, ইঁহাদের এইরূপ বুঝাইবার লক্ষণ বা চিহ্ন আছে।

[৪. অর্চিরাদিরা হইলেন তৎ তৎ অভিমানী দেবতা। ব্রহ্মলোকে গমনকারী আত্মার ইঁহারা নিয়ন্তা—এক লোক হইতে অপর লোকে পরিচালনা করিয়া শেষ পর্যন্ত ইঁহারা আত্মাকে ব্রহ্মলোকে পৌঁছাইয়া দেন।]

পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে অর্চিঃ, শুক্লপক্ষ, সংবৎসর ইত্যাদির যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন তৎ তৎ অভিমানী দেবতা, ইঁহারা উৎক্রান্ত আত্মাকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকের পথে পরিচালনা করিয়া লইয়া যান। এখানে যে দেবতাকেই বুঝাইয়াছে, লিঙ্গ বা ভোগায়তনকে নহে, তাহা এই ছান্দোগ্য শ্রুতিটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, শ্রুতিটি এইভাবে সমাপ্ত হইয়াছে: "এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্মলোক হইতে) কোন অ-মানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলাভ করান।" (ছাঃ ৪.১৫.৫,৫.১০.১) এই শ্রুতিটি ইহা প্রমাণ করিল যে, পূর্ববর্তী বাহকেরা অনেকটা মানবরূপীই ছিলেন— কিন্তু এই বিশেষ বাহকটি মানব প্রকৃতির নহেন।

উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ ॥৪।৩।৫॥

উভয়-ব্যামোহাৎ (উভয়ের মোহগ্রস্ত অবস্থা হেতু) তৎ-সিদ্ধেঃ (তাহা সিদ্ধ হয়)।

৫. (ঐ শ্রুতিসমূহে যে দেবতাদেরই লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা নির্ণীত হইয়াছে, কারণ উভয়েই [যাত্রী আত্মা এবং পথ] হইলেন সংজ্ঞারহিত (অচেতন)।

[৫. এই সকল শ্রুতিতে অর্চিরাদি যে সকল অভিমানী দেবতার কথা বলা হইয়াছে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ। কারণ, দেহরহিত আত্মা এবং অর্চিরাদি মার্গ— উভয়েই ক্রিয়া ও সংজ্ঞারহিত। দেবযানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মলোকে পরিচালনার জন্য ঐ সকল অভিমানীদেবতার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।]

উৎক্রান্ত আত্মার ইন্দ্রিয়াদি মনে লীন হইয়া যাইবার জন্য আত্মা স্বয়ং অর্চিরাদি মার্গে গমন করিতে পারে না। এবং অর্চিঃ প্রভৃতিও চেতনারহিত হওয়ায় আত্মাকে পরিচালিত করিতে পারে না। সুতরাং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, চৈতন্যসম্পন্ন অর্চিরাদির অভিমানী দেবতাই আত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। অধিকন্তু যেহেতু উৎক্রান্ত আত্মার ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লীন হইয়া থাকে, সেইজন্য তাহারা কোন কিছু ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং অর্চিরাদির জগৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগায়তনও নহে।

বৈদ্যুতেনৈব ততঃ, তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৩।৬॥

বৈদ্যুতেন (বিদ্যুতের সহিত সংশ্লিষ্ট [অতিমানব] নিয়ন্তার দ্বারা) এব (একমাত্র) ততঃ (সেইস্থান হইতে) তৎ-শ্রুতেঃ (তাহা শ্রুতিতে বর্ণনা থাকা হেতু)।

৬. সেই স্থান হইতে, বিদ্যুতে আগত কোন (অতিমানব) পুরুষ কর্তৃক আত্মা-সমূহ (ব্রহ্মলোকে) নীত হন, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়।

[৬. বিদ্যুতের উপরে আগত অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মবিদ্‌গণের আত্মাসমূহ ব্রহ্মলোকে নীত হন— ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়।]

তাঁহারা (ব্রহ্মবিদের আত্মাসমূহ) বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে পর, কোন অতি-মানব পুরুষ সেখানে আসিয়া বিদ্যুদভিমানী দেবতার নিকট হইতে তাঁহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বরুণলোক, ইন্দ্রলোক এবং প্রজাপতিলোকের মধ্য দিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন। ইহা ছাঃ ৪.১৫.৫, ৫.১০.১, এবং বৃহঃ ৬.২.১৫ সংখ্যক শ্রুতিসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ বাস্তবিকপক্ষে আত্মাসমূহকে পূর্ব পূর্ব দেবতার ন্যায় পরিচালনা করেন না, কারণ অমানব সেই পুরুষই বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বিস্তারিত পথে আত্মাসমূহকে পরিচালনা করিয়া লইয়া যান। এই সকল দেবতাগণ আত্মাকে কোনরূপ বাধাপ্রদান না করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিয়া আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সুতরাং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অর্চিরাদি দ্বারা দেবতাবিশেষকেই বুঝাইয়াছে।

অধিকরণ ৫ : দেবযানের মাধ্যমে উৎক্রান্ত আত্মা যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তিনি হইলেন সগুণ ব্রহ্ম।

কার্যং বাদরিঃ, অস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪।৩।৭॥

কার্যং (সগুণ [আপেক্ষিক ব্রহ্ম]) বাদরিঃ (বাদরি মনে করেন), অস্য (ইহার) গতি-উপপত্তেঃ (শেষ লক্ষ্যস্থল ইহা হইবার সম্ভাবনা হেতু)।

৭. (দেবযানের মাধ্যমে গমন করিয়া আত্মা) সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, বাদরি মুনি এইরূপই মনে করেন—কারণ বাদরি (সগুণ ব্রহ্মকেই) আত্মার সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল বলিয়া মনে করেন।

[৭. বাদরি মুনি মনে করেন যে, দেবযানের মধ্য দিয়া, নানা দেবতার সাহায্যে নীত হইয়া উৎক্রান্ত আত্মা যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনি সম্ভাব্য ধারণায় সগুণ ব্রহ্মই। কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম হইলে, তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন প্রসঙ্গই উঠে না।]

পূর্ববর্তী সূত্রে উৎক্রান্ত আত্মার গতিপথকে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন, এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সূত্রগুলিতে গতির লক্ষ্য বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা

হইবে। পথ সম্পর্কে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইল— "তৎপর অমানব কোন পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।" (ছাঃ ৫.১০.১) এখন প্রশ্ন হইল, এই ব্রহ্ম কি সগুণ ব্রহ্ম, না পর ব্রহ্ম? বাদরি বলেন যে, ইনি সগুণ ব্রহ্মই—কারণ এইরূপ গতি বা যাত্রা শুধুমাত্র সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবপর হইতে পারে—কারণ, সগুণ ব্রহ্ম হইলেন সসীম এবং সেইজন্যই তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন— যে স্থানে আত্মা গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ গতি বা প্রাপ্তি নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে— কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী।

বিশেষিতত্বাচ্চ ।।৪।৩।৮।।

বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষ গুণসমূহের উল্লেখ হেতু) চ (এবং)।

৮. এবং (অন্য শ্রুতিতে এই ব্রহ্ম সম্পর্কে) বিশেষ গুণের উল্লেখ-হেতু।

[৮. অন্য কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকের বিশেষ গুণ (বহু বচন) উল্লেখ থাকায়ও বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি সগুণ ব্রহ্মই।]

"এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকসমূহে লইয়া যান" (বৃহঃ ৬.২.১৫)। পরব্রহ্ম সম্পর্কে বহু বচন প্রযোজ্য নহে, সগুণ ব্রহ্ম সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য—কারণ, সগুণ ব্রহ্মই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থান করিতে পারেন।

সামীপ্যাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ ।।৪।৩।৯।।

সামীপ্যাৎ (সামীপ্যহেতু) তু (কিন্তু) তৎ-ব্যপদেশঃ (তাহার এইরূপ সংজ্ঞা বা নাম হইয়াছে)।

৯. কিন্তু সান্নিধ্যহেতু (সগুণ ব্রহ্মের পরব্রহ্ম সান্নিধ্যহেতু) ইহারও এইরূপ নাম (পরব্রহ্ম) হইয়াছে।

[৯. পরব্রহ্মের সান্নিধ্যহেতু সগুণ ব্রহ্মকেও পরব্রহ্ম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।]

এখানে 'তু' শব্দটি ছান্দোগ্য উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম প্রসঙ্গে 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ থাকায় যে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার খণ্ডন করিতেছে। এই সূত্র অনুসারে পরব্রহ্মের সান্নিধ্য হেতুই সগুণ ব্রহ্মেরও এই অভিধা হইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে।

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্, অভিধানাৎ ॥৪।৩।১০॥

কার্য-অত্যয়ে (ব্রহ্মলোক লীন হইবার পর) তৎ-অধ্যক্ষেণ সহ (সেইলোকের অধ্যক্ষের সহিত [পরব্রহ্মের সহিত]) অতঃ পরম্ (ইহা হইতে উচ্চতর) (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে উচ্চতর) অভিধানাৎ (শ্রুতির উল্লেখ হেতু)।

১০. ব্রহ্মলোক বিলীন হইবার পর, (আত্মাগুলি) সেইলোকের অধ্যক্ষের সহিত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের সহিত— ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পরব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হইয়া যান। কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে।

[১০. ব্রহ্মলোক বিলীন হইবার পর উৎক্রান্ত আত্মা—ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ সগুণ ব্রহ্মের সহিত পরব্রহ্মেই লীন হইয়া যান—কারণ শ্রুতিতে এইরূপই আছে যে, "তিনি আর প্রত্যাবৃত্ত হন না।" একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইলেই প্রত্যাবর্তন হয় না।]

যদি আত্মাগুলি দেবযানের মাধ্যমে সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এইরূপ শ্রুতি কিভাবে সম্ভব হয় যে, "তাঁহারা ইহলোকে আর প্রত্যাগমন করেন না" (বৃঃ ৬.২.১৫)? কারণ, পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুতেই স্থায়িত্ব নাই। এই বলিয়া এই সূত্রটি ইহার ব্যাখ্যা করিতেছে যে— ব্রহ্মলোকের বিলীন হওয়ার সময় আত্মাসমূহ ইতিমধ্যে জ্ঞানলাভ হেতু সগুণ ব্রহ্মের সহিত ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রুতির বক্তব্য।

স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১১॥

স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রের উল্লেখহেতু) চ (এবং)।

১১. এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও (এই যুক্তির সপক্ষে উক্তি আছে)।

[১১. স্মৃতিশাস্ত্রও ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরব্রহ্মেই লীন হইয়া— ব্রহ্মস্বরূপত্বলাভ করেন।]

পরং জৈমিনিঃ, মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১২॥

পরং (পরব্রহ্ম) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি বলেন) মুখ্যত্বাৎ (ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ— বলিয়া)।

১২. (দেবযানের মাধ্যমে গমন করিয়া জীবাত্মাগণ) পরব্রহ্মকেই (লাভ করেন), (ইহা) জৈমিনি মুনির মত—কারণ ইহাই 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ। (মুখ্যার্থ)

[১২. জৈমিনি মুনির মতে ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। কারণ, ইহাই 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ। সুতরাং আত্মা পরব্রহ্মেই লীন হন—অন্যত্র নহে।]

১২-১৪ সংখ্যক সূত্রগুলি এই বিষয়ের একটা আপাতগ্রাহ্য মতকেই প্রকাশ করিয়াছে।

জৈমিনি মনে করেন যে, 'ব্রহ্ম' শব্দটিকে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পরব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন—কারণ ইহাই শব্দটির মুখ্য অর্থ।

দর্শনাচ্চ ॥৪।৩।১৩॥

দর্শনাৎ (শ্রুতিশাস্ত্রের উল্লেখ হেতু) চ (এবং)।

১৩. এবং যেহেতু শ্রুতি ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন (যে আত্মা পরব্রহ্মেই লীন হন)।

[১৩. ব্রহ্মজ্ঞের আত্মা যে পরব্রহ্মে লীন হয় তাহা শ্রুতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।]

"ইহার দ্বারা তিনি ঊর্ধ্বলোকে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন" (ছাঃ ৮.৬.৬, কঠ ২.৩.১৬)। এই শ্রুতি অনুসারে আত্মা দেহ হইতে সুষুম্নানাড়ী পথে নির্গত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন—এবং এই অমৃতত্বলাভ একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইতে পারিলেই সম্ভব হয়।

ন চ কার্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥৪।৩।১৪॥

ন (নহে) চ (এবং) কার্যে (সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে) প্রতিপত্তি অভিসন্ধিঃ (ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা)।

১৪. এবং ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা—যাহা উপাসকগণ মৃত্যুকালে পোষণ করেন, তাহা সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে হইতে পারে না।

[১৪. মৃত্যুকালে উপাসকগণ যে ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা পোষণ করেন, তিনি কখনও সগুণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না— তিনি অবশ্যই পরব্রহ্ম।]

"আমি যেন প্রজাপতির সভায়, প্রজাপতির প্রাসাদে গমন করি" (ছাঃ ৮.১৪.১)। এই 'প্রাসাদ' গমনের অভীপ্সা সগুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে—পরব্রহ্ম বিষয়েই

উহা সঠিকভাবে সঙ্গত। কারণ এই উদ্ধৃত শ্রুতিটিরই পূর্বাংশে আছে— "উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম"—। এখানে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ৭-১১ সংখ্যক সূত্রগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সূত্র ১২-১৪ বিরুদ্ধবাদিগণের মতকে প্রকাশ করিয়াছে। ১২-১৪ সংখ্যক সূত্রগুলির আপত্তিগুলিকে এইভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে— দেবযানের মাধ্যমে গমনকারী সাধকগণ যে ব্রহ্মকে লাভ করেন তিনি পরব্রহ্ম হইতে পারেন না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মকে মাত্র লাভ করেন। পরব্রহ্ম হইলেন সর্বব্যাপী— সকলেরই অন্তরাত্মা। এইরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন— কারণ তিনি তো সকলেরই আত্মাস্বরূপ। কোন কিছুর উদ্দেশ্যে যাত্রা বা কোন কিছুকে প্রাপ্তি তখনই সম্ভবপর হয়, যেখানে ভেদ বর্তমান থাকে—যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিন্নরূপে বর্তমান থাকেন। পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করার অর্থ হইল, ইহার সম্পর্কে অজ্ঞতাকে দূর করা— ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ অনুভূতির মধ্যে গতি বা প্রাপ্তি বলিয়া কিছুই নাই। যখনই অজ্ঞান দূরীভূত তখনই ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশিত হইয়া উঠেন। কিন্তু শ্রুতিতে দেবযানের মাধ্যমে যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা শুধুমাত্র অজ্ঞানের দূরীকরণ নহে— কিন্তু ইহা বাস্তবিকই একটি প্রাপ্তির বিষয়। এইরূপ প্রাপ্তি পরব্রহ্ম বিষয়ে সম্ভব নহে। পুনশ্চ, "আমি যেন প্রজাপতির সভায় গমন করি"— ইত্যাদি শ্রুতিকে পূর্ববর্তী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সগুণ ব্রহ্মের সহিতও সংযুক্ত করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮.১৪.১ অংশে যে বলা হইয়াছে, "আমি ব্রাহ্মণগণের যশ, ক্ষত্রিয়ের যশ"— ইত্যাদি তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে উক্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ সগুণ ব্রহ্মকেও সকলের আত্মা বলা যাইতে পারে—যেমন আমরা ছাঃ ৩.১৪.২ শ্রুতিতে পাই—"যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম"— ইত্যাদি। পরাবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গের অধ্যায়ে ব্রহ্মলোকে যাত্রার যে উল্লেখ আছে তাহা হইল আপেক্ষিক জ্ঞানের অধীন— এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা করা। সুতরাং ৭-১১ সংখ্যক সূত্রগুলিতে বাদরি মুনির যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই যথার্থ।

অধিকরণ ৬ : যাঁহারা প্রতীক ব্যতীত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, শুধুমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ, উভয়থাঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥৪।৩।১৫॥

অপ্রতীক-আলম্বনাৎ (যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনায় ব্রহ্মের কোন প্রতীক ব্যবহার করেন না) নয়তি (অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে লইয়া যান) ইতি বাদরায়ণঃ

(ইহা বাদরায়ণের মত) উভয়থা (যদি এইরূপ ভেদজ্ঞান করা হয়) অদোযাৎ (তাহা হইলে কোন বিরোধিতা দোষ হয় না) তৎ-ক্রতুঃ (যেইরূপ উপাসনা করেন, [সাধক সেইরূপই হইয়া যান] চ (এবং)।

১৫. বাদরায়ণ বলেন যে, যাঁহারা তাঁহাদের উপাসনায় (ব্রহ্মের) কোন প্রতীকের ধ্যান করেন না, শুধুমাত্র তাঁহাদিগকেই (অ-মানব পুরুষ) (ব্রহ্মলোকে) লইয়া যান, যদি এই ভেদকে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও কোন বিরোধ হয় না, এবং "যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি"— এই নীতিকে ধরিয়া নিলেও ইহাই যথার্থ।

[১৫. ঋষি বাদরায়ণের মতে যাঁহারা উপাসনায় কোন প্রতীকের ধ্যান করেন না, শুধুমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মলোকে নীত হন। কারণ 'ব্রহ্ম' কোন প্রতীকে সীমাবদ্ধ নন। যাঁহার যেমন ধ্যান, তাঁহার সেইরূপই প্রাপ্তি হয়—এই নীতি অনুসারেও ইহা সত্য। এই ভেদকে স্বীকার করিলেও কোন বিরোধ হয় না— (পূর্বোক্ত ৩.৩.৩১ সূত্রের সিদ্ধান্ত)।]

এখন প্রশ্ন হইল, ছাঃ ৪.১৫.৫ শ্রুতিতে যে আছে, একজন অ-মানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান— এখানে কি সকল সগুণব্রহ্ম উপাসককেই লইয়া যান বলিয়া বুঝিতে হইবে? বিপক্ষবাদিগণ বলেন যে, হ্যাঁ সকলকেই লইয়া যান; পূর্বে উল্লিখিত ৩.৩.৩১ সূত্রে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা যেইরূপই হউক না কেন— সকল সাধকই ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, শুধুমাত্র সগুণব্রহ্মের উপাসকগণই, যাঁহারা ব্রহ্মের কোন প্রতীক ধ্যান করেন না— তাঁহারাই ব্রহ্মলোকে যান। অবশ্য ইহার দ্বারা ৩.৩.৩১ সূত্রের সিদ্ধান্তের কোন বিরোধিতা হয় না, যদি আমরা 'সকল' বলিতে সেই সকল উপাসকগণকেও অন্তর্ভুক্ত করি যাঁহারা উপাসনায় প্রতীকের সহায়তা গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু, শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়শাস্ত্রই এই মতের সমর্থন করেন—তাঁহাদের উক্তি হইল: "উপাসকগণ যেভাবে তাঁহার উপাসনা করিবেন, তাঁহারা সেইরূপই প্রাপ্ত হইবেন।" প্রতীকোপাসনায়— ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম নহেন, সেই ধ্যানে প্রতীকের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় অধিক, সেইজন্যই উপাসক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যাঁহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনা করেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রটি ভিন্ন— তাঁহাদের ক্ষেত্রে শাস্ত্রে স্পষ্ট উক্তিই আছে যে তাঁহারা ব্রহ্মলোকেই গমন করেন। যেখানে শাস্ত্রের এইরূপ স্পষ্ট কোন উক্তি নাই, সেখানে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, যাঁহাদের ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম, কেবলমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন—অন্যেরা নহে।

বিশেষং চ দর্শয়তি ॥৪।৩।১৬॥

বিশেষং (পার্থক্য) চ (এবং) দর্শয়তি (শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে)।

১৬. এবং শাস্ত্র (প্রতীকোপাসনার বিষয়ে) পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

[১৬. উপাসনার বিভিন্ন প্রতীকের ফল যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা শাস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।]

"যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছ গমন হইয়া থাকে"— (ছাঃ ৭.১.৫): "যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বাক্-এর গতি যতদূর, তাঁহার ততদূর যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে"— (ছাঃ ৭.২.২)। এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে শ্রুতি উপাসনার প্রতীকের বিভিন্নতাহেতু বিভিন্ন ফলের কথা বলিতেছেন। উপাসনার ফলের বিভিন্নতা তখনই সম্ভব হয়, যখন উপাসনার প্রতীক বিভিন্ন হয়, অপরপক্ষে, যদি উপাসকগণ এক এবং অভিন্ন ব্রহ্মের উপর ধ্যান করিতেন, তাহা হইলে ফলের এইরূপ বিভিন্নতা হইতে পারিত না। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, যাঁহারা উপাসনায় প্রতীককে ধ্যান করেন, তাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন না।

ব্রহ্ম-সূত্র

চতুর্থ অধ্যায় । চতুর্থ পাদ

পূর্ববর্তী পাদে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এইপাদে উপাসকগণের পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

অধিকরণ ১ : মুক্ত আত্মা নূতন কিছু লাভ করেন না, তিনি তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত করেন মাত্র।

সংপদ্যাবির্ভাবঃ, স্বেনশব্দাৎ ॥৪।৪।১॥

সংপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে) আবির্ভাবঃ (যথার্থ আত্ম-স্বরূপের আবির্ভাব হয়) স্বেন শব্দাৎ (স্ব,নিজ—এই শব্দ হইতে জানা যায়)।

১. (জীব যখন) (পরম জ্যোতি) ব্রহ্মকে লাভ করেন তখন তাহার (যথার্থ স্বরূপের) প্রকাশ হয়— আমরা শ্রুতির 'স্ব' শব্দের ব্যবহার হইতেই ইহা বুঝিতে পারি।

[১. মুক্ত জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রুতির 'স্ব' শব্দ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে জীব এবং ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন। সুতরাং মুক্তি বা ব্রহ্মলাভের অর্থ হইল স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।]

"আবার এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরম জ্যোতি-সম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন"— (ছাঃ ৮.৩.৪)। বিরুদ্ধপক্ষ এই শ্রুতিবচনটিকে এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করেন: জীবাত্মা স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিন প্রকার দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ করার পর ব্রহ্মেই মুক্তাবস্থায় অবস্থান করে। এই মুক্ত অবস্থাটি কিন্তু পূর্বে বর্তমান ছিল না—স্বর্গাদির ন্যায় ইহা একটি নূতন অর্জিত অবস্থা— শ্রুতির 'প্রাপ্ত হয়' এই শব্দটি হইতেই ইহা স্পষ্টত বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং মুক্তি হইল জীবাত্মার এমন একটি প্রাপ্তি যাহা পূর্বে ছিল না। এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছে যে, 'স্বীয়' শব্দটি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা একটি পূর্ব বিদ্যমান প্রাক্ সত্তার অবস্থাই। জীব তাহার

'স্বীয়' স্বভাবকে প্রকাশ করে—অর্থাৎ ইহাই তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা এতদিন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত ছিল মাত্র। ইহাই তাহার মুক্তিলাভ। ইহা অভিনব কিছুর প্রাপ্তি নহে।

মুক্তঃ, প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২॥

মুক্তঃ (মুক্ত) প্রতিজ্ঞানাৎ (শাস্ত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিজ্ঞা হিসাবে বর্ণিত বলিয়া)।

২. (শ্রুতির) সিদ্ধান্তের পূর্ব ঘোষণা (প্রতিজ্ঞা) হইতেই জানা যায় যে, আত্মা যখন নিজের যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হন তখনই মুক্ত হন।

[২. '(জীবাত্মা নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই) মুক্ত হন,' শ্রুতিতে ইহাকে প্রতিজ্ঞারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—এবং সর্বশ্রুতি শেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছে।]

মুক্তি যদি জীব দ্বারা অর্জিত নূতন কিছু নাই হয়, তাহা হইলে বদ্ধাবস্থা হইতে ইহার পার্থক্য কি? বদ্ধাবস্থায় জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধীন থাকিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র ও সসীম মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছিল। এই সকল ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হইবার পর জীব তাহার নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বীয় সত্তাকে অনুভব করে। এই সকল ভ্রান্ত ধারণার সামগ্রিক অপসারণই হইল মুক্তি পদবাচ্য। এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী পৃথক্ একটি জগৎ আছে। এই অবস্থায় যে জীব মুক্ত তাহা কিভাবে বুঝিতে পারা যায়? শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাবচন হইতে ইহা জানিতে পারা যায়, এই সূত্রটি ইহাই বলিয়াছে। "পূর্বোক্ত আত্মাকেই পুনর্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব"— (ছাঃ ৮.৯.৩, ৮.১০.৪, ৮.১১.৩)— এখানে শ্রুতি সকল অজ্ঞতা-অপূর্ণতা হইতে মুক্ত আত্মাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রস্তাব করিলেন, এবং এইভাবে এই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন "যিনি অশরীর তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না"— (ছাঃ ৮.১২.১) এবং এই ব্যাখ্যাকে শেষ করিলেন এই বলিয়া: "তেমনি এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়াও পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন"— (ছাঃ ৮.১২.৩)।

আত্মা, প্রকরণাৎ ॥৪।৪।৩॥

আত্মা (পরমাত্মা) প্রকরণাৎ (আলোচ্য প্রকরণ হইতে)।

৩. (জীবাত্মা যে 'পরম জ্যোতিকে' লাভ করে) তিনি পরমাত্মাই, কারণ ইহা প্রকরণ (আলোচ্য বিষয়বস্তু) হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

[৩. জীবাত্মা যে 'জ্যোতিকে' প্রাপ্ত হন, তিনি পরব্রহ্মই। শ্রুতিতে পরব্রহ্ম বুঝাইতে এইরূপ শব্দ বহুস্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং প্রকরণ হইতেও বুঝিতে পারা যায় এখানে পরব্রহ্মই উদ্দিষ্ট।]

ছান্দোগ্য ৮.৩.৪ শ্রুতিতে জীবাত্মা যে জ্যোতিকে প্রাপ্ত হন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই জ্যোতি পরমাত্মাই— অন্য কোন বস্তুগত জ্যোতি নহে— কারণ এই প্রকরণের উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু হইলেন পরমাত্মা, যাঁহাকে এইভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে: "যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর"— ইত্যাদি (ছাঃ ৮.৭.১)। আত্মাকে বুঝাইতে 'জ্যোতিঃ' শব্দটির ব্যবহার এইজাতীয় শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়: "সেই জ্যোতির্ময়দিগের অমর জ্যোতিকে দেবগণ আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন" (বৃহঃ ৪.৪.১৬)।

অধিকরণ ২: মুক্ত আত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ-সম্পর্ক।

অবিভাগেন, দৃষ্টত্বাৎ ।।৪।৪।৪।।

অবিভাগেন (অভিন্নরূপে) দৃষ্টত্বাৎ (শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া)।

৪. (মুক্ত অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত) অভিন্নভাবে বর্তমান থাকে, কারণ শাস্ত্রে এইরূপ বহু উক্তি দৃষ্ট হয়।

[৪. মুক্ত জীব ও পরব্রহ্ম এক এবং অভিন্নই। উহাদের মধ্যে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ শাস্ত্রে আছে— 'তুমিই সেই' (ব্রহ্ম), 'আমিই ব্রহ্ম'— ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান।]

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে: মুক্ত অবস্থায় জীব কি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, না, ব্রহ্মের সহিত এক এবং অবিভক্তভাবে অবস্থান করে? এই সূত্রটি বলে যে, জীব ব্রহ্মের সহিত মুক্ত অবস্থায় অবিভাজ্যরূপেই অবস্থান করে, শাস্ত্র এইরূপই বলেন। "তুমিই সেই (ব্রহ্ম)" (ছাঃ ৬.৮.৭); 'আমিই ব্রহ্ম' (বৃহঃ ১.৪.১০); "ব্রহ্ম বলিয়াই তিনি ব্রহ্মে লীন হন" (ছাঃ.....)— এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যে সকল শ্রুতিতে পার্থক্যের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়—সেই সকলকে গৌণ অর্থে একত্ববোধকরূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

অধিকরণ ৩: নির্গুণ ব্রহ্মত্বের লক্ষণ।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিঃ, উপন্যাসাদিভ্যঃ ।।৪।৪।৫।।

ব্রাহ্মেণ (ব্রহ্মের যে সকল গুণ আছে সেই সকল গুণান্বিত) জৈমিনিঃ (ইহা জৈমিনির মত) উপন্যাসাদিভ্যঃ (শাস্ত্রের প্রামাণ্য উক্তি হেতু)।

৫. (মুক্ত পুরুষগণ) ব্রহ্মগুণান্বিত হইয়া অবস্থান করেন; ইহা জৈমিনি মুনির মত। শাস্ত্রেও এইরূপ উল্লেখ আছে।

[৫. ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর ব্রহ্মস্থ পুরুষেরা ব্রহ্মের ন্যায়ই গুণাদিসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন। ইহা জৈমিনির মত এবং শাস্ত্রেও এই মতের সমর্থন আছে।]

মুক্তজীব ব্রহ্মলাভ করেন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা আছে, একটি হইল প্রজ্ঞাঘন শুদ্ধচৈতন্যরূপ অবস্থা, আর অপরটি হইল যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮.৭.১ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। "যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প"— ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হইল, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের কোন্ অবস্থাকে প্রাপ্ত হন? জৈমিনি বলেন, ব্রহ্মের সগুণ অবস্থা। কেন বলেন? কারণ ব্রহ্মের গুণাদির কথা শাস্ত্রের উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ইত্যাদি'-শব্দ দ্বারা বিধি এবং ব্যপদেশও অন্তর্ভুক্ত হয়। বিধিবিষয়ক যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইল— "তাঁহাকে জানিতে হইবে"— ইহাকেই ছান্দোগ্য পরবর্তী কালে বিধানরূপে নির্দেশ দিয়াছেন। আর ব্যপদেশ বা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ব্যাপারটি হইল, একই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বব্যাপিত্বের উল্লেখ—"তিনি সমস্তলোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন"। এই সকল কারণেই জৈমিনি মনে করেন যে, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের এই সগুণ সত্তাকেই প্রাপ্ত হন।

চিতিতন্মাত্রেণ, তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪।৪।৬॥

চিতি-তন্মাত্রেণ (শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে) তৎ-আত্মকত্বাৎ (তাহাই ইহার যথার্থ স্বরূপ বলিয়া) ইতি (এইরূপ) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি মুনি মনে করেন)।

৬. (মুক্ত পুরুষগণ) শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপেই অবস্থান করেন, যেহেতু ইহাই তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ— ইহা ঔড়ুলোমি মুনির মত।

[৬. ঔড়ুলোমি মুনি মনে করেন যে, ব্রহ্মবিদ্ বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপেই লীন থাকেন— ইহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ।

এই সূত্রটি মুক্ত পুরুষের অবস্থা বিষয়ে ঔড়ুলোমি মুনির আর একটি মতকে উপস্থাপিত করিতেছে। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ মাত্র হওয়ার জন্য— মুক্ত অবস্থায় ইঁহা এইরূপ ভাবেই অবস্থান করেন। নিষ্পাপত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি গুণসমূহ কল্পিতমাত্র— এবং ইহারা পাপাদির অভাব মাত্রকেই বুঝায়।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।।৪।৪।৭।।

এবম্ (এইরূপ) অপি (ও) উপন্যাসাৎ (উল্লেখ হেতু) পূর্বভাবাৎ (পূর্বগুণগুলির অবস্থান হেতু) অবিরোধং (কোন বিরোধ নাই) বাদরায়ণঃ (ইহা বাদরায়ণ মুনির মত)।

৭. যদি ইহা এইরূপও হয়, (অর্থাৎ যদি মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপেও অবস্থান করেন), তথাপি যেহেতু উল্লেখহেতু পূর্বগুণগুলির বর্তমানতা থাকে। (সেই হেতু আমরা ঐ সকল গুণগুলিকে আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি), কারণ— ইহাতে কোন বিরোধ হয় না (এই দুইয়ের মধ্যে)। বাদরায়ণ মুনির ইহাই মত।

[৭. যদিও মুক্তাত্মা বিজ্ঞানমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিজ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপ নিষ্পাপত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়াও শ্রুতি সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আত্যন্তিক দৃষ্টিতে তিনি গুণাদিরহিত হইলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে তাঁহার গুণকল্পনা অসঙ্গত নহে। বাদরায়ণ এই উভয় মতকেই (জৈমিনি এবং ঔডুলোমির) সমর্থন করিয়াছেন।]

যদিও আত্যন্তিক দৃষ্টিকোণ হইতে মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপই বটেন, তথাপি ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ হইতে জৈমিনি উল্লিখিত গুণাদিকে স্বীকার করা যায়— কারণ ইহাতে ঔডুলোমির মতের কোন বিরোধিতা হয় না। মুক্ত জীবাত্মা কখনও নিজেকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু বিশুদ্ধচৈতন্যরূপেই অবস্থান করেন। কিন্তু ব্যবহারিক দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এইরূপ মুক্ত আত্মা সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, কারণ বিশুদ্ধচৈতন্য আমাদের ধারণার অতীত। এই দুইটি মত দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মুক্ত আত্মার বর্ণনা করিয়াছে— সুতরাং মূলত ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাই বাদরায়ণের মত।

অধিকরণ ৪ : সগুণ ব্রহ্মবিদ্ সঙ্কল্পমাত্র ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন।

সংকল্পাদেব তু, তচ্ছ্রুতেঃ ।।৪।৪।৮।।

সংকল্পাৎ (ইচ্ছামাত্র) এব (মাত্র) তু (কিন্তু) তৎ-শ্রুতেঃ (তাহা শ্রুতিতে উল্লেখহেতু)।

৮. কিন্তু ইচ্ছামাত্রই (মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারেন)— কারণ এইরূপ উক্তি শ্রুতিতে আছে।

[৮. শ্রুতির বহু উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষগণ ইচ্ছামাত্র তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারেন।]

এই সূত্রটিতে যাঁহারা দহরাদি-বিদ্যা সাহায্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই বিদ্যায় বলা আছে— "যদি তিনি পিতৃলোক কামনা করেন, তাঁহার ইচ্ছামাত্র ইহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে" (ছাঃ ৮.২.১)। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই ফললাভে শুধুমাত্র ইচ্ছাই কি যথেষ্ট, না, সক্রিয় কোন কারণ থাকা প্রয়োজন? এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ইচ্ছামাত্রই ফললাভ হয়, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। মুক্ত পুরুষের ইচ্ছা এবং আমাদের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে—উহা ক্রিয়াশীল কারণের অবর্তমানেও ফল প্রসব করিবার শক্তি ধারণ করে।

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯॥

অতঃ এব (এই কারণেই) চ (এবং) অনন্যাধিপতিঃ (তাঁহার কোন নিয়ন্তা অধিপতি নাই)।

৯. এবং এই কারণেই মুক্ত পুরুষের কোন অধিপতি নাই।

[৯. মুক্ত পুরুষ ইচ্ছামাত্র সর্বময় কর্তা হইতে পারেন, সুতরাং তাঁহার কোন নিয়ন্তা বা কর্তা থাকিতে পারেন না।]

একজন মুক্ত পুরুষ নিজেই নিজের অধিপতি— স্বরাট্‌। "তাঁহারা সকললোকেই স্বচ্ছন্দগতি হন" (ছাঃ ৮.১.৬)।

অধিকরণ ৫ : ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত মুক্ত জীবাত্মা তাঁহার ইচ্ছামত শরীর অথবা অশরীর উভয়ভাবেই অবস্থান করিতে পারেন।

অভাবং বাদরিঃ, আহ হ্যেবম্‌ ॥৪।৪।১০॥

অভাবং (দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের) (অভাব) বাদরিঃ (বাদরি মুনি মনে করেন) আহ (শ্রুতি এইরূপ বলেন) হি (কারণ, যেহেতু) এবম্‌ (এইরূপ)।

১০. (মুক্ত জীবের কোন দেহ বা ইন্দ্রিয়) থাকে না (ইহা) বাদরি মুনি (মনে করেন), কারণ (শাস্ত্র) এইরূপ বলেন।

[১০. বাদরি মুনির মতে মুক্ত জীবাত্মা শরীররহিত অবস্থাতেই বিরাজ করেন, কারণ শাস্ত্র এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন।]

পূর্ববর্তী সূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞের ইচ্ছামাত্র কাম্যবস্তু আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্ত জীবাত্মার মন আছে। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই ব্রহ্মজ্ঞের কি শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিও আছে? বাদরি বলেন, "না ব্রহ্মজ্ঞের শরীর থাকে না, কারণ শাস্ত্রেই এইরূপ উক্তি আছে," "এই পুরুষ দৈব মানস চক্ষু অবলম্বনে এই সমস্ত"কাম্যবস্তু— অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মলোকে আছে তাহা— দর্শন করিয়া আনন্দিত হন" (ছাঃ৮.১২.৫)। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্ত আত্মার শুধু মনই আছে—ইন্দ্রিয়াদি নাই।

ভাবং জৈমিনিঃ, বিকল্পামননাৎ ।।৪।৪।১১।।

ভাবং (অস্তিত্ব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মনে করেন) বিকল্প-আমননাৎ (কারণ শাস্ত্র বলেন যে, বিভিন্ন আকার ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে)।

১১. (মুক্ত আত্মার) (দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি) থাকে—ইহা জৈমিনির মত, কারণ শাস্ত্রে আছে যে, (এইরূপ মুক্ত পুরুষের) নানারূপ দেহধারণ (করিবার ক্ষমতা আছে)।

[১১. জৈমিনি মুনি মনে করেন যে, মুক্ত আত্মা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন, এবং শাস্ত্রেও এইরূপ বিচিত্র দেহধারণের সপক্ষে উক্তি আছে।]

"তিনি এক প্রকার থাকেন; তিন প্রকার হন, পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার এবং নব প্রকার হন"— (ছাঃ ৭.২৬.২)। এই শ্রুতিটি বলিতেছে যে, একজন মুক্ত আত্মা একাধিক শরীর ধারণ করিতে পারেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে— মুক্ত আত্মা মনের সহিত দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিও পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাই জৈমিনির মত।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ।।৪।৪।১২।।

দ্বাদশাহবৎ (দ্বাদশাহ যজ্ঞের ন্যায়) উভয়বিধং (দুই প্রকারেরই) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ মুনি বলেন) অতঃ (ইহা হইতে)।

১২. ইহা হইতেই ঋষি বাদরায়ণ মনে করেন যে, মুক্ত আত্মা উভয় প্রকারেই (সশরীর ও অ-শরীর) অবস্থান করিতে পারেন— যেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞকে উভয় প্রকারই বলা যায়।

[১২. বাদরি এবং জৈমিনি মুনি দুইজনই শাস্ত্র হইতে ভাব এবং অভাবসূচক দুই প্রকার উক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে ঋষি বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উভয়ই সত্য— যেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞের দুইটি নাম একই বস্তুকে বুঝাইয়াছে।]

শাস্ত্রের দুই প্রকার উক্তি হইতে ঋষি বাদরায়ণ মনে করেন যে, মুক্ত আত্মা তাঁহার ইচ্ছামত দেহ ধারণ অথবা বিদেহ অবস্থায় উভয় প্রকারেই ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে পারেন। ইহা দ্বাদশাহ যজ্ঞের ন্যায়— এই যাহাকে সত্র এবং অহীন যজ্ঞ উভয় নামেই অভিহিত করা যায়।

তন্বভাবে সন্ধ্যবৎ, উপপত্তেঃ ॥৪।৪।১৩॥

তনু-অভাবে (শরীর না থাকিলে) সন্ধ্যবৎ (স্বপ্নবৎ— যাহা জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তির মধ্যাবস্থা) উপপত্তেঃ (ইহাই যুক্তিসঙ্গত যেহেতু)।

১৩. শরীর না থাকিলেও (কামনার পরিতৃপ্তি সম্ভব হয়) যেমন স্বপ্নে— এবং যেহেতু ইহাই সম্ভব (শরীর ব্যতীতও ভোগ)।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪।৪।১৪॥

ভাবে (যখন শরীর থাকে) জাগ্রৎবৎ (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়।)

১৪. যখন শরীর থাকে তখন কামনার পূর্তি হয় জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়।

[১৪. মুক্ত আত্মা অ-শরীর হইলে স্বপ্নের ন্যায় এবং স-শরীর হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় কামনা সম্ভোগের ন্যায় ইচ্ছামত বাসনার পূরণ করিতে পারেন।]

অধিকরণ ৬ : মুক্ত আত্মা যিনি সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি একই কালে বহু শরীরকে প্রাণবন্ত করিতে পারেন।

প্রদীপবদাবেশঃ, তথা হি দর্শয়তি ॥৪।৪।১৫॥

প্রদীপবৎ (প্রদীপ শিখার ন্যায়) আবেশঃ (প্রাণদানকারী) তথা (এইরূপ) হি (যেহেতু) দর্শয়তি (শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়)।

১৫. মুক্ত আত্মার (বিভিন্ন দেহকে) প্রাণসম্পন্ন করার ক্রিয়া হইল প্রদীপের অপর প্রদীপকে প্রজ্বলনের ন্যায়—কারণ শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে।

[১৫. একটি প্রদীপ যেমন নিজ দেহে বর্তমান থাকিয়া অনুরূপ বহু প্রদীপকেই প্রজ্বলিত করিতে পারে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ অন্যান্য বহু দেহকেও উদ্দীপ্ত করিতে পারেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে আছে।]

১১ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে যে, একজন মুক্ত পুরুষ ভোগের নিমিত্ত একই সময়ে বহু দেহ ধারণ করিতে পারেন। বিরুদ্ধপক্ষগণ মনে করেন যে এইরূপ অনুমান অর্থহীন; কারণ, ভোগ সেই দেহেই সম্ভব, যেখানে আত্মা এবং মন অবস্থান করে; অন্যান্য দেহগুলি হইল প্রাণহীন পুত্তলিকার ন্যায়, কারণ অবিভাজ্য আত্মা এবং মন একাধিক দেহে বর্তমান থাকিতে পারে না। এই সূত্রটি উক্ত মতকে খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিতেছে যে, অন্যান্য দেহগুলি প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র নহে; কারণ, একজন মুক্ত পুরুষ তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাহেতু এই সমস্ত দেহকেই জীবন্ত করিতে পারেন— যেমন একটি প্রদীপ শিখা বহু প্রদীপ শলাকাকেই নিজদেহ হইতে প্রজ্বলিত করিতে পারে। এই মুক্ত আত্মা তাঁহার ক্ষমতাবলে নিজ অন্তরস্থিত ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় আন্তর-ইন্দ্রিয়-যুক্ত বহু দেহ নির্মাণ করিয়া, ইহার দ্বারা সসীম হইয়া, নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেকটি সৃষ্ট দেহেরই একটি আত্মা আছেন, যাহার সাহায্যে প্রতিটি দেহেই ভোগ সম্ভব হয়। এই সত্যটি আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্, আবিষ্কৃতং হি ॥৪।৪।১৬॥

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ (সুষুপ্তি এবং ব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক মিলনের) অন্যতর-অপেক্ষম্ (ইহাদের যে কোন একটিকে লক্ষ্য রাখিয়া) আবিষ্কৃতং (ইহা [শ্রুতি দ্বারা] স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে) হি (যেহেতু)।

১৬. (সকল প্রকার জ্ঞান বিলুপ্তির যে উক্তি আছে) এই দুইটি অবস্থাকে (অর্থাৎ সুষুপ্তি এবং ব্রহ্মে পূর্ণ বিলুপ্তি) লক্ষ্য করিয়া— শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

[১৬. শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে যে জ্ঞান-বিলুপ্তির কথা আছে, যেমন সুষুপ্তি এবং ব্রহ্মলীন অবস্থায়— তাহা মুক্ত আত্মা ব্রহ্মজ্ঞ সম্পর্কে নহে—তাহা সুষুপ্তি এবং মৃত্যুদশাপন্ন সাধারণ জীব সম্পর্কে। শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে।]

"কাঁহাকে এবং কিসের দ্বারা জানিবে?" (বৃহঃ ২.৪.১৪); "পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি জানিবেন"— (তদেব, ৪.৩.৩০); "তিনি সলিলসদৃশ (স্বচ্ছ), এক, দ্রষ্টা ও অদ্বৈত হন" (তদেব, ৪.৩.৩২)। এই সকল শ্রুতি মুক্ত আত্মার সংজ্ঞাকে প্রতিষেধ করেন, সুতরাং মুক্ত আত্মার পক্ষে বহু দেহধারণ এবং সম্ভোগ কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?— ইহাই হইল বিরুদ্ধপক্ষের আপত্তি। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, এই উদ্ধৃত শ্রুতিগুলি হয় সুষুপ্তিকে নতুবা নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার আত্যন্তিক বিলুপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে; যেহেতু ইহা আমরা শ্রুতির প্রকরণ এবং প্রসঙ্গের বিচার হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারি। কিন্তু পূর্ববর্তী সূত্রসমূহে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি তাহা ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মলাভ বিষয়ক নহে— কিন্তু তাহা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি মাত্রই। এই অবস্থাটি অপর দুইটি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এবং সেইজন্যই এখানে সংজ্ঞা সম্ভব, যেহেতু বৈচিত্র্য আছে ভোগও আছে, স্বর্গে যেমন বিচিত্র ভোগ আছে এখানেও সেইরূপ আছে, পার্থক্য শুধু এই যে, ব্রহ্মলোক হইতে এই জগতে কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না; অপর পক্ষে যে সকল কর্মফল তাহাকে দেবতার মর্যাদা দান করিয়া স্বর্গে উন্নীত করিয়াছিল, সেই সকল কর্মের ফল নিঃশেষ হইলে পর, তাহাকে আবার স্বর্গ হইতে মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

অধিকরণ ৭ : ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত মুক্ত আত্মা সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অপর সর্ববিধ শক্তির অধিকারী হন।

জগদ্ব্যাপারবর্জম্ প্রকরণাৎ, অসন্নিহিতত্বাচ্চ ।।৪।৪।১৭।।

জগদ্ব্যাপারবর্জম (সৃষ্ট্যাদি শক্তি ব্যাপার ব্যতীত) প্রকরণাৎ (যেহেতু আলোচ্য বিষয় হইলেন ঈশ্বর— সেইহেতু) অসন্নিহিতত্বাৎ (এবং যেহেতু [মুক্ত আত্মার] উল্লেখ নাই) চ (এবং)।

১৭. (মুক্ত আত্মা) সৃষ্টি-স্থিতি ইত্যাদির ক্ষমতা ব্যতীত (অন্য ক্ষমতার অধিকারী হন)— কারণ যে প্রকরণে সৃষ্ট্যাদির কথা বলা আছে সেখানে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে—মুক্ত আত্মার কোন উল্লেখ নাই।

[১৭. মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তি ব্যতীত অপর সর্ববিধ শক্তির অধিকারী হন। সৃষ্টি প্রকরণে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। ঐ প্রকরণে মুক্ত পুরুষের কোন উল্লেখই নাই। মুক্ত পুরুষের ক্ষমতা সসীম।]

এখন প্রশ্ন হইল, যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদি করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং কর্তৃত্ব শক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের সেই শক্তি কি সসীম, না অসীম? বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, এই শক্তি অসীমই হওয়া সঙ্গত, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে; "সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতিপ্রাপ্ত হন"— (ছাঃ৭.২৫.২, ৮.১.৬); "সকল দেবতা তাঁহারই আরাধনা করেন" (তৈঃ ১.৫?)...। এই সূত্রটি বলিতেছে যে, মুক্ত আত্মা কর্তৃত্বশক্তি লাভ করেন—তবে তাঁহার বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব থাকে না। এই সৃষ্ট্যাদি শক্তি ব্যতীত অন্য সকল শক্তিই তাঁহাদের করায়ত্ত থাকে। সৃষ্ট্যাদি শক্তি কেন নাই?— কারণ যে সকল প্রকরণে শাস্ত্র সৃষ্ট্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সেখানে ঈশ্বরই হইলেন উদ্দিষ্ট বিষয়—অপরপক্ষে, এই প্রসঙ্গে মুক্ত জীবের কোন উল্লেখই সেখানে নাই। অধিকন্তু, এইরূপ হইলে বহু ঈশ্বরের সম্ভাবনা দেখা দিত এবং সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দেখা দিত। অতএব, মুক্ত পুরুষের শক্তি অপরিসীম নহে, সীমিত মাত্র; এবং এই শক্তি ঈশ্বরেচ্ছাধীনই।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেৎ, ন, আধিকারিক মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪।৪।১৮॥

প্রত্যক্ষ-উপদেশাৎ (প্রত্যক্ষ উপদেশ হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়) ন (না, তাহা নহে) আধিকারিকমণ্ডলস্থ-উক্তেঃ (কারণ শাস্ত্র বলেন যে, মুক্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন যে ব্রহ্ম সূর্যমণ্ডলাদির অন্তর্বর্তী থাকিয়া সূর্যাদিকে কর্মে প্রবৃত্ত করান)।

১৮. যদি এইরূপ বলা হয় যে, (মুক্ত জীবাত্মা সর্বশক্তির অধীশ্বর হন) কারণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে, (তাহার উত্তরে আমরা বলিব) না, তাহা নহে, (কারণ শাস্ত্র বলেন যে, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) এবং এই ব্রহ্মই সূর্যাদিমণ্ডলের অন্তর্বর্তী থাকিয়া সূর্যাদিকে নিজ নিজ কর্মাধিকারের শক্তি প্রদান করেন।

[১৮. শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বরাট্ হন সুতরাং তিনি সর্বক্ষমতাবান— যদি এইরূপ বলা হয়? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, তাহা ঠিক নহে, কারণ ইহাও শাস্ত্রে আছে যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন— সেই ব্রহ্মই সূর্যাদির শক্তিরূপে তাহাদের অন্তর্বর্তী থাকিয়া তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করান। ব্রহ্মই স্বরাট্— মুক্ত জীব নহে।]

"তিনি স্বরাট্ হন" (তৈঃ ১.৬)। শ্রুতির এই প্রত্যক্ষ উক্তিহেতু বিপক্ষবাদিগণ মনে করেন যে, মুক্ত পুরুষ সকল শক্তিরই অধিকারী হন। ইহার উত্তরে এই সূত্রটি বলিতেছে যে, তাহার শক্তি ঈশ্বরের শক্তির অধীন, কারণ শ্রুতির পরবর্তী অংশে এইরূপ আছে— "তিনি মনের অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হন"— এই ঈশ্বরই সূর্যমণ্ডলাদিতে অবস্থান করিয়া, সূর্যাদিকে তাহাদের স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত রাখেন। অতএব শ্রুতির এই পরবর্তী অংশ হইতে ইহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্তপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই তাঁহার শক্তিলাভ করেন— এবং তাঁহার উপরই তিনি নির্ভরশীল। সুতরাং মুক্ত জীবাত্মার শক্তি অসীম নহে।

বিকারাবর্তি চ তথা হি, স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥

বিকার-অবর্তি (সকল বিকারের বহির্ভূত) চ (এবং) তথা (সেইরূপ) হি (কারণ) স্থিতিম্ (স্থিত বলিয়া) আহ (শাস্ত্র বলেন)।

১৯. এবং (পরমেশ্বরের এমন একটি রূপ আছে) যাহা সকল বিকারশীল সৃষ্ট পদার্থ হইতে ঊর্ধ্বে, শাস্ত্র তাঁহার (দুই প্রকার অস্তিত্বের কথাই) ঘোষণা করিয়াছেন।

[১৯. ব্রহ্ম সকল সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্বর্তীও বটেন, আবার ইহাদের বহির্ভূত অবিকারী অবস্থায়ও অবস্থান করেন। শাস্ত্রে তাঁহার এই দুই অবস্থার কথাই বর্ণিত আছে।]

"উক্ত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমাও সেই পরিমাণ, অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপ সর্বভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র। পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম) কিন্তু তাহা হইতেও মহত্তর, অর্থাৎ যিনি গায়ত্রী-ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রিপাদ অবিকারী পূর্ণব্রহ্ম, তিনি আপন স্তান-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।"— (ছাঃ ৩.১২.৬) এই শ্রুতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পরমেশ্বর (পরব্রহ্ম) দুইরূপেই অবস্থান করেন, অতীন্দ্রিয়রূপে এবং আপেক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ। যে উপাসক পরমেশ্বরকে তাঁহার আপেক্ষিক সাকাররূপে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহার (ব্রহ্মের) অতীন্দ্রিয়-রূপ প্রাপ্ত হন না— কারণ, শ্রুতি বলেন, "(ব্রহ্মকে) তাঁহাকে উপাসক যেভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেইরূপই প্রাপ্ত হন।" এইরূপভাবে, যেহেতু উপাসক পরমেশ্বরের অশেষগুণ ও শক্তিবিশিষ্ট সগুণরূপেরও সম্পূর্ণ ধারণা করিতে সক্ষম নহেন, সেইহেতু তিনি তাঁহাকে আংশিকভাবে মাত্র ধারণা করিতে পারেন। এইজন্যই মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের অংশমাত্র সসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন— স্বয়ং পরমেশ্বরের ন্যায় অসীম শক্তির অধিকারী হইতে পারেন না।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ।।৪।৪।২০।।

দর্শয়তঃ (দুইটি [প্রত্যক্ষ ও অনুমান] প্রদর্শন করে) চ (ও) এবং (এইরূপ) প্রত্যক্ষ-অনুমানে (প্রত্যক্ষ এবং অনুমান)।

২০. এবং প্রত্যক্ষ এবং অনুমান হইতেই এইরূপ বুঝিতে পারা যায়।

[২০. প্রত্যক্ষ এবং অনুমান— এই দুইটি হইতেই ইহা (ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় সত্তাটি) বুঝিতে পারা যায়।]

এই সূত্রটি বলিতেছে যে, ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় সত্তার বিষয়টি শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী সূত্রে যে রূপটির উল্লেখ করা হইয়াছে একটি দৃষ্টান্তরূপে এই সূত্রটি শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণের উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

"সূর্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র ও তারকাগণও নহে"— ইত্যাদি (মুঃ২.২.১০)। "সূর্য সেখানে আলোক দেয় না, চন্দ্র অথবা অগ্নিও নহে"— (গীতা ১৫.৬)।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ।।৪।৪।২১।।

ভোগমাত্র-সাম্য-লিঙ্গাৎ (শুধুমাত্র ভোগবিষয়ে সাম্যের লক্ষণ হেতু) চ (এবং)।

২১. এবং লক্ষণ হেতু (শাস্ত্রে প্রদর্শিত) সাম্যের (মুক্ত পুরুষের পরমাত্মার সহিত) শুধুমাত্র ভোগ ব্যাপারে।

[২১. শুধু ভোগব্যাপারে মাত্র পরমেশ্বর এবং মুক্ত পুরুষের মধ্যে সাম্যভাব আছে— সর্ব শক্তিমত্তা বিষয়ে নহে। সৃষ্ট্যাদি পরমশক্তির অধিকারী— একমাত্র পরমেশ্বর— মুক্ত জীব নহে।]

শ্রুতির প্রদত্ত লক্ষণসমূহ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্ত পুরুষের শক্তি ঈশ্বরের ন্যায় অসীম নহে, এবং এই সকল মুক্ত আত্মার সহিত পরমেশ্বরের সাম্য শুধুমাত্র ভোগব্যাপারে— সৃষ্ট্যাদি শক্তিব্যাপারে নহে। "নিখিল প্রাণী যেমন এই (হিরণ্যগর্ভ) দেবতাকে পূজা করে, ঠিক তেমনি সর্বভূত এতাদৃশ জ্ঞানীকে পূজা করে" (বৃঃ ১.৫.২০); "এই ব্রতের ফলে তিনি এই দেবতার সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন" (তদেব, ১.৫.২৩)। এই সকল শ্রুতি শুধুমাত্র ভোগবিষয়েই সাম্যের কথা বলে, সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের কোন উল্লেখই এখানে নাই।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২॥

অনাবৃত্তিঃ (অ-প্রত্যাবর্তন) শব্দাৎ (শাস্ত্রের ঘোষণা অনুসারে)।

২২. মুক্ত জীব আর (মর্তলোকে) প্রত্যাবৃত্ত হন না— শাস্ত্রে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে।

[২২. মুক্ত আত্মা ব্রহ্মলাভ করার পর ব্রহ্ম-সদৃশ সর্বশক্তিমান না হইলেও তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আর মর্তলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে ইহা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা আছে।]

বিরুদ্ধপক্ষ বলেন যে, যেহেতু মুক্ত আত্মার শক্তি সীমিত, সেইহেতু সকল সীমিত বস্তুর ন্যায় তাঁহারও ধ্বংস পরিণাম আছে— এবং সেইজন্যই মুক্ত আত্মাকে আবার ব্রহ্ম-লোক হইতে মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই সূত্রটি এইরূপ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করিতেছে— শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা। দেবযানের মাধ্যমে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করেন না। "(বিদ্বান্) তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করেন"— (ছাঃ ৮.৬.৬) ; "তাঁহাদের (এই সংসারে) পুনরাবৃত্তি হয় না" (বৃহঃ ৬.২.১৫)।

'অনাবৃত্তি'— ইত্যাদি শব্দের দ্বিরুক্তি হইতে বুঝিতে হইবে যে গ্রন্থখানা এখানে সমাপ্ত হইল।

সূত্রানুক্রমণিকা

অধ্যায় = অ., পাদ = পা., সূত্র = সূ.

মোট সূত্রসংখ্যা = ৫৫৫

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

আলোচিত গ্রন্থ তালিকা

১। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যম্ (রত্নপ্রভা, ভামতী এবং ন্যায়নির্ণয় টীকা সহ) —কাশীশেষ বেঙ্কটাচল শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত ছোটুপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। বৈয়াসক ন্যায় মালা— দধীচপণ্ডিত শিবদত্ত সম্পাদিত।

৩। বেদান্ত-দর্শনম্: শাঙ্কর ভাষ্য এবং ভামতী টীকা সহ— শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ সম্পাদিত।

৪। বেদান্ত-দর্শনম্: শাঙ্কর ভাষ্য এবং ভামতী টীকা সহ— শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত বঙ্গানুবাদ।

৫। The Vedanta-Sutras: শঙ্করাচার্যকৃত টীকা সহ। George Thibaut কৃত ইংরেজী অনুবাদ সহ।

৬। The Vedanta Sutras —রামানুজ কৃত টীকাসহ এবং George Thibaut কৃত ইংরেজী অনুবাদ সহ।

৭। অপ্পয় দীক্ষিত, সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ— এস. এন. সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী-কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ সহ।

৮। শ্রীধর মজুমদার, The Vodanta Philosophy or ব্রহ্মসূত্র (মুখ্যত নিম্বার্কভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।)

৯। এস. এন. দাসগুপ্ত, A History of Indian Philosophy.

১০। এস. রাধাকৃষ্ণন —Indian Philosophy.